



মাসুদ রানা

মুক্ত বিহঙ্গ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

এক

মেশিন বা যন্ত্রের মধ্যে নারীসুলভ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। আপনমনে মুচকি একটু হেসে কথাটা ভাবল মাসুদ রানা। ওর কাছে মেশিন মাদ্রেই স্ত্রীলিঙ্গ। অস্বীকার করবার যো আছে ওগুলো কৌতুকপ্রিয়, ছলনাময়ী এবং কেউ কেউ নষ্টা? কাজেই সবুজ আমগাছ তলায় এক সারে দাঁড় করানো বাহনগুলোকে প্রথমবার দেখামাত্র রানা বুঝল, ওগুলো অঘটনঘটনপটিয়সী লৌহমানবী।

তাজানিয়া সরকার শুধু এই গাড়িগুলোই নয়, বাড়তি অথবা বাতিল আরও অনেক জিনিস নিলামে বিক্রি করতে যাচ্ছে। অন্যান্য জিনিসের স্তূপ থেকে দূরে রাখা হয়েছে গাড়ি পাঁচটা। মে মাস, এবং সময়টা দুই বর্ষা মরশুমের মধ্যবর্তী শীতল ঋতু হলেও, সকালের মেঘহীন আকাশের নীচে জ্বলন্ত তন্দুর হয়ে আছে দার-এস-সালাম। আমগাছ তলার ছায়ায় পৌছে স্বস্তিবোধ করল রানা, দাঁড়াল লৌহমানবীদের গা ঘেঁষে, খুঁতখুঁতে মেকানিকের দৃষ্টিতে জরিপ শুরু করল।

পাঁচিল ঘেরা বড় উঠনটার চারদিকে একবার চোখ বুলাল ও, দেখল সে শুধু একাই গাড়িগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী। বহুবর্ণ সম্ভাব্য

ক্রেতারা ভিড় করেছে ভাঙা কোদাল, শাবল, খালি ড্রাম, টেবিল-চেয়ার ইত্যাদির সামনে, আর্মারড কারগুলোর দিকে কেউ ভুলেও তাকাচ্ছে না। ওগুলোর দিকে আবার ফিরল ও, জ্যাকেট খুলে ঝুলিয়ে রাখল আমগাছের নিচু একটা ডালে।

ভাল জাতের জিনিস, তবে কঠিন ধকল গেছে ওগুলোর উপর দিয়ে। শক্ত চোখা রেখা আর কিনারাগুলো ভেঁতা হয়ে গেছে, রঙ চটে যাওয়ায় মরচে ধরেছে গায়ে, উপরের অংশ কাক আর বাদুড়ের বিষ্ঠা দিয়ে লেপা। ক্যানভাস ব্যাগটা একপাশে সরিয়ে রাখল রানা, ভিতরে টুলস্ রয়েছে। গাড়িগুলোর ঠিকানা কুলজী সম্পর্কে জানা আছে ওর। কারিগরি নৈপুণ্যের ভারি চমৎকার পাঁচটা নমুনা, তাঞ্জানিয়া উপকূলে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ষাট সত্তর বছর আগে শ্রেইনার বানিয়েছিল ওগুলো, উঁচু গম্বুজে ম্যাক্সিম মেশিনগান বসানোর জন্য রয়েছে খোলা জায়গা, এই মুহূর্তে শূন্য একটা অক্ষিকোটরের মত হাঁ করা। এঞ্জিন হাউজিঙের উপর প্ল্যাটফর্মটা ঢোকো আর ঢালু, অত্যন্ত ভারি আর্মার প্লেট, রিবেটগুলোর সারি নিখুঁত ভাবে সাজানো, ছুটে আসা শত্রুর বুলেট থেকে রেডিয়েটরকে রক্ষার জন্য ইস্পাতের শাটার আছে, প্রয়োজনে বন্ধ করা যায়। ধাতব হুইলে নিরেট রাবারের টায়ার লাগানো, কাঠামোটাকে উঁচু করে রেখেছে। রানার ভাবতেও খারাপ লাগল সম্ভবত ওর হাত দিয়েই বডি়র ভিতর থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসবে এঞ্জিনগুলো। দু'একটা বডিও বোধহয় বাতিল করতে হবে, রঙের পৌঁচ দিয়ে আর যাই হোক বুলেটের ফুটো বন্ধ করা যায় না। আর্মারড কারগুলোর উপর দিয়ে একটা বিশ্বযুদ্ধের ধকল গেছে, আবরণের ভিতর মরচে ধরা লোহা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা তাই সন্দেহ। অবশ্য মাঝখানে এক সময় এঞ্জিন বদলে নতুন সাড়ে ছয় লিটার বেন্টলি লাগানো হয়েছিল, পরীক্ষা করে দেখতে

হবে সেগুলোরই বা কী অবস্থা। নতুন এঞ্জিন লাগানোর পর তাঞ্জানিয়া সরকার একটানা কয়েক যুগ সীমান্ত এলাকায় প্রহরার কাজে ব্যবহার করেছে ওগুলো, ড্রাইভাররা বেশিরভাগ সময় দুর্গম পাহাড় আর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গরুচোরদের ধাওয়া করে ফিরেছে। তবু রানার মনে ক্ষীণ আশা, যতই কিনা দুঃসময়ের ভিতর দিয়ে আসুক, বেন্টলি এঞ্জিন একেবারে বাতিল হওয়ার জিনিস না। অপারেশন শুরুর মুহূর্তে সার্জেন যেমন আস্তিন গুটায়, রানাও তেমনি গুটাল, নড়ে উঠল ঠোঁট জোড়া, 'তৈরি হও, সুন্দরীরা; তোমাদের নাড়ী-নক্ষত্র যাচাই করা হবে।'

মাসুদ রানা প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা, গায়ে অতিরিক্ত চর্বি না থাকলেও হাড়গুলো চওড়া এবং পেশীবহুল শরীর, আর্মারড কারের বডি়র ভিতর ঢুকবার পর নড়াচড়ার জায়গা খুব কমই অবশিষ্ট থাকল। কিন্তু কাজের ভিতর মন ঢেলে দেওয়ায় কোথায় কী কষ্ট বা অসুবিধে হচ্ছে খেয়ালই থাকল না ওর। গোল করা জোড়া ঠোঁট থেকে বিরতিহীন শিস হয়ে বেরিয়ে আসছে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'-সুর, ভিতরের আবছা অন্ধকারে কুঁচকে আছে চোখের চারপাশ।

দ্রুত কাজ করছে রানা। প্রথমে কন্ট্রলের থ্রটল আর ইগনিশন সেটিং চেক করল। দেখে নিল পিছনে বসানো ফুয়েল ট্যাংক থেকে লাইনগুলো কোন্ পথ ধরে এসেছে। ড্রাইভারের সিটের তলায় কক রয়েছে দেখে সন্তুষ্টির আভা ফুটল মুখে। পাঁচিল বেয়ে উঠবার ভঙ্গিতে টারিট থেকে বেরিয়ে এল ও, লাফ দিয়ে বাহনের উঁচু পাশটায় নামল, চুল থেকে গড়িয়ে গালে নেমে আসা ঘামের ধারা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছবার জন্য থামল মুহূর্তের জন্য, তারপর সামনে এগিয়ে খুলে ফেলল আর্মারড এঞ্জিনকভার।

এঞ্জিনে চোখ পড়তেই খুশিতে নেচে উঠল মন। বেন্টলির গায়ে ধুলো আর তেল মাখামাখি হয়ে আছে, কিন্তু মরচের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কাঠামোর কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই, প্রতিটি পার্টসের আকৃতি অবিকৃত। হাতের আঙুল আর তালু দিয়ে এঞ্জিনের গায়ে হাত বুলাল রানা, যেন আদর করছে। এঞ্জিন সাম্প থেকে ডিপস্টিক বের করে এক ফোঁটা তেল নিল দু'আঙুলের মাঝখানে। করকরে ভাব অনুভব করে গম্ভীর হলো চেহারা, গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল কাঠি। টেনে প্লাগ খুলল ও, অলসভঙ্গিতে ঘুরঘুর করতে দেখে এক আফ্রিকানকে কাছে ডেকে এক শিলিঙের বিনিময়ে ক্র্যাংকটা ঘোরাতে বলল, হাতের তালু ঠেকিয়ে কমপ্রেশন পরীক্ষা করল।

দ্রুত হাঁটাচলা করছে রানা, কখনও পিছু হটছে, কখনও সামনে বাড়ছে, দূর থেকে দেখে মনে হতে পারে নৃত্যচর্চায় মশগুল। এক এক করে পাঁচটা আর্মারড কার পরীক্ষা করল ও, গুরুত্বপূর্ণ কোন অংশই চেক করতে বাকি রাখল না। কাজ শেষ করে বুঝল, তিনটে অবশ্যই চালানো যাবে, সম্ভবত চারটে।

বাকি একটার কোন আশা নেই। ওটার এঞ্জিন ব্লকে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, রানার মনে হলো পিঠে মাল্হত নিয়ে একটা হাতি অনায়াসে গলে যেতে পারবে। আর পিস্টনগুলো নিজেদের খোপে এমন নিরেটভাবে আটকে গেছে, দু'জন মিলে ক্র্যাংক হাতল ঘুরিয়েও সেগুলোকে নড়ানো গেল না।

দুটো গাড়ির গোটা কারবুরেটরই নেই, তবে চেষ্টা করলে হয়তো বাতিল লোহা-লক্কড়ের গাদা থেকে একটা অন্তত ম্যানেজ করা যেতে পারে। অর্থাৎ কারবুরেটর পাওয়া গেলে মোট চারটে সচল গাড়ি ভাগ্যে জুটবে। বেশি আশা না করে, তিনটেই ধরা উচিত।

প্রতিটি যদি এক হাজার একশো শিলিঙে বিক্রি করা যায়, সব মিলিয়ে হাতে আসবে তিন হাজার তিনশো শিলিং। কেনা এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বাদ দেওয়া যাক এক হাজার শিলিং, তারমানে লাভ থাকবে দু'হাজার তিনশো শিলিং। অর্থাৎ নিলামের সময় প্রতিটির জন্য দুশো শিলিঙের বেশি ডাক দেওয়া যাবে না। আফ্রিকান ছোকরাকে প্রতিশ্রুত শিলিং ছুঁড়ে দিয়ে আপনমনে হাসতে লাগল রানা। কেউ যখন স্বদেশ থেকে বহুদূর যোগাযোগবিহীন অনির্দিষ্টকাল আত্মগোপন করে থাকে, দু'হাজার তিনশো তাঞ্জানিয়ান শিলিং তার কাছে অস্তিত্ব রক্ষার বিরাট অবলম্বন তো বটেই।

ট্রাউজার থেকে পকেট-ঘড়িটা বের করে চোখ বুলাল রানা। নিলাম শুরু হতে এখনও দু'ঘণ্টা দেরি আছে। বেন্টলিগুলোর উপর কাজ শুরু করবার জন্য অস্থির হয়ে আছে ও। লাভটা বড় কথা নয়, এঞ্জিন নিয়ে কাজ করতে ভাল লাগে ওর, তা ছাড়া সময়টাও সুন্দর কাটত। দেখে শুনে মনে হলো মাঝখানে দাঁড়ানো গাড়িটার উপর হাত দিলে খুব তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যাবে। মাডগার্ডের আর্মারড উইং-এ ক্যানভাস ব্যাগটা রেখে একটা ৩/৮ ইঞ্চি স্প্যানার বেছে নিল। পরমুহূর্তে কাজের ভিতর বুঁদ হয়ে গেল ও।

আধ ঘণ্টা পর এঞ্জিনের ভিতর থেকে মাথা বের করল রানা, ন্যাকড়াই হাত মুছতে মুছতে গাড়ির সামনে ছুটে এল।

ফুলে উঠল ডান হাতের পেশী, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে। প্রথমবারের চেষ্টায় ভারি এঞ্জিন যান্ত্রিক শব্দহীন তুলল, কিন্তু পরমুহূর্তে থেমে গেল, স্টার্ট নিল না। মিনিটখানেক পর হাতল খুলে নিল রানা, ন্যাকড়া দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তেল আর কালির দাগ অবশ্য আগেই ভৌতিক করে তুলেছে চেহারাটা।

‘দেখেই বুঝেছিলাম, তুমি রগচটা,’ ফিসফিস করে বলল ও। ‘কিন্তু ডার্লিং, আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।’

আবার ওর কাঁধ আর মাথা এঞ্জিন কাউলিঙের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল, ভিতর থেকে শক্ত ধাতুর সঙ্গে স্প্যানারের ঠোকাঠুকি আর শিসের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। দশ মিনিট পর আবার ক্র্যাঙ্ক হাতল ঘোরাল ও। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল এঞ্জিন, ব্যাক-ফায়ারের আওয়াজ হলো কামান দাগার মত, হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল-ওটা উল্টো করা মুঠোর ভিতর ধরা থাকলে বুড়ো আঙুলটা ছিঁড়ে নিয়ে যেত।

‘শালীর দেমাক কী!’ হতভম্ব রানা টারিটে উঠে কন্ট্রোলের দিকে ঝুঁকল, রিসেট করল ইগনিশন।

পরের বার ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে সচল হলো এঞ্জিন, নিস্তেজ হতে শুরু করে আবার সতেজ হলো, তারপর নিয়মিত শব্দহীন বজায় রাখল। আড়ষ্ট সাসপেনশনের উপর কাঠামোটা মৃদু কাঁপছে, তবে জ্যাগু থাকল এঞ্জিন।

পিছিয়ে এল রানা, দরদর করে ঘামছে, চেহারায় লালচে একটা আভা, তবে আনন্দে চকচক করছে চোখ জোড়া।

‘পরস্পরকে আমরা চিনেছি, তাই না?’

‘ব্রাভো! ব্রাভো!’ পিছন থেকে, দরাজ কণ্ঠস্বর। প্রায় চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘাড় ফেরাল রানা। ভুলেই গিয়েছিল দুনিয়ায় সেই একমাত্র প্রাণী নয়। অপ্রতিভ বোধ করল ও, যেন একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপন শারীরিক একটা বৈশিষ্ট্য আড়াল থেকে দেখে ফেলেছে কেউ। লোকটার দিকে কটমট করে তাকাল ও, পোজ দেওয়ার মার্জিত ভঙ্গিতে আমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে।

‘দারুণ একটা কৃতিত্ব চাক্ষুষ করলাম, মাইরি বলছি!’ মিটিমিটি

www.BanglaBook.org

হাসছে আগন্তুক, তার কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার কানে ঢুকতেই রানার ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেল চুল। উচ্চারণ এবং বাচনভঙ্গি ইংলিশ, সবজাতা ট্যুরিস্টদের একজন বলে মনে হলো। রানার জানা আছে, পরের ব্যাপারে নাক গলাতে ওদের জুড়ি মেলা ভার। কে জানে লোকটা কে বা কেমন! পালিয়ে তাঞ্জানিয়ায় চলে এসেছে ও, আবার না তাঞ্জানিয়া ছেড়ে পালাতে হয়।

পরে আছে মাখন রঙা দামী ট্রপিক্যাল লিনেন-এর সুট, পায়ে সাদা আর খয়েরী জুতো। সাদা স্ট্র হ্যাটের চওড়া কার্নিস ছায়া ফেলেছে মুখে। তবে চেহারায় লেপ্টে থাকা হাসিখুশি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূচক ভাব রানার চোখ এড়াল না। প্রচলিত অর্থে সুদর্শন বলা চলে, যদিও সহজ-সরল হাবভাবের মধ্যে সকৌতুক শয়তানীর একটা ভঙ্গি উঁকি-ঝুঁকি মারছে বলে সন্দেহ হলো রানার। চেহারায় অভিজাত একটা ভাবও আছে, তবে তার কতটুকু বানোয়াট বা অর্জিত আর কতটুকু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, বলা কঠিন। তবে সন্দেহ নেই সুন্দরীদের আবেগ উথলে উঠবার একটা কারণ সৃষ্টি করবে এই মুখ, তাতে গতি সঞ্চরণ করবে দরাজ কণ্ঠস্বর। বহুজাতিক কোন কোম্পানীর সেলস এজেন্ট? উঁহ, সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল রানা। কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল ওর। লোকটা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাত ও পা স্থির, তবু গোটা ভঙ্গিটার মধ্যে কী যেন একটা আছে যা ধরা দেই দেই করেও দিচ্ছে না।

‘ওটাকে জ্যাগু করতে মোটেও বেশি সময় নাওনি তুমি।’ গাছে হেলান দিয়েই থাকল, তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা বদলে গেল। জোড়া পা নীচের দিকে ক্রস চিহ্নের আকৃতি পেল, একটা হাত কোট পকেটের ভিতর। আবার হাসল সে, এবার তার হাসিতে ব্যঙ্গ আর

চ্যালেঞ্জ পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। লোকটাকে চিনতে ভুল করেছে ও। না, সাধারণ কোন লোক নয়। ভালমানুষ তো নয়ই। ওই চোখ জোড়া একজন সর্বস্বহরণকারী লুটেরার, ব্যঙ্গাত্মক এবং নেকড়েসুলভ, ছায়ার ভিতর ছুরির ধারাল ফলার মত বিপজ্জনক।

‘বাকিগুলোও যে সহজে মেরামতযোগ্য তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই,’ অনুসন্ধানী সুর, শ্রেফ মন্তব্য নয়।

‘ভুল করছ, বন্ধু।’ সব হারানোর একটা আশংকা রীতিমত ব্যথা হয়ে জাগল রানার বুকে। চেহারা সুরে দেখে মনে হয় না সৌখিন ইংরেজ পাঁচটা আর্মারড কার কিনতে চাইবে, আবার বলাও যায় না-হাজার হোক বেনিয়ার জাত। সাবধানের মার নেই, গাড়িগুলোর অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাইয়ে দিলে মন্দ হয় না। ‘শুধু এই একটাই কোন রকমে চলবে, এটারও নাড়িভুড়ি ছিঁড়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শব্দ শুনে বুঝছ না, উন্মাদ কাঠমিস্ত্রী যেন যেখানে-সেখানে পেরেক ঠুকছে।’ কাউলিঙের ভিতর হাত গলিয়ে ম্যাগনিটো অফ করল ও।

হঠাৎ এঞ্জিনের আওয়াজ থেমে যাওয়ায় নিস্তব্ধতা নেমে এল। গলার স্বরে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে আবার বলল রানা, ‘বাতিল লোহা!’ সামনের চাকার কাছে মাটিতে থুথু ফেলল ও, কিন্তু চাকায় নয়। চেষ্টা করেও অতটা নির্দয় হতে পারল না ও। তারপর যন্ত্রপাতি কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরল, এক কাঁধে ব্যাগ অপর কাঁধে জ্যাকেট ঝুলিয়ে রওনা হলো গেট অভিমুখে, লোকটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না।

‘তুমি তা হলে নিলামে অংশগ্রহণ করছ না, ওল্ড চ্যাপ?’ আগন্তুক গাছতলা ছেড়ে রানার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

‘আরে না!’ গলার সুরে বিপুল হতাশা ফোটাতে চেষ্টা করল রানা। ‘তুমি?’

‘খ্যেৎ, ভাঙাচোরা পাঁচটা আর্মারড কার নিয়ে আমি কী করব!’ নিঃশব্দে হাসল লোকটা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। ‘বাঙালী, তাই না? ভারতীয়?’

দাঁড়িয়ে পড়তে গিয়েও দাঁড়াল না রানা। উত্তর না দিয়ে পাঁচটা প্রশ্ন করল ও, ‘কেন মনে হলো?’

‘কোলকাতায় ছিলাম কিছুদিন,’ আড়ষ্ট উচ্চারণে বাংলায় বলল আগন্তুক। ‘এঞ্জিনিয়ার?’

‘তুমি আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছ,’ কঠিন সুরে বলল রানা। হোটেলের খাতায় লেখা তথ্যগুলোই উচ্চারণ করেছে লোকটা। ভারতীয়, কার মেকানিক। লোকটা এঞ্জিনিয়ার বলেছে ব্যঙ্গ করে। তবে কোলকাতায় বোধহয় সত্যি ছিল, চেহারা দেখে ধরে নিয়েছে বাঙালী।

‘চলো কিছু পান করা যাক, কী?’ ভুরু নাচিয়ে প্রস্তাব করল লোকটা, রানার মনে হলো ঘুষ দিতে চাইছে।

‘কত খরচ করতে চাও হিসেব করে টাকাটাই বরং দাও,’ বলল ও। ‘আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।’

সৌখিন আগন্তুক আবার হেসে উঠল, বন্ধুত্বসূচক সকৌতুক শব্দবাংকার। ‘তা হলে শুভেচ্ছা জানাই, ওল্ড চ্যাপ,’ বলল সে, তাকে পিছনে ফেলে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল রানা তাপদন্ধ দার-এস-সালামের খোলা রাস্তায়, পিছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে হাঁটতে লাগল হন হন করে। দৃঢ় পদক্ষেপ, কাঁধ জোড়ার আড়ষ্ট ভাব পরিষ্কার জানিয়ে দিল এখানেই বিদায়পর্ব চূড়ান্ত, পিছু নিয়ে কোন ফায়দা হবে না।

প্রথম বাঁকেই খুদে একটা রেস্টোরাঁ পেয়ে গেল রানা, সরকারী

গুদামের উঠান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ, লুকিয়ে থাকবার জন্য পছন্দ হলো ওর। একটা নোটিস দেখে ভাল লাগল, শুধু বিদেশীদের বিয়ার বা মদ পরিবেশন করা হয়। বরফ আর বিয়ার নিয়ে বসল রানা, চিন্তায় পড়ে গেছে। ব্যাটা ইংরেজ ওকে ভারি অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি দান করেছে, গাড়িগুলো সম্পর্কে তার আগ্রহ শ্রেফ নির্মল কৌতূহল বলে মনে হয়নি। নিলামে যদি জাত বেনিয়া কেউ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ওকে হয়তো প্রতিটি গাড়ির জন্য দুশো শিলিঙের বেশি প্রস্তাব দিতে হতে পারে। জ্যাকেটের ভিতরের পকেট থেকে ছাগ চর্মের তৈরি মানিব্যাগটা বের করল রানা, ওর সমস্ত জাগতিক সম্পদের এটাই বর্তমানে একমাত্র ভাণ্ডার-অন্তত যতদিন না বি.সি.আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে পরিচিত দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ হয়। কোলের উপর সব টাকা বের করে গুণল ও। তাঞ্জানিয়া শিলিং রয়েছে হাজার পাঁচেক। কিছু ডলার আর ব্রিটিশ পাউন্ডও আছে, ভাঙানো কঠিন কিছু নয়, তবে সব মিলিয়ে অংকটা এত বড় নয় যে রানী এলিজাবেথের সৌখিন ধান্দাবাজ প্রজার সঙ্গে টক্কর দেওয়া যায়। বিয়ার শেষ করল রানা, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল, শক্ত করল চোয়াল, আরেকবার চোখ বুলাল পকেট-ঘড়ির উপর। বারোটো বাজতে আর পাঁচ মিনিট।

দীর্ঘদেহী মাসুদ রানাকে ভিজে বেড়ালের মত গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেখে সামান্য হতাশ হলো মেজর মাইকেল সেভারস্, কিন্তু মোটেও বিস্মিত হলো না। পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন একটা টি-পার্টিতে শুধু বয়োবৃদ্ধারা রয়েছে, কাঁটাচামচ চুরি করবার জন্য চুপিসারে ঢুকে পড়েছে একজন লোক-রানার হাঁটা আর হাবভাব দেখে এরকম একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে

গেল তার।

আমগাছ তলায় উল্টো করা একটা ড্রামের উপর বসে রয়েছে মাইকেল সেভারস্, ড্রামের উপর একটা রুমাল বিছিয়ে নিয়েছে দামী সুটে যাতে কোন ময়লা না লাগে। স্ট্রি হ্যাটটা তার হাতে রয়েছে, মাথার চুল সুন্দর করে ছাঁটা এবং নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো। চুলের এই রঙ সহজে চোখে পড়ে না, সোনালি লালচে, কোমল জ্বলজ্বলে একটা ভাব নিয়ে শোভা পাচ্ছে মাথায়। গাঁফ জোড়াও একই রঙের, চওড়া এবং খাটো করে ছাঁটা। রোদে পোড়া তামাটে মুখ, স্নান নীল রঙের চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। উঠন পেরিয়ে জোড়া আমগাছের দিকে এগোচ্ছে রানা, ক্রেতার সর্বাভিভিড় করেছে সেখানে। সরাসরি না তাকিয়েও টের পেয়ে গেছে ও, কেউ একজন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে ওকে। কে হতে পারে লোকটা আন্দাজ করে নিয়েছে। পরিবর্তনটুকু সূক্ষ্ম হলেও, মাইকেল সেভারসের দৃষ্টি এড়াল না। শক্ত হয়ে উঠল রানার কাঁধের পেশী, দৃঢ় হলো হাঁটবার ভঙ্গি, উঁচু করা মাথা আর ফুলে থাকা বুক আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চোখ ফিরিয়ে নিল মাইকেল সেভারস্, পকেট থেকে এনভেলোপ বের করে নিজের আর্থিক সঙ্গতির হিসাব পাবার চেষ্টা করল।

তার আর্থিক অবস্থা রানার চেয়ে কোন অংশে সুবিধের নয়, গত পাঁচটা মাস ভাগ্য তাকে কোন রকম সহায়তা করেনি। অসুস্থতার মিথ্যে অজুহাতে ব্রিটিশ আর্মি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মেজর মাইকেল সেভারস্ অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্য আর আফ্রিকা চষে বেড়াচ্ছে। অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে ব্যবসাকে জোড়া লাগানোয় ভারি ওস্তাদ সে। ‘যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই,’ এই নীতি কখনোই তার দ্বারা লঙ্ঘিত

হয়নি। কিন্তু তার কপাল মন্দ, শিয়া মিলিশিয়াদের কাছে বিক্রি করা অস্ত্রের চালান বৈরত বন্দরে পৌঁছানোর মাত্র দু'ঘণ্টা আগে খ্রীস্টান ফালাঞ্জিস্টদের স্যাবোটাজের শিকার হয়ে ভূমধ্যসাগরে তলিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে তার পাঁচ বছরের কষ্টকর সাধনালব্ধ মূলধন। তবে হাল ছেড়ে দেয়নি সে, আবার প্রথম থেকে শুরু করবার জন্য যথেষ্ট খাটাখাটনি করছে। ব্যবসায়িক বুদ্ধি, কূটকৌশল, মোক্ষম জায়গায় উপটোকন বিতরণ ইত্যাদির সাহায্যে অস্ত্রের আরেকটা চালান ডেলিভারি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে সে, অস্ত্রগুলো এই মুহূর্তে দার-এস-সালাম বন্দরের চার নম্বর ওয়ার হাউসে রয়েছে, তার বের করে নিয়ে আসবার অপেক্ষায়। ক্রেতাও ঠিক করা আছে, বারো দিনের মধ্যে ডেলিভারি নিতে আসবে সে। চালানটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা চেহারা পেতে পারে যদি অস্ত্রের সঙ্গে আর্মারড কারগুলোও থাকে।

আর্মারড কার? হ্যাঁ, চেষ্টা করলে কোন রকমে গছিয়ে দেওয়া সম্ভব। যদিও তার ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জানা যায় পাইলট সহ এয়ারক্রাফট পেলে সবচেয়ে খুশি হবে সে।

আজ সকালে প্রথম যখন ওগুলো দেখল মাইকেল, সঙ্গে সঙ্গে কিনবার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছিল। অত্যন্ত পুরানো, অবহেলার সঙ্গে রাখা হয়েছে, চেহারাই বলে দেয় মেরামতের যোগ্য নয়। ফিরে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ দেখতে পেল একটা আর্মারড কারের তলায় পেশীবহুল একজোড়া পা। তারপর তার কানে ঢুকল, গাড়ির তলা থেকে শিসের আওয়াজ আসছে।

এখন সে জানে অন্তত একটা গাড়ি মেরামত করে চালানো যাবে। কীভাবে কী করতে হবে সব ঠিক করে ফেলেছে সে। কয়েক গ্যালন রঙ দরকার হবে। প্রতিটি আর্মারড কারের

মাউন্টিঙে একটা করে ভিকার্স মেশিনগান থাকবে। দেখে কী মনে হবে? মনে হবে সদ্য তৈরি ঝকঝকে পাঁচটা আর্মারড কার কারখানা থেকে এইমাত্র বের করা হয়েছে। ক্রেতাকে কীভাবে মোহিত করবে মাইকেল সেভারস্? কেন, তার প্রসিদ্ধ বিক্রয় কৌশল রয়েছে না! একটা, মাত্র একটা আর্মারড কার স্টার্ট দেবে সে, এলোপাতাড়ি পাঁচশো গুলি ছুঁড়ে মেশিনগানের কেরামতি প্রদর্শন করবে—ব্যস, গলে ছাতু হয়ে যাবে রাস্টাফারিয়ান গোত্রের রাজপুত্র, উল্লাসে উদ্ভ্রান্ত হয়ে সবগুলো আর্মারড কার আর মেশিনগানের দাম চুকিয়ে দেবে।

তার রঙিন স্বপ্নে কালি ছিটাচ্ছে শুধু একজন। বাঙালী যুবকটাই তার উদ্বেগের কারণ। হয়তো ভয় পাবার কিছু নেই, দু'দশ শিলিং বেশি দর হাঁকলেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, পাল্লা দিতে না পেরে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে লোকটা। না, আসলেও ভয় পাবার কোন কারণ নেই। হাবভাব, চেহারা-সুরং দেখে তো মনে হলো কোন রকমে দিন কাটাচ্ছে, ঝুঁকি নেওয়ার বা বাজে খরচ করবার পয়সা পকেটে নেই। দেখা যাক।

কোটের আঙ্গিনে আঙুলের টোকা দিল মাইকেল, হয়তো ধুলোর খানিকটা ভাব জমেছিল ওখানে। সোনালি লালচে মাথায় পানামাটা তুলল, সতর্কতার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করল চওড়া কার্নিস, ছাই পরীক্ষা করবার জন্য লম্বা সরু চুরটটা নামাল ঠোঁট থেকে, তারপর ড্রাম ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, ধীর শান্ত পায়ে এগোল ভিড় লক্ষ্য করে।

নিলামদার একজন শিখ বামন, কালো সুট পরা, লম্বা দাড়ি বাঁক নিয়ে গলায় মাফলারের মত জড়িয়ে আছে, মাথায় মস্ত একটা সাদা পাগড়ি।

সবচেয়ে কাছের আর্মারড কারের টারিটে উঠে পড়েছে সে, দাঁড়ে বসা কালো কাকের মত লাগছে তাকে। তার কণ্ঠস্বর সক্রিয় বিলাপের মত, শোকাকুল। প্রস্তাব পাবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে সে। উপস্থিত লোকজন ভাবলেশহীন পাথুরে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, চোখে শাণিত দৃষ্টি।

‘আসুন, ভদ্রমহোদয়গণ, কেউ একজন এক হাজার শিলিং বলে চিৎকার করে উঠে আমার কানে মধুবর্ষণ করুন! আমি কি “প্রতিটি হাজার শিলিং” শুনলাম?’

মাথা একদিকে কাত করে ভাল করে শুনবার ভঙ্গি করল সে, গাছের ডালে বাতাসের শব্দ ছাড়া কোথাও কোন আওয়াজ নেই। কেউ নড়ল না, কেউ মুখ খুলল না।

‘পাঁচশো শিলিং, প্লিজ? বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, সুচতুর কোন ব্যবসায়ী আছেন কি যিনি এই চমৎকার বাহনগুলোর প্রতিটির জন্য পাঁচশো শিলিং দিতে চান? ওগুলো আর্মারড কার, মহোদয়গণ! নামটাই যে শুধু গালভরা তাই নয়, কাজেও এক একটা অক্লান্ত ঘোড়া! যেমন তেজি তেমনি সুন্দর, যেমন রূপ তেমনি তার গুণ! ঠিক আছে, ভাইসব, মাত্র আড়াইশো শিলিং-আসুন, জমজমাট দর হাঁকাহাঁকির প্রতিযোগিতা আড়াইশো শিলিং দিয়েই শুরু করি আমরা।’ চোখে নগ্ন প্রত্যাশা নিয়ে ভিড়ের উপর চোখ বুলাল বামন শিখ, কেউ নড়ছে না দেখে কৌচকানো ভুরু থেকে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কল্পিত ঘাম মুছল সে। ‘প্রস্তাব, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে একটা প্রস্তাব দিন, প্লিজ!’ চোখ নামিয়ে নিয়েছে সে।

‘পঞ্চগশ শিলিং!’ ভিড় থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। শিখ নিলামদার এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল, তারপর ধীর নাটকীয় মন্তব্যের সঙ্গে মাথা তুলে রানার দিকে তাকাল সে। ভিড়ের মধ্যে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে রানার মাথা।

‘পঞ্চগশ শিলিং!’ খসখসে, কাঁদো কাঁদো গলায় ফিসফিস করে বলল শিখ নিলামদার। ‘এত সুন্দর, এমন তেজি আর্মারড কারের জন্যে মাত্র পঞ্চগশ শিলিং...’, কথা শেষ না করে দুঃখ এবং হতাশার সঙ্গে ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে। তারপর অকস্মাৎ তার আচরণ বদলে গেল, চোখের পলকে ব্যবসায়ীসুলভ চটপটে ভাব ফুটল চেহারায়ে। ‘আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে প্রতিটি পঞ্চগশ শিলিং। আমি কি একশো শিলিং শুনলাম? পঞ্চগশ শিলিঙের ওপর কেউ প্রস্তাব দিচ্ছেন না?’ হাতে ধরা হাতুড়িটা শূন্যে তুলল সে। ‘প্রথমবার বলছি, পঞ্চগশ শিলিং। দ্বিতীয়বার বলছি...’

সামনে বাড়ল মাইকেল সেভারস্, জাদুমন্ত্রের মত ফাঁক হয়ে গেল ভিড়টা, লোকজন দু’পাশে সরে গেল সসম্মানে।

‘একশো শিলিং,’ মৃদুকণ্ঠে বলল সে, নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেল কথাটা। দীর্ঘদেহী রানার আপাদমস্তক আড়ষ্ট হয়ে উঠল, লালচে আভা ফুটল নগ্ন ঘাড়। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পাশে তাকাল সে, ইতিমধ্যে ভিড়ের কিনারায় পৌঁছে গেছে ইংরেজ যুবক।

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মাইকেলের চেহারা, রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে অভিজাত ভঙ্গিতে সে তার পানামা হ্যাটের কার্নিস দু’আঙুলে আলগোছে একবার স্পর্শ করল। শিখ নিলামদারের পাকা ব্যবসা বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে গেছে ওদের দু’জনের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব রয়েছে। দু’কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে উঠল তার হাসি।

‘আমি শুনলাম একশো...।’ নিরীহ ভঙ্গিতে শুরু করল সে।

‘দেড়শো,’ ধমকের সুরে বলল রানা।

‘দুশো,’ বিড়বিড় করে উঠল মাইকেল, রানা অনুভব করল

ক্রোধের অদম্য একটা ঢেউ ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। অনুভূতিটার সঙ্গে পরিচয় আছে, চেষ্টা করল দমন করতে, কিন্তু কোন লাভ হলো না। উপস্থিত লোকজন লম্বা লোকটার দিকেই তাকিয়ে আছে, সবাই উত্তেজিত। উপভোগ্য নিলাম দেখবার লোভেই ভিড় জমিয়েছে তারা।

‘আড়াইশো,’ বলল রানা, পরমুহূর্তে প্রতিটি মাথা ঘুরে গেল ইংরেজ লোকটার দিকে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে ফিরল মাইকেল। ‘তিনশো?’

‘সাড়ে তিনশো।’ রানার চোখে পলক পড়ল না।

‘চারশো?’

‘পাঁচশো।’

‘সাড়ে পাঁচশো।’

‘ছ’শো।’ নির্লিপ্ত রানা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

‘আমি সাড়ে ছ’শো।’

‘আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সাড়ে ছ’শো...,’ নিলামদারের গলা কেঁপে গেল।

‘সাতশো।’ বাইরে থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই রাগ দমন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু মনে মনে জানে বেনিয়া লোকটাকে গাড়িগুলো কোনভাবেই নিতে দেবে না ও। শেষ পর্যন্ত যদি কিনতে না-ই পারে, ওগুলো পুড়িয়ে দেবে সে।

কুতকুতে চোখে মাইকেলের দিকে তাকাল নিলামদার। ‘সাড়ে সাতশো, স্যার?’ জিজ্ঞেস করল সে, উত্তরে মৃদু হাসির সঙ্গে হাতের চুরটটা শুধু দোলাল মাইকেল। মনে মনে বিস্ময়ের সীমা নেই, তার হিসাব অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক আগেই আর্থিক সঙ্গতির সীমা পেরিয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে হিসাবে ভুল হয়েছে

তার।

‘আট,’ বলল রানা, মনে মনে নিজের সঙ্গে কথা বলছে—ওগুলো আমার, মানিব্যাগ খালি করে হলেও কিনব আমি।

‘নয়শো।’ মাইকেল সেভারসের হাসিতে আড়ষ্ট ভাব, সে-ও এবার তার নিজের আর্থিক সঙ্গতির কিনারায় পৌঁছে যাচ্ছে। নিলামে জিতলে সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা অথবা স্থানীয় অনুমোদিত ব্যাংকের চেক জমা দিতে হবে। নগদ টাকা যেখানে যা পাওয়ার ছিল অনেক আগেই সব চেষ্টে তুলে এনেছে সে। আর স্থানীয় কোন ব্যাংকের ম্যানেজার যদি মাইকেল সেভারসের চেক পেয়ে টাকা দেয় তা হলে চাকরি থাকবে না।

‘সাড়ে নয়শো।’ রানার কণ্ঠস্বর কঠিন, আপোষহীন। যদিও তিরস্কার করছে নিজেকে, লাভের মধ্যে ইংরেজ ব্যাটাকে এক হাত দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা-ও শেষ পর্যন্ত কে জিতবে বলা যায় না।

‘সাড়ে...,’ মাইকেল সেভারস শেষ করতে পারল না।

তার আগেই রানা বলল, ‘পুরো এক হাজার।’

‘এগারোশো?’

‘বারো,’ দম না নিয়ে বলল রানা। ক্ষীণ আশা রয়েছে, ওর ক্রেতাকে হয়তো বুঝিয়ে একেকটা বারোশো শিলিঙে বিক্রি করা যাবে।

মাইকেল বলল, ‘সাড়ে বারোশো।’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। বারোশো শিলিঙের বেশি দাম পড়লে নির্খাত লোকসান দিতে হবে ওকে।

‘আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিলামদার, ‘বারোশো পঞ্চাশ শিলিং...।’ হ্যাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

‘তেরো।’

‘তেরো পঞ্চগশ।’

মনে মনে হিসাব রাখছে রানা, দুশো শিলিং করে লোকসান হবে। ‘চোদ্দ।’

‘পনেরো,’ এবং এটাই মাইকেল সেভারসের শেষ সীমা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, বুঝতে পেরেছে গাড়িগুলো তার কপালে এভাবে জুটবে না। সাড়ে সাত হাজার শিলিংই তার পকেটের সম্মল, জবাই করে ফেললেও তার বেশি বের করতে পারবে না। অবশ্য আরও হাজারটা উপায় আছে, তার যে-কোন একটার সাহায্যে গাড়িগুলোর মালিক হতে পারবে সে। হতে পারবে, এবং হবেও। প্রিন্স হাসান সালে হারারি-কে পটিয়ে বেশি দাম আদায় করতে হবে, এই যা।

‘সাড়ে পনেরোশো,’ বলল রানা, ভিড়ের ভিতর থেকে চাপা গুঞ্জন উঠল, প্রতিটি মাথা ঘুরে গেল মাইকেল সেভারসের দিকে।

‘সম্মানিত মহাশয়,’ নিলামদার সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি ষোলোশো বলেছেন, স্যার?’ পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন পাবে সে।

সগর্বে, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও, মাথা নাড়ল মাইকেল সেভারস, গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে তার চুরীদের ছাই পরীক্ষা করছে। তারপর মুখ তুলল সে, ঠোঁটে এক টুকরো কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘না, ভুলে যান, আমি কিছুই বলিনি।’ রানার দিকে তাকাল সে। ‘ওগুলো তোমাকে আনন্দ দান করুক, এই কামনা করি। মনে কোন দৃগুথ রেখো না, ওল্ড চ্যাপ।’ ভিড় ঠেলে ঘুরে দাঁড়াল সে, গেটের দিকে হাঁটা ধরল। এখুনি কোন প্রস্তাব দিয়ে লাভ নেই, বাঙালী বাবু ভাল একটা প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে বসতে পারে। তবে একটা বিষয় নিয়ে ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে। এত দিন নিজের উপর অগাধ আস্থা ছিল তার, লোক চিনতে কখনও ভুল

করে না। বাঙালী লোকটাকে দেখে তার মনে হয়েছিল, লোকটা ভাবাবেগ দমন করতে জানে। কিন্তু প্রমাণিত হলো ঠিক উল্টোটা। এত দাম দিয়ে গাড়িগুলো সে কিনল শুধু রাগের বশে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনতে ভুল করেছে সে?

বহু কাল আগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে পৌঁচেছে মেজর মাইকেল সেভারস, যুদ্ধ করে শুধু বোকারা, জ্ঞানী লোকেরা তাদেরকে যুদ্ধের উপকরণ যোগান দেয়-লাভের বিনিময়ে, অবশ্যই।

দুই

ঠিক তিন দিন পর আবার ইংরেজ লোকটার সঙ্গে দেখা হলো রানার। ইতিমধ্যে সে তার পাঁচটা লৌহমানবীকে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে এনেছে ছোট্ট ঝর্ণার কিনারায় নিজের সদ্য তৈরি ক্যাম্পে। জায়গাটা শহরের বাইরে, পাহাড়ের কাছাকাছি, চারপাশে আফ্রিকান মেহগনি গাছের ছড়াছড়ি, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা শিস দেয় পাখিরা।

মেহগনির ডালে কপিকল ঝুলিয়ে এঞ্জিনগুলো বের করে নিয়েছে রানা, পেট্রল ল্যাম্পের আলোয় গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেছে ওগুলোর উপর। পুরো একটা দিন কেটেছে বাতিলযোগ্য পার্টস সনাক্ত করতে। পুরানো লোহা-লকড়ের দোকানে গিয়ে তালিকা মিলিয়ে খুঁজতে হয়েছে সেগুলো। দিনে আঠারো ঘন্টা খেটেছে ও, দিনের বেলা ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাখিরা শিস দেওয়ায় পরিশ্রমটুকু গায়ে লাগেনি। তৃতীয় দিন বিকেলের দিকে

ঘর্মান্ত কলেবর মাসুদ রানা তিনটে বেন্টলি এঞ্জিন চালু করতে পারল। খুঁটির উপর তৈরি বাঁশের নিচু মাচায় এঞ্জিনগুলোকে একেবারে নতুন বলে মনে না হলেও, ঝকঝক করছে। সন্দেহ নেই মেকানিকের হাতের ছোঁয়ায় জাদু আছে।

সেদিনই বিকেলে, চারদিক যখন নির্মম রোদে পুড়ছে, রানার ক্যাম্পে হাজির হলো মাইকেল সেভারস। রিকশায় চেপে এল সে, সেটা টেনে নিয়ে এল অর্ধনগ্ন ঘর্মান্ত একজন কালো আফ্রিকান। গদি লাগানো সিটের উপর বিশ্রামের চিতার মত লাগল তাকে, পরে আছে দুধ-সাদা লিনেনের সুট, ভাঁজগুলো তীক্ষ্ণ। একটা এঞ্জিন চালু করে আওয়াজে কোন ঝ্রটি আছে কি না পরীক্ষা করছিল রানা, কোমর পর্যন্ত উদোম, গ্রিজ লেগে কালো হয়ে আছে হাত দুটো, বুক আর পিঠে ঘাম চকচক করছে, যেন তেল মেখেছে সারা গায়ে।

‘এমনকী দাঁড়িয়ে-ও না, বন্ধু,’ মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। ‘সোজা হেঁটে চোখের সামনে থেকে দূর হও।’

নিঃশব্দে হাসল মাইকেল, যেন পুরানো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর রসিকতা গায়ে মাখছে না। সিটের এক পাশ থেকে সিলভারের একটা বালতি উঁচু করে রানাকে দেখল সে, গায়ে শিশিরের মত পানি জমে আছে, ভিতরে টুকরো বরফ পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ করছে। বালতির কিনারা থেকে উঁকি দিচ্ছে এক ডজন বিয়ারের বোতল।

‘যুদ্ধ নয়, শান্তির প্রস্তাব, ওল্ড চ্যাপ,’ বলল মাইকেল, ‘শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অঙ্গীকার।’ তৃষ্ণার্ত রানার গলার ভিতরটা হঠাৎ করে এমন শুকিয়ে গেল যে এক মুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারল না ও।

‘শর্তহীন উপহার-ঘুষ বা টোপ নয়?’ এই প্রচণ্ড গরমের

ভিতরও কাজের মধ্যে এমনই মগ্ন হয়ে ছিল রানা যে যতটুকু প্রয়োজন তার সিকিভাগ তরলপদার্থও গলাধঃকরণ করেনি, যা-ও বা করেছে তার মধ্যে এ-ধরনের স্নান সোনালি, বুদবুদ ওঠা, বরফ মেশানো কিছু ছিল না। বিয়ারের বোতলগুলো দেখে শুধু যে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার অবস্থা হলো তাই নয়, ওগুলো পাবার প্রচণ্ড ইচ্ছায় কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি।

রিকশা থেকে নামল মাইকেল, বগলের তলায় বালতি নিয়ে এগিয়ে এল। ‘মাইকেল,’ বলল সে। ‘মেজর মাইকেল সেভারস।’ খালি ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

‘রানা, মাসুদ।’ তাই তো বলি! ভাবল রানা। হাতটা ধরল ও, তবে চোখ এখনও আটকে আছে বালতির উপর।

তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে গিয়ে বিজয়রত্ন নামে এক সিংহলী বক ভারতীয় র., মার্কিন সি.আই.এ. এবং রাশিয়ান কে.জি.বি-র আক্রোশে পড়ে। বিজয়রত্ন যে মাসুদ রানা এ-কথা বি.সি.আই. চীফ রাহাত খান ছাড়া আর কেউ জানত না। গোপনসূত্রে তিনি খবর পান, তিনটে দানবাকৃতি সংস্থার একটি বিজয়রত্নকে মাটির বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেছে। সময় থাকতে রানাকে তিনি আত্মগোপন করবার নির্দেশ দেন। বসের নির্দেশ মেনে নিলেও, নিজের নামটা গোপন করবার কোন কারণ দেখেনি রানা, হোটেলের খাতায় তাই আসল নামটাই লিখিয়েছে।

বিশ মিনিট পর। ঝর্ণার পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে রানার, বগলের তলায় সাবান ঘষছে, বিয়ারের বোতল নাগালের মধ্যে।

‘বিপদটা দেখা দেয়, কারণ পরস্পরকে আমরা চিনতে ভুল করেছিলাম,’ ব্যাখ্যা করল মাইকেল, বোতল থেকে সরাসরি বিয়ার

ঢালল গলায়। তাঁবুর বাইরে, শেড ফ্ল্যাপের নীচে ছায়ায় ফেলা রানার একমাত্র ক্যানভাস ক্যাম্প চেয়ারটায় প্রায় শুয়ে আছে সে। ‘স্বীকার করছি, কোথায় পা ফেলছি দেখিনি।’

‘লাথিটা প্রায় নিজের বুকেই খেয়েছ,’ একমত হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা, তবে গলায় ঝাঁঝ নেই, ঠাণ্ডা বিয়ার মেজাজের উপর ওষুধের কাজ করছে।

‘তোমার কেমন লেগেছিল বুঝতে পারি,’ বলল মাইকেল। ‘কিন্তু ভেবে দেখো, বলেছিলে নিলামে তুমি থাকবে না। যদি সত্যি কথা বলতে, আমরা হয়তো একটা চুক্তিতে আসতে পারতাম।’

সাবানের ফেনা ঢাকা হাত বাড়িয়ে বিয়ারের একটা বোতল তুলে নিল রানা। ঢক ঢক করে দু’টোক গিলল। একজোড়া ঢেকুর তুলল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল।

‘ব্লেস ইউ!’ ঢেকুর তোলা অমঙ্গলসূচক ধরে নিয়ে সম্ভাব্য অঘটন বা উৎপাত থেকে রানাকে রক্ষার জন্য আশীর্বাদ করল মাইকেল। ‘যখনই বুঝতে পারলাম তুমি সিরিয়াসলি ডাক দিচ্ছ, পিছিয়ে গেলাম আমি। জানতাম, দু’জনের জন্যে লাভজনক একটা সমঝোতায় পরে আমরা ঠিকই আসতে পারব। আর দেখো, বান্দা হাজির, তোমার সাথে বসে বিয়ার খাচ্ছি, একটা চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা চলছে।’

‘কথা বলছ একা তুমি, আমি শুধু শুনছি,’ বলল রানা।

‘ঠিক তাই।’ চুরট কেস বের করল মাইকেল, সাবধানে বেছে নিল একটা, সামনের দিকে ঝুঁকে কায়দা করে গুঁজে দিল রানার দুই ঠোঁটের মাঝখানে। বুটের সোলে ঘষা দিয়ে দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালল, জোড়া করপুটের ভিতর নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল আগুনটা। ‘আমার ধারণা তোমার সন্ধানে ভাল একজন ক্রেতা আছে, কী?’ ভুরু জোড়া একবার নাচাল সে।

‘এখনও আমি শুনছি,’ আয়েশ করে চুরটে টান দিয়ে একমুখ ঘোঁয়া ছাড়ল রানা।

‘তুমি নিশ্চয়ই গাড়িগুলোর একটা দাম ঠিক করেছ। তারচেয়েও বেশি দাম দিতে আমি ইতস্তত করব না।’

মুখ থেকে চুরট নামিয়ে এই প্রথমবার স্থিরদৃষ্টিতে মাইকেলকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে, আমার নির্ধারিত দামে, গাড়ি পাঁচটা কিনতে চাও তুমি?’

‘চাই,’ বলল মাইকেল।

‘যদি বলি শুধুমাত্র তিনটে চালানো যাবে, বাকি দুটোর কোন আশা নেই?’

‘তাতেও আমার প্রস্তাব বদলাবে না।’

হাত বাড়িয়ে বিয়ারের বোতলটা তুলে নিল রানা, কয়েক টোকে নিঃশেষ করে ফেলল। আরেকটা বোতল খুলল মাইকেল, ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

প্রস্তাবটা নিয়ে দ্রুত চিন্তা করল রানা। তাঞ্জানিয়ার মাঝারি গোছের একটা সুগার কোম্পানীর সঙ্গে কথা হয়েছে ওর, ওদেরকে নির্ধারিত এক হাজার একশো শিলিং গ্যাসোলিন-চালিত সুগারকেইন ক্র্যাশার সরবরাহ করবে ও। তিনটে গাড়ি থেকে সব মিলিয়ে তিন হাজার তিনশো শিলিং আসবার কথা। কিন্তু ইংরেজ লোকটা কিনতে চাইছে পাঁচটাই, ওর চাওয়া দামে। ‘বুঝতেই পারছ, ওগুলোর পিছনে সময় নষ্ট করেছি আমি।’ দাম হাঁকবার আগে মাইকেলকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে নিতে চাইছে।

‘জানি, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।’

‘প্রতিটি তিন হাজার একশো শিলিং, মোট পাঁচটা। সব মিলিয়ে পনেরো হাজার পাঁচশো শিলিং।’

‘এঞ্জিনগুলো তুমি আবার জোড়া লাগিয়ে জাহাজে তোলার উপযোগী করে দেবে।’

‘অবশ্যই।’

‘রাজি,’ বলল মাইকেল, দু’জনেই পরস্পরকে স্মিতহাসি উপহার দিল। ‘বেচাবিক্রির একটা চুক্তিপত্র এখনি আমি তৈরি করে ফেলতে চাই।’ একটা চেক বই বের করল মাইকেল। ‘আমি আবার বাকিতে কাজ করতে পছন্দ করি না। তোমার পাওনা পুরো টাকার চেক এখনি লিখে দিচ্ছি।’

‘টাকার কী?’ রানার মৃদুহাসি শ্রান হতে শুরু করল।

‘চেক। যে সে ব্যাংক নয়, লন্ডনের সিটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে আমার, পিকাডেলি স্কয়ারে...।’

কথাটা মিথ্যে নয়। লন্ডনের সিটি ব্যাংকে সত্যিই একটা অ্যাকাউন্ট আছে বটে মাইকেল সেভারসের। তবে অ্যাকাউন্টটার সর্বশেষ হিসাবে জানা যায়, পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ও.ডি.নিয়েছে মাইকেল, এবং বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও টাকাটা শোধ দিতে গড়িমসি করেছে সে। মাত্র ক’দিন আগেও লাল কালিতে লেখা ম্যানেজারের একটা রিমাইন্ডার পেয়েছে সে।

‘নগদ টাকা নিজের সাথে রাখা নিরাপদ নয়, বিশেষ করে বিদেশবিভূঁইয়ে,’ বলল মাইকেল, চেক বইটা খুলে লিখবার জন্য তৈরি হলো সে। চেকটা লন্ডনে পৌঁছুতে অন্তত হপ্তাখানেক লাগবে—এবং টাকার আকৃতি নিয়ে কখনোই ওটা ফিরে আসবে না। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার আগেই পালিয়ে মাদ্রিদে চলে যাবে মাইকেল, শুনেছে ওখানে নাকি ধনকুবেরদের বোকা বানিয়ে সহজেই দু’পয়সা কামানো যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশও নাকি ভাল। হাতে কিছু পুঁজি থাকলে সিঁড়ি বেয়ে আবার তর তর করে উঠে যাবে সে।

‘চেক ভাল জিনিস, তোমার সাথে আমি একমত। কিন্তু মুশকিল হলো আমার ঠিক সয় না, অ্যালার্জি আছে।’ চুরটটা নামিয়ে হাতে নিল রানা। ‘নগদ আর চেক দুটোই যদি তোমার কাছে সমান হয়, আমি বরং পনেরো হাজার পাঁচশো শিলিং নগদই নেব।’

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল মাইকেল। উঁহু, ব্যাপারটা এত সহজে সারা যাচ্ছে না। ‘দেখো দিকি, কী বিপদেই না পড়া গেল—চেক ক্লিয়ার হয়ে আসতে খানিকটা সময় তো লাগবেই।’

‘কোন তাড়া নেই,’ নিঃশব্দে হেসে তাকে আশ্বস্ত করল রানা। ‘কাল দুপুরের মধ্যে যে-কোন সময় টাকাটা পেলেই চলবে আমার। আমার প্রথম ক্রেতাকে ওই সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দেয়ার কথা হয়ে আছে। সময় মত তুমি যদি টাকা নিয়ে পৌঁছুতে পারো, গাড়িগুলো তোমার হয়ে যাবে।’ নিচু ঝর্ণা থেকে উঠে এল ও, ওর আফ্রিকান ভৃত্য হাতে একটা তোয়ালে ধরিয়ে দিল।

‘আজ তোমার ডিনার প্ল্যানটা কী রকম?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

‘মোসলেমের ইচ্ছে আজ আমাকে হরিণের মাংস রঁধে খাওয়াবে।’ আফ্রিকান কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল রানা।

‘তারচেয়ে ফরচুনা-য় তুমি আমার অতিথি হও, কী?’

‘যার বিয়ার খেতে পারি তার ডিনার খেতে আপত্তি করব কেন?’ সহাস্যে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল রানা।

ফরচুনার ডাইনিং রুমটা বরফের মত ঠাণ্ডা, তবে মেজবান মাইকেলের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করল রানা। ওকে আলিঙ্গন করল সে, সবিনয় ভদ্রতার সঙ্গে পথ দেখিয়ে এক কোণে

একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল, সারাক্ষণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা, একের পর এক দামী খাবারের অর্ডার দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল ওয়েটারদের। তার হাসি সংক্রামক, এক সময় রানাও আক্রান্ত হয়ে পড়ল। আলাপ শুরু হতে না হতে দু'জনেই ওরা আবিষ্কার করল দুনিয়ার প্রায় সব বড় শহরে রানা যখন ছিল প্রায় ঠিক একই সময়ে মাইকেলও সেখানে ছিল। তারপর জানা গেল রানা যাদেরকে চেনে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের চেনে মাইকেল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রানা যখন সম্মুখসমরে লড়াই, মাইকেল তখন লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চাঁদা তুলছে। তারপর জানা গেল, দু'জনের রক্তেই রয়েছে দুর্দমনীয় অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, কেউ বিবাহিত নয়, কারও কোন পিছুটান নেই, এবং দু'জনেই স্বাধীনচেতা। পরস্পরকে কিশিৎ চিনতে পারবার পর, একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। ডিনার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দু'জনের মধ্যকার অমিল সম্পর্কে সহনশীল একটা মনোভাব তৈরি হলো ওদের মধ্যে। রানা মাইকেলকে জাত বেনিয়াদের একজন বা মাইকেল রানাকে কালা আদমী বলে ভাবছে না—কিন্তু তার মানে অবশ্য এই নয় যে রানা মাইকেলের কাছ থেকে কোন চেক গ্রহণ করতে যাচ্ছে বা মাইকেল গাড়ি পাঁচটা হাত করবার প্ল্যান ত্যাগ করেছে। অবশেষে ব্র্যান্ডির বোতলটা নিঃশেষে খালি করে হাতঘড়ি দেখল মাইকেল।

বলল, 'আরে, মাত্র ন'টা বাজে! রাত সবো শুরু হলো, তাই না, ওল্ড চ্যাপ? কোথায় যাব আমরা, কী করব?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রস্তাব পাবার অপেক্ষায় থাকল রানা।

'শুনেছি মাদাম জুলিয়ানার ওখানে আজই নাকি ইটালি থেকে দুটো মেয়ে এসেছে, ভারি সুন্দরী। একেবারে ফ্রেশ।'

প্রস্তাবটা তাড়াতাড়ি বাতিল করে দিল রানা। 'পরে দেখা যাবে—ডিনারের পরপরই ঠিক ভাল্লাগবে না।'

দ্বিগুণ উৎসাহে আরেকটা প্রস্তাব দিল মাইকেল, আসলে এটাই গেলাতে চাইছে রানাকে। 'কয়েক হাত তাস খেললে কেমন হয়? দার-এস-সালাম ক্লাবে মার্জিত ভদ্রলোকেরা খেলেন।'

'কিন্তু যাব কীভাবে। আমরা তো মেম্বার নই।'

'খুশির কথা, দু'জনকে এক ইউনিট হিসেবে দেখছ—দেহ আলাদা হলেও আত্মা এক। কিন্তু আমি মেম্বার, অর্থাৎ আমরা মেম্বার, কী?' ভুরু নাচিয়ে একগাল হাসল মাইকেল।

দেড় ঘণ্টা হয়ে গেছে খেলতে বসেছে ওরা। সময়টা উপভোগ করছে রানা। সুন্দর, মার্জিত পরিবেশ; উপস্থিত সবাই গণ্যমান্য ব্যক্তি। জানালা দরজায় ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে, দেয়ালে ঝুলছে হান্টিং ট্রফি এবং গাঢ় রঙের তৈলচিত্র। তিনটে বিলিয়ার্ড টেবিল থেকে আইভরি বলের আওয়াজ ভেসে আসছে, কালো টাই আর কালো ট্রাউজার পরা ধনীর দুলালরা খেলছে ওদিকে, সবাই যে-যার সান্দ্যকালীন জ্যাকেট খুলে রেখেছে।

কন্ট্রাস্ট ব্রিজ খেলা হচ্ছে তিনটে টেবিলে, ফিসফিসে আওয়াজ ভেসে আসছে ডাক পাল্টা-ডাকের, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই শ্বেতাঙ্গ, সবার পরনে দামী সুট।

টেবিলগুলোর ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত আসা-যাওয়া করছে ওয়েটাররা, পরনে আজানুলম্বিত আচকান, মাথায় ফেজ টুপি, হাতের ট্রে-তে পানীয় ভর্তি গ্লাস।

পোকার খেলা চলছে মাত্র একটা টেবিলে। টেবিলটা বার্মা টিকের তৈরি, পিতলের ছাইদানি কাঠের সঙ্গে জু দিয়ে আটকানো,

মদের গ্লাস ও আইভরি চিপস্ রাখবার জন্য অগভীর গর্ত করা রয়েছে টেবিলের উপর, তা-ও চকচকে পিতল দিয়ে মোড়া। টেবিলে পাঁচজন বসে আছে, তাদের মধ্যে একা শুধু রানার পরনে আনুষ্ঠানিক সান্দ্যকালীন পোশাক নেই। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন পোকার খেলায় এতটাই কাঁচা যে রানার লোভ হতে লাগল-ওদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে হোটেল কামরার আলমারিতে তুলে রাখে। টাকার অভাব হলেই আলমারি খুলে খেলতে বসাবে।

একজন আমেরিকান, প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য, আফ্রিকায় এসেছেন শিকার করতে। গভীর জঙ্গল থেকে সদ্য ফিরেছেন তিনি, ওখানে বন্য পশুদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য আফ্রিকান এক শিকারী হেভি ক্যালিবার রাইফেল হাতে সারাক্ষণ তাঁর কনুইয়ের পাশে উপস্থিত ছিল, এবং তার উপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি বুনো মোষ, সিংহ ও গণ্ডার নিধন করেছেন ভদ্রলোক। তাঁর একটা শারীরিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করল রানা-ডান চোখের নীচে অতি সংবেদনশীল একটা শিরা রয়েছে, হাতে ভাল কার্ড উঠলেই তড়াক তড়াক করে লাফাচ্ছে সেটা। এতে যদি প্রমাণও হয় যে লোকটা নার্সাস প্রকৃতির, বলতেই হবে তার প্রকৃতির সঙ্গে ভাগ্যের কোন সম্পর্ক নেই। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ভদ্রলোক প্রায় প্রতি দানেই ভাল কার্ড পাচ্ছেন, ফলে রানা আর তিনিই শুধু জিতছেন।

দ্বিতীয়জন মাইকেলের সমবয়সী, উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পপতি। হাতের কার্ড খারাপ হলে বা হেরে গেলে সাপের মত হিসহিস করে ওঠে।

রানার ডান দিকে বসেছেন বয়স্ক একজন আমলা, তাঁর মস্ত টাকের মাঝখানে কলংকের মত কাঁচাপাকা অল্প ক'গাছি চুল দেখে খুবই বিরক্ত বোধ করল রানা, ওর মনে হলো ওগুলো ফেলে দিলে

টাকটা যথাযোগ্য মর্যাদা পেতে পারত। ভদ্রলোক বেশিরভাগ সময় হু-হু করে হাসছেন, কিন্তু জিতবার ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিলেই নেয়ে উঠছেন ঘেমে।

সতর্কতার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক খেলবার পর সাতশো শিলিঙের মত জিতল রানা, মাইকেলের ঔদার্যে ভক্ষণ করা উপাদেয় ডিনার যেখানে হজম হচ্ছে সেখানে উষ্ণ এবং তৃপ্তিকর একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। এই মুহূর্তে ওর জীবনে অশান্তি এবং অস্বস্তির এক মাত্র কারণ যেটা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য দায়ী মাইকেল সেভারস্, ওর নতুন বন্ধু এবং স্পনসর।

সহজ ভঙ্গিতে, পেশী টিল করে দিয়ে বসে আছে মাইকেল। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে মোটেও কার্পণ্য করছে না। আমেরিকান শিকারী জিতছেন, কাজেই তাঁকে বাহবা দিচ্ছে। সমবয়সী শিল্পপতি আর বয়স্ক আমলা হারছে, ওদেরকে আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে সাবুনা দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে সং পরামর্শ দিতেও ইতস্তত করছে না-যেহেতু হেরেছেন, কাজেই টাকা তুলতে হলে বেশি করে বাজি ধরতে হবে। সে নিজে খুব বেশি হারেনি বা জেতেনি, প্রায় সমান সমান অবস্থায় রয়েছে অথচ তার তাস বাঁটার মনোমুগ্ধকর ধরন অভিজ্ঞ রানার চোখে সাংঘাতিক সন্দেহজনক বলে মনে হতে লাগল। লম্বা দশ আঙুলের ভিতর নিয়ে কার্ডগুলো এত দ্রুত শাফল করতে পারে যে দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি কার্ড অনুসরণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ রাখল রানা, চুপিসারে, প্রতিবার যখনই কার্ড বিলি করবার দায়িত্ব পেল মেজর মাইকেল সেভারস্। একজন ডিলার যত কুশলীই হোক, তার হাতের ছোঁয়ায় যতই না কেন জাদু থাকুক, পছন্দ মত নির্দিষ্ট কোন কার্ড অন্যান্য কার্ডের

ভিতর সাজিয়ে রাখা সম্ভব নয় যদি না সে শাফল করবার সময় ওগুলো নিজের দিকে সিধে করে রাখে। রানা দেখল, শাফল করবার সময় কার্ডের দিকে তাকাচ্ছেই না মাইকেল। প্রতিপক্ষের মুখের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে তার শান্ত দৃষ্টি, হালকা সুরে কথা বলে চলেছে। রানার পেশী একটু একটু করে শিথিল হতে শুরু করল।

শিল্পপতি কার্ড বাঁটল। চারটে একরঙা কার্ড পেয়ে দানটা জিতল রানা। আইভরি চিপস নিজের দিকে টেনে গর্তের ভিতর জমা করল ও।

সেদিকে তাকিয়ে রমাল দিয়ে মুখ মুছল মাইকেল। ‘এসো নতুন একটা প্যাকেট খোলা যাক,’ বলল সে, হাসল, আঙুল বাঁকা করে কাছে ডাকল একজন ওয়েটারকে। ‘দেখা যাক, তোমার জেতার ভাগ্যটাকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় কি না।’

নতুন প্যাকেটের সীল পরীক্ষা করবার জন্য সবাইকে দেখাল মাইকেল, তারপর প্যাকেট খুলে কার্ডগুলো মেলল, বের করে নিল জোকার দুটো। তাসের পিছনে বাইসাইকেলের চাকার ছবি ছাপা রয়েছে। শাফল করতে শুরু করল সে, একই সঙ্গে শুরু হলো একজন বিশপের অশ্লীল গল্প-চারিং ক্রস স্টেশনে ভুল করে মহিলাদের রেস্টরুমে ঢুকে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, তারপর সেখানে কী ঘটেছিল। কৌতুকটা বর্ণনা করতে এক কি দেড় মিনিট সময় নিল সে, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষালি হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই, এই সুযোগে কার্ড বিলি করতে শুরু করল মাইকেল-যথেষ্ট দূর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের সামনে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হলো কার্ডগুলো, একটার উপর নিখুঁত ভাবে আরেকটা। একা শুধু রানাই লক্ষ করল, রেস্টরুমে মহিলাদের নির্লজ্জ আচরণে বিশপ যখন আতংকিত এবং দিশেহারা, কার্ডগুলো দু’ভাগে ভাগ করে দু’হাতে নিয়ে শাফল করছে মাইকেল, শার্টের আঙ্গিন আগেই খানিকটা

গুটিয়ে নিয়েছে সে-কার্ডগুলো বাঁকা হয়ে একটার উপর আরেকটা পড়বার আগের মুহূর্তে উপর দিকে মুখ তুলছে, চকিতে সেগুলোর উপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল মাইকেল।

প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন, হাসতে হাসতেই নিজের কার্ডগুলো তুলে নিয়ে চোখ বুলালেন। দম নিয়ে আবার হাসতে শুরু করবেন, মাঝপথে বিষম খেলেন তিনি। তাঁর ডান চোখের নীচে ঘন ঘন লাফাতে শুরু করল বেয়াড়া শিরাতা, ওটা যেন তাঁর নাকটাকে আদর করছে। টেবিলের ওদিক থেকে জোরাল হিসহিস ভেসে এল, হাতে ধরা কার্ডগুলো তাড়াতাড়ি এক করে টেবিলে নামিয়ে রাখল শিল্পপতি, তারপর দু’হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল। রানার ডান দিকে আমলা ভদ্রলোকের চেহারা হাতির হলুদ দাঁতের মত চকচক করছে, মাথার চুল থেকে কপাল বেয়ে নেমে আসছে ঘামের একাধিক ধারা, বিস্ফারিত চোখে হাতে ধরা কার্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

নিজের কার্ড তুলল রানা, তিনটে কুইন পেয়েছে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার নিজের গল্প বলা শুরু করল ও।

‘আমি একবার মোটর ভেসেল হোয়াং টাং-এর এঞ্জিনরুমে ছোটখাট একটা দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমাদের জাহাজ নোঙর ফেলেছিল হংকঙে। আমাদের ক্যাপটেন একদিন এক সৌখিন শ্বেতাঙ্গকে অভ্যর্থনা জানালেন জাহাজে, ভদ্রলোকের খুব ইচ্ছে দু’চার দান তাস খেলবেন আমাদের সাথে। খেলা শুরু হলো, প্রথম থেকেই লাফিয়ে বাড়তে লাগল বাজির অংক। মাঝরাতের দিকে সৌখিন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক ভয়ংকর একটা দান বাঁটলেন।’

রানার গল্প কেউ শুনছে বলে মনে হলো না, প্রত্যেকে যে যার নিজের কার্ড নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত। শুরু করল রানা:

‘স্কিপার পেলেন চারটে রাজা। আমি পেলাম চারটে গোলাম। আর জাহাজের ডাক্তার পেল চারটে দশ।’ আবার গল্পের মাঝপথে থামল রানা, হাতের রানী তিনটে নতুন করে সাজাল। এই সময় আমলা ভদ্রলোকের অনুরোধে সাড়া দিয়ে মাইকেল তাঁকে আরও দুটো কার্ড সরবরাহ করল।

‘সৌখিন ভদ্রলোক নিজেও ড্র থেকে একটা কার্ড নিলেন, আর তারপরই খেলাটা বিদ্যুৎ গতি লাভ করল। যার যা আছে সব বের করে বাজির অংক বাড়াতে লাগলাম সবাই। ধন্যবাদ, বন্ধু, আমিও দুটো কার্ড নেব।’

রানার দিকে দুটো কার্ড ছুঁড়ে দিল মাইকেল, সেগুলো তুলবার আগে নিজের হাত থেকে কার্ড ফেলে দিল রানা। ‘যা বলছিলাম, সবার হাতে ভাল তাস থাকায় উন্মাদের মত সর্বস্ব বাজি ধরছিলাম আমরা। একা শুধু আমার পকেট থেকেই আড়াই হাজার হংকং ডলার বেরিয়ে গেছে...।’

নতুন কার্ড তুলে কোনরকমে হাসি চাপল রানা। ওর হাতে এখন চার চারটে সুন্দরী নারী। ‘নগদ টাকা শেষ, সবার পকেট খালি, এখন উপায়? লিখিত বড্ড দিতে শুরু করলাম আমরা। ডাক্তার আর আমি আমাদের আগামী কয়েক মাসের বেতনের টাকা বাজি ধরলাম। খেলা চলছে, কেউ হার মানতে রাজি নয়, সবার ধারণা তার কার্ডই সবার চেয়ে ভাল, সে-ই জিতবে।’

প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যকে একটা কার্ড দিল মাইকেল, নিজেও একটা নিল। এতক্ষণে ওরা গল্পটা শুনছে, রানার চোঁট আর নিজেদের কার্ড, দুটোর মাঝখানে ছোটোছুটি করছে ওদের দৃষ্টি।

‘যাই হোক, এক সময় কার্ড শো করার অবস্থা হলো। আমাদের সামনে সিলিং ছোঁয়া নগদ টাকা। সৌখিন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক স্ট্রেইট ফ্ল্যাশ দেখিয়ে কুপোকাৎ করলেন আমাদের।

পরিস্কার মনে আছে আমার-তিন থেকে আট পর্যন্ত ছ’টা চিড়িতন। আঘাতটা সামলে উঠতে আমার আর স্কিপারের সময় লাগে বারো ঘণ্টা, এবং তারপরই আমরা হিসেব করে বের করলাম কোন রকম কারচুপি না করে বাঁটা হলে এ-ধরনের তাস পড়ার সম্ভাবনা হয় কোটি বারের মধ্যে একবার। ব্যাপারটা সৌখিন শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে যায়, কাজেই তাঁকে আমরা খুঁজতে বেরলাম।’

থামল রানা, সবাই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে যে যার কার্ডের দিকে, তবে খাড়া কান রানার দিকে তাক করা।

‘ভদ্রলোককে আমরা সী বীচ হোটেলের সৈকতে পেলাম, আমাদের কষ্টার্জিত টাকা মদ আর মেয়েমানুষের পিছনে দু’হাতে ওড়াচ্ছিলেন। ওই সময় আমরা নোঙর তোলায় প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আমাদের বয়লার ঠাণ্ডা ছিল। ভদ্রলোককে ধরে এনে বসানো হলো ঠিক বয়লারের ওপর, তারপর আগুন দেয়া হলো নীচে। তাঁকে অবশ্য বেঁধে নিতে হয়েছিল। খানিকক্ষণ পরই নিতম্বের ওপর তাঁর ট্রাউজার আর খুলির ভেতর তাঁর শয়তানী বুদ্ধি আগুনের আঁচ পেতে শুরু করল। ট্রাউজার পোড়ার গন্ধের সাথে মাংস পোড়ার গন্ধ পেতে শুরু করলাম আমরা...।’

‘মাই গড,’ প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য আঁতকে উঠলেন। ‘কী ভয়ংকর!’

‘হ্যাঁ, বিশেষ করে গন্ধটা,’ তাঁর সঙ্গে একমত হলো রানা। ‘আমরা অবশ্য নাকে রুমাল দিয়ে নিয়েছিলাম, তা না হলে কার বাপের সাখ্যি এঞ্জিনরুমে থাকতে পারে!’

টেবিল ঘিরে বিস্ফোরণোন্মুখ নিস্তব্ধতা নেমে এল। সবাই সচেতন, প্রচণ্ড ঝড়ের মত একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই বুঝল গুরুতর একটা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু

বেশিরভাগ লোক জানে না অভিযোগটা কি বা কার বিরুদ্ধে উত্থাপিত। রক্ষাকবচের মত যে-যার কার্ড আঁকড়ে ধরে আছে সবাই, চোখে নগ্ন সন্দেহ নিয়ে একজন আরেকজনের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। টেবিলের পরিবেশ এতটাই উত্তেজনাকর হয়ে উঠল যে তা গোটা কামরায় ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না, আশপাশের টেবিলের লোকজন নিজেদের খেলা ছেড়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল ওদের পাঁচজনের দিকে।

‘আমার ধারণা,’ দৃঢ়, মার্জিত কণ্ঠে বলল মাইকেল সেভারস্, কামরায় উপস্থিত প্রত্যেকে শুনতে পেল তার কথা, ‘মি. মাসুদ রানা বলতে চাইছেন কেউ একজন খেলায় চুরি করছে।’

মাথার উপর ছাদ ভেঙে পড়লেও কেউ বোধহয় এতটা চমকে উঠত না। দার-এস-সালাম ক্লাবে চুরির অভিযোগ! চিন্তাও করা যায় না। অভিজাত পরিবেশে মার্জিত ভদ্রলোকেরা সুরচির অনুশীলন করেন এখানে, তাঁদের মাঝখানে চোর থাকে কীভাবে! খুনের অভিযোগ মেনে নেওয়া যায়, যৌন-অপরাধের অভিযোগও না হয় সহ্য হয়, কিন্তু চুরির অভিযোগ, হায় ঈশ্বর!

‘আমিও মি. মাসুদ রানার সাথে একমত হয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, হ্যাঁ,’ মাইকেলের ঠাণ্ডা নীল চোখ বিস্ময়ে হতভম্ব প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের উপর স্থির হলো, ‘চুরি সত্যি হচ্ছে বটে।’ মার্কিন শিকারী ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকল সে। ‘এখন দেখার বিষয়, আপনি, স্যার, যথেষ্ট ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে, আমাদের টাকা যা আপনি অন্যায়ভাবে জিতেছেন, দয়া করে প্রত্যেককে ফেরত দেবেন কি না।’ শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বর চড়ল, গুরুগম্ভীর মেঘের ডাকের মত লাগল শুনতে।

আমেরিকান ভদ্রলোক তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, যেন জন্ম থেকেই হাবা এবং বোবা তিনি, মাইকেলের

কোন কথাই তাঁর বোধগম্য হয়নি। তারপর, ধীরে ধীরে, তাঁর চেহারা রঙ পেতে শুরু করল। প্রথমে বেগুনি, তারপর লালচে, সবশেষে টকটকে রক্তবর্ণ ধারণ করল তাঁর অবয়ব। ‘স্যার! আপনার এত স্পর্ধা! গুড গড, স্যার!’ সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছেন, ঠকঠক করে কাঁপছেন, গলার ভিতর শব্দ আটকে যাচ্ছে।

‘উনি পালানোর মতলবে আছেন!’ চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিল মাইকেল! ‘ধরো, ধরো!’ দু’হাতে ধরে টেবিলটা উল্টে দিল সে, যেন প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের পালানোর পথ বন্ধ করাই উদ্দেশ্য। টেবিলটা সশব্দে কাত হলো মেঝেতে, ওটার নীচে চাপা পড়ল শিল্পপতি এবং আমলা ভদ্রলোক-চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আইভরি চিপস আর তাস। এখন আর কারও জানবার উপায় নেই মাইকেল সেভারস্ নিজে বেঁটে কী তাস নিয়েছিল। উঠে দাঁড়াবার সংগ্রামে ব্যস্ত ধরাশায়ী খেলোয়াড়দের দিকে ঝুঁকে মার্কিন শিকারীর বাম কানের নীচে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল সে। ‘চিটিং, অ্যা? চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন, আজ আপনার রক্ষা নেই!’

শিকারী ভদ্রলোক আহত বাঘের মত গর্জে উঠলেন, তিনিও মুঠো পাকিয়ে ঘুসি ছুঁড়লেন মাইকেলকে লক্ষ্য করে। মাইকেল তো সহজেই একদিকে কাত হয়ে সেটা এড়াল, কিন্তু বেচারার ক্লাব সেক্রেটারী এড়াতে পারল না-হে চৈ শুনে এইমাত্র দু’জনের মাঝখানে ছুটে এসেছে সে। সরাসরি নাকের উপর খেলো বেচারার।

সংক্রামক মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ল মারামারি। ক্লাব সেক্রেটারীকে সাহায্য করবার জন্য আর সব টেবিল থেকে লোকজন ছুটে এল। হঠাৎ সৃষ্ট ভিড়ের মধ্যে থেকে হাত বাড়িয়ে

মাইকেলের শার্ট খামচে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। ‘উনি নন-তুমি!’ ত্রুদ্বকণ্ঠে চৈঁচিয়ে বলল ও। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শোরগোলের মধ্যে চাপা পড়ে গেল।

কামরায় চল্লিশজন সদস্য উপস্থিত রয়েছে। মাত্র একজনের পরনে আনুষ্ঠানিক পোশাক নেই-জ্যাকেট পরে রয়েছে রানা। কাউকে কিছু বলে দিতে হলো না, এক পাল শিকারী কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল খরগোশের উপর।

‘পিঠ বাঁচাও, ওল্ড বয়!’ পরম বন্ধুর মত রানাকে সাবধান করে দিল মাইকেল, রানার লম্বা করা হাত তার কোটের কিনারা প্রায় ধরে ফেলেছে।

ঝট করে ঘুরল রানা, রক্ত-মাংসের সচল একটা পাঁচিলের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটল। সদস্যরা রাগে উন্মাদ, তারস্বরে চিৎকার করছে। মাইকেলের উদ্দেশ্যে শক্ত করা রানার মুঠো প্রথম সারির দু’জন সদস্যের উপর বর্ষিত হলো, প্রথমজন ঘুসি খেলো চোয়ালে, দ্বিতীয়জন নাকের উপর। তারা পড়ে গেল বটে, কিন্তু বাকিরা হুংকার ছেড়ে আরও দ্রুতগতিতে ছুটে এল ওর দিকে।

‘চালিয়ে যাও!’ বিপুল উৎসাহে আহ্বান জানাল মাইকেল। ‘যে খামতে বলবে তার কপালে জুতোর বাড়ি!’ অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সে এখন সশস্ত্র, তার হাতে একটা বিলিয়ার্ড কিউ দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কালো সান্ধ্যপোশাকের তলায় আক্ষরিক অর্থেই চাপা পড়ে গেছে রানা। ওর পিঠে সওয়ার হয়েছে তিনজন, দু’জন ঝুলে আছে উরু আঁকড়ে ধরে, দু’জন দুই বগলের নীচে মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

‘আমি নই!’ মিছেই চিৎকার করছে রানা। ‘ভুল করছেন-আমি নই, ও!’ মাইকেলের দিকে হাত তুলবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু হাত দুটোর কোনটাই মুক্ত করা গেল না।

‘ঠিক বলেছ, বৎস!’ সায় দেওয়ার সুরে বলল মাইকেল। ‘ভদ্রবেশী চোর!’ আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বিলিয়ার্ড কিউটা ব্যবহার করছে সে। উল্টো করে ধরেছে সেটা, মোটা প্রান্তটা সজোরে ঠুকে অব্যর্থভাবে একের পর এক খুলি ফাটিয়ে চলেছে রানার পিঠে সওয়ার সুবেশী ভদ্রলোকদের। এক এক করে রানার পিঠ থেকে খসে পড়তে লাগল তারা। আবার একবার মাইকেলের মুখোমুখি হলো রানা।

‘শোনো-’, গর্জে উঠল রানা। ধরাশায়ী কয়েকজন লোক ওর পা জড়িয়ে ধরেছে, তা সত্ত্বেও মাইকেলের দিকে এগোবার চেষ্টা করল ও।

‘আমিও তো তাই বলছি, শোনো!’ মাথা একদিকে কাত করে শুনবার ভঙ্গি করল মাইকেল, দু’জনেই হঠাৎ উপলব্ধি করল পুলিশের হুইসেল বাজছে। জোড়া দরজার সামনে ইউনিফর্মও দেখতে পেল মাইকেল। ‘এটা সত্যিকার বিপদ, ওল্ড চ্যাপ, একশো ভাগ খাঁটি! সুবোধ বালকের মত পিছু নাও!’ সুকৌশল অসি চালানোর ভঙ্গিতে বিলিয়ার্ড কিউটা বার কয়েক ব্যবহার করে পাশের জানালার সমস্ত কাচ ভেঙে ফেলল সে, তারপর ধীর শান্ত ভঙ্গিতে বাইরের অন্ধকার বাগানে নেমে পড়ল।

তিন

দ্রুতপায়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে রানা। মেইন রোড ধরে বার্ণার কিনারায় নিজের ক্যাম্পে ফিরছে ও। পিছনের অন্ধকারে শোরগোল আর হুইসেলের আওয়াজ অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। ওর রাগও পড়ে গেছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের রক্তবর্ণ চেহারা আর বিস্ফারিত চোখ দুটো কল্পনা করে আপনমনে হাসল কিছুক্ষণ। একটু পরই সন্দেহ হলো ওর, পিছু নিয়েছে কেউ। টুংটাং ঘণ্টা বাজিয়ে একটা রিকশা আসছে, রিকশাওয়ালার খালি পা থপ থপ আওয়াজ তুলছে কংক্রিটের রাস্তায়। পিছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারল রানা কার পাল্লায় পড়েছে সে।

‘সন্দেহ হচ্ছিল, তোমাকে বুঝি হারিয়েই ফেললাম,’ হালকা সুরে বলল মাইকেল, হাস্যরসে ভরপুর তার সুদর্শন চেহারা দু’সারি দাঁতের মাঝখানে ধরা চুরটের আঙুনে উদ্ভাসিত হয়ে আছে, আয়েশী ভঙ্গিতে রিকশার গদিতে হেলান দিয়ে রয়েছে সে। ‘তোমার কেটে পড়ার ভঙ্গিটা দারুণ মুগ্ধ করেছে আমাকে, মাইরি বলছি! তাদ্র মাস এলে আমাদের পোষা টম পাড়ার বিউটিকে যে গতিতে ধাওয়া করত, ঠিক যেন সেই গতিতে ছুটতে দেখলাম তোমাকে। সত্যি, তোমার আরেকটা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল।’

কথা না বলে নিজের পথে হাঁটতে থাকল রানা।

‘এ-ও কি সম্ভব যে তুমি শুয়ে পড়ার কথা ভাবছ?’ মাইকেলের রিকশা রানার পাশেই থাকছে। ‘রাত তো এখনও শিশু হে, তা ছাড়া কে বলতে পারে মজার মজার আরও কত কী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কী?’ ভুরুর কৌতুককর নাচ কল্পনায় দেখা

গেল।

হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা করল রানা, নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে হাঁটছে।

‘মাদাম জুলিয়ানার ওখানে?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

রানা নিরুত্তর।

‘আমি তো ভেবে পাই না, বয়স থাকতে কেন মানুষ মৌজ-ফুটি করবে না—বিশেষ করে পরের খরচায়!’

‘গাড়িগুলো তোমার খুব দরকার, না?’

‘ব্যথা পেলাম,’ ঘোষণা করল মাইকেল। ‘আমার বন্ধুত্বের প্রস্তাবের সাথে কোন জাগতিক স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে এ-কথা তুমি ভাবতে পারলে?’

‘মাদাম জুলিয়ানাকে আমি চিনি না,’ বলল রানা। ‘তার কাছে আসা মেয়েদের সম্পর্কেও আমার কোন আগ্রহ নেই।’

‘বিশ্বাস করলাম না। নিঃসঙ্গ পুরুষমানুষ, মেয়েদের সম্পর্কে আগ্রহ থাকবে না কেন? নাকি ভাবছ রদ্দিমার্কী বাসি মাল?’

‘নয়?’

‘মাতা মেরীর কিরে, তোমার একজন বয়স্ক গাইড-কাম-গার্জেন দরকার,’ বলল মাইকেল। ‘তুমি দেখছি কিছুই জানো না, হে। শোনো তা হলে। মাদাম জুলিয়ানা ইটালিয়ান ভদ্রমহিলা, দার-এস-সালামে আদম ব্যবসা করেন। চাকরি পাবার আশায় ইটালি থেকে বহু ভদ্র পরিবারের মেয়ে তাঁর কাছে আসে। কিন্তু সবাইকে তিনি সাথে সাথে চাকরি যোগাড় করে দেবেন কীভাবে, বলো? অথচ মেয়েগুলো আসে প্রায় খালি হাতে। মাদাম জুলিয়ানা অত্যন্ত দয়ালু, তিনি শুধু শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ডেকে পাঠান, এবং মেয়েগুলোকে বলে দেন তারা যেন ওদের সঙ্গদান করে কিছু

খসিয়ে নেয়। এতে দু'পক্ষেরই লাভ-আমরাও ফুটি পেলাম, ওদেরও দিন কয়েক চলার মত ব্যবস্থা হলো। তাজা, এবার বুঝতে পারছ তো?’

একটা ঢোক গিলল রানা। হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। নারীসঙ্গ থেকে কতদিন বঞ্চিত, হিসাব পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। যেন এক যুগ পেরিয়ে গেছে। শরীরে চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, ঠিকই বলেছে মাইকেল-আগ্রহ নেই, কথাটা সত্য নয়। তবে পয়সার বিনিময়ে নারীসঙ্গ লাভের কথা কল্পনাও করা যায় না। আরও কয়েক যুগ নিঃসঙ্গ থাকলেও না। কিন্তু এই লোকটা এভাবে লেগেছে কেন ওর পেছনে...আসল উদ্দেশ্যটা কী? বাজে একটা লোক, কিন্তু একে কিছুতেই অপছন্দ করতে পারছে না কেন সে?

‘মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে কী...’

‘তুমি না বললে, শুধু শ্বেতাঙ্গদের ডেকে পাঠান...।’

‘আমার কাছে সাদা-কালোর ভেদাভেদ নেই,’ বলল মাইকেল। ‘মাদাম জুলিয়ানা ট্যা-ফোঁ করলে আমি তার ভুঁড়ি গেলে দেব।’ কী যেন মনে করে হো হো করে হেসে উঠল সে।

‘আমি কোন কথা দিচ্ছি না,’ বলল রানা। ‘এমন হতে পারে ওখানে যাবার পর ভাল লাগল না, তা হলে ফিরে আসব আমি। কিন্তু খরচ দেবে কে?’

‘কেন, বলিনি তুমি আমার মেহমান? উঠে এসো, ওল্ড চ্যাপ।’

তবু ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল রানা। কোন সন্দেহ নেই ওর নির্বাসিত জীবনে অদ্ভুত এক চরিত্র হিসাবে উদয় হয়েছে মাইকেল সেভারস্, তার আচরণের অপছন্দনীয় দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও কী এক দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করছে ও, লোকটার সঙ্গ ছেড়ে ক্যাম্পে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। জানতে ইচ্ছে করছে লোকটা আসলে কী রকম।

‘কী হলো, উঠে এসো!’ তাগাদা দিল মাইকেল। ‘কী ভাবছ? গাড়ির বদলে রিকশা করে গেলে রাজার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে? নাকি ভাবছ আমার পয়সায় আর কত ফুটি করবে?’

‘তোমার বিয়ার খেয়েছি, ডিনার খেয়েছি, হঠাৎ সমাপ্তিই বা টানব কেন?’ ফুটপাত থেকে নেমে রিকশার দিকে এগোল রানা। ‘চলো তা হলে, দেখা যাক। কী বললে? রাজা?’

দু’জন হাস্যমুখর আরোহীকে নিয়ে শহরের দিকে ফিরে চলল রিকশাওয়ালা, রানার দুই চৌঁটের মাঝখানে একটা চুরট ঠেসে দিল মাইকেল। জবাব দিল না।

‘নিজের পাতে ঝোল তো ভালই ঢেলেছিলে,’ জিজ্ঞেস করল রানা, ‘কিন্তু কী ঝোল?’ ঘন ঘন চুরটে টান দিয়ে গলগল করে ঝোঁয়া ছাড়ছে ও। ‘চারটে টেক্সা? নাকি স্ট্রাইট ফ্যাশ?’

‘আমার চরিত্রে কলংক লেপনের অপচেষ্টা হতে দেখে আমি স্তম্ভিত এবং মর্মাহত, স্যার। প্রশ্নটা আমি এড়িয়ে যাব।’

ঝাঁকি খেতে খেতে আরও খানিক সামনে এগোল রিকশা, এরপর মাইকেলের প্রশ্নে নিস্তব্ধতা ভাঙল। ‘সৌখিন শ্বেতাঙ্গের পাছটা সত্যি তোমরা পোড়াওনি, তাই না?’

‘না,’ স্বীকার করল রানা। ‘তবে এই উপাদানটুকু থাকায় গল্পটা দারুণ উতরে গেছে।’

মাদাম জুলিয়ানার গেটে পৌঁছুল ওরা, গেটের ভিতর অন্ধকার বাগান, বাগানের শেষ মাথায় কাঠের একটা দরজার পাশে অল্প শক্তির একটা বালব জ্বলছে। বাগান পেরিয়ে এল ওরা। নক করল দরজায়।

‘নাহ্, এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, আরও দেরি করে অপরাধের মাত্রা বাড়াতে চাই না,’ বলল মাইকেল, তার কাঁচুমাচু

ভঙ্গি দেখে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। ‘তোমার কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সত্যি, প্রথম থেকেই তোমাকে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম।’

‘আসল কথা সময়টা আমরা উপভোগ করেছি।’

‘না, মানে, ভাবছি, তোমার কাছে আমার সৎ থাকতে হবে।’

‘এভাবে বেমক্কা ধাক্কা দিয়ে না তো, আছাড় খেয়ে মারা গেলে চিরকালের জন্যে হারাবে আমাকে। তারচেয়ে যেমন আছ তেমনি থাকো, শুধু খেয়াল রেখো ভুল করেও আমার লেজে পা দিয়ে ফেলো না।’ দু’জনেই ওরা নিঃশব্দে হাসতে লাগল, রানার কাঁধে হালকা ঘুসি মারল মাইকেল।

বলল, ‘আগের কথাই ঠিক থাকল, কেমন? সব খরচা আমার।’

মাদাম জুলিয়ানার ভুঁড়ি গেলে দেওয়ার কথা বলে হেসে উঠেছিল মাইকেল, মহিলাকে দেখামাত্র কারণটা বুঝতে পারল রানা, এবং হাসি চেপে রাখা দায় হলো ওর। মহিলা এত বেশি লম্বা আর রোগা যে কোমর, পেট, নিতম্ব বা বুক বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ হতে লাগল। এমন একটা ড্রেস পরে আছে যেটা হাড়িসার দেহকাঠামো ঢাকবার চেয়ে বেশিরভাগ উন্মুক্ত করে রেখেছে, তবে পায়ের পিছনে তিন ফুট মেঝে ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হয়নি। গলার পিছনে ঘাড়ের উপর মস্ত একটা খোঁপা, নিঃসন্দেহে পরচুলার অবদান। মাইকেলের সঙ্গে রানাকে দেখে মহিলা বিশেষ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না, তবে ভদ্রতা বজায় রেখে মৃদু হাসল সে। সোফায় বসতে বলল। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে কার্পেটের উপর, রানার পায়ের কাছে বসল মাইকেল।

‘মেজর সেভারস্, আপনার দর্শনলাভ করা একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা। এত দিন কোথায় ছিলেন? ভাবছিলাম শহর ছেড়ে

আবার কোথাও চলে গেলেন কি না!’

‘ওনাকে চেনেন, মাদাম জুলিয়ানা?’ সোফায় বসা রানাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মাইকেল। ‘আরব্য রজনী থেকে উঠে আসা মহানুভব একটা চরিত্র। নাম জেনে কাজ নেই, মধ্যপ্রাচ্যের ছোট্ট এক রাজ্যের রাজা উনি, গরিবী হালে চলাফেরা করেন, দুনিয়াটা ঘুরে দেখবার জন্যে বেরিয়ে আমাকে বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসেবে পেয়ে গেছেন। উনি যে দয়া করে আপনার এখানে পায়ের ধুলো ফেলেছেন, সে আপনার সাত পুরুষের ভাগ্য। নতজানু হোন, নতজানু হোন!’

‘আহ, মাইকেল!’ প্রতিবাদ করল রানা। ‘তুমি দেখছি জঘন্য...’

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এক মুহূর্ত স্থির পাথর হয়ে থাকল মাদাম জুলিয়ানা, তারপর রানার সামনে মাইকেলকে নতজানু হয়ে প্রণাম জানাতে দেখে সে-ও আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করল।

রানা ছিটকে সরে যাবার আগে ওর পায়ের পাতায় চিমটি কাটল মাইকেল, তারপর সিধে হলো সে, বসল, ফিসফিস করে বলল, ‘উদ্দেশ্যটা যদি তুমি ধরতে পেরে না থাকো...’

‘আমি গেলাম,’ বলে দরজার দিকে ঘুরল রানা, ভয়ানক রেগে গেছে।

‘রাজা কী ভাষায় কথা বলেন?’ ফিসফিস করে মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল মাদাম জুলিয়ানা। ‘আপনি ওঁকে শান্ত করুন, আমি এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করছি।’ প্রায় ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কার্পেট থেকে লাফ দিয়ে উঠে রানার পথরোধ করে দাঁড়াল মাইকেল। ‘আরে পালাচ্ছ কেন! রাজা না বানালে মাদাম জুলিয়ানা

তোমাকে মশা বা মাছি ছাড়া কিছুই ভাবতেন না। এখন দেখে কেমন তোয়াজ করেন!’

রানা কিছু বলবার আগেই কামরায় পুনরাগমন ঘটল মাদাম জুলিয়ানার। সে নিজেই একটা ট্রে-তে করে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস নিয়ে এসেছে, তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া মাত্র আবার সোফার নীচে কার্পেটের উপর বসে পড়েছে মাইকেল। ‘আপনার প্রাইভেট লাউঞ্জ খালি তো, মাদাম?’ জিজ্ঞেস করল সে। ‘মহামান্য রাজা আমার সাথে কিছু গোপন আলাপ করবেন-কেউ যেন আমাদেরকে বিরক্ত না করে। আর, মহামান্য রাজার সেবা করার জন্যে দু’চারটে ভাল জিনিস যদি থাকে তা হলে পাঠিয়ে দেবেন, একদম ফ্রেশ হওয়া চাই, তা না হলে দরকার নেই।’

পথ দেখিয়ে ওদেরকে প্রাইভেট লাউঞ্জে নিয়ে এল বাকরুদ্ধ মাদাম জুলিয়ানা। মাইকেল তাকে এক রকম ঠেলেই বের করে দিল প্রাইভেট লাউঞ্জ থেকে, তার পিঠের উপর বন্ধ করে দিল দরজা।

ধপাস করে একটা সোফায় বসে হেলান দিল সে, দু’সারি দাঁতের মাঝখানে সদ্য ধরানো লম্বা চুরট, এক হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস। ‘ইথিওপিয়ায় এখন কী ঘটছে সে-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে, ওল্ড বয়?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

বিষণ্ণ দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল রানা। হাতে গ্লাস থাকলেও শ্যাম্পেন খেতে ভাল লাগছে না ওর।

‘ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তোমার বিশ্বাস জন্মেছে যে কোন কারণ ছাড়া আমি কিছু করি না?’ হাসছে না মাইকেল। ‘এবং এখন থেকে যা কিছু করব তার একটাই উদ্দেশ্য থাকবে-বন্ধুত্বটাকে লাভজনক করে তোলা।’

‘ওখানে সম্রাট হাইলে সেলাসির বিরুদ্ধে আন্দোলন এখন

তুঙ্গে।’

‘বলো সম্রাটের সম্রাট হাইলে সেলাসি। বেশ, এবার বলো, ইরিত্রিয়া সম্পর্কে তুমি কী জানো?’ রানা রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল মাইকেল, ‘আহা, এত অধৈর্য হলে চলে কী করে! সবুরে কী ফলে জানো না?’

‘বছর দশেক আগে ইথিওপিয়ার সাথে এক হয়েছে ইরিত্রিয়া।’

‘কিন্তু তবু সব ইটালিয়ান ইরিত্রিয়া ছেড়ে আজও চলে যায়নি, শিফটারা তাদেরকে জামাই আদরে রেখেছে।’

‘শিফটা?’

‘চোর-ডাকাত, দুষ্কৃতকারী, অসভ্য-পাহাড় আর বনেজঙ্গলে বাস। ইটালিয়ানদের ওপর তাদের ভারি ভক্তি, কারণ ওরা যুদ্ধকৌশল জানে, অন্তত শিফটারাদের তাই ধারণা। এবার, ইথিওপিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা কী?’

‘আদিবাসীদের মধ্যে অন্তর্কলহ এবং সম্রাটের শোষণ।’

‘ব্রাভো! শোনো তা হলে, এখানেই আমার কথা এসে পড়ে। আদিবাসীদের একটা গ্রুপ, রাসটাফারিয়ানরা দুর্গম এলাকায় বাস করে, অন্যান্য গোত্রের সাথে এমন কোন দিন নেই যেদিন তাদের সংঘর্ষ বাধে না। কিন্তু সে-সব ছোটখাট সংঘর্ষ, কয়েক শতাব্দী ধরেই চলছে। ওদের আসল শত্রু শিফটারা। শিফটারাদের হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে ইটালিয়ানরা, কিছু ভাড়াটে সৈনিকও আছে তাদের, ফলে হামলা হলেই মার খায় রাসটাফারিয়ানরা, পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই গোত্রটি সম্রাট হাইলে সেলাসিকে দেবতা জ্ঞান করে, কিন্তু সম্রাট নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্যে এতই ব্যস্ত যে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এদেরকে সাহায্য করার কথা ভাবার সময় নেই তাঁর।’

‘বুঝলাম,’ বিরক্ত হয়ে বলল রানা। ‘কিন্তু এ-সব কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন?’

‘বরং জিজ্ঞেস করো, এত কথা আমি জানলাম কোথেকে। জানাই আমার পেশা, ওল্ড চ্যাপ। রাসটাফারিয়ানদের একজন গোত্রপ্রধান আছে, সে-ও ছোটখাট একজন রাজা, তার আছে এক পুত্র অর্থাৎ ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার হলেও সে-ও একজন রাজপুত্র। এই রাজকুমারের সাথে অস্ত্র বেচাকেনার একটা চুক্তি হয়েছে আমার।’

ক্ষীণ আশ্রয় বোধ করল রানা। ‘কেন, তোমার কাছ থেকে কেন অস্ত্র কিনতে যাবে তারা?’

‘এমবার্গো, ওল্ড চ্যাপ। উপজাতীয়দের মধ্যে হরদম যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকে বলে অস্ত্র কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন সম্রাট। অবশ্য অন্তর্নিহিত কারণটা হলো একটা ভয়-গোত্রপ্রধানদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার অনুমতি দেয়া হলে সে-সব সম্রাটকে উৎখাতের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে। এতে করে শিফটাদের ভারি সুবিধে হয়ে গেছে, লুণ্ঠ আর ডাকাতি করা বিপুল সম্পদ রয়েছে তাদের হাতে, রয়েছে ইটালিয়ান সমরনায়ক, তার ওপর বিদেশী কুচক্রের কুমন্ত্রণা এবং সহযোগিতা তো আছেই। এই কুচক্রটির উদ্দেশ্য সম্রাটের অবহেলার সুযোগে ইথিওপিয়ার ওই অঞ্চলে ব্যাপক গোলযোগ ছড়িয়ে দেয়া। ইরিত্রিয়ার লোকজন এক অর্থে এই বিশৃংখলা সমর্থন করে, কারণ দুর্বল ইথিওপিয়াই তাদের কাম্য-তা হলে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পাবে তারা।’

‘শিফটাদের রয়েছে রাইফেল, আর্মার, এয়ারক্রাফট-এয়ারক্রাফট বা ট্যাংক ঠিক এই মুহূর্তে নেই, তবে বিদেশী কুচক্রের কাছ থেকে পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে তারা।’

আর রাসটাফারিয়ানদের? মান্বাতা আমলের ঢাল আর তরোয়াল, ভাঙাচোরা দু’একটা রাইফেল।’

গল্পটা শুনছে রানা, তবে ঠিক বুঝতে পারছে না কতটুকু সত্যি বা এ-সবের মধ্যে ওদের স্বার্থ কোন্‌খানটায় বা কী পরিমাণ। মাইকেলের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসবার কোন ইচ্ছে ওর নেই, বরং সুগার মিলেই আর্মাড কারগুলো বিক্রি করতে চায় ও।

মাইকেল মিটিমিটি হাসছে, যেন রানার মনের সব কথা অনায়াসে পড়তে পারছে। ‘খবরটা শুনেছ?’ অলস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল সে। ‘আর কারও মুখ থেকে শুনলে ভাল হত। আমি বললে তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না।’

‘কী খবর?’

‘তোমার পার্টি, মানে পুয়াভা সুগার মিল লাটে উঠেছে?’

কথাটা বিশ্বাস করবে কি না চিন্তা করবার আগেই বুকে একটা ধাক্কা খেলো রানা। ‘তুমি কীভাবে জানলে?’

‘বললাম না, জানাই আমার পেশা, ওল্ড চ্যাপ?’ সহানুভূতিসূচক চুচু আওয়াজ বেরল মাইকেলের মুখ থেকে। ‘নাকি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, কী?’

বাইরে বেরিয়ে খবর নিলে সত্যিমিথ্যে এখনি জানা যাবে। তবে খবরটা মিথ্যে না হওয়ারই সম্ভাবনা। পুয়াভা সুগার মিল স্যাবোটাজের কারণে গত ক’বছর ধরেই লোকসান দিচ্ছিল। চুপ করে থাকল রানা, এতক্ষণে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিল ও।

‘আমরা যখন পরস্পরের প্রতি এমন ভীতিকরভাবে সৎ, তোমাকে লাভের পরিমাণ জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। রাসটাফারিয়ানরা আমাদেরকে একেকটা গাড়ির জন্যে পনেরো হাজার ইথিওপিয়ান ডলার দেবে। অবশ্য ওগুলোর পিছনে আরও

কিছু খরচ আছে আমাদের। রঙ লাগাতে হবে, টারিটে থাকবে একটা করে মেশিনগান।’

‘এখনও আমি শুনছি,’ সোফায় হেলান দিল রানা।

‘ক্রেতা আমি ঠিক করছি, ভিকার্স মেশিনগান আমি যোগান দিচ্ছি, যেগুলো ছাড়া গাড়িগুলোর কোন মূল্যই নেই। তোমার রয়েছে গাড়িগুলো এবং ওগুলোকে চালানোর জন্যে কারিগরি দক্ষতা।’

মাইকেল সেভারসের মধ্যে আরেকজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছে রানা। অলস ভঙ্গি, সকৌতুক হাসি, বোকা বোকা ভাব তার চেহারা থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। তার ভাষা এখন কাটা কাটা, শব্দগুলো নির্বাচিত, স্লান নীল চোখে দস্যুসুলভ আলো ঝিক ঝিক করে উঠছে। আবার মুখ খুলল সে, ‘এর আগে কখনও কারও সাথে পার্টনারশিপে ব্যবসা করিনি আমি। সব সময় জানতাম, আমি একাই ভাল করব। তবে এক্ষেত্রে তোমার ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখার এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাইছি না। কেন যেন মনে হচ্ছে আরও অনেক গভীরে তোমার সাথে আমার মধুর এবং সুস্থ কিছু মিল আছে। সত্যি আছে কিনা জানার একটা কৌতূহল হলো। জীবনে এই হয়তো প্রথম এবং শেষবার। তুমি কী বলো?’

‘মাইকেল সেভারস্, মনে রেখো, বেঈমানী করলে আমি তোমাকে আগুনে পোড়াব।’

পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে উল্লাসে হেসে উঠল মাইকেল। ‘তুমি যে তা পারো আমি বিশ্বাস করি, রানা!’ সোফা থেকে নেমে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। ‘সমান সমান পার্টনার। তুমি গাড়ি দিচ্ছ, আমি দিচ্ছি মেশিনগান-লভ্যাংশ ভাগ হবে আধাআধি, কী?’ উত্তরে তার হাতটা ধরে ঝাঁকাল রানা।

‘ঠিক আছে,’ বলল ও।

‘আজকের মত যথেষ্ট ব্যবসা হয়েছে,’ বলল মাইকেল। ‘এসো মেয়েদের ওপর চোখ বুলানো যাক।’

‘বরং, আমি এখন ক্যাম্পে ফিরব।’

বডিতে এঞ্জিন আর রঙ লাগানোর কাজে যথেষ্ট খাটাখাটনি আছে, রানা নিজের ধারণা প্রকাশ করল, সমান অংশীদার হিসাবে কাজটায় নিশ্চয়ই ওকে সাহায্য করবে মাইকেল।

মাইকেলের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি একটা চুরট ধরাল সে। ‘শোনো, ওল্ড চ্যাপ। সমান অংশীদারিত্বের ব্যাপারটা টেনে খুব বেশি লম্বা কোরো না। গায়ে-গতরে খাটা আমার পোষাবে না, তা ছাড়া এ-ধরনের পরিশ্রম আমার সম্মানের জন্যে হানিকর।’

‘তা হলে আমাকে লোকজন ভাড়া করতে হবে।’

‘গায়ে তেল-কালি মেখে সং সেজে থাকো সেটা আমারও পছন্দ নয়। যাকে খুশি যত খুশি লোক যোগাড় করো।’ উদার ভঙ্গিতে চুরটটা নাড়ল সে। ‘আমাকে বন্দরে একবার যেতে হচ্ছে, ডকের কিছু অফিসারের মুখ চুম্বন করে আসি, অদূর ভবিষ্যতে কাজে আসবে। আজ সন্ধ্যায় ব্রিটিশ দূতাবাসে ডিনারেও উপস্থিত থাকতে হবে। ভেবো না নিজের কাজে যাচ্ছি। ওখানে গুরুত্বপূর্ণ কারও সাথে খাতির হয়ে গেলে দু’জনের স্বার্থেই কাজে লাগবে।’

রিকশায় চেপে, পাশে বিয়ারের ভর্তি সিলভারের বালতি সহ, পরদিন সকালে মেহগনি গাছের নীচে রানার ক্যাম্পে হাজির হলো মাইকেল, দেখল ছয়জন লোক নিয়ে গাড়ি রঙ করবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে রানা। রঙটা রানা বেছে নিয়েছে গ্রে, কয়েকটা গাড়িতে প্রথম পোচ লাগানো হয়েছে মাত্র। পরিবর্তনটা অবিশ্বাস্য, বিধ্বস্ত

এবং পরিত্যক্ত আর্মাড কারগুলো অজেয় ওঅর মেশিনে রূপান্তরিত হয়েছে, আনকোরা নতুন এবং বিপজ্জনক।

‘মাইরি বলছি,’ উৎফুল্ল হয়ে উঠল মাইকেল, ‘রাসটারা পাগল হয়ে যাবে।’ গাড়িগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে এল সে। ‘মাত্র তিনটে রঙ করা হয়েছে। এ-দুটো বাদ পড়ল কেন?’

‘তোমাকে আগেই বলেছি। শুধু তিনটে চালানো যাবে।’

‘শোনো, ওল্ড চ্যাপ। স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে ইতস্তত কোরো না তো। সব ক’টায় রঙ চড়াও-কীভাবে গছাতে হয় সে আমি দেখব। আমরা কোন গ্যারান্টি দিয়ে মাল সাপ্লাই দিচ্ছি না। কী, ঠিক আছে?’

‘না, নেই...,’ গুরু করল রানা, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল মাইকেল।

‘ভয় পাচ্ছ পরে ওরা আমাদের ধরবে, কী?’ উজ্জ্বল হাসির সঙ্গে একটা চোখ টিপল মাইকেল। ‘অভিযোগ যখন উঠবে, ততদিনে আমরা অন্য কোথাও সরে গেছি-ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস না রেখেই।’

প্রস্তাবটা যে রানার নীতিবোধ, বিবেক ইত্যাদির উপর চাপ সৃষ্টি করছে সেটা উপলব্ধি করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল মাইকেলের। হঠাৎ সে লক্ষ করল, রানার কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ।

আধঘণ্টা পরও দেখা গেল ওদের তর্ক থামেনি।

‘এ শ্রেফ আমার দ্বারা সম্ভব নয়,’ চেষ্টা করে উঠল রানা, বাতিল বাহনগুলোর একটা চাকায় লাথি মারল ও। ‘এভাবে মানুষকে ঠকাবার কথা তুমি ভাবতে পারো কীভাবে! অচল জিনিস সচল বলে চালিয়ে দেয়া...’

দ্রুত শিখবার ব্যাপারে মাইকেলের জুড়ি নেই, রানার

মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলবার চমৎকার একটা কৌশল বেছে নিল সে। বুঝতে পারছে, এভাবে চলতে থাকলে দু’জনের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি বেধে যাবে। হঠাৎ করে কৌশলটা কাজে লাগাল সে। ‘শোনো, ওল্ড চ্যাপ,’ নরম সুরে বলল, ‘নিজেদের মধ্যে চেষ্টামেচি করার কোন মানে হয় না...’

‘আমি চেষ্টাচ্ছি না!’ গর্জে উঠল রানা।

‘না, অবশ্যই না,’ প্রায় আদর করবার সুরে রানাকে শান্ত করবার চেষ্টা করল মাইকেল। ‘তোমার যুক্তি আমি বুঝতে পারছি। তুমি ঠিক কথাই বলছ। তোমার মত আমিও কাউকে ঠকাতে চাই না।’

সামান্যই শান্ত হলো রানা, প্রতিবাদে ফেটে পড়বার জন্য আবার মুখ খুলল, কিন্তু ঠোঁট গলে শব্দ বেরবার আগেই ফাঁকটার ভিতর লম্বা কালো একটা চুরট ভরে দিল মাইকেল। ‘এসো, এবার ঈশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধি খাটাই আমরা, কেমন? প্রথমে আমাকে বলো, কেন চলবে না, বা কী করলে ওগুলোকে সচল করা যায়।’

পনেরো মিনিট পর। তাঁবুর বাইরে সান-ফ্ল্যাপের ছায়ায় বসে বরফ দেওয়া বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ওরা, মাইকেলের নিপুণ দক্ষতায় মধুর বন্ধুত্বসূচক পরিবেশ ফিরে এসেছে আবার।

‘একটা স্মিথ-বেনটলি কারবুরেটর,’ চিন্তিতভাবে পুনরাবৃত্তি করল মাইকেল।

‘সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করে দেখেছি আমি, কোথাও নেই। এক হতে পারে, অর্ডার দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আনানো-তাও যদি পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকান থেকে কোন সাপ্লাইয়ার যোগাড় করতে পারে। এত পুরনো জিনিস কে রাখতে গেছে!’

‘উঁহু, ইংল্যান্ড থেকে আনাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে।’

শোনো, ওল্ড বয়। কী করতে হবে, আমি জানি। কাজটা করার জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বড় ঝুঁকি নিতে হবে, তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু আমাদের যৌথ ব্যবসার স্বার্থে কাজটা আমি করব।’

তাজানিয়ায় ব্রিটিশ অ্যামবাসাডর ভদ্রলোকের এক মেয়ে আছে, বাবার বিশাল সয়-সম্পত্তি এবং সম্মানজনক খেতাব থাকা সত্ত্বেও বত্রিশ বছর পেরিয়ে যেতে চলল অথচ আজও তার বিয়ের ফুল ফোটেনি।

আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে এক পলকে কারণটা উপলব্ধি করতে পারল মাইকেল সেভারস্। প্রথম যে বিশেষণটা তার মনে পড়ল সেটা হলো ‘ঘোড়ামুখী’, কিন্তু না, ঠিক মিলল না বলে মনে হলো মাইকেলের। ‘উটমুখী’-হ্যাঁ, উটমুখী বললে চেহারার কাছাকাছি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। দেহ-মন অবশ্য করা একটা উট, ভাবল সে। চামড়া মোড়া নরম সিটে কাত হয়ে বসে মেয়েটা তার দিকে প্রেম-কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, জবাবে দু’কান বিস্তৃত হাসি হাসছে মাইকেল, ফলে আপনা থেকেই চোখ বুজে আসায় না তাকানোর অজুহাত তৈরি করতে হচ্ছে না। কিন্তু এভাবে সারাক্ষণ হাসতে থাকায় এরইমধ্যে মুখ ব্যথা করছে তার, তা ছাড়া চোখ বুজে কতক্ষণ একজন মানুষ গাড়ি চালাতে পারে? রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে বলল, ‘মেয়ে হিসেবে তোমার কোন তুলনা হয় না। বেড়ানোর জন্যে তোমার বাবার এত শখের গাড়িটা আমার হাতে তুলে দিয়েছ, কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!’

রোমান্স বা রোমাঞ্চ যাই হোক, তার প্রতিক্রিয়া, এরকম আগে কখনও হতে দেখেনি মাইকেল। মেয়েটা কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল, হলুদ কোদালগুলো বের করে, যেন কেউ তাকে অবিরাম

কাতুকুতু দিচ্ছে।

‘তুমি জানো, তোমার বাবাকে আমি হিংসা করি? কোথাও যদি পাই, এ-ধরনের পুরনো একটা গাড়ি অবশ্যই আমি কিনব, দেশে ফিরে।’ মেইন রোড ছেড়ে ধুলো ঢাকা পথ ধরল মাইকেল, পামগাছের মাঝখান দিয়ে সাগরের কিনারা ঘেঁষে বহুদূর চলে গেছে। বাঁক নেওয়ার সময় একজন পুলিশ এমবাসার নাম্বার প্লেট চিনতে পারল, ঝট করে সিঁধে হয়ে স্যাঁলুট করল সে। মার্জিত ভঙ্গিতে আলগোছে হ্যাটের কিনারা ছুঁলো মাইকেল, একটা ঢোক গিলে লক্ষ করল, দূতাবাসে গাড়িতে উঠবার পর থেকে মুহূর্তের জন্যও তার মুখ থেকে দৃষ্টি সরায়নি চিরকুমারী মেয়েটা।

‘সামনে চমৎকার একটা স্পট আছে-নির্জন। কিছুক্ষণের জন্যে ওখানে আমরা থামতে পারি।’

এত জোরে ঘাড় ঝাঁকাল মেয়েটা, মাইকেলের সন্দেহ হলো ওটা না মাথা সহ ছিঁড়ে পড়ে। কোন কথাই বলছে না ওর সঙ্গিনী, সম্ভবত বিপুল উল্লাস আর অবিশ্বাস নিজের উপর আস্থাহীন করে তুলেছে তাকে, ভয় পাচ্ছে কথা বলতে চেষ্টা করলে চিঁচিঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বেরাবে না। সেজন্য মাইকেল অবশ্য কৃতজ্ঞ, এবং তার কৃতজ্ঞতা মিটিমিটি হাসি হয়ে ফুটে বেরল। সাড়া পাচ্ছে মনে করে বেগুনি হয়ে গেল সঙ্গিনীর চেহারা, ঠোঁটের ফাঁকে আবার বেরিয়ে পড়ল হলুদ কোদালগুলো।

ওর চোখ দুটো সুন্দর, নিজেকে সান্ত্বনা এবং অভয় দেওয়ার চেষ্টা করল মাইকেল-অবশ্য তোমার যদি উটের চোখ পছন্দ হয়। একজোড়া বিষণ্ণ সাগর, বড় বড় পাতা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মাইকেল, শুধু চোখ দুটোর দিকে তাকাবে সে, এড়িয়ে যাবে দাঁতগুলোকে। আকস্মিক উদ্বেগের একটা আঁচ অনুভব করল সে।

নাজুক, সংকটময় মুহূর্তে মেয়েটা কামড়ায় না তো? ওই ধারাল কোদাল গুরুতর জখম করতে পারে! মুহূর্তের জন্য পরিকল্পনাটা বাতিল করে দেওয়ার কথা ভাবল সে। তারপর কল্পনার সাহায্যে নিজেকে দেখাল থরে থরে সাজানো রয়েছে ইথিওপিয়ান ডলার, সঙ্গে সঙ্গে সাহস ফিরে পেল সে।

ব্রেক করল মাইকেল, বাঁকটা কোথায় খুঁজল। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা, পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। গাড়ি নিয়ে পিছিয়ে আসতে হলো।

অবশেষে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে থামল বেন্টলি। চারপাশে উঁচু ঝোপ, মাথার উপর পাম গাছের ডাল, খুব কাছে থেকে সাগরের ভাঁতা গর্জন ভেসে আসছে, আশপাশে লোকবসতি বা লোকজনের আনাগোনা নেই।

‘দেখো কাণ্ড, সত্যি পৌছে গেছি আমরা, কী?’ সঙ্গিনীর দিকে ফিরল মাইকেল, মুখে চোখ বোজা হাসি। ‘ঘাড়টা যদি একটু বাঁকাও, বোধহয় সাগরও দেখতে পাবে।’

সামনের দিকে ঝুঁকে সাগরের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে সে, অ্যামবাসাডরের মেয়ে বাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। মাইকেলের সর্বশেষ সচেতন চিন্তা ছিল, অবশ্যই তাকে দাঁতের কামড় এড়াতে হবে।

নতুন রঙ করা ঝকঝকে বিশাল বেন্টলি যতক্ষণ না বাঁকি খেতে শুরু করল, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, ওটাকে চেউয়ের উপর লাইফবোটের মত দুলতে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও, হাতে ক্যানভাস ব্যাগ। মাথা নিচু করে বনেটের কাছে চলে এল, এঞ্জিন কাউলিং খুলবার সময় শব্দ হলেও গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা ফোঁস-ফোঁস আর নাকিসুরে ফোঁপানির আওয়াজে চাপা পড়ে গেল সব। ইচ্ছাকৃতভাবে নয়,

দুর্ঘটনাবশত উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ভিতরে একবার চোখ পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আতংকে কুঁকড়ে গেল ও, দৃশ্যটা জীবনে কখনও ভুলবে না-মেয়েটার সরু সাদা পা, লম্বা আর হাড়িসার, গাঁটগুলো উটের পায়ের মত শক্ত আর বেটপ, ক্যাবের সিলিঙে অবিরত লাথি মারছে। তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে একটা ঢোক গিলল ও। এই প্রথম দুঃখ হলো মাইকেলের জন্য।

কাজটা দ্রুত শেষ করল রানা, কারবুরেটর হাতে চলে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গাড়ির ভিতর ধস্তাধস্তির আওয়াজ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। আর্মারড কারগুলো রঙ করবার কাজে মাইকেল ওকে সাহায্য করেনি বলে রাগ হয়েছিল রানার, হঠাৎ করে সেই রাগটা পানি হয়ে গেল। এই মুহূর্তে মাইকেল সেভারস্ যে গাধার খাটনি খাটছে, তার তুলনায় গাড়ির পেছনে যে-কোন অমানুষিক পরিশ্রম তাৎপর্যহীন বলে মনে হবে।

গোটা কারবুরেটর অ্যাসেম্বলি ক্যানভাস ব্যাগে ভরে নিয়ে পিছু হটতে শুরু করল রানা। হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল বেন্টলি, তীক্ষ্ণ একটা শেষ চিৎকারের পর অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল। ঝোপের আড়ালে পৌছে সিধে হলো রানা। ভাড়া করা রিকশাটা আধ মাইল দূরে রেখে এসেছে ও।

‘আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, এই অসুস্থ শরীরে হেঁটে বাড়ি ফিরতে জান বেরিয়ে গেছে আমার। সেই সাথে মহিলাকে বিশ্বাস করাতে হয়েছে, গাড়ির ভেতর ঘটনাটা বাগদানের কোন অংশ ছিল না।’

‘অকুতোভয় বীরত্ব দেখানোর জন্যে অবশ্যই তোমাকে পদক দেয়া হবে,’ প্রতিশ্রুতি দিল রানা, আর্মারড কারের হাউজিঙ থেকে

ক্রল করে বেরিয়ে এল ও। ‘ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে আদর্শের ধ্বজাধারী মেজর মাইকেল সেভারস্ একাই দুর্গম দুর্গের দিকে ধাবিত হন, শত্রুহননে চরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বধ করেন...’

‘প্রচণ্ড কৌতুককর,’ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল মাইকেল। ‘কিন্তু মনে রেখো, লোকজনকে না ঠকানোর ব্যাপারে তোমার যেমন একটা সুখ্যাতি আছে তেমনি আমারও একটা সুনাম আছে। এই ঘটনা যদি ফাঁস হয়ে যায়, নির্দিষ্ট একটা মহলে আমার মাথা কাটা যাবে। কথা দিতে হবে, ওল্ড চ্যাপ। স্পিকটি নট, কী?’

‘কথা দিলাম,’ আন্তরিকতার সঙ্গে বলল রানা, ক্র্যাঙ্ক, হ্যান্ডেল ঘোরাবার জন্য ঝুঁকল। প্রথমবার ঘোরাতেই স্টার্ট নিল এঞ্জিন, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করবার পর নিঃশব্দে হাসল রানা। ‘শুনতে পাচ্ছ, মাইকেল? এঞ্জিনের এই মিষ্টি গান তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়?’

নরকতুল্য দৃশ্যটার কথা স্মরণ করে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়বার ভঙ্গি করল মাইকেল, হেসে উঠল রানা।

‘চার চারটে লৌহমানবী। জীবনের কাছ থেকে আর কী আশা করো তুমি?’

‘পাঁচটা,’ সঙ্গে সঙ্গে বলল মাইকেল, ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা। ‘পাঁচ নম্বরটা আমার নামে বিক্রি হবে,’ মিনতির সুরে আবার বলল সে। ‘তোমার সুখ্যাতি রক্ষার জন্যে আমার নিজের প্যাডে লিখব, ওটা আমি বিক্রি করেছি, কী?’ কথা না বললেও রানার গম্ভীর চেহারা জবাবের জন্যে যথেষ্ট। ‘না?’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইকেল। ‘এই আমি বলে রাখলাম, তোমার মাকাতা আমলের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দু’জনকেই প্রতিমুহূর্তে বিপদে ফেলবে।’

‘আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি।’

www.BanglaBook.org

‘স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, ওল্ড চ্যাপ।’ ঘন ঘন মাথা নাড়ল মাইকেল। ‘একটা কথা বোধহয় ঠিক, অচল মাল দিলে রাসটার বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। ওরা আবার তরোয়াল ব্যবহার করে, আর ওটা দিয়ে ওরা শুধু মাথাই কাটে না-অন্তত তাই শুনেছি। থাক, পাঁচ নম্বরটা গছাবার দরকার নেই।’

মাসের বাইশ তারিখে ‘একের বুন’ নোঙর ফেলল দার-এস-সালাম বন্দরে, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক বার্জ আর লাইটার হেঁকে ধরল জাহাজটাকে। সাউদাম্পটন থেকে রওনা হয়ে কেপ টাউন, ডারবান ঘুরে দার-এস-সালাম এসেছে একের বুন, জিবুতি পর্যন্ত যাবে।

প্রথমশ্রেণীর দুটো সুইট আর পাঁচটা ডাবল কেবিন প্রিন্স হাসান সালে হারারির দখলে রয়েছে, কয়েকজন সঙ্গী-সহকারীকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ সফর শেষ করে ফিরছে সে। প্রিন্স হাসান সালে একজন রাসটাফারিয়ান, সম্রাট হাইলে সেলাসি কর্তৃক নিযুক্ত পাহাড় এবং মরু অধ্যুষিত বিশাল এক ভূখণ্ডের শাসক তার বাবা। শিফটাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, এবং সম্রাটের দৃষ্টি তথা আর্থিক ও সামরিক সাহায্য আদায়ে ব্যর্থ হয়ে চাঁদা সংগ্রহের জন্য পশ্চিমা দুনিয়ার কাছে ধরনা দিতে গিয়েছিল প্রিন্স, দীর্ঘ তিন মাসের সফর আংশিক সফল হওয়ায় দেশে ফিরবার পথে দার-এস-সালামে যাত্রাবিরতি, উদ্দেশ্য গোপনে কিছু অস্ত্র কেনা। প্রিন্সের পশ্চিমা দেশগুলো সফর করবার পিছনে শুধু আর্থিক সহায়তা লাভই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, শিফটাদের ঘন ঘন হামলায় কীভাবে তার গোত্রের লোকজন প্রাণ এবং সম্পদ হারাচ্ছে তার একটা ছবি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বলা যায় সংবাদমাধ্যমগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হয়েছে

সে, যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত একটি পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতাকে তার সঙ্গে পাঠানো হয়েছে সরেজমিনে পরিস্থিতি জরিপ করবার জন্য। এই সংবাদদাতার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সরকার এবং সাহায্যদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করবার পরিকল্পনা রচনা করবে, সে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে তাকে। তবে, এক অর্থে, মন ভেঙে গেছে প্রিন্সের। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তার গোত্রকে শিফটাদের হামলা থেকে রক্ষার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করতে রাজি হয়নি কেউ। সবার ধারণা, সম্রাট এই মুহূর্তে নিজের সিংহাসন রক্ষায় এতই ব্যস্ত যে এ-ধরনের অনুরোধে তিনি কান দেবেন না। মন খারাপের আরেকটা কারণ, পশ্চিমা দুনিয়ার কোন সরকার অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়নি তাকে, এবং বিভিন্ন বেসরকারী সূত্র থেকে যে চাঁদা পাওয়া গেছে তা দিয়ে চোরা বাজার থেকে খুব বেশি কিছু কেনাও যাবে না।

জেটি থেকে একটা হুড খোলা করে চড়ল প্রিন্স, অপরটায় উঠল তার সঙ্গী-সাথীরা। ওগুলো কে পাঠিয়েছে এই মুহূর্তে ঠিক জানা নেই প্রিন্সের, ড্রাইভারদের কাছ থেকে শুধু জানা গেল ডকে অপেক্ষা করছেন স্যার, তিনিই পাঠিয়েছেন।

স্যার অর্থাৎ মেজর মাইকেল সেভারস্ তার নবীন বন্ধু মাসুদ রানাকে নিয়ে চার নম্বর ওয়্যারহাউসে অপেক্ষা করছে, ড্রাইভারদের আগেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সে।

‘মনে আছে তো, ওল্ড চ্যাপ? কথা বলার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেবে তুমি, কী?’ বিশাল ওয়্যারহাউসের ভিতর আলো খুব কম, আগ্রহ এবং উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছে ওরা। ‘মারমুখো গান্ধীর্ষ্য থাকবে তোমার চেহারায়ে। জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে দেখানোর দায়িত্ব তুমি নিতে চাইছ, বেশ নাও, কিন্তু দেখো,

আবার ডুবিয়ে না।’

‘তোমাকে না বললাম, ভাড়াটে সৈনিক হিসেবেও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে,’ রানা গম্ভীর এবং মারমুখো।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ তাড়াতাড়ি রানাকে শান্ত করল মাইকেল। ‘মোট কথা, প্রিন্সকে মুক্তি করতে হবে। তুমি ভাড়াটে সৈনিকই হও বা গুপ্ত পুলিশই হও, সে-ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা এই কারণে নেই যে তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি।’

আবছা অন্ধকারে হাসি গোপন করতে রানাকে বেগ পেতে হলো না।

ম্লান নীল ট্রপিক্যাল সুট পরেছে মাইকেল, বোতামের গর্তে ঝুলছে তাজা একটা গোলাপ। তার টাইটা আড়াআড়িভাবে ডোরা কাটা। লালচে সোনালি চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, আজ সকালে সুন্দর করে গৌঁফও ছেঁটেছে সে। বন্ধু রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকাল, সম্ভৃষ্টির হাসি ফুটল ঠোঁটে। নিজের পকেট থেকে একশো শিলিং খরচ করে ওকে নতুন একটা সুট বানিয়ে দিয়েছে সে, অবশ্য তারপরই ওর কাছ থেকে ধার করেছে দুশো শিলিং, ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ জানাতে ভুলে গেছে। রানার পায়ের জুতোটা পুরানো হলেও, সদ্য পালিশ করা, নতুনের মতই ঝকঝক করছে। তবে অনেক বলেও চুল ছাঁটাতে পারেনি, ঝাঁকড়া হয়ে কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে। যদিও নিজের গরজেই হাত আর নখের ভিতর থেকে গ্রিঞ্জের সব দাগ পরিষ্কার করে ফেলেছে রানা।

‘ওরা সম্ভবত ইংরেজি জানে না,’ বলল মাইকেল। ‘প্রয়োজনে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে হতে পারে। রাগ কোরো না, এখনও সময় আছে—তুমি রাজি হলে পাঁচ নম্বরটা ওদেরকে

অনায়াসে গছানো যায়।’ রানার চেহারা দেখে একটা হাত তুলল। ‘থাক, এ-প্রসঙ্গ থাক।’ কান খাড়া করল সে, এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। ‘ওই বোধহয় আসছে ওরা। সব মনে আছে তো, কী?’

ওয়্যারহাউসের সামনে প্রখর রোদের মধ্যে থামল গাড়ি দুটো, কিচিরমিচির করতে করতে নামল আরোহীরা। সাদা ঢোলা আলখাল্লা পরে আছে চারজন, অনেকটা প্রাচীন রোমানদের পরিধেয় টোগা-র মত দেখতে, কাঁধের উপর থেকে ভাঁজ হয়ে নেমে এসে পা ঢেকেছে। আলখাল্লার নীচে গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার আর খোলা স্যান্ডেল। সবাই তারা বয়স্ক লোক, মুখে বলিরেখা, মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল। কেউ নিশ্চরতা ভাঙল না, সবাই সসম্মমে ঘিরে দাঁড়াল পশ্চিমা ধাঁচে তৈরি গাঢ় রঙের সুট পরা দীর্ঘদেহী যুবককে। তাদেরকে নিয়ে ওয়্যারহাউসের আবহা অন্ধকারে প্রবেশ করল যুবক। নিয়ে যাচ্ছে মাইকেল সেভারসের কাছে।

লম্বায় প্রিন্স হাসান সালে ছ’ফুটের বেশি হবে, কাঁধ দুটোয় পণ্ডিতসুলভ ঝুঁকে থাকা ভাব। গাঢ় মধু রঙের চামড়া, চকচকে চোখা নাক আর চিন্তামগ্ন বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সামনের দিকে ঝুঁকে থাকবার প্রবণতা সত্ত্বেও তার হাঁটবার ভঙ্গির মধ্যে একজন দক্ষ অসিযোদ্ধার সৌষ্ঠব আর মাধুর্য ফুটে বেরুল, হাসতে শুরু করায় গাঢ় চামড়ার মাঝখানে ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত।

‘খোদার কসম,’ বলল হাসান সালে, তার ইংরেজি উচ্চারণ ভঙ্গি হুবহু মাইকেলের সঙ্গে মিলে যায়, গলার আওয়াজটাও একই রকম দরাজ, ‘আমি কি স্বপ্ন দেখছি? উলঙ্গ সেভারস না?’

মাইকেলের অভিজাত গম্ভীর চেহারা থেকে মার্জিত ভাবভঙ্গি মোমের মত গলে পড়তে শুরু করল। তোতলাচ্ছে সে, যদিও শুধু ঠোঁটই নড়ছে, গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না, সেই সঙ্গে

মনে পড়ে গেছে শেষবার বিশ বছর আগে শোনা নিজের ডাকনাম। হোস্টেলের খালি কামরায় দিগম্বর সেজে যে-ই না পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতে যাবে মেয়েটাকে, জানালার বাইরে থেকে একদল ছাত্র অমনি শেয়াল-কুকুরের ডাক ছাড়তে শুরু করল, সেই সঙ্গে তুমুল হাততালি। কলেজ ছাড়বার পর গত বিশ বছরে ঘুণাঙ্করেও কল্পনা করেনি সে ওই ডাকনাম আবার তাকে শুনতে হবে। শেয়াল-কুকুরের ডাকগুলো প্রচণ্ড ঘুসির মত আঘাত করেছিল তাকে, এতদিন পর আবার সেই একই ঘুসি খেলো সে।

প্রিন্স হাসান সালে উল্লাসে হেসে উঠল, হাত তুলে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল নেকটাইয়ের নট। এই প্রথম লক্ষ করল রানা, মাইকেলের গলাতেও হুবহু ওই জিনিস শোভা পাচ্ছে।

‘ইটন, বিশ বছর আগে। হাউজের ক্যাপটেন ছিলাম আমি। ক্লাসে সিগারেট খাওয়ার অপরাধে সাজা দিয়েছিলাম তোমাকে, মনে নেই?’

‘মাই গড,’ হাঁপিয়ে উঠল মাইকেল। ‘চকলেট সালে! মাই গড! আমি ভাষা হারিয়ে ফেলছি!’

‘তা হলে সাংকেতিক ভাষায় চেষ্টা করে দেখো,’ ফিসফিস করল রানা।

‘শাট আপ, ড্যাম ইউ,’ হিসহিস করে উঠল মাইকেল, তারপর অনেক কষ্টে চেহারায় ফুটিয়ে তুলল তার স্বভাবজাত ভুবনভোলানো হাসি, প্রায় অন্ধকার ওয়্যারহাউসে যেন নতুন সূর্য উঠল। ‘ইওর এক্সপ্লেসিভ-চকলেট-মাই ডিয়ার ফেলো!’ ছুটল সে, হাতটা সামনে বাড়ানো। ‘কী পরম আনন্দ, কী অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য!’

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে করমর্দন করল ওরা, দুই পুরানো বন্ধুর

পুনর্মিলনের দৃশ্য চাক্ষুষ করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উপদেষ্টাদের ভাবগম্ভীর কালো চেহারাগুলো অকস্মাৎ ফুটিফাটা হয়ে উঠল।

‘এসো, আমার পার্টনার, ভারতীয় মি. মাসুদ রানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। মি. রানা একজন এঞ্জিনিয়ার এবং ফাইন্যান্সার-রানা, ইনি হিজ এক্সেলেন্সি হাসান সালে, শোয়ার ডেপুটি গভর্নর, এবং আমার প্রাচীন ইয়ার-বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়।’

প্রিন্সের হাত সরু, ঠাণ্ডা ও শক্ত। মাইকেলের দিকে ফিরবার আগে তার দৃষ্টি এক পলকে রানার অন্তরের অন্দরমহল পর্যন্ত যেন দেখে নিল। ‘কবে যেন তোমাকে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়?’ জিজ্ঞেস করল সে। ‘চুয়ান্ন, নাকি পঞ্চগন্না সালের গ্রীষ্মে? সেবারও একটা চাকরানীর ওপর চড়াও হয়েছিলে, এটুকু বেশ মনে করতে পারি...।’

‘গুড লর্ড, নো!’ মাইকেল আতংকিত। ‘চাকরানীর ওপর ওই একবারই, হোস্টেল রুমে। তুমি আসলে হাউজ মাস্টারের মেয়ের কথা বলছ...’

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, ঠিক। হোস্টেলের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাওয়াতেই তো নামটা দেয়া হলো তোমাকে...ছেলেরা বোধহয় তোমার কাপড়চোপড় সব সরিয়ে রেখেছিল, তাই না? ঘন্টা কয়েক উলঙ্গ থাকতে হয়েছিল তোমাকে। তুমি চলে আসার পরও অনেক দিন ছেলেরা তোমার কথা ভোলেনি। শুনেছিলাম সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলে, সেখান থেকেও নাকি তোমাকে...।’

হঠাৎ ঝুঁকে প্রিন্স হাসান সালের গালে চুমো খেলো মাইকেল, কারও মুখ বন্ধ করতে হলে এরচেয়ে ভাল অস্ত্র আর হতে পারে না। ‘তুমি আমার পরাণের দোস্তু...।’

প্রিন্স হাসান জানতে চাইল, ‘তারপর থেকে কী করছ তুমি, ওল্ড চ্যাপ?’

মাইকেলের জন্য প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে বিব্রতকর। উদার ভঙ্গিতে হাতের চুরটটা নাড়ল সে। ‘এটা-সেটা, বোঝাই তো। একটা না একটা। ব্যবসা আর কী। আমদানী-রফতানী, বেচা-বিক্রি।’

‘সেই সূত্রেই আমরা আবার মিলিত হলাম, তাই না?’ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল প্রিন্স।

‘ঠিক তাই,’ বলে প্রিন্সের একটা হাত ধরল মাইকেল। ‘এখন যখন জানি কে আমার ক্রেতা, উন্নতমানের জিনিস সাপ্লাই দিতে পারছি বলে আনন্দের পরিমাণ বেড়ে গেল আমার।’

ওয়্যারহাউসের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে কাঠের বাক্সগুলো সুন্দর করে সাজানো রয়েছে।

‘চোদ্দটা ভিকার্স মেশিনগান, বেশিরভাগ সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে আনা হয়েছে-বলতে পারো ব্যারেল থেকে এখনও কোন গুলি বেরোয়নি।’

বাক্সগুলোর সামনে দিয়ে এগোল ওরা, থামল সর্বশেষ বাক্সটার কাছে, ওটা খুলে বের করা হয়েছে একটা মেশিনগান, তেপায়ার উপর ফিট করে রাখা হয়েছে।

প্রিন্সের সঙ্গী পাঁচজন ইথিওপিয়ানই অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধা, মেশিনগানটার দিকে সবাই তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

‘দেখতেই পাচ্ছ, সবগুলো ফাস্টরুলাস জিনিস।’ রানার দিকে চট করে একবার তাকিয়ে একটা চোখ টিপল মাইকেল। ‘একশো চুয়াল্লিশটা লী-এনফিল্ড রাইফেল-এখনও গ্রিজ লেগে রয়েছে-’, প্রদর্শনের জন্য মাত্র ছ’টা রাইফেল পরিষ্কার করা হয়েছে।

ওদের কাছে সাতরাজার গুপ্তধনে ঠাসা গুহা হয়ে উঠল চার

নম্বর ওয়্যারহাউস। বয়স্ক যোদ্ধারা ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা ভুলে পচা আবর্জনাভাষী কাকের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্রগুলোর উপর, তেলমাখা ঠাণ্ডা ইস্পাতগুলোকে ব্যগ্রতার সঙ্গে হাতে তুলে নিয়ে আদর করতে শুরু করল, ভিজিয়ে দিল চুমোয় চুমোয়, অ্যামহারিক ভাষায় কিচিরমিচির করছে। তাদের একজন মেশিনগানের পিছনে দাঁড়াল, পরনের আলখাল্লা হাঁটুর উপর তোলা, হঠাৎ ঝুঁকে তেপায়ার উপর ঘোরাতে শুরু করল মেশিনগানটা, মুখ দিয়ে গুলিবর্ষণের আওয়াজ ছাড়ল, অবিরাম হাসছে।

এমনকী প্রিন্স হাসান সালেও ইটোনিয়ান ভব্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে ভিড়ে গেল, সত্তর বছরের এক যোদ্ধাকে কনুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে লী-এনফিল্ড তুলে গুলিবর্ষণ করবার কৃত্রিম মহড়া দিতে শুরু করল—কাল্পনিক শত্রুদের পাইকারী হাতে নিধন করছে। ঠিক সময়মত নাক গলাল মাইকেল।

‘বলছিলাম কী, চকলেট, ওল্ড চ্যাপ—তোমার জন্যে এগুলোই আমার সব উপহার নয়। আসল জিনিস সবশেষে দেখাব বলে রেখে দিয়েছি।’ আলখাল্লা পরা শূশ্র্শমণ্ডিত উপদেষ্টাদের এক জায়গায় জড়ো করতে তাকে সাহায্য করল রানা, তারপর পথ দেখিয়ে ওয়্যারহাউস থেকে বের করে এনে সবাইকে তুলল খোলা গাড়ি দুটোয়।

মটর শোভাযাত্রা শহর ছেড়ে মেহগনি বনে ঢুকল, প্রথম গাড়িতে মাইকেল, রানা ও প্রিন্স রয়েছে। রানার ক্যাম্পের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় চাঁদোয়া আর রঙিন ছাতা টাঙানো হয়েছে, নীচে কাপড় ঢাকা দুটো টেবিল, টেবিলে সিটি হোটেলের প্রায় সব উপাদেয় খাবারই পরিবেশনের অপেক্ষায়। আরও আছে রূপালি বালতি ভরা বিয়ার ও শ্যাম্পেন। পরিবেশন শুরু করবার অপেক্ষায় মাথায় ফেজ টুপি আর সাদা আচকান পরা ওয়েটাররা অদূরে

দণ্ডায়মান।

খরচের প্রশ্ন তুলে এই আয়োজনে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল রানা, কিন্তু মাইকেল তার প্রতিবাদে কান দেয়নি। তার যুক্তি ছিল, ‘বলতে পারো এক ধরনের জুয়া খেলছি। মুসলমান, মদ খায় না, কিন্তু যদি খায়—পেটভরে খাওয়াও। ভুলে যেয়ো না কয়েকশো গুণ দাম চাইব গাড়িগুলোর, মাতাল ছাড়া ওই দামে কে ওগুলো কিনতে চাইবে? তা ছাড়া, ওরা তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করে বলে ওদের সাথে আমরা তো আর বারবারদের মত আচরণ করতে পারি না! সব কাজের একটা স্টাইল আছে। স্টাইল অ্যান্ড টাইমিং—জীবন তো এই দুটোর নির্যাস বৈ কিছু নয়, কী?’

অনুমতির ধার না ধরে প্রিন্স আর তার সঙ্গীরা বালতি থেকে হেঁ মেরে তুলে নিল শ্যাম্পেনের বোতলগুলো। হাতে গ্লাস নিয়ে ছুটে এল ওয়েটাররা, কিন্তু বৃথাই, সরাসরি বোতল থেকে খেতেই পছন্দ করল তারা। বিশেষ করে প্রিন্সকে অনবরত উৎসাহ দিয়ে চলেছে মাইকেল।

আধ ঘণ্টা পর আস্ত রোস্ট করা একটা বাচ্চা ছাগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অতিথিরা। ভূরিভোজনের সঙ্গে এখনও মদ্যপান চলছে সমানে। রানা বা মাইকেল, দু’জনের কেউই খুব বেশি পান করেনি, তবু পরস্পরকে প্রায়ই সতর্ক করে দিচ্ছে ওরা, ‘অ্যাঁ, মাত্রা ছাড়িয়ে না!’

হাতের বোতল মুখের কাছে তুলে প্রিন্স সালে চেষ্টা করে বলল, ‘সম্রাট হাইলে সেলাসির শুভবুদ্ধির উদ্দেশে!’

রানার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করল মাইকেল, ‘শালাকে আরও খাওয়াতে হবে, দেখছ না নিজের সমস্যার কথা এখনও ভোলেনি!’ সিধে হয়ে প্রিন্সের হাতে আরেকটা বোতল

ধরিয়ে দিল সে, নিজের হাতের গ্লাস উঁচু করে ঘোষণা করল, ‘রানী এলিজাবেথের উদ্দেশে।’

এরপর রানার পালা, ‘ব্রিটিশ দূতের মেয়ের উদ্দেশে।’

প্রতিটি ঘোষণার সঙ্গে এক দফা করে পানীয় পান করল অতিথিরা।

‘উল্গ সেভারস্,’ ফিসফিস করল রানা, ‘এবার থামাতে হয়, কী বলো?’

‘শোনো, ওল্ড চ্যাপ,’ গম্ভীর সুরে বলল মাইকেল, ‘ওই নামটা উচ্চারণ না করলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব। ডিসটেস্টফুল, কী?’ রানার কাঁধে হালকা একটা ঘুসি মারল, কিন্তু লাগল না—টলছে সে। রানার নিষেধ সত্ত্বেও যথেষ্ট গিলেছে।

‘অনেক হয়েছে, মাইকেল, এবার ইতি করো!’

প্রিন্সের দিকে ফিরল মাইকেল। ‘চকলেট, ওল্ড স্পোর্ট—এবার চলো, শেষ চমকটা দেয়া যাক তোমাকে।’ তার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিল সে, কজি ধরে টেনে নিয়ে চলল। ‘এসো সবাই। এদিকে, ভায়েরা।’

বিশেষ করে যাদের পাকা দাড়ি তারাই পান-ভোজনের রমরমা আসর ছেড়ে নড়তে চাইল না, দলটাকে খেদিয়ে মেটে পথে নামিয়ে আনতে রানার সাহায্য লাগল মাইকেলের। তাকে হেই, হো ইত্যাদি ডাক ছাড়তে শুনে হাসি চেপে রাখা দায় হলো রানার। অবশেষে একশো গজের মত এগিয়ে ঝোপের পাঁচিল ভেদ করল ওরা, সামনে বেশ বড়সড় একটা খোলা মাঠ।

লৌহমানবীদের দিকে চোখ পড়তেই স্তব্ধ পাথর হয়ে গেল দলটা। নতুন ধূসর রঙ রোদ লেগে ঝলমল করছে, পোর্ট থেকে বেরিয়ে আছে ভয়াল-দর্শন ভিকার্স মেশিনগান, বুদ্ধি করে চারটে আর্মারড কারের মাথায় একটা করে ইথিওপিয়ান পতাকা উড়িয়ে

দিয়েছে মাইকেল।

ওদেরকে দেখে মনে হলো কেউ জেগে নেই, ঘুমের মধ্যে হাঁটছে। এগিয়ে গিয়ে ছাতার নীচে ফেলা চেয়ারগুলোয় বসল সবাই, কারও চোখে পলক নেই। স্কুল মাস্টারের মত তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল, যদিও এখনও সে একটু একটু টলছে।

‘ভদ্রমহোদয়গণ, এখানে আমরা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের প্রদর্শনী দেখতে পাচ্ছি, নিঃসন্দেহে বলা যায় বৃহৎ সামরিক শক্তিগুলোও এত উন্নতমানের আর্মারড ভেহিকেল ব্যবহারের সুযোগ পায়নি—,’ প্রিন্স হাসান সালে তার বক্তব্য অনুবাদ করতে শুরু করল, এই ফাঁকে রানার দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল সে, বলল ‘স্টার্ট দাও, ওল্ড বয়!’

প্রথম এঞ্জিন গর্জে উঠতেই বয়োবৃদ্ধ উপদেষ্টারা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল সবাই। তারপর তারা পালা করে পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল।

‘একেকটা পনেরো হাজার পাউন্ড স্টার্লিং,’ রানার কানে ফিসফিস করে বলল মাইকেল, ফ্রেতাদের উৎসাহের মাত্রা লক্ষ করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে সে, রানার সঙ্গে পরামর্শ না করেই। ‘নেবে, ওরা নেবে!’

প্রিন্স হাসান সালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ডিনার খেতে এসেছে ওরা একের বৃনে। একই সূট দ্বিতীয়বার পরে প্রিন্সের সামনে হাজির হওয়া ঠিক হবে না, তাতে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবার সম্ভাবনা, এই যুক্তিতে তাড়াহুড়ো করে রানাকে আরও একটা ডিনার জ্যাকেট বানিয়ে দিয়েছে মাইকেল, এবারও দুশো শিলিং ধার চাইতে ভুল

হয়নি তার।

রানার মন খুঁতখুঁত করছে, ভাল ফিট করেনি গায়ে।

ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হাসল মাইকেল। ‘জানো, তোমাকে একজন ডিউকের মত লাগছে দেখতে? এত দিনে তোমার মধ্যে একটা স্টাইল দেখতে পাচ্ছি আমি। স্টাইল, ওল্ড চ্যাপ, সব সময় মনে রাখবে। স্টাইল! দেখে যদি মনে হয় তুমি লোকটা গরীব, লোকজন তোমার সাথে নোংরা আচরণ করবে।’

প্রিন্স হাসান সালে সাদা আলখাল্লা পরেছে; তাতে সোনালি, বেগুনি আর কালো এমব্রয়ডারির কাজ করা, গলার কাছে গাঢ় লাল রঙের একটা পদ্মরাগমণি ঝুলছে। আলখাল্লার ভিতর পরেছে আঁটসাঁট ভেলভেট পা’জামা, পায়ে চব্বিশ ক্যারেট সোনার তার জড়ানো স্যাভেল। ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে তার নিজস্ব স্যুইটে। প্রচুর সময় নিয়ে খাওয়াদাওয়ার পালা চুকল। মস্ত একটা ঢেকুর তুলে মাইকেলের দিকে ফিরল সে।

‘এবার, মাই ডিয়ার সেভারস্,’ বলল প্রিন্স, ভব্যতার খাতিরেই মাইকেলের কণ্ঠার্জিত ডাকনামটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেনি সে। ‘মেশিনগান আর অন্যান্য অস্ত্রের দাম কয়েক মাস আগেই ঠিক করা হয়েছে, কিন্তু চিঠিপত্রে কখনোই তুমি আর্মারড কারগুলোর কথা উল্লেখ করেনি। ওগুলোর দাম সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারো?’

‘ইওর এক্সেলেন্সি, তোমার সাথে দেখা হওয়ার আগে ন্যায্য একটা দাম আমি ভেবে রেখেছিলাম—,’ প্রিন্সের একটা হাভানা চুরুটে কষে দম দিল মাইকেল। ‘কিন্তু ক্রেতা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ায় কেনা দামে ওগুলো বিক্রি করতে হবে আমাকে।’ ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে। ‘না, অসম্ভব! বন্ধুর কাছ থেকে আমি কোন লাভ করতে পারব না।’ রানার দিকে তাকাল সে। ‘ওকে আমি বুঝিয়ে-

শুনিয়ে ম্যানেজ করব। তা নিয়ে চিন্তা করো না।’

খুশি হয়ে হাসল প্রিন্স।

তাকে খুশি হতে দেখে দাম আরও বাড়িয়ে দিল মাইকেল। ‘প্রতিটি বিশ হাজার পাউন্ড,’ দ্রুত বলল সে, শব্দগুলো জড়িয়ে গিয়ে অর্থটা যাতে একটু দেরিতে বোধগম্য হয়। তারপরও হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলো রানা।

চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাল প্রিন্স। ‘আচ্ছা,’ বলল সে। ‘দামটা সম্ভবত ন্যায্যমূল্যের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি চাইছ।’

মাইকেলের চেহারায় ব্যথা ও বিস্ময় ফুটে উঠল। ‘ইওর এক্সেলেন্সি...’

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল প্রিন্স। ‘গত তিন মাস ধরে বিভিন্ন ধরনের সামরিক ইকুইপমেন্ট দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্লিজ, সেভারস্, প্রতিবাদ করে আমাদের দু’জনকেই অপমান করো না।’

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এল, গিটারের তারের মত উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল পরিবেশ।

অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রিন্স। ‘যেগুলো দেখে এসেছি তার দাম দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তবু আমি ওগুলো কিনতে পারি না। আমার মহামান্য সম্রাট গোত্রগুলোর জন্যে অস্ত্র কেনা নিষিদ্ধ করেছেন। মুশকিল হলো, ওরা বেচতে রাজি কিন্তু জায়গামত ডেলিভারি দিতে রাজি নয়।’ তার চোখে বিষণ্ণ ভাব। ‘আপনারা জানেন, অস্ত্রগুলো যেখানে আমার দরকার সেখানে কোন সাগর নেই। ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার অংশ হলেও, সেখানে শিফটাদের শক্তিশালী ঘাঁটি রয়েছে, তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অস্ত্র পরিবহন সম্ভব নয়, অন্তত আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সোমালিদের চোখকেও ফাঁকি দেয়া যাবে না।' আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের গ্লাসে মৃদু চুমুক দিল সে।

তার অজান্তে রানা আর মাইকেল মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। নতুন, এবং উৎকট একটা বিপদের আভাস পাচ্ছে ওরা।

'মেজর সেভারস্, তুমি আমাকে ভাঙাচোরা, বাতিল কিছু অস্ত্র কেনার প্রস্তাব দিচ্ছ, দাম চাইছ প্রকৃত মূল্যের পাঁচগুণ। এই মুহূর্তে আমি ভারি অসহায় বোধ করছি। মরিয়ান না হয়ে আমার কোন উপায় নেই। তোমার প্রস্তাব এবং মূল্য আমাকে মেনে নিতে হবে।'

সামান্য স্বস্তি ফিরে পেয়ে রানার দিকে তাকাল মাইকেল।

'হ্যাঁ, ব্রিটিশ স্টার্লিংয়েই পেমেন্ট করা হবে তোমাকে-তোমার এই শর্তটাও আমি মেনে নিচ্ছি।'

এতক্ষণে হাসল মাইকেল। 'মাই ডিয়ার ফেলো-', শুরু করল সে, কিন্তু আবারও হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল প্রিন্স।

'তোমার অনেক শর্ত, কিন্তু আমার মাত্র একটা,' বলল হাসান সালে। 'এটার ওপরই নির্ভর করছে অস্ত্রগুলো আমি কিনব কিনা। ওগুলো ইথিওপিয়ায়, আমার এলাকায়, পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাদের। আমার কাছে বা আমার নির্বাচিত এজেন্টের কাছে অস্ত্রগুলো ডেলিভারি দেয়ার পর পেমেন্ট পাবে তোমরা।'

'গুড গড, ম্যান!' ফেটে পড়ল মাইকেল। 'কী বলছ তুমি নিজেও জানো না! কয়েকশো মাইল দুর্গম এলাকা, চারদিকে শত্রু গিজগিজ করছে, তার ভেতর দিয়ে আমরা ওগুলো স্মাগল করে নিয়ে যাব? এমন আশু উন্মাদ তো দেখিনি!'

'উন্মাদ, মেজর সেভারস্? ভেবে দেখো। ওগুলো এখানে ডেলিভারি নিলেই লোকে বরং আমাকে উন্মাদ বলবে, তাই না? আরও ভাবো। দার-এস-সালামে ওগুলো না আমার কোন কাজে আসবে, না তোমার। দুনিয়ায় এমন কোন বোকা নেই যে ওগুলো

কিনতে চাইবে তোমার কাছ থেকে। শত্রু এলাকার ভেতর দিয়ে ওগুলো আমি নিয়ে যেতে পারব না, কারণ শিফটাদের গুপ্তচররা আমার ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছে। জিবুতিতে নামার সাথে সাথে সার্চ করা হবে আমাকে। অপরদিকে, এখানে পড়ে থাকলে ওগুলোর কোন মূল্যই নেই।' থেমে মাইকেলের দিকে, তারপর রানার দিকে তাকাল সে।

চোয়ালে আঙুল বুলিয়ে রানা বলল, 'আপনার যুক্তি বুঝতে পারছি, মি. সালে।'

'আপনি বুদ্ধিমান, মি. রানা,' বলল প্রিন্স, আবার সে মাইকেলের দিকে তাকাল। 'ইথিওপিয়ায় পৌঁছে দাও, একেকটার জন্যে বিশ হাজার পাউন্ড পাবে তুমি। এখানে ফেলে রাখো, মরচে ধরে নষ্ট হবে। কী করবে সেটা তোমার ব্যাপার। কী বলো? না হয় পৌঁছেই দাও ইথিওপিয়ায়।'

চার

‘লোকটাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম!’ উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে মাইকেল রানার ক্যাম্পের সামনে। ‘কল্পনাও করিনি পুরনো ইটোনিয়ান একজন বন্ধু এভাবে আমার সাথে বেসম্মানী করবে! এ তো শ্রেফ চুক্তিভঙ্গ!’

‘তোমার বন্ধু তোমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে,’ বলল রানা।

উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না মাইকেল। চুপচাপ খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে হঠাৎ প্রশ্ন করল, ‘রানা, কী ঠিক করলে? কাল সকালে চকলেটকে কী বলব আমরা? চার চারটে আর্মারড কার কীভাবে আমরা শত্রু উপকূলে নিয়ে যাব, বলতে পারো? ওখানেই সমস্যার শেষ নয়। দুশো মাইল মরু পেরিয়ে পৌঁছে দিতে হবে ইথিওপিয়ায়...’

ভুরু কুঁচকে কী ভাবছে রানা, জবাব দিল না। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে মাটিতে বিছানো বড়সড় একখানা ম্যাপের দিকে।

‘রানা,’ বলল মাইকেল, ‘একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, তাড়াতাড়ি। আমরা যাব, নাকি যাব না?’ ম্যাপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে, তারপর দেখাল, হাজার মাইল লম্বা সুরক্ষিত কোস্ট লাইন, ম্যাপের গায়ে আঙুল বুলিয়ে উপকূল রেখা চিহ্নিত করল মাইকেল। ‘জাহাজ ভেড়াতে হবে ইরিত্রিয়া উপকূলের কোথাও, ওখান থেকে ইথিওপিয়ায় অর্থাৎ রাসটাদের এলাকায় পৌঁছুতে হলে মরু পেরোতে হবে। মরু মানে ফাঁকা জায়গা, বহুদূর থেকে লোকে আমাদের দেখতে পারে। তবে আশার কথা ওদিকে লোকবসতি নেহাতই কম।’

‘পথে যাদের সাথে দেখা হবে বেশিরভাগ সম্ভাবনা, তারা মানুষখেকো না হলেও অসভ্য,’ মন্তব্য করল রানা।

‘তারমানে আমরা যাচ্ছি না, কী?’

‘তুমি জানো, যাচ্ছি।’

‘হ্যাঁ, জানি আমরা যাচ্ছি। আশি হাজার ব্রিটিশ স্টার্লিং সেই কথাই বলে।’

ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ওদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল প্রিন্স হাসান সালে, জিজ্ঞেস করল, ‘কীভাবে যাওয়া হবে ঠিক করেছে? ইচ্ছে করলে আমার পরামর্শ নিতে পারো তোমরা। উপকূল, আর উপকূল থেকে ভেতর দিকের সবগুলো পথ সম্পর্কে জানি আমি।’ একজন উপদেষ্টাকে ইঙ্গিত করতে টেবিলের উপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে দিয়ে গেল।

‘আমরা দার-এস-সালামে একটা জাহাজ ভাড়া করব বলে ভেবেছি,’ বলল রানা। ‘জাহাজ আমাদেরকে,’ ম্যাপের গায়ে এক জায়গায় আঙুল রাখল ও, ‘এখানে কোথাও নামিয়ে দেবে। আর্মারড কারে বাস্তুগুলো ভরা হবে, ট্যাংকে থাকবে যথেষ্ট গ্যাসোলিন, সরাসরি ইনল্যান্ডের দিকে যাব আমরা, সামনে কোথাও আপনার লোকদের সাথে মিলিত হব-জায়গাটা আগেই ঠিক করা থাকবে।’

‘গুড,’ বলল প্রিন্স। ‘বেসিক আইডিয়াটা ঠিক আছে। লোহিত সাগরে পৌঁছে কোথায় নোঙর ফেলবেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। সোমালি প্রজাতন্ত্র এড়িয়ে যেতে পারলে সব দিক থেকে ভাল, ওদের উপকূলে কড়া পাহারা আছে। ফ্রেন্স জিবুতির কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলতে হবে।’

অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হলো। রানা এবং মাইকেল দু’জনেই উপলব্ধি করল, বাধাগুলোকে হালকাভাবে নিয়েছিল ওরা, প্রিন্সের পরামর্শ খুব কাজে এল ওদের।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে জাহাজ ভেড়ানোর জন্য একটা জায়গা বাছল প্রিন্স। ‘ওদিকের উপকূলে নোঙর ফেলতে হলে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই, ঢেউগুলো একেকটা বিশ ফুট উঁচু, পানির নীচে পাথুরে স্তরগুলোও অনুকূল নয়।’ ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখল সে। ‘এখানে, জিবুতি থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, প্রাচীন একটা হারবার আছে, নাম মণ্ডি। না, চার্টে মার্ক করা নেই। জাজ্জিবার আর মোজাম্বিক দ্বীপের মত মণ্ডিও এককালে ক্রীতদাস ব্যবসার একটা কেন্দ্র ছিল।’

‘হারবারটা এখন আর ব্যবহার করা হয় না?’

‘না। কারণ বিশুদ্ধ পানির অভাব। যদিও গভীর একটা ওয়াটার চ্যানেল আছে, তীরে পৌঁছানোর পথটাও বেশ নিরাপদ-পানির নীচে পাথর কম। তবে জাহাজ থেকে কার্গোগুলো নামাবার জন্যে ট্রেন ইত্যাদির সাহায্য পাবেন না।’

একের বনের একটা নোটবুকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো টুকে নিচ্ছে মাইকেল, রানা ঝুঁকে আছে ম্যাপের উপর। ‘পুলিস পেট্রোল এদিকটায় কী রকম?’ জিজ্ঞেস করল ও।

কাঁধ ঝাঁকাল প্রিন্স। ‘জিবুতি সরকার উট ব্যবহার করে, মাঝে মাঝে উপকূল এলাকায় দেখা যায় ওগুলোকে। দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে খুবই কম।’

‘এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে আমার না খুব ভাল লাগে,’ মাইকেলের কণ্ঠে ব্যঙ্গ বারল।

‘তীরে নামলাম, তারপর?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

ম্যাপে চোখ রাখল প্রিন্স। ‘আপনারা তারপর সাবেক ইটালিয়ান ইরিত্রিয়া সীমান্ত ধরে এগোবেন, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এক সময় জলাভূমি দেখতে পাবেন, যেখানে অ্যাওয়াস নদী মরুভূমিতে শুকিয়ে গেছে। ওখান থেকে সরাসরি পশ্চিম দিকে মুখ

করে এগোবেন, পেরিয়ে আসবেন সোমালি সীমান্ত, সেই সাথে ঢুকে পড়বেন ইথিওপিয়ার ডানাকিল প্রদেশে। আমার লোকেরা আপনাদের সাথে দেখা করবে এখানে-,’ বয়স্ক উপদেষ্টাদের দিকে ফিরে কিছু প্রশ্ন করল সে। উচ্চস্বরে আলোচনা চলল বেশ কিছুক্ষণ অ্যামহারিক ভাষায়। তারপর ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে আবার রানার দিকে ফিরল সে।

‘আমরা একমত হয়েছি, সাক্ষাৎটা হবে ওয়েলস অভ চান্ডি-তে-এখানে।’ ম্যাপটা আবার সে দেখাল ওদের। ‘দেখতেই পাচ্ছেন, জায়গাটা ইথিওপিয়ার বেশ খানিকটা ভেতরে। আমার গোত্রের জন্যে এই ডেলিভারি পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কারগুলো সারডি গিরিপথ আর ডেসিগামী পথটার প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করা হবে।’ উপদেষ্টাদের একজন প্রিন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আবার ওদের দিকে ফিরল হাসান সালে। ‘আমার উপদেষ্টা জানালেন, মণ্ডি থেকে ওয়েলস অভ চান্ডি পর্যন্ত আপনাদের যাত্রা মরুর ওপর দিয়ে হবে, ওখানে কোন পথ চিহ্ন নেই। কোথাও কোথাও গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। এলাকাটা সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এমন একজন গাইড পেলে সুবিধে হবে আপনাদের...।’

‘খুব ভাল হয়,’ বলল রানা। ‘তেমন কেউ আছে?’

‘চুক্তিভঙ্গ করলেও, লোক তুমি খারাপ নও,’ বিড়বিড় করে উঠল মাইকেল।

‘যাকে আপনাদের সাথে পাঠাব বলে ভাবছি সে আমার আত্মীয়-ভাইপো। তিন বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়েছে, ভাল ইংরেজি জানে। আপনাদের পথটাও চেনে সে, ওদিকে অনেকবার সিংহ শিকার করতে গেছে।’ একজন উপদেষ্টাকে অ্যামহারিক ভাষায়

কিছু বলল সে। উপদেষ্টা কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ‘আমার ভাইপো আসছে। ওর নাম আব্বাস খায়ের।’

আব্বাস খায়েরের বয়স হবে আঠারো কি উনিশ, যদিও এরই মধ্যে সে তার চাচার মতই লম্বা হয়ে উঠেছে, চেহারা আদিবাসী যোদ্ধার ছাপ থাকা সত্ত্বেও আচরণে অত্যন্ত মার্জিত। পরেও আছে পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক, চোখ দুটো মায়া ভরা, অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় জ্বলজ্বল করছে। নিজেদের ভাষায় কিছু কথা বলল চাচা-ভতিজা, তারপর ভতিজা ওদের দিকে ফিরল।

‘আমাকে কী করতে হবে চাচার কাছ থেকে শুনলাম,’ তার কর্ণস্বর স্পষ্ট এবং আগ্রহে ভরপুর। ‘আপনাদের কাজে লাগার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।’

‘গাড়ি চালাতে জানো?’ বাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রানা।

হাসল আব্বাস খায়ের। ‘জানি, স্যার। আদিস আবাবায় আমার নিজের একটা স্পোর্টস কার আছে।’

তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা। ‘দ্যাটস গ্রেট। তবে আর্মারড কার চালানো একটু কঠিন।’

‘আব্বাস ওর ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করবে,’ বলল প্রিন্স। ‘মনে আছে তো, জাহাজ রওনা হবে দুপুরে।’ চাচার উদ্দেশ্যে বাউ করে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল আব্বাস খায়ের।

‘উপকারের বিনিময়ে উপকার, এটাই দুনিয়ার নীতি,’ বলল প্রিন্স, গম্ভীর দৃষ্টিতে মাইকেলের দিকে তাকাল সে। ‘এইমাত্র তোমার একটা উপকার করেছে আমি, সেভারস্। বিনিময়ে আমার একটা পাওনা হয়েছে।’

দর কষাকষিতে প্রিন্সের সঙ্গে হেরে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে মাইকেলের, তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করল সে, ‘দেখো

চকলেট, ওল্ড চ্যাপ...।’

কিন্তু প্রিন্স নিজের কথা বলে চলল, যেন কেউ তাকে বাধা দেয়নি, ‘তোমাকে আমি আগেই বলেছি, আমার গোত্রের জন্যে যে-সব অস্ত্র দরকার তার মধ্যে বিশ্ব-বিবেকও একটা।’

‘কিন্তু সমস্যার আকৃতি-প্রকৃতি ক্ষুদ্র হলে বিশ্ব-বিবেক কান্নাকাটি করে না,’ মন্তব্য করল রানা। ‘আবার কান্নাকাটি করলেও তাতে সাধারণত কোন কাজ হয় না।’

‘না, তা হয় না, জানি,’ একমত হলো প্রিন্স। ‘তাই বলে আমরা তো আর চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। আমাদের সমস্যার কথা দুনিয়াকে আমরা জানাতে চাই। আশা করি তাতে খানিকটা হলেও চাপ সৃষ্টি হবে সম্রাটের ওপর। সে-কথা ভেবেই আমেরিকার সেই নামকরা সাংবাদিককে সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি। তিনি যে পত্রিকায় কাজ করেন, সারা দুনিয়ায় তার অজস্র পাঠক আছে। তিনি নিজে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর একজন গুভানুধ্যায়ী, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তিনি আমার বন্ধুও বটেন।’

‘কে তিনি?’ উত্তেজিত হয়ে উঠল মাইকেল। ‘সংক্ষেপে ব্যাপারটা কী? অস্ত্রের চোরাচালান সম্পর্কে কতটুকু কী জানেন? চকলেট সালে, তুমি কি শেষ পর্যন্ত আমাদের জেল খাটাতে চাও?’

‘বললাম না, তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?’ হাসল প্রিন্স, তারপরই তার চেহারা গম্ভীর হলো। ‘আদিস আবাবায় সম্রাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাড়তে থাকায় কর্তৃপক্ষ বিদেশী সাংবাদিকদের ইথিওপিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমি যে উপকারটা চাইছি...’

‘জানি কী চাইছ,’ তাকে বাধা দিয়ে বলল মাইকেল। ‘কিন্তু না,

সম্ভব নয়। এমনিতেই হাজারটা বিপদ মাথায় করে যেতে হবে, তার ওপর উটকো আরেকটা ঝামেলা কাঁধে নিতে পারব না...।’

‘সে কি গাড়ি চালাতে পারে, আর্মারড কার?’ জিঙ্কস করল রানা। ‘শেষ গাড়িটার জন্যে একজন ড্রাইভার লাগবে আমাদের।’

‘তাই তো!’ মাইকেলের রাগ খানিকটা পড়ল।

‘তাকেই জিঙ্কস করা যাক,’ বলল প্রিন্স, তার ইঙ্গিতে একজন উপদেষ্টা কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

আলোচনার বিরতিতে সুযোগটা নিল মাইকেল, প্রিন্সের কনুই খামচে ধরে দল থেকে সরিয়ে আনল একপাশে। ‘অতিরিক্ত যে খরচ হবে তার একটা হিসেব করেছি আমি—জাহাজ ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি খাতে। পুঁজির ওপর অপ্রত্যাশিত চাপ পড়ছে কি না, তাই ভাবছিলাম তোমাকে বিশ্বস্ততা প্রমাণের সুযোগ দেয়ার জন্যে অল্প কিছু টাকা অগ্রিম চাইব কিনা...।’

‘মেজর সেভারস্, আমার ভাইপোকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে তা আমি এরইমধ্যে প্রমাণ করেছি...।’

‘সেটা যে আমি বুঝতে পারছি না তা নয়...,’ তর্কটাকে টেনে লম্বা করতে যাচ্ছিল মাইকেল, কিন্তু কেবিনের দরজা খুলে যাওয়ায় বাধা পেল সে, দেখল সাংবাদিক ভিতরে ঢুকছে। টান টান হলো মাইকেল, টাইয়ের নটটা স্পর্শ করল। ভোরের প্রথম সূর্যের মত ঝলমলে হাসি ফুটল তার মুখে।

চার্ট টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে নেতিয়ে ছিল রানা, চুরট ধরাবার জন্যে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জেঁলেছে, কিন্তু ধরানো আর হলো না। জ্বলন্ত কাঠির কথা ভুলে আগন্তকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ও।

‘ভদ্রমহোদয়গণ,’ বলল প্রিন্স। ‘মিস অ্যানি উইসপারের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত।

অ্যানি উইসপার, আমেরিকান প্রেসের স্বনামখ্যাত একজন সদস্যা, এবং আমাদের গোত্রের একজন সদয় বন্ধু।’

অ্যানি উইসপারের বয়স এখনও পঁচিশ পেরোয়নি। আশ্চর্য আকর্ষণীয় তার চেহারা, এই পেশায় ঠিক যেন মানায় না। অবশ্য অনেক আগেই উপলব্ধি করেছে সে, অল্প বয়স আর নারীসুলভ সৌন্দর্য তার বেছে নেওয়া পেশায় কোন সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না, কাজেই এ-দুটোই সে গোপন করবার চেষ্টা করে, যদিও সাফল্যের পরিমাণ সামান্যই।

পুরুষদের মত শার্ট পরে আছে সে, হালকা খাকী সামরিক রঙ, এখানে সেখানে অনেক পকেট। দু’দিকে দুটো বোতাম লাগানো বুক পকেট, সুগঠিত স্তনের উঁচু রেখা গোপন করা যায়নি তাতে। পরনের ট্রাউজারেও অনেক পকেট, সেটাও একই রঙের, সরু কোমর জড়িয়ে আছে চওড়া চামড়ার বেল্ট। পায়ে হালকা বুট। চুলগুলো টেনে তোলা হয়েছে মাথার উপর দিকে, ফলে লম্বা ঘাড় নগ্ন হয়ে পড়েছে। রেশমি কোমল চুল, হালকা সোনালি, পাকা গমের মত গায়ের রঙের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে গেছে।

ধাক্কাটা প্রথম সামলে উঠল মাইকেল। ‘মিস অ্যানি উইসপার, অফকোর্স! তোমার কিছু কিছু লেখা আমি পড়েছি। অবজারভারে কিছুদিন নিয়মিত কলাম লিখতে তুমি।’ তার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল অ্যানি উইসপার, ভূবনভোলানো সেভারস্-হাসি মেয়েটার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। তার চোখ, মাইকেল লক্ষ করল, স্নান সবুজ-বড়বড় চোখে সিরিয়াস দৃষ্টি, সরাসরি তাকানোর প্রবণতা।

দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা আঙুলের ডগা পুড়িয়ে দিল, ব্যথায় উফ্ করে উঠল রানা। অ্যানি উইসপার দ্রুত ফিরল ওর দিকে।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ‘আমি কোন মেয়ে আশা করিনি।’

‘মেয়ে তুমি পছন্দ করো না?’ শুকনো পাতার সঙ্গে পাতার ঘষা লাগলে যে খসখসে শব্দ হয়, গলার আওয়াজ অনেকটা সেরকম; রানার গা শিরশির করে উঠল।

‘রানা? মেয়ে পছন্দ করে কিনা?’ দরাজ গলায় হাসল মাইকেল। ‘আরে, ও তো একটা ছেলেমানুষ! টানা-হ্যাঁচড়া করেও কোথাও নিয়ে যেতে পারি না...।’ হঠাৎ উপলব্ধি করল মাইকেল, হিতে বিপরীত ঘটে যাচ্ছে, মেয়েটার কাছে নিজের চরিত্র তুলে ধরছে সে। চুপ করে গেল, ইচ্ছে হলো নিজের গালে চড় মারে।

‘পছন্দ করি,’ শান্তভাবে জবাব দিল রানা, ‘পছন্দ করার মত হলে।’ লক্ষ্য করল, মেয়েটা বেশ লম্বা, প্রায় ওর কাঁধ পর্যন্ত। দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে অ্যাথলেটিক ভাবটুকু ভাল লাগল ওর। চিবুক উঁচু হয়ে আছে, মুখ আর চোয়ালের রেখাগুলোয় আলাদা ধরনের সৌষ্ঠব দৃষ্টি কাড়ে, ঠিক ধারাল নয়-স্পষ্ট। ‘সত্যি কথা বললে কেউ যদি কিছু মনে না করে, তোমাকে অপছন্দ করবে এমন পুরুষ খুব কমই আছে।’

এই প্রথম হাসল মেয়েটা। স্বতঃস্ফূর্ত, উষ্ণ হাসি। রানা দেখতে পেল, অ্যানি উইসপারের সামনের সারির একটা দাঁত অসমান, লাইন থেকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। হতভম্ব হয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে ছিল ও, হঠাৎ খেয়াল হতে একটু অপ্রতিভ হলো, দৃষ্টি রাখল সবুজ চোখে।

সবুজ চোখে সোনালি একটু আভাও দেখতে পেল ও। ‘তুমি গাড়ি চালাতে জানো?’ সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করল ও।

‘জানি,’ আবার শব্দ করে হাসল অ্যানি উইসপার। ‘সেই সাথে আমি ঘোড়া আর সাইকেলেও চড়তে পারি, স্কি করতে পারি, প্লেন

চালাতে জানি, কুকার আর ব্রিজ খেলতে জানি, গান গাই, নাচি, পিয়ানো বাজাই।’

‘চলবে,’ তার সঙ্গে রানাও যোগ দিল হাসিতে। ‘তাতেই আমার চলবে।’

প্রিন্সের দিকে ফিরল অ্যানি উইসপার। ‘ব্যাপারটা কী বলো তো, সালে?’ জিজ্ঞেস করল সে। ‘আমার অ্যাসাইনমেন্টের সাথে এই দুই ভদ্রলোকের কী সম্পর্ক?’

একেরবুন তার নোঙর তুলল। আপার ডেকে দীর্ঘদেহী প্রিন্স দাঁড়িয়ে আছে, দু’পাশে সাদা আলখাল্লা পরা উপদেষ্টারা। জাহাজের গতি বাড়তে শুরু করল, একটা হাত তুলে বিদায় জানাল হাসান সালে।

ধীরে ধীরে দিগন্তরেখায় অদৃশ্য হয়ে গেল একেরবুন। প্রথম কথা বলল রানা, ‘অ্যানি উইসপারের জন্যে একটা ঠাই খুঁজে বের করতে হবে।’ চিন্তাটা জাগতেই, ওরা দু’জনেই, রানা ও মাইকেল, একযোগে হাত বাড়াল অ্যানি উইসপারের ব্যাগ আর টাইপরাইটার কেসের দিকে।

‘টস করি এসো,’ প্রস্তাব দিল মাইকেল, ভোজবাজির মত তার হাতে একটা তাঞ্জানিয়ান শিলিং বেরিয়ে এল।

‘টেইলস,’ বলল রানা।

শিলিংটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তালি মারবার ভঙ্গিতে দুই তালুর মাঝখানে সশব্দে গ্রহণ করল সেটা মাইকেল, হাত খুলল। ‘ব্যাড লাক, ওল্ড চ্যাপ,’ সহানুভূতি জানাল মাইকেল, পকেটে চালান করে দিল শিলিংটা। ‘মিস অ্যানি উইসপারের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি ওর একটা জুতসই ব্যবস্থা করে জাহাজের খোঁজে বেরাব।’

ইতিমধ্যে তুমি আবার মন খারাপ করে বসে থেকো না, বরং গাড়িগুলো আরেকবার চেক করে নাও।’ কথা বলবার ফাঁকে হাতছানি দিয়ে একটা রিকশা ডাকল সে। ‘মনে রেখো, রানা, শক্ত রাস্তায় চালিয়ে ওগুলোকে হারবারে আনা এক কথা, আর দুশো মাইল মরু পাড়ি দেয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা।’ অ্যানি উইসপারের হাত ধরে মার্জিত ভঙ্গিতে বাউ করল সে, তাকে রিকশায় উঠতে সাহায্য করল। ‘ড্রাইভার, অ্যাডভান্স।’ বিজয়ীর হাসি হেসে রানার উদ্দেশে হাত নাড়ল।

‘মনে হচ্ছে আমরা একা হয়ে গেলাম, স্যার,’ আব্বাস খায়ের বলল।

‘হুম!’ এখনও রানা দ্রুত অপস্রয়মান রিকশার দিকে তাকিয়ে আছে।

‘যাই, আমাকেও একটা ঠাই খুঁজে নিতে হবে...।’

‘আমার সাথে চলো, আব্বাস। এই ক’টা দিন তাঁবুতে থাকতে পারবে।’ হঠাৎ হাসল রানা, ‘যদি বলি তোমার বদলে তাঁবুতে অ্যানি উইসপারকে পেলে খুশি হতাম, আশা করি দুঃখ পাবে না?’

হেসে ফেলল ছেলেটা। ‘আপনার মনের কথা বুঝতে পারি...কিন্তু অ্যানি সম্ভবত নাক ডাকে, স্যার।’

‘যে মেয়ে দেখতে অত সুন্দর সে নাক ডাকতে পারে না,’ জ্ঞানদানের সুরে বলল রানা। ‘আরেকটা কথা, আমাকে তুমি স্যার স্যার করবে না, নার্ভাস বোধ করি। আমার নাম মাসুদ রানা, নাম ধরে ডাকতে না পারলে মাসুদ ভাই বলতে পারো।’ আব্বাসের একটা ব্যাগ তুলে নিল ও। ‘চলো হাঁটি।’

মেহগনি বনে ঢুকবার মুখে রানা জিজ্ঞেস করল, ‘বলছিলে তোমার একটা স্পোর্টস কার আছে।’

‘আছে, মাসুদ ভাই।’

‘জানো, কী ওটাকে চালায়?’

‘ইন্টারন্যাশনাল কমবাসশন এঞ্জিনিয়ার।’

আব্বাসের পিঠ চাপেড়ে দিল রানা। ‘এইমাত্র তোমাকে সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হলো—আস্তিন গুটাও।’

নিজের ফাঁদে মেয়েদের ধরবার জন্য মেজর মাইকেল সেভারসের রয়েছে নিজস্ব একটা কৌশল, যা গত বিশ বছরে একবারও পরিবর্তন বা সংশোধন করবার কারণ দেখেনি সে। মেয়ে মাত্রই অভিজাত পুরুষের সঙ্গলোভী, তারা শক্তের ভক্ত, বাস্তবতা এবং দারিদ্র্য তাদের দুচোখের বিষ, মিষ্টি কথা আর বড়লোকি চালচলন দিয়ে তাদেরকে সহজেই কাবু করা যায়। একটা মেয়ে যতই কিনা কঠোরভাবে নিজেকে গার্ড দিয়ে রাখুক, এই সব অস্ত্রশস্ত্র ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে দুর্গ অরক্ষিত হয়ে পড়তে বাধ্য, বিজয় কেতন উড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়া তখন পানির মত সহজই শুধু নয়, আনন্দময় অভিজ্ঞতাও বটে। গদি মোড়া রিকশায় উঠে আর দেরি করল না মাইকেল, সে তার চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সবটুকু হাসি আর মার্জিত আচরণের মায়াজাল বিস্তার করবার কাজে নেমে পড়ল।

কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কণ্টকাকীর্ণ সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক বৃত্তে যে মেয়ে পঁচিশে পা দেওয়ার আগেই নাম কিনেছে, লক্ষণ দেখে পরিস্থিতি আঁচ করতে পারা তার জন্য কঠিন কিছু নয়, এবং এমনও নয় যে দুনিয়ার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ। পরিচয় হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে মাইকেল সেভারস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটা পেয়ে গেছে অ্যানি উইসপার। পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা, মার্জিত হাস্যরস, দরাজ কণ্ঠস্বর, উদার ভাবভঙ্গি,

আভিজাত্যের গর্ব, চোখে ইম্পাতের মত চকচকে দৃষ্টি-এ-সব বহু পুরুষের মধ্যেই দেখেছে সে। পাজি এবং দুর্বৃত্ত হিসাবেই তাদেরকে চেনে অ্যানি উইসপার। মাইকেলের সঙ্গলাভ করবার পর প্রতিটি মুহূর্ত তার সন্দেহ দৃঢ় হতে লাগল, এ-ও তাদেরই দলে, হয়তো সবার মধ্যে সেরা একজন, পাজিদের শিরোমণি। তবে পাজি হলেও, সুদর্শন পাজি। তাকে মুগ্ধ করবার জন্য বক বক করে চলেছে মাইকেল, অ্যানি ভাবছে শতকরা কত ভাগ গাল-গল্প আর কত ভাগ সত্যি। শুনছে আর কৌতুক বোধ করছে সে।

‘কর্নেলের কথা বলছি, আমার বাবা...’ বলল মাইকেল। সত্যি কর্নেল হয়েই মারা গেছেন ভদ্রলোক, তবে তিনি কর্নেল ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে।

‘হুঁ-হুঁ,’ প্রতিটি নতুন বিষয়ে কথা শুরু করলেই মাইকেলকে উৎসাহ দিচ্ছে অ্যানি উইসপার।

‘বলাই বাহুল্য, পারিবারিক বিশাল জমিদারী আর সম্পত্তি আমার হাতে আসে মায়ের তরফ থেকে...’ মাইকেলের মা ছিল ব্যর্থ এক মুদির মেয়ে।

‘হুঁ-হুঁ।’

‘আমি যে ইটনে পড়াশোনা করব সে তো জানা কথা-পারিবারিক ঐতিহ্য, বুঝতেই পারছ!’ মাইকেলের চোদ্দপুরুষের কেউ ইটনে কেন, কোন কলেজেই পড়াশোনা করেনি। তাকে ইটনে ভর্তি করা হয়েছিল পরিবারের খুদ-কুঁড়ো যা ছিল সব বিক্রি করে, বখাটে ছেলেকে মানুষ করবার জন্য সেটাই ছিল মা-বাবার সর্বশেষ ব্যর্থ চেষ্টা।

‘ফরেন সার্ভিসে ছিলেন বাবা, ভারি রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। বীরত্ব আর আদর্শ তাঁর রক্তের প্রধান উপাদান ছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাছ থেকেই ওগুলো পেয়েছি আমি। বিশ্বাস করবে,

ভদ্রলোক ডুয়েল লড়ে জীবনের ইতি ঘটান?’ আসলে ভারত ভাগ হওয়ার আগে আত্মহত্যা করেন ভদ্রলোক, কারণ ঘুষ খেয়ে ধরা পড়বার পর বিচারের সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন।

‘তাই?’

‘ইটন ছাড়তে হলো আমাকে, স্বভাবতই-বিশাল সম্পত্তি আর জমিদারী দেখাশোনা করার জন্যে।’ ইটন ছাড়তে হয়েছিল হাউজ মাস্টারের মেয়ের সঙ্গে কলেংকারিতে জড়িয়ে পড়ায়।

‘তারপর সেনাবাহিনীতে নাম লেখালাম। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ট্রেনিং শেষ করার পর বড় কোন যুদ্ধে ব্রিটেন নামল না, তাই তেমন বীরত্ব দেখানোর সুযোগও আমার ঘটেনি। কবে যুদ্ধ বাধবে সেই আশায় বসে না থেকে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করলাম।’ অনিয়ম, বিশৃংখলা, গাফিলতি ইত্যাদির দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, এই খবর পেয়ে অসুস্থতার অজুহাতে চাকরি ছেড়ে দেয় সে।

‘তারপর থেকে আমি স্বাধীন, নিজের ব্যবসা করছি,’ বলে চলল মাইকেল। ‘পারিবারিক সম্পত্তি নিইনি, তুমিও স্বীকার করবে একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পুরুষের জন্যে তা নেয়া অসম্মানজনক, তাই না? তবে আছে, সবই আমার ফিরে যাবার অপেক্ষায় সাজানো গোছানো আছে। ভাল একটা মেয়ে পেলে সুস্থির হয়ে ঘর-সংসার করব না, এমন কথা জোর গলায় বলতে পারি না। মধ্যপ্রাচ্যে আমার রয়েছে ব্যবসায়িক সুনাম,’ কয়েকটা দেশে ওর নামে হলিয়া আছে। ‘আফ্রিকাতে রয়েছে বিরাট স্বার্থ।’ এই মুহূর্তে প্রায় কপর্দকহীন সে। ‘আর রক্তে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা।’ এতক্ষণে একটা সত্যি কথা বলল বটে।

সতর্ক থাকা সত্ত্বেও, খানিকটা মুগ্ধ হলো অ্যানি উইসপার।

তার জানা আছে, এ হলো মুরগির সামনে কেউটের নৃত্য, ছোবল দেওয়ার আগের মুহূর্ত। তার পেশাই তাকে দুনিয়ার সংকটবহুল এলাকাগুলোয় নিয়ে গেছে, সে-সব জায়গায় এ-ধরনের লোক ভূরি ভূরি দেখেছে সে। এরা উত্তেজনা আর বিপদ ভালবাসে, জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করতে চায়, কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের শেষ পরিণতি হয় বেদনামলিন।

কিন্তু হুঁ-হুঁ করা ছাড়া সাড়া দিল না অ্যানি উইসপার। জানে, এক সময় ক্লান্ত হয়ে থামবে মাইকেল সেভারস্, কোন আশা নেই বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র মাইকেল সেভারস্ নয়। সিটি হোটেলের সামনে রিকশা যখন থামল, তখনও পুরোদমে বক বক করে চলেছে সে। শুনতে শুনতে হাসি চেপে রাখা দায় হলো অ্যানি উইসপারের। রিকশা থেকে নামবার সময় নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। খিলখিল করে হেসে ফেলল, মাথাটা ঝাঁকি খাওয়ায় তার সোনালি চুল উড়তে শুরু করল বাতাসে।

মেয়েদের হাসির মাপ নিতে জানে মাইকেল সেভারস্। হাসি যদি মিষ্টি, গভীর আর দীর্ঘস্থায়ী হয়, বুঝতে পারে অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে গেছে। রিকশা থেকে নেমে অ্যানি উইসপারের কজি চেপে ধরল সে, যেন মহামূল্যবান ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজের হেফাজতে নিয়ে এল।

‘সিটি হোটেলে একটাই মাত্র সুইট। আমারই দখলে, স্বভাবতই। বুল-বারান্দা থেকে বাগান দেখা যায়, সন্ধ্যার দিকে সাগরের বাতাস পাবে। আর বিছানাটা এত নরম, মনে হবে তুমি মেঘের ওপর শুয়ে আছ। একা শোয়ার অভিজ্ঞতা এক রকম, কাউকে নিয়ে শোয়ার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে।’

‘আমাকে কি এখানেই থাকতে হবে?’ ছোট্ট খুকির সরলতা

নিয়ে প্রশ্ন করল অ্যানি উইসপার।

‘ভাবছি দু’জনেরই যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে নেয়া কঠিন হবে না,’ বলল মাইকেল। ‘ও-সব তুমি ভেবো না, আয়োজনটা কী হবে আমার ওপর ছেড়ে দাও।’

অ্যানির মনে কোন সন্দেহ নেই, কী ধরনের আয়োজন করবার কথা ভাবছে মাইকেল। ‘তোমার খুব দয়া, মেজর,’ বিড়বিড় করে বলল সে, ধীর পায়ে টেলিফোনটার দিকে এগোল। রিসিভার তুলে বলল, ‘অ্যানি উইসপার বলছি। মেজর সেভারস্ তাঁর সুইট খালি করছেন। রুম-সার্ভিস পাঠিয়ে তার জিনিস-পত্র অন্য কোথাও সরাবার ব্যবস্থা করুন, প্লিজ।’

‘বলছিলাম কী...,’ মুখের হাঁ তাড়াতাড়ি বন্ধ করে শুরু করল মাইকেল।

মাউথপীসে হাতচাপা দিয়ে মিষ্টি করে হাসল অ্যানি উইসপার। ‘সত্যি তুমি মহৎ পুরুষ, মেজর। মেয়েদের জন্যে ক’জন আজকাল এমন আত্মত্যাগ করতে জানে?’ তারপর সে মুখ ফিরিয়ে টেলিফোনে কথা বলল, ‘কী বললেন? আর কোন ভাল কামরা নেই? খালি বলতে শুধু সিঁড়ির তলাটা? কী আর করা, একটা কাপড় টাঙিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করুন...কী বললেন? ভাঙা একটা চৌকি ছাড়া বিছানা করার মত কিছু নেই? ঠিক আছে, ঠিক আছে-মি. সেভারস্ কিছু মনে করবেন না-ধারণা করি, আমার জন্যে উনি কষ্টটুকু সানন্দে মেনে নেবেন।’

সিঁড়ির তলায় ওটা কামরা নয়, কবুতরের খোপের চেয়েও খারাপ। চৌকির উপর শুয়ে আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগল মাইকেল, ‘সানন্দে মেনে নিতে পারছি কই!’

পাঁচ

পরবর্তী তিন দিন বন্দরে কাটাল মাইকেল, হারবার মাস্টারের অফিসে বসে চা খেলো, প্রতিটি সদ্য নোঙর ফেলা জাহাজের পাইলটের সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করল। সারা দিন ঘরোয়া কলেবরে কাজে ব্যস্ত থাকলেও, সন্ধ্যার দিকে ফিটফাট বাবু সেজে অ্যানি উইসপারকে সঙ্গ দিতে ভুল হয় না তার। সহজে ডাল গলবে না উপলব্ধি করবার পর কাজটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে সে, মেয়েদের মন জয় করবার সম্ভাব্য সবগুলো কৌশল এক এক করে প্রয়োগ করছে। প্রথমে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দিয়ে গুরু করল, অ্যানি উইসপারের মত সুন্দরী মেয়ে নাকি সে তার জীবনে দেখেনি। ডিনারের সময় সিটি হোটেলের সবচেয়ে দামী খাবার আর শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল সে। দেখা গেল, প্রায় নির্লিপ্তভাবে সমস্ত কিছু হজম করে নেওয়ার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা রয়েছে অ্যানি উইসপারের। মাইকেল তার প্রশংসা করলে মৃদু হাসির সঙ্গে গ্রহণ করে সে, বিনয় বা ভদ্রতা দেখিয়ে মৃদু প্রতিবাদও করে না। সহজ সরল হাসির সঙ্গে মাইকেলের কথা শোনে, আগ্রহের সঙ্গে শ্যাম্পেনের স্বাদ নেয়, আশ্চর্যের খালি করে ফেলে প্লেটগুলো। কিন্তু মাঝরাতের দিকে মাইকেল যখন তার সঙ্গে সুইটে ঢুকতে চেষ্টা করে, অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে মুখের উপর বন্ধ করে দেয় দরজা, তার আগে কোমল স্বরে জানিয়ে দিতে ভোলে না যে রঙিন স্বপ্ন দেখবার জন্য সিঁড়ির তলায় ভাঙা টোکیটা রয়েছে।

চার দিনের দিন সকালে, সঙ্গত কারণেই বেশ খানিকটা হতাশ হয়ে পড়ল মাইকেল। তার ইচ্ছে হলো এক বালতি বিয়ার নিয়ে

www.BanglaBook.org

রানার ক্যাম্পে যায়, বন্ধুর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বললে মনটা হয়তো হালকা হবে। কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, নিজের পরাজয়ের কথা রানার কাছে স্বীকার করা উচিত হবে না, কাজেই ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারল সে, রিকশায় চেপে রওনা হলো বন্দরের দিকে।

রাতে নতুন একটা জাহাজ বহির্নোঙ্গরে ভিড়েছে, চোখে বিনকিউলার তুলে সেটাকে খুঁটিয়ে দেখল মাইকেল। কিনারায় আর গায়ে লবণ জমে আছে, অত্যন্ত পুরানো, কোথাও কোথাও তোবড়ানো আর ভাঙা, এমনকী ক্রুদের চেহারাও বিশেষ সুবিধের নয়, তবে মাইকেলের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ল জাহাজটার রিগিং-এ কোন খুঁত নেই। মাস্তুল দেখে বোঝা যায় বিশাল ক্যানভাস পাল ওড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে, অর্থাৎ প্রথম জীবনে পালতোলা জাহাজই ছিল, পরে ডিজেল এঞ্জিন ফিট করা হয়েছে। হারবারে এ-পর্যন্ত যত জাহাজ দেখেছে সে, সেগুলোর মধ্যে এটাকেই তার মনে ধরল। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে ফেরিতে চড়ল সে, ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে এক শিলিং বেশি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল মাঝিকে।

কাছ থেকে আরও করণ দেখাল জাহাজটাকে। রঙের ভিতর অন্য রঙ দেখা যাচ্ছে, খোলের গায়ে কাদাটে হলুদ বর্জ্য পদার্থের সচল ধারা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না স্যানিটারি ব্যবস্থা মাস্কাতা আমলের।

আরও কাছ থেকে জানা গেল রঙ চটা হলেও, প্ল্যাকিং-এ কোন খুঁত নেই। স্বচ্ছ পানির নীচে খোলের তলাটাও পরিষ্কার দেখা গেল-নিখাদ কপারের তৈরি, কোথাও জলজ সবুজ আগাছা জড়িয়ে নেই। জাহাজটার নাম পাপাগোয়া, গ্রীসে রেজিস্টার করা। দেখে মনে হয় ভাঙাচোরা, বাতিল জিনিস, কিন্তু কাজের সময় ওটা একটা বুনো ঘোড়ার মতই শক্তিশালী। এ-ধরনের জাহাজ সোনা,

ড্রাগস, আদম-সন্তান ইত্যাদি পাচার করবার কাজেই সাধারণত ব্যবহার করা হয়, জানা আছে মাইকেলের। তার মন বলছে, ঠিক জাহাজটি খুঁজে পেয়েছে সে। অবৈধ মালামাল পাচার করে এমন একজন ক্যাপ্টেনই তার দরকার। হাত তুলে নাড়ল সে, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চিৎকার করল, ‘আহু, পাপাগোয়া!’

ক্রুরা রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কোন সাড়া দিল না। চোখে বিদ্রোহ, হাবভাব মারমুখো, তাকিয়ে আছে ফেরির দিকেই। ক্রুদের মধ্যে চীনা, ভারতীয়, নিগ্রো রয়েছে, দু’একজন আরবও আছে।

হাত দুটোকে মুখের চারপাশে চোঙ বানাল মাইকেল, ইংরেজিতে বলল, ‘ভয় নেই, আমি কাস্টমস অফিসার নই—পারস্পরিক স্বার্থ নিয়ে তোমাদের ক্যাপটেনের সাথে কথা বলতে চাই।’

ক্রুদের মধ্যে সামান্য নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। খানিক পর তাদের মাঝখানে একজন শ্বেতাঙ্গ উদয় হলো। রোদে পোড়া গ্রীক চেহারা, এত বেঁটে যে কোন রকমে ক্রুদের কাঁধ পর্যন্ত পৌঁচেছে মাথাটা। নীচের দিকে ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করল, ‘কী চাও তুমি? পুলিশ?’

লোকটার এক চোখে কালো একটা পট্টি বাঁধা, ফলে অপর চোখটা অত্যন্ত উজ্জ্বল আর চকচকে লাগল। ‘আরে না, পুলিশ হতে যাব কেন!’ বলল মাইকেল। কোটের পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে দেখাল সে। ‘বন্ধু!’

রেলিঙের উপর ঝুঁকে আরও কিছুক্ষণ মাইকেলকে খুঁটিয়ে দেখল ক্যাপটেন। কে জানে, সে হয়তো ওর চোখে দুষ্টামির ঝিলিক আর ঠোঁটের কোণে লুটেরার হাসি দেখে থাকবে। রতনে রতন চেনে, কথাটা তো মিছে নয়। তার ভাব দেখে মনে হলো

খুশি হয়েছে সে। গ্রীক নাকি আরবী ভাষায় কী যেন বলল, ক্রুরা রশির সিঁড়ি নামিয়ে দিল নীচে।

‘উঠে আসুন,’ আমন্ত্রণ জানাল ক্যাপটেন। কিছুই তার লুকোবার নেই। এবারের যাত্রায় পাপাগোয়া শুধু তুলো বয়ে নিয়ে এসেছে বোম্বে থেকে। অবশ্য দার-এস-সালামে তুলো খালাস করবার পর, আশপাশ কোথাও থেকে কিছু অবৈধ কার্গো তোলা হবে জাহাজে, তা না হলে খরচায় পোষাবে না। গালা গোত্রের কিছু মেয়ে পাচার করতে পারলে মোটা টাকা আয় হবে। গালা মেয়েদের বাজারদর খুব ভাল।

জাহাজে পা দিয়েই মাইকেল ঘোষণা করল, ‘সামান্য হুইস্কির সাথে টাকা আয় করার পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা। আমার নাম মেজর সেভারস।’

‘আমি কোস্টাস অ্যারোনিকাস।’ এই প্রথম হাসল ক্যাপটেন। ‘টাকা পয়সার আলাপ আমার কাছে মিষ্টি সঙ্গীতের মত—ভারি পছন্দ করি।’ সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল।

রানার জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে মেহগনি বনের ক্যাম্পে পৌঁছল মাইকেল সেভারস, সঙ্গে অ্যানি উইসপার।

‘সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ।’ ব্যঙ্গাত্মক সুরে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল রানা, ওয়েল্ডিং সেট হাতে নিয়ে সিঁধে হলো সে, টর্চটা থেকে এখনও হিস হিস করে নীলচে আগুন বেরচ্ছে। ‘আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা দু’জন পালিয়েছ।’

‘আগে কাজ, তারপর ফুর্তি।’ অ্যানির হাত ধরে রিকশা থেকে তাকে নামাল মাইকেল। ‘বুঝলে, ওল্ড চ্যাপ, এই ক’দিন কঠিন ধকল গেছে আমাদের ওপর দিয়ে।’

‘দেখতেই তো পাচ্ছি। প্রচণ্ড পরিশ্রমে শুকিয়ে তুমি অর্ধেক হয়ে গেছ।’ টর্চ নিভিয়ে বিয়ারের বালতিটা নিল রানা। বোতলের ছিপি খুলে একটা করে ওদের হাতে ধরিয়ে দিল, নিজেও একটা মুখে তুলল। কালি মাখা খাকী শর্টস পরে আছে ও, উধ্বাঙ্গে কিছু নেই।

কয়েক ঢোক বিয়ার খেয়ে বোতলটা নামাল, বলল, ‘তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কাজেই তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিলাম।’

‘আপনারা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, মেজর সেভারস্ ও মিস অ্যানি উইসপার,’ বলে ওদেরকে স্যাঁলুট করল আব্বাস খায়ের। বিয়ারের একটা বোতল তার কপালেও জুটেছে।

‘কী ব্যাপার? কী বলছে ও?’ ঘাড় ফিরিয়ে বড়সড় কাঠামোটর দিকে তাকাল মাইকেল, ওটাকে নিয়েই রানা আর আব্বাস কাজ করছিল।

জিনিসটার গায়ে হাত বুলাল রানা। ‘এটা একটা ভেলা।’ বাঁশ আর খালি ড্রাম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ভেলাটা। ‘আর্মারড কার ভাসতে বা সাঁতার কাটতে জানে না অথচ আমাদেরকে জাহাজ থেকে নামতে হবে তীরে পৌঁছানোর আগেই। উপকূলের যা অবস্থা, জাহাজ সৈকতের কাছাকাছি যেতে পারবে না, আমরা ওগুলোকে ভেলায় চড়িয়ে তীরে নিয়ে যাব।’

অ্যানি উইসপার রানার কাঁধ আর বাহুর পেশীগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ বুলাল ওর সমতল পেট আর বুক ঢেকে থাকা ঘন কালো লোমগুলোর উপর।

মাইকেলের দৃষ্টি এখনও ভোঁতা চেহারার ভেলার দিকে নিবদ্ধ। ‘ল্যান্ডিঙের সমস্যা নিয়ে আমিও ভাবছিলাম,’ বলল সে। ‘ঠিক এ-ধরনের একটা পরামর্শই তোমাকে আমি দিতে যাচ্ছিলাম।’

রানার তির্যক দৃষ্টিতে ক্ষীণ অবিশ্বাস। ‘দেখতে হবে

জাহাজটায় যথেষ্ট শক্তিশালী ডেরিক আছে কিনা, সেটা ভেলা পর্যন্ত কারগুলোকে পৌঁছে দিতে পারবে কিনা।’

‘ওগুলোর ওজন কত?’

‘একেকটা পাঁচ টন।’

‘কোন সমস্যা হবে না, পাপাগোয়া সামলাতে পারবে।’

‘পাপাগোয়া?’

‘ওই জাহাজেই যাচ্ছি আমরা।’

‘তারমানে সত্যি তুমি কাজ করছিলে!’ হেসে উঠল রানা। ‘অবিশ্বাস্য! দেখা যাচ্ছে তোমার ভেতর পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। কখন রওনা হচ্ছি আমরা?’

‘পরশু সকালে। কার্গো লোড করব রাতে, চাই না কেউ দেখে ফেলুক।’

‘তা হলে তো বেশি সময় নেই, মিস উইসপার,’ বলে এবার অ্যানি উইসপারের দিকে ফিরল রানা। ‘মনে আছে, একটা আর্মারড কার চালাতে হবে? গাড়ি চালাতে জানলেও, আরও কিছু শিখতে হবে তোমাকে।’

‘আপাতত আমার সবটুকু সময় নিতে পারো তুমি, আর শেখার ব্যাপারে আমার আশ্রয়েরও কোন শেষ নেই।’ দার-এস-সালামে অ্যানি উইসপারের এই যাত্রাবিরতি ক্লান্ত আর উত্তেজিত নার্ডগুলোকে বিশ্রাম পাবার সুযোগ এনে দিয়েছে, এর আগের জেনেভা অ্যাসাইনমেন্টটায় সাংঘাতিক ছুটোছুটি করতে হয়েছিল তাকে। গত ক’টা দিন দার-এস-সালামের প্রাচীন বন্দরে ঘোরাফেরা করেছে সে, বন্দরের জন্ম আর ইতিহাস সম্পর্কে দু’হাজার শব্দের একটা ছোট্ট ফিচার লিখেছে। সেই সঙ্গে তার প্রতি মাইকেল সেভারসের গভীর মনোযোগও উপভোগ করেছে

সে, সংকটময় মুহূর্তগুলোয় ছলনা আর চাতুরির সাহায্যে লোকটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও তার কাছে কৌতুককর একটা খেলা বিশেষ ছিল। এই মুহূর্তে মাসুদ রানার মুখ দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন মেয়েটা। দুই কঠিন পাত্র, বিপজ্জনক এবং প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর, নিজেদের সমস্ত পৌরুষ নিয়ে যদি কোন মেয়ের পিছু নেয় বা মনোরঞ্জনর চেষ্টা করে, মেয়েটির জন্য এরচেয়ে আনন্দময় অভিজ্ঞতা আর কী হতে পারে? বিদূষী-হ্যাঁ, সৎ-হ্যাঁ, বুদ্ধিমতী-হ্যাঁ, কিন্তু তারমানে তো এই নয় যে পুরুষকে নিয়ে খেলবার জন্মগত অধিকার ও নারীসুলভ প্রবণতাটুকু বিসর্জন দিতে হবে। কথাটা ভেবে, রানার চোখে চোখ রেখে হাসল অ্যানি-রানা সাড়া দিতে উপভোগ করল মুহূর্তটি, উপভোগের মাত্রা বেড়ে গেল হতাশায় ভেঙে পড়তে পড়তে বাধা দেওয়ার জন্য মাইকেলকে ছুটে আসতে দেখে।

‘তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করার দরকার কী,’ রানাকে বলল মাইকেল। ‘তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছ, ওটা থেকে তোমাকে সরাতে চাই না। অ্যানিকে যা শেখাবার আমিই শেখাব।’

অ্যানি উইসপার মাথা ঘোরাল না, রানার দিকে তাকিয়ে হাসতেই লাগল। ‘কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, ডিপার্টমেন্টটা মি. মাসুদ রানার।’

‘রানা,’ বলল রানা।

‘অ্যানি,’ বলল অ্যানি।

গোটা ব্যাপারটা, কোন সন্দেহ নেই, চমৎকার উতরে যাচ্ছে। নির্জলা সত্য হলো, এটা একটা পিছু ধাওয়ার কাহিনী, দু’জন পুরুষের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, আর সেই সঙ্গে বহু কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত অ্যানি উইসপারের চারিত্রিক সুনাম আরেকটু বাড়িয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। অ্যানি উইসপারের জানা

আছে, তার পেশায় নিয়োজিত আর কোন মেয়ে একটা রিপোর্ট তৈরির খাতিরে দু’জন অস্ত্র চোরাচালানীর সঙ্গে মেলামেশা করবে না, বা অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরোবে না-অত সাহস তাদের কারও নেই। এখন দেখবার বিষয়, সতেজপ্রাণ ষাঁড় দুটোকে ঠিক মত সে সামলাতে পারে কিনা। তার নিজের ভাবাবেগেরও লাগাম টেনে রাখবার দরকার আছে। আর বিপদ, সে তো ঘটতেই পারে। বিপদ আছে বলেই না জীবন এত রোমাঞ্চকর!

মেহগনি বনের ভিতর দিয়ে ঐক্যে ঐক্যে এগিয়ে যাওয়া সরু পথ ধরে হাঁটছে ওরা। রানা আর মাইকেলকে তার পাশে জায়গা পাবার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করতে দেখে গোপনে হাসল অ্যানি উইসপার। তবে ফাঁকা জায়গাটায় পৌছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মাইকেল।

‘এ-সব কী?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘নতুন রঙ। আব্বাসের আইডিয়া,’ ব্যাখ্যা করল রানা। ‘গুলি ছোঁড়ার আগে প্রতিপক্ষকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হবে।’

দুধ-সাদা চকচকে চেহারা পেয়েছে আর্মারড কারগুলো, টারিটে আগুন রঙা ক্রস চিহ্ন।

‘জিবুতি বা সোমালিয়ানরা যদি খামতে বলে আমাদের, নিজেদের পরিচয় দেব ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রসের সদস্য বলে-ওগুলো আর্মারড অ্যান্ডুলেস। তুমি, আব্বাস আর আমি ডাক্তার; অ্যানি সিস্টার।’

‘মাই গড, আমার প্রমোশন হয়েছে!’ হেসে উঠল অ্যানি।

‘সাদা রঙ গাড়ির ভেতরটাও ঠাণ্ডা রাখবে,’ বলল আব্বাস।

‘র্যাকের ডিজাইন আমি তৈরি করেছি,’ বলল রানা। ‘টারিটের

পিছনে প্রতিটি গাড়িতে থাকবে চল্লিশ গ্যালন গ্যাসোলিনের দুটো ড্রাম, পানির একট ড্রাম। অস্ত্র আর গোলাবারুদের বাক্সগুলো সমান চার ভাগে ভাগ করে চারটে গাড়িতে রাখা হবে।’ আর্মারড কারের গায়ে রশি দিয়ে বাঁধা র্যাকগুলো এই মুহূর্তে খালি।

‘ভেবেছ রেড ক্রস বললেই পার পেয়ে যাবে?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল। ‘বাক্সগুলো দেখামাত্র ফাঁস হয়ে যাবে সব, প্রত্যেকটার গায়ে লেবেল সাঁটা আছে...।’

‘সব ছিঁড়ে ফেলে মেডিকেল সাপ্লাইয়ের নতুন লেবেল লাগানো হবে,’ বলে অ্যানির দিকে ফিরল রানা। ‘তোমার জন্যে একটা গাড়ি আলাদা করে রেখেছি, দেখবে এসো। চারটের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে বাধ্য আর...আর লক্ষ্মী।’

‘ওমা, সেকী! ওগুলোর আবার নিজস্ব চরিত্রও আছে নাকি?’ হালকা গলায় বিদ্রূপ করল অ্যানি।

‘ঠিক মেয়েদের মতই ওরা, লৌহমানবী।’ কাছের একটা আর্মারড কারে মৃদু চাপড় দিল রানা। ‘এটা সবচেয়ে শান্ত, সুবোধ বালিকা-শুধু ওর সাসপেনশনটা একটু বাঁকা হয়ে আছে, গতি খুব দ্রুত হলে নিতম্ব বাঁকায়, এই যা। তবে সিরিয়াস কিছু নয়, যদিও এ-কারণেই ওর নাম দেয়া হয়েছে নিতম্বিনী। ওটা তোমার। দেখবে, ভাল না বেসে পারবে না।’ এগিয়ে পাশের গাড়ির সামনে দাঁড়াল রানা, লাথি কষল টায়ারে। ‘এটা যেমন অস্থির তেমনি পাজি, প্রথম বার ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতেই আরেকটু হলে আমার কজি ভেঙে দিয়েছিল। ওর পরিচয়, চঞ্চলা। একমাত্র আমার পক্ষেই ওকে সামলানো সম্ভব। আমাকে ও ভালবাসে না, তবে শ্রদ্ধা করে।’ সামনে এগোল ও। ‘নিজের জন্যে এটা বেছে নিয়েছে আব্বাস, নাম ভাগ্যদেবী। ভবিষ্যতেই জানা যাবে ভাগ্যদেবী কী বর দেয় আমাদের। আর মাইকেল, এটা তোমার জন্যে-এতে

রয়েছে আনকোরা নতুন একটা কারবুরেটর। আমার ধারণা, এটাকে ভোগ দখল করার অধিকার একা তুমি সংরক্ষণ করো, কারণ কারবুরেটরটা সংগ্রহ করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তোমাকে।’

‘তাই?’ গল্পের গন্ধ পেয়ে অ্যানির চোখ দুটো আত্মহে জ্বলজ্বল করে উঠল। ‘কী ঘটেছিল?’

‘সে এক লম্বা কাহিনী,’ নিঃশব্দে হাসল রানা। ‘উটের পিঠে চড়ে দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার দুঃসাহসিক অভিযান।’ চুরটের ধোঁয়া গলায় আটকে যাওয়ায় খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করল মাইকেল, তবু বলে চলল রানা, ‘কাজেই ওটার নাম দেয়া হয়েছে বিপদতারিণী।’

‘হাউ ভেরি কিউট!’ অ্যানির কণ্ঠনিঃসৃত হাসি মর্মরধ্বনির মত বাজল রানার কানে।

মাঝরাতের খানিক পর ঘুমন্ত শহরের নির্জন রাস্তায় উঠে এল চারটে আর্মারড কার। হেডলাইটের সামনে ইস্পাতের শাটার নামানো রয়েছে, ফলে আলোর সরু একটা ফালি শুধু নীচের দিকে সামনেটা আলোকিত করেছে। গতি খুব মন্থর, সামান্যই শব্দ করছে এঞ্জিন। রাস্তার দু’ধারে গাছের সারি, মাথার উপর ডালপালা আর পাতা আড়াল করে রেখেছে তারাগুলোকে।

গায়ে-মাথায় একাধিক বোঝা থাকায় গাড়িগুলোর আকৃতি বদলে গেছে। ড্রাম, কাঠের বাক্স, রশির কুণ্ডলী, ট্রেসিং টুল, আর ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট-ওগুলোর ভিড়ে আর্মারড কার চেনাই দায়।

কনভয়ের সামনে রয়েছে মেজর সেভারস্, সদ্য দাড়ি কামিয়ে ধূসর রঙের প্যান্টের উপর সাদা জ্যাকেট চড়িয়েছে সে। দার-এস-

সালাম ত্যাগ করবার এই বিশেষ মুহূর্তটিতে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন মাইকেল। সিটি হোটেলের মালিক কোনভাবে যদি টের পেয়ে যায়! বেশি না, দিন সাতেকের সুইট ভাড়া আর সাত দিন তিনবেলা করে আহার গ্রহণ ও মদ্যপানের বিল বাকি পড়েছে তার। সন্দেহ নেই একবার সাগরে পৌঁছুতে পারলে হয়, সিটি হোটেল কবে কী খেয়েছে বা ক’দিন কোথায় শুয়েছে সব ভুলে যাবে সে। অনেক দিন আগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছে মাইকেল সেভারস্, জীবনটাকে আনন্দময় করে তুলতে হলে নিজের ব্যর্থতাগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করতে হয়।

মাইকেলের পিছনে রয়েছে আব্বাস খায়ের। নিজের গোত্র তার একটা সামরিক পদ আছে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, বাম শাখার কমান্ডার। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে রয়েছে সে, তবু নিজেকে নিয়ে তার গর্বের পরিসীমা নেই, কারণ এরই মধ্যে ছোটখাট যুদ্ধে এবং শিকারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে—আহত করেছে একাধিক শিফটাকে, গেছে দু’একটা সিংহ শিকারে, রাইফেলে তার হাত সম-বয়েসীদের ঈর্ষার কারণ। শহরের ভিতর দিয়ে কনভয় নিয়ে যাওয়ার সময় চোখ দুটো বিপুল উত্তেজনায় চকচক করছে তার, দেশ তথা গোত্রপ্রেমে উজ্জীবিত, জানে নিজের এলাকায় পৌঁছানোর আগে একের পর এক বহু বিপদ পেরোতে হবে তাদের, নিতে হবে মৃত্যুর অথবা দীর্ঘ কারাভোগের ঝুঁকি। বলাই বাহুল্য, যুদ্ধের মত নোংরা ও অকারণ রক্তঝরা ব্যাপারটা তার কাছে এখনও গৌরবের এবং পুরুষোচিত বীরত্বের কাজ।

তার পিছনে রয়েছে অ্যানি উইসপার, নিতম্বিনীকে সতর্ক দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছে। এঞ্জিনের ভাষা ঠিক মত বুঝতে পারছে মেয়েটা, হালকা ছোঁয়ায় ক্লাচ, স্টিক আর মাল্কাতা আমলের গিয়ার

যেভাবে অপারেট করছে, মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না রানা। অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাবার লোভে সে-ও উত্তেজিত হয়ে আছে, অভিজ্ঞতার ঝুলিতে নতুন একটা কিছু যোগ হবে। কাল বিকেলে প্রাথমিক রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে সে আমেরিকায়, এয়ার মেইল যোগে তার সম্পাদকের ডেস্কে পৌঁছুতে তিন-চার দিন লাগবে। পরিস্থিতির নেপথ্যকাহিনী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছে সে। অজ্ঞাত পরিচয় কোন এক বৃহৎ শক্তি নিজস্ব এজেন্ট পাঠিয়ে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী গোত্রগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছে, সাহায্য করছে শিফটা তথা দুষ্কৃতকারীদের; উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা, তারা যাতে আলোচ্য বৃহৎ শক্তির প্রভাববলয়ের ভিতর দ্রুত ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়। জিবুতি, সোমালি আর ইথিওপিয়ান সীমান্ত এলাকায় ইটালিয়ানদের ভূমিকাও অত্যন্ত নিন্দনীয়। বহুকাল আগেই তাদের সরকার এলাকা থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু অনেকেই তারা রয়ে গেছে, বেশিরভাগ প্রাক্তন যোদ্ধা, বর্তমানে দুষ্কৃতকারীদের সামরিক উপদেষ্টা এবং মাথার মুকুট। ইথিওপিয়ান সম্রাট হাইলে সেলাসির পতন এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র, তবে সব একনায়কের মত তিনিও গদি আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করছেন। সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোর ব্যাপারে কোনদিনই তেমন একটা মাথা ঘামাননি, এখন তো প্রশ্নই উঠে না। সবশেষে অ্যানি লিখেছে, ‘বাধ্য হয়েই নির্যাতিত গোত্রগুলো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অস্ত্র সংগ্রহের প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তারা চূপ করে বসে থাকতে পারে না, কারণ এটা তাদের জন্যে জীবন-মরণ সমস্যা। রাসটাফারিয়ান গোত্রের জন্যে একটা অস্ত্রের চালান ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হবে কাল, সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওদের সঙ্গেই যাব আমি।

কিন্তু পাঠক যখন আমার এই রিপোর্ট পড়বেন, তার আগেই অস্ত্রপাচারের এই অভিযান ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, আর সবার সঙ্গে মারা যেতে পারি আমি। জাহাজ থেকে তীরে নামার পর একজন রাসটোফারিয়ান প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করার জন্যে কয়েকশো মাইল মরু পেরোতে হবে আমাদের। যদি বেঁচে থাকি, পরবর্তী রিপোর্টে অভিযানের কথা লিখব।’ প্রথম রিপোর্টটা আসলে ভূমিকার কাজ করবে, অ্যানি জানে। সিরিজটা যে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং সুপাঠ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই তার। নিজের লিখবার স্টাইলের উপর আস্থা আছে তার, আর অভিযান শেষ হওয়ার আগে চমকপ্রদ ঘটনা যে ভূরি ভূরি ঘটবে তাতে আর সন্দেহ কী!

তার পিছনে রয়েছে মাসুদ রানা। ওর অর্ধেক মন জুড়ে রয়েছে চঞ্চলার এঞ্জিন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। কোন প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই, যাত্রার শুরুতে স্টার্ট নিচ্ছিল না কারটা। ভবিষ্যতে এঞ্জিনটার কাছ থেকে কী আশা করতে পারে ও, সেটাই কি আভাসে জানিয়ে দেওয়া হলো ওকে? অবিরাম ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে ঘোরাতে হাত অসাড় হয়ে পড়েছিল, লাভ হয়নি কোন। অগত্যা নতুন করে ফুয়েল সিস্টেম পরীক্ষা করেছে ও, চেক করেছে প্লাগ, ম্যাগনিটো সহ সচল সবগুলো পার্ট। কোথাও কোন ত্রুটি দেখতে পায়নি। আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর, এটাসেটা নাড়াচাড়া করে রানা যখন শেষ চেষ্টা হিসাবে আবার ক্র্যাঙ্ক ঘোরাল, প্রথমবারই স্টার্ট নিল এঞ্জিন, তারপর থেকে ছন্দ বজায় রেখে চমৎকার চালু রয়েছে, আগে কেন স্টার্ট নেয়নি সে-সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

রানার বাকি অর্ধেক মন ব্যস্ত রয়েছে ইতিমধ্যে গ্রহণ করা প্রস্ততির মধ্যে কোথাও কোন ত্রুটি বা ফাঁক আছে কিনা খুঁজে বের করার কাজে। মণ্ডি থেকে ওয়েলস অভ চান্ডি দীর্ঘ পথ, মাঝখানে কোন সার্ভিস স্টেশন আশা করা বৃথা। ড্রাম আর বাঁশ দিয়ে তৈরি

ভেলাটা আগেই পাপাগোয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সচল থাকবার জন্য যা যা দরকার সব তোলা হয়েছে প্রতিটি গাড়িতে।

দুই কাজে মনটা দুই ভাগ হয়ে গেলেও, মাঝে মধ্যে অ্যানি উইসপারের কথাও ভাবছে রানা। নারীসঙ্গ কার না ভাল লাগে। সুন্দরী নারী দেহ-মনে আলোড়ন তুলবে এ আর নতুন কথা কী! কিন্তু তবু ওর মনে হয়েছে, অ্যানি উইসপার একটা ব্যতিক্রম, আর কারও সঙ্গে তার তুলনা চলে না। বহু বছর পর এ-ধরনের মেয়ে এই প্রথম দেখছে রানা, যে কি না যে-কোন পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে, হতে পারে তার সমকক্ষ, তথা পার্টনার। একটা কথা পরিষ্কার, গৃহবধূ হয়ে স্বামীর নির্যাতন সহ্য করার জন্য জন্ম হয়নি অ্যানি উইসপারের। ইউরোপ বা পশ্চিমা জগতে এ-ধরনের স্বাধীনচেতা স্বাবলম্বী মেয়ে অনেক আছে। রানার মন খারাপ হয়ে গেল নিজের দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়ে যাওয়ায়। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, কেনা-বাঁদীর মত জীবন-যাপন করছে তারা। কুসংস্কারের বাঁধন ছিঁড়ে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে একটা জাতির এত বেশি সময় লাগে-অসহ্য!

মাঝে মধ্যে মাইকেল সেভারসের কথাও ভাবছে রানা। যতবারই তার কথা মনে পড়ছে, আপনমনে না হেসে পারছে না। সিটি হোটেলের সামনে দিয়ে আসা উচিত ছিল ওদের, ওটাই সরল পথ, কিন্তু মাইকেল জেদ ধরায় ঘুর পথ ধরে আসতে হয়েছে ওদেরকে। তখনই রানা যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে-হোটেলের বিল বাকি রেখে যাচ্ছে সে। ভয় পাবার আরেকটা কারণ আছে তার, কিন্তু সে-ব্যাপারে রানা তাকে কিছু বলেনি। ব্রিটিশ অ্যামবাসাডরের মেয়েটা ক’দিন থেকেই গরুখোঁজা করছে

মাইকেলকে। সে যদি জানে মাইকেল চিরকালের জন্য দার-এস-সালাম ছেড়ে যাচ্ছে, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

জেটি থেকে খানিক দূরে, জাহাজঘাটায় অপেক্ষা করছিল কোস্টাস অ্যারোনিকাস, পরনে হাঁটু ঢাকা ওভারকোট, হাতে ল্যাম্প। ল্যাম্প নেড়ে সংকেত দিল সে, সামনে এগোতে বলল কনভয়টাকে। পাথুরে জাহাজঘাটায় পাপাগোয়ার জুরাও দাঁড়িয়ে রয়েছে রক্ষকঠিন চেহারা নিয়ে। হাবভাব আর কাজের দক্ষতা দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, রাত দুপুরে সন্দেহজনক কার্গো লোড করতে তারা অভ্যস্ত।

একটা করে গাড়ি সামনে এগিয়ে থামল, গা থেকে খুলে নেওয়া হলো ড্রাম আর বাক্সগুলো। ওগুলো তোলা হলো কার্গো নেটে, ডেরিকের সাহায্যে জাহাজে উঠে গেল নেট। এরপর গাড়িটার তলায় কাঠের তক্তা ঢোকানো হলো, মোটা রশি দিয়ে তক্তার সঙ্গে বাঁধা হলো চেসিস, কোস্টাস অ্যারোনিকাসের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে উইঞ্চ-এর এঞ্জিন চালু হলো, ধীরে ধীরে ভারি বোঝা নিয়ে শূন্যে উঠে গেল ডেরিক।

কাজটা শেষ হলো প্রায় নিঃশব্দে, অপ্রয়োজনীয় একটা কথাও বলল না কেউ। ‘ব্যটারা নিজেদের কাজ বোঝে,’ ফিসফিস করল মাইকেল, রানার কাঁধে টোকা দিল। ‘আমি যাই, হারবার মাস্টারের কাছ থেকে কাগজ-পত্র নিয়ে আসি। ঘন্টাখানেকের মধ্যে রওনা হব।’ উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

গ্যাংপ্ল্যাক্স বেয়ে ডেকে উঠে এল রানা, অ্যানি উইসপারের একটা হাত ধরে আছে। ‘চলো, থাকার কী ব্যবস্থা হয়েছে দেখে আসি।’

‘হ্যাঁ, চলো,’ হাসি চেপে বলল অ্যানি। ‘তুমি কী ধরনের

ব্যবস্থা পছন্দ করবে দেখার খুব ইচ্ছে আমার।’

‘মানে?’

হেসে উঠে অ্যানি বলল, ‘সে এক লম্বা কাহিনী। ফোমের বিছানা থেকে ভাঙা চৌকিতে অধঃপতনের কারণ ইতিহাস।’

ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অতিরিক্ত কেবিন মাত্র একটাই আছে, ওদের সবাইকে সেখানে মাথা গুঁজতে হবে।

খানিক পর হারবার মাস্টারকে দুশো শিলিং ঘুষ দিয়ে কাগজ-পত্র নিয়ে ফিরে এল মাইকেল। কাগজে দেখা গেল, আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে চারটে আর্মারড অ্যাম্বুলেন্স আর মেডিকেল সাপ্লাই নিয়ে যাচ্ছে ওরা, আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের তরফ থেকে। ‘পাঁচশো শিলিং ঘুষ দিতে হয়েছে,’ রানাকে জানাল সে।

কেবিন সম্পর্কে তাকে বলা হলো, কোন রকম ইতস্তত না করে জবাব দিল সে, ‘কার সাথে কে থাকে সে তো আগেই ঠিক হয়ে আছে, বদলানোর কী কারণ ঘটল? অ্যানি উইসপার আর আমি কেবিনে থাকব, আর তোমরা ডেকে কোথাও...নাকি আবার টস করতে চাও?’

রেলিঙের সামনে সবাই ওরা দাঁড়িয়ে আছে। অ্যানি উইসপার চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে, ও কী বলে শুনতে চায়, আত্মহে চকচক করছে তার চোখ। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়বার লোভ সামলাতে পারল না রানা। ‘পাপাগোয়ায় শুধু কেবিন আর বাক্স আছে, মাইকেল। তুমি ভাঙা চৌকি কোথায় পাবে যে...’ কথা শেষ করতে পারল না, খিলখিল করে হেসে উঠল অ্যানি।

মাইকেলের হাঁ করা মুখে তাড়াতাড়ি একটা চুরুট গুঁজে দিল

রানা, মাইকেলেরই চুরট ওটা। তারপর আবার বলল, ‘মাত্র ক’টা দিনেরই তো ব্যাপার, অ্যানি বাদে সবাই আমরা ডেকে কাটিয়ে দিতে পারব। আর যদি বৃষ্টি আসে, গাড়িতে ঢুকে পড়লেই হবে।’

একটু পর সবার কানকে বাঁচিয়ে আব্বাস খায়ের রানাকে বলল, ‘ভেবেছিলাম মেয়েটা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে কি না মেজরের কাছ থেকে জানা যাবে, কিন্তু এখন দেখছি আমার হিসেবে ভুল হয়েছিল।’

মদু হেসে আব্বাসের মাথার চুল এলোমেলো করে দিল রানা।

চোখে-মুখে নক্ষত্রের কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে ঘুম ভাঙল অ্যানি উইসপারের, চোখ মেলেই তারা ভরা মুক্ত আকাশ দেখে কী এক আনন্দে মনটা ভরে গেল তার, পূর্ব আকাশ থেকে সবে মাত্র পালাতে শুরু করেছে অন্ধকার। মনে পড়ে গেল, কেবিনের ভিতর গরম লাগায় সবার সঙ্গে ডেকে এসে শুয়েছিল সে, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। গা থেকে চাদরটা সরিয়ে দাঁড়াল সে, পা টিপে টিপে রেলিঙের দিকে এগিয়ে গেল।

নানা রঙের আলো মেখে বিচিত্র চেহারা পেয়েছে সাগর। প্রতিটি ঢেউ যেন নিরেট ও মহামূল্যবান কোন ধাতু থেকে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে, নক্ষত্রের আলোকচ্ছটা অলংকার হিসাবে ছড়িয়ে রয়েছে গায়ে। জাহাজের পিছনে আলোড়িত পানি যেন সবুজ আগুন। হাত আর চুলে, মুখ আর গলায় প্রেমিকের আদরমাখা স্পর্শের মত সাগরের বাতাস, মাথার উপর বিশাল পালাটা ফিসফিস করছে। রাতের এই রূপ দেখতে দেখতে হাঁপ ধরে গেল অ্যানি উইসপারের, অদ্ভুত একটা পুলকে অবশ হয়ে এল সারা শরীর।

নিঃশব্দ পায়ে মাইকেল যখন এগিয়ে এল, দাঁড়াল তার

পিছনে, দু’হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার কোমর, সে এমনকী ঘাড় ফিরিয়ে তাকালও না, বরং হেলান দিল ওর গায়ে। তর্ক বা ব্যঙ্গ করবার কোন ইচ্ছাই তার হলো না। কথাটা তো আর মিথ্যে লেখনি সে, দু’চার দিনের মধ্যে মারা যেতে পারে। অথচ এত সুন্দর রাত জীবনে আর হয়তো না-ও আসতে পারে।

কেউ ওরা কথা বলল না, তবে মাইকেলের হাত চোরের মত সন্তর্পণে রাউজের ভিতর ঢুকছে বুঝতে পেরে কেঁপে উঠল অ্যানি উইসপার। ওর হোঁয়া, বাতাসের মতই, কোমল আর আদরমাখা।

পাতলা কাপড় ভেদ করে মাইকেলের গরম শরীরের আঁচ অ্যানির চামড়া যেন পুড়িয়ে দিল। বুঝতে পারছে অ্যানি, অস্বিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছে মাইকেল।

আলিঙ্গনের ভিতর থেকেই ধীরে ধীরে ঘুরে গেল অ্যানি, মুখ তুলে তাকাল মাইকেলের চোখে। সামনের দিকে চাপ দিয়ে অ্যানির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হলো মাইকেল, সাড়া দিল অ্যানিও—দুটো শরীর জোড়া লেগে এক হয়ে গেল। মাইকেল চুমো খেতেই পুরুষালি গন্ধে নেশা ধরে গেল অ্যানির, বুঝতে পারল এখন যদি সাবধান না হয় পরে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না।

মনের সমস্ত দৃঢ়তা আর সংযম একত্রিত করতে হলো, মুখ নামিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল অ্যানি। খানিকটা জোর খাটাতে চেষ্টা করলেও, মাইকেল তাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হলো। ঘুরে দাঁড়াল অ্যানি, দ্রুত ফিরে এল নিজের চাদরের কাছে। কাঁপা হাতে সেটা তুলল সে।

রানা আর আব্বাসের মাঝখানে সাবধানে চাদরটা বিছাল অ্যানি, কোন শব্দ না করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এখনও হাঁপাচ্ছে

সে, চেষ্টা করছে নিজেকে শান্ত করতে। আর ঠিক এই সময় টের পেল, মাসুদ রানা জেগে আছে।

চোখ বুজে রয়েছে রানা, নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে অ্যানি জানে, জেগে আছে ও।

ছয়

পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে আসমাঁরা শহরের দিকে তাকিয়ে আছে বিশালবপু আবদেল কাদের ফাদ। পরনে নিজের খেয়ালি ডিজাইনে তৈরি সামরিক ইউনিফর্ম-কালচে সবুজ মোটা কাপড় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে অসংখ্য সোনার বোতাম আর পদকে, রঙচঙে ফিতে আর ব্যাজে। কোমরে খোপ বসানো মোটা একটা বেল্ট, প্রতিটি খোপে রাইফেলের বুলেট, যদিও রাইফেলটা বহন করছে তার সহকারী মোরেট টিউরেলাস। স্বঘোষিত জেনারেল আবদেল কাদের ফাদের কোমরে দ্বিতীয় আরেকটা বেল্ট রয়েছে, হোলস্টার বলা যায়, সেটা থেকে নিতম্বের দু'পাশে দুটো রিভলভার বুলছে। শিফটা নেতৃত্বের প্রতীকচিহ্ন হিসাবে খোপে ভরা একটা তরোয়ালও বহন করছে সে। তিন মন ওজনের জেনারেল জামা-কাপড় ও পদক ছাড়াও আরও আধ মন-টাক বোঝা বহন করছে অবলীলায়। তার ঝুঁড়িটা মস্ত ড্রামের মত, উপর দিকে ঘাড়ে-গর্দানে সমান। চোখ দুটো স্বাভাবিক অবস্থায় এত বড় দেখায় যেন বিস্ফারিত হয়ে আছে, জ্বলন্ত দু'টুকরো কয়লার মত লাল। দাড়ি নেই, চওড়া আর ঘন জুলফি চিবুক বাদে মুখ প্রায় সবটাই ঢেকে রেখেছে, ঠোঁটের কোণ থেকে বাঁকা হয়ে জুলফির সঙ্গে মিলিত হয়েছে পৌফ জোড়া, মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। চেহারা বা পোশাকে

কিন্তুতকিমাকার ভাঁড় বলে মনে হলেও, গোটা পুব আফ্রিকায় আবদেল কাদের ফাদই সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং ক্ষমতাস্বত্ব অপরোধী-পাহাড়ী দুষ্কৃতকারী শিফটাদের দৌর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা।

শিফটারা এতদিন সাধারণ ডাকাত ছিল, যদিও তাদের দুঃসাহস আর নৃশংসতার ছাপ গোটা পুব আফ্রিকার সবখানে ছড়িয়ে আছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা, মা-বাবার চোখের সামনে ধর্ষণ করেছে কিশোরী মেয়েদের, যুবকদের ধরে পুরুষত্বহীন করেছে, শিশুদের নিক্ষেপ করেছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে-সবই নগ্ন উল্লাস আর অটহাসির সঙ্গে, সঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই। তবে এতদিন ওরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, প্রতিটি দলের ছিল গোপন আস্তানা, তারা স্বাধীনভাবে লুণ্ঠপাট করত, ফলে দলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই ছিল, খুনোখুনি আর হানাহানি ছিল রোজকার ব্যাপার। শিফটাদের সবচেয়ে বড় দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদেল কাদের ফাদ, সে-ই সবগুলো দলকে এক করে সুশৃংখল ও অজেয় একটা শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। তার পক্ষে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়েছে মি. এক্স-এর পরামর্শ আর আর্থিক সাহায্য পাওয়ায়। মি. এক্স রুশ, ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ আর ইটালিয়ান ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, তবে নিজের পরিচয় সম্পর্কে কখনোই মুখ খোলে না। শিফটারা একত্রিত হতে পারলে, তাদের সম্মিলিত শক্তি সংশ্লিষ্ট এলাকার যে কোন সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, এই চেতনা তার দ্বারাই শিফটা নেতাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। জোট বাঁধবার কাজটা একদিনে হয়নি, প্রায় বছর দেড়েক সময় লেগেছে। শিফটারা এখন সুসংবদ্ধ, শক্তির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় এখন আর তাদেরকে গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকতে হয় না। ইরিত্রিয়ার বুকে স্বাধীন একটা

সরকার পরিচালনা করছে আবদেল কাদের ফাদ। স্থানীয় আমলা থেকে শুরু করে পুলিশ আর পুঁজিপতিরাও শিফটাদের মান্য করে, নিয়মিত খাজনা দিয়ে তুষ্ট রাখে। সাধারণ মানুষ যেখানে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেও দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, শিফটারা সেখানে প্রায় কোন কাজ না করেই রাজার হালে আছে। এত দিন পুঁজিপতিদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় এবং দূর-দূরান্তের জনপদে ডাকাতি করেই সম্ভূষ্ট ছিল শিফটারা। এখন তাদেরকে নতুন ধরনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মি. এক্সের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে আবদেল কাদের ফাদ। শিফটাদের সামরিক উপদেষ্টা, বেশিরভাগই ইটালিয়ান, তাদেরকে এবার কাজে লাগানোর জন্য চাপ দিচ্ছে সে।

ইরিত্রিয়া ইটালির দখলে থাকবার সময়, এই ইটালিয়ানরা ছিল বিশাল সব ভূ-সম্পত্তির মালিক। ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার পর অনেকেই তারা ইটালিতে ফিরে যায়নি, অথচ সবাই তাদের ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছে। চোরজোচ্চোর, দাংগাবাজ-প্রতারকরাই অসভ্য অশিক্ষিত আদিবাসীদের বোকা বানিয়ে, বন্দুকের জোরে ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিল। সেগুলো হাতছাড়া হবার পর মরিয়া হয়ে উঠল তারা। ভূ-সম্পত্তি দখল ও রক্ষার জন্য বন্দুকযুদ্ধ করতে হত তাদের, কারও কারও আনুষ্ঠানিক সামরিক ট্রেনিংও নেওয়া ছিল, সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা ছোট ছোট ডাকাতদল গঠন করে, পাহাড়ী দুষ্কৃতকারীদের নেতা হয়ে বসে। সেই নেতাদেরই একত্রিত করেছে আবদেল কাদের ফাদ। মি. এক্সের পরামর্শে সে এখন তাদেরকে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিতে বলছে। হুঁজন শিফটা নেতাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, ম্যাপ দেখিয়ে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট একটা এলাকা নিজেদের দখলে আনতে হবে। দখল করবার পর এলাকায় শান্তি

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তারপর খাজনা আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা চাই। এলাকা দখলের কাজটা পানির মত সহজ, প্রায় বিনা যুদ্ধেই অর্জিত হবে সাফল্য, কারণ সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর উপর সরকারের কোন নজর নেই। ক্ষমতাসীন ব্যক্তির নিজেদের পদ আর ক্ষমতা ধরে রাখবার জন্য শুধু রাজধানী আর শহরগুলোতেই তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে। আর আদিবাসীরা কোন সমস্যা নয়, কারণ তাদের কাছে তীর ও বর্শা ছাড়া আধুনিক কোন অস্ত্র নেই বললেই চলে।

পাহাড়চূড়া থেকে দূর দিগন্তে চোখ রেখে সাম্রাজ্য গড়বার স্বপ্ন দেখছে আবদেল কাদের ফাদ। তার পায়ের নীচে, পাহাড়ের গোড়ায়, অস্ত্র আর গোলাবারুদ সহ ট্রাক বহর অপেক্ষা করছে। কয়েকশো শিফটা ট্রেনিং নিচ্ছে খোলা মাঠে। প্রায় সবার পরনেই সামরিক ইউনিফর্ম। ওরা সবাই কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরের-এর সৈনিক। অস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সামরিক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হয়েছে, বেশিরভাগই চোরাবাজার থেকে কেনা। টাকা এসেছে শিফটা নেতা কর্নেল ডেকানডিয়া লেকরেরের কাছ থেকে, মি. এক্সও উদার হাতে দান করেছে। মেজর লুইগি রাকার অধীনে হয় হস্তার ট্রেনিং আজ শেষ হতে যাচ্ছে।

খবর দেওয়া হয়েছে কাউন্টকে, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে সে।

পাহাড়চূড়া থেকে হেডকোয়ার্টারে নিজের অফিসে নামবার সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল আবদেল কাদের ফাদ। ‘খবর তো দিয়েছি, কিন্তু কাজটা কি করতে পারবে কর্নেল ডিকানডিয়া, মোরেট?’

ফাদ যেমন স্বঘোষিত জেনারেল, মোরেট তেমনি স্বঘোষিত মেজর। ইটালিয়ান হলেও, কাউন্ট ডিকানডিয়াকে দুচোখে দেখতে পারে না সে। ‘একটা ভাঁড়!’ সংক্ষেপে মন্তব্য করল মোরেট।

কাজটা হলো সারডি গিরিসঙ্কট দখল করা। সারডি গিরিসংকট-বিশাল মরুভূমির মাঝখানে সরু একটা ফাটল, আরও বিস্তৃত হয়ে দুর্গম পাহাড়শ্রেণীকে দু’ভাগ করেছে। সমতল মরু থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে মালভূমি, ওখানে পৌঁছুতে হলে এই গিরিপথ ব্যবহার করা ছাড়া আর কোন সহজ পথ নেই। সামরিক দিক থেকে সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে এই গিরিপথের। ওটা দখলে থাকলে ইথিওপিয়ার সেনাবাহিনী ফাদ সাম্রাজ্যের ভিতর ঢুকতেই পারবে না। আর এই সারডি গিরিসংকট দখল করতে হলে প্রথমে দখল করতে হবে গিরিসংকটে পৌঁছানোর রাস্তাটা।

মেজর মোরেট মিথ্যে বলেনি, কাউন্ট ডিকানডিয়া খানিকটা ভাঁড়ই বটে। যোদ্ধা হিসাবেও তার তেমন কোন খ্যাতি নেই। তবে কাউন্টের রয়েছে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাহিনী, দলে ট্রেনিং পাওয়া দু’চারজন ইটালিয়ান সৈনিকও আছে। তা ছাড়া, ফাদের ধারণা, ওই এলাকায় আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করবে কাউন্ট, কারণ এক সময় ওদিকেই তার বিশাল ভূ-সম্পত্তি ছিল।

‘কাউন্টের ওপর অবিচার করছ তুমি, মোরেট,’ ভারি গলায় বলল জেনারেল ফাদ। ‘ভুলে যেয়ো না, ইটালিতে প্রভাবশালী আত্মীয়স্বজন রয়েছে তাঁর। তা ছাড়া, তিনি সত্যিকার একজন কাউন্ট, স্বঘোষিত নন।’

‘তা হতে পারেন,’ মুখ ভার করে বলল মোরেট। ‘কিন্তু তিনি যে কর্নেল নন এ আমি হলপ করে বলতে পারি।’

‘তাতে কী হলো?’ হেসে উঠল বিশালবপু জেনারেল ফাদ। ‘তুমিও তো মেজর নও, আমিও তো জেনারেল নই। ভেবে দেখো

না, উনি যে দয়া করে নিজেকে জেনারেল বলে ঘোষণা করেননি সেটাই কি আশ্চর্য নয়? এ থেকে ওনার পরিমিতি বোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না?’

হেডকোয়ার্টার পৌঁছানোর পরপরই খবর এল, কাউন্ট আসছেন। কাউন্টকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসবার জন্য মেজর মোরেটকে নীচে পাঠিয়ে দিল ফাদ।

উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে এল কাউন্ট ডিকানডিয়ার রোলস-রয়েস। সন্ধ্যার আবহা আলোয় গাড়িটার হেডলাইট রাস্তার বিস্তারিত চোখের মত লাগল, আকাশ-নীল বডিতে মিহি ধুলোর প্রলেপ লেগে রয়েছে। পাঁচ বছর রোজগারের টাকা এক করলেও এ-ধরনের একটা গাড়ি কিনতে পারবে না মেজর মোরেট, কাউন্টের প্রতি তার বিদ্রোহের সেটাও একটা অন্যতম কারণ।

ডিকানডিয়া লেকরের, তিন হাজার দক্ষ-অদক্ষ শিফটার অবিসম্বাদিত নেতা, জবরদখল করা বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক, প্রচার লালায়িত কাউন্ট, স্বঘোষিত কর্নেল, কোথাও দু’পা যেতে হলেও রোলস-রয়েস ছাড়া তার চলে না। প্রস্তুতকারকরা তার রুচিমারফিক তৈরি করে দিয়েছে গাড়িটা। মডেলটা ১৯৩০ সালের।

মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে মাস্কাতা আমলের পাথরের তৈরি দালানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস-রয়েস। মোরেট লক্ষ করল, গাড়ির গায়ে ক্ষতচিহ্নের মত অসংখ্য স্টিকার সাঁটা রয়েছে, সবচেয়ে বড়টি দরজার গায়ে, তাতে লেখা-‘সাহসই আমার অস্ত্র এবং ভূষণ’।

গাড়ি থামতেই বানরতুল্য ছোটখাট একজন মানুষ, পরনে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম, লাফ দিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। সে নিজেই

পড়ল, নাকি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হলো বলা কঠিন। একটা গড়ান দিয়েই সিধে হলো, পরমুহূর্তে কাঁকরের উপর একটা হাঁটু গেড়ে বেচপ আকৃতির ক্যামেরাটা চোখে তুলল সে, ভয়ানক অস্থির এবং সতর্ক-জানে, জেনারেল ফাদের সঙ্গে কাউন্টের দেখা করতে আসবার এই দুর্লভ মুহূর্তটির ছবি ঠিকমত তুলতে না পারলে তার নিতম্বের দফারফা হয়ে যাবে।

ড্রাইভার দরজা খুলে অপেক্ষা করছে, ভিতরে বসে গাড়ি থেকে নামবার প্রস্তুতি নিচ্ছে কাউন্ট ডিকানডিয়া। প্রথমে সে দেখে নিল, তার নিত্যসঙ্গী ক্যামেরাম্যান তথা এইড বানানটো সাতা ঠিক জায়গাটিতে পজিশন নিয়েছে কি না। তারপর নাকের ভিতর পাকানো কাগজের সরু দিকটা ঢুকিয়ে হ্যাঁচো করল। বড়সড় একটা রুমাল দিয়ে প্রথমে ঘাড়, তারপর ভুরু, সবশেষে নাক মুছল। সতর্কতার সঙ্গে ঠিকঠাক করে নিল কালো বেরেটা। বড় করে শ্বাস টানল। তারপর হাসল, আয়নায় তাকিয়ে দেখে নিল হাসিটা। এরপর গাড়ি থেকে নামতে উদ্যত হলো সে।

তার চোখ ঘুমকাতুরে মেয়েদের মত, সারাক্ষণ যেন রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর। গায়ের চামড়া নরম আর রক্তশূন্য সাদাটে। কালো বেরের নীচে বেরিয়ে থাকা চুলগুলো কৌকড়ানো। পঁয়তাল্লিশের মত বয়স হলেও, চুলে কোন পাক ধরেনি। তুমি যে কলপ লাগিয়েছ সে আমার জানা আছে, ভাবল মোরেট।

লোকটা অস্বাভাবিক লম্বা, ফলে ভিড়ের মধ্যে তাকে টাওয়ারের মত লাগে। ইটালিয়ান কাউন্টদের আনুষ্ঠানিক ড্রেস পরে আছে সে, তাতে বহুবর্ণ পদক আর ফিতের হড়াছড়ি। গুজব আছে, ঘুমোতে যাবার সময় বা প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে যাওয়ার সময়ও এই পোশাকে থাকে সে। কোমরের খাপে রয়েছে মস্ত একটা ছোরা, হীরে আর মুক্তো বসানো হাতল। নিতম্বের আরেক

পাশে রয়েছে বেরেটা পিস্তল, হাতির দাঁতের বাঁটটা হাতে তৈরি করা। কোমর পেঁচিয়ে থাকা হোলস্টারটা ভুঁড়ির বিদ্রোহ ভাব সাফল্যের সঙ্গে দমিয়ে রেখেছে।

গাড়ির দরজায় পোজ নিল কাউন্ট, খাটো সার্জেন্টের দিকে চোখ গরম করে তাকাল। ‘ঠিক আছে, সাতা?’ জিজ্ঞেস করল সে। বানানটো সাতাকে যেমন শাসন করে কাউন্ট, তেমনি আদরও করে। তবে কখন যে লাথি মারবে আর কখন চুমো খাবে কেউ তা বলতে পারে না, তার অস্থির মর্জি আর মেজাজের উপর নির্ভর করে সেটা।

‘আরেকটু, মাই কাউন্ট!’ বিনীত অনুরোধ জানাল বানানটো সাতা। ‘আর সামান্য একটু উঁচু করণ চিবুকটা।’ জীবনে কে যে কী থেকে বেঁচে থাকবার রসদ আহরণ করে, বলা কঠিন-আদর বা লাঞ্ছনা কখন কপালে জুটবে জানা না থাকায় সারাক্ষণ অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে সে। আদর পেলে আনন্দে গলে গিয়ে কাউন্টের পা চাটে, মার খেলে বুক ভরা আশা আর মুখ ভরা হাসি নিয়ে অপেক্ষা করে কখন আদর জুটবে। এমন প্রভুভক্তি মানবকুলে দুর্লভ।

কাউন্টের চিবুকটা ওদের দু’জনের জন্যই উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ একটা কোণ থেকে তাকালে মনে হয় চিবুক একটা নয় দু’টো।

মুখ প্রায় আকাশের দিকে তুলে চিবুক টান টান করল কাউন্ট। উল্লাসে চেষ্টা করে উঠল বানানটো সাতা, ‘হয়েছে! হয়েছে!’ ক্যামেরার শাটার টিপে দিল সে।

দরজা থেকে নেমে সিধে হলো কাউন্ট, তার নড়াচড়ায় সোনা-রূপো-পিতলের পদকগুলো একযোগে বেজে উঠল। তার সামনে

দাঁড়িয়ে স্যাণ্টু করল মেজর মোরেট। এরপর কাউন্টের নিজস্ব বাহিনী তাকে গার্ড অভ অনার দিল। স্যাণ্টু গ্রহণ করে মেজরের দিকে তাকাল কাউন্ট।

থেমে থেমে সামরিকসুলভ হাঁক ছাড়ল মোরেট, ‘জেনারেল আবদেল কাদের ফাদ মহামান্য কাউন্টের জন্যে অপেক্ষা করছেন!’

‘খবর পেয়ে প্রথমে আমি আমার বাহিনীকে পাঠিয়েছি,’ সার বেঁধে সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের সৈনিকদের দিকে তাকাল কাউন্ট, গর্বে তার ছাতি কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল। ‘জেনারেল ফাদ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে ইচ্ছে করলে গোটা ইথিওপিয়া দখল করে নিতে পারি আমি?’

ভাঁড়, মনে মনে বলল মোরেট, কী বলছে নিজেও জানে না! ইথিওপিয়া দখল করতে হবে না, ওয়েলস অভ চান্ডিতে গিয়ে উটের মূত খাও গে। ‘এদিকে,’ পথ দেখিয়ে সবিনয়ে বলল সে, ‘মহামান্য কাউন্ট!’

জেনারেল ফাদের অফিসে ঢুকেই কাউন্ট ঘোষণা করল, ‘যুদ্ধযাত্রার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি।’ নাটকীয় ভঙ্গিতে দ্রুত পায়চারি শুরু করল। ‘আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ এবং ধন্য। বলুন, জেনারেল, কোথায় শত্রু? কোথায় তারা? আমি তাদের বংশ ধ্বংস করে দেব! আমি তাদের...’ চমৎকার ভাষা, পরে আবার ব্যবহারের জন্য মনে গেঁথে রাখা দরকার, নিজেকে পরামর্শ দিল সে।

শান্তভাবে, মৃদু হেসে, জেনারেল ফাদ বাধা দিল তাকে, ‘আলোচনার আগে দুটোক হুইস্কি খেলে হত না, মাই ডিয়ার কাউন্ট ডিকানডিয়া?’

জেনারেলের সামনে থামল কাউন্ট, তার হাতে চুমো খেলো। ‘আওয়ারস ইজ দ্য ভিক্টরি! আপনি আমাকে যে কোন রণাঙ্গনে

পাঠাতে পারেন, কথা দিচ্ছি রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে বিজয় আমি ছিনিয়ে আনবই। তবে, ইঁ্যা, নির্দেশ পাবার আগে খানিকটা হুইস্কি খেয়ে নেয়া দরকার বটে।’

কাউন্টকে প্রায় গোটা একটা বোতল হুইস্কি খাইয়ে আলোচনা শুরু করল জেনারেল ফাদ। আলোচনা মানে, নির্দেশটা উচ্চারণ করল।

‘ওয়েলস অভ চান্ডি,’ পুনরাবৃত্তি করল কাউন্ট, হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। লাফ দিল সে, টেবিলের কোনায় কোমরের ধাক্কা লাগায় হুইস্কির বোতল আর গ্লাস মেঝেতে পড়ে গেল। উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করল সে, উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে তার চিবুক, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে মুখের রঙ। ‘সম্মান হারানোর আগে মৃত্যুও শ্রেয়!’ গর্জে উঠল সে, মদ তাকে ভালভাবেই ধরেছে।

‘উত্তেজিত হবেন না, কাউন্ট,’ অভয়দানের সুরে বলল জেনারেল ফাদ। ‘আপনাকে আমি শুধু একটা অরক্ষিত ওয়াটার-হোল-এ পজিশন নিয়ে পাহারায় থাকতে বলছি, তার বেশি কিছু না।’

কিন্তু কাউন্ট তার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। ‘আপনি আমাকে বীরত্ব প্রদর্শনের এই বিরাট সুযোগ দেয়ায় আমি ধন্য! এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার বিকল্প যদি মৃত্যুও হয়, তা-ও আমি বরণ করে নেব।’ নতুন একটা চিন্তা মাথায় ঢুকতে পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ‘আপনি অবশ্যই আমাকে আর্মার আর এয়ার ক্রাফট দিয়ে সাহায্য করবেন, জেনারেল?’

‘ওসবের কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না,’ মৃদুকণ্ঠে বলল ফাদ, বীরত্ব আর মৃত্যুর প্রসঙ্গ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে

দিয়েছে তাকে। প্রতিপক্ষ যেখানে নগণ্য, সম্রাট হাইলে সেলাসি যেখানে সেনাবাহিনী পাঠাবেন না, সেখানে যুদ্ধ করার সুযোগ কোথায়? কিন্তু এমন কিছু সে বলবে না যাতে আহত হয় কাউন্ট। মি. এক্সের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এই লোক। ‘ওখানে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।’

‘কিন্তু শত্রুকে ছোট করে দেখা উচিত নয়,’ বলল কাউন্ট। ‘যদি বাধা পাই?’

চেয়ার ছেড়ে কাউন্টের সামনে দাঁড়াল জেনারেল ফাদ, তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, ‘আপনার কাছে তো রেডিও আছেই, সাহায্য দরকার হলে জানাবেন আমাকে। আর হ্যাঁ, সাবধান থাকবেন, আপনার বাহিনী যেন সারডি গিরিসংকট

দখল করার আগে লুঠপাঠ শুরু না করে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো কাউন্ট। ‘আওয়ারস ইজ দ্য ভিস্টরি,’ হুংকার ছাড়ল সে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলল ফাদ। অকস্মাৎ চরকির মত আধপাক ঘুরে গিয়ে দরজার দিকে ছুটল কাউন্ট, হাঁক ছাড়ল, ‘সাতা!’

গলায় মস্ত ক্যামেরা ঝুলিয়ে দরজার আড়ালে এই ডাকের আশাতেই লুকিয়ে ছিল বানানটো সাতা, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে উদয় হলো সে, ব্যস্ত হাতে ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করছে।

জেনারেল ফাদের কজি ধরে জানালার দিকে টেনে নিয়ে চলল কাউন্ট। ‘আশা করি, জেনারেল কিছু মনে করবেন না? ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে জানালাটা আমার পছন্দ।’ ফ্রেমটা কারুকাজ করা। জেনারেলের কাঁধে হাত রেখে পোজ নিল সে।

‘দু’জন আরও ঘনিষ্ঠ হোন, প্লিজ। একটু পিছিয়ে যান, জেনারেল, প্লিজ-মহামান্য কাউন্টকে আপনি আড়াল করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। চিবুকটা, মাই কাউন্ট, একটু উঁচু

করুন। বাহু, চমৎকার!’ হতচকিত জেনারেলের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, শাটার টিপে দিল সাতা।

ডিকানডিয়া বাহিনীতে একমাত্র সত্যিকার যোদ্ধা হলো লুইগি রাকা। বাহিনীর কমান্ডার কাউন্ট হলেও, যুদ্ধের তেমন কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই, এবং সে একটা কাপুরুষও বটে। ইটালিয়ান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর রাকা, একটা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ মাথায় নিয়ে বছর পনেরো আগে ইরিত্রিয়ায় পালিয়ে এসেছিল, ভাগ্য তাকে কাউন্ট ডিকানডিয়া বাহিনীর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। বলতে গেলে তার একক প্রচেষ্টায় ভোর পাঁচটার দিকে যুদ্ধযাত্রার জন্য সৈনিক বাছাইয়ের কাজটা শেষ হলো। ছয়শো নব্বুইজনের একটা দল, নাম দেওয়া হলো থার্ড ব্যাটালিয়ান। আসমারার পাহাড়ী রাস্তায় ট্রাক বহর দাঁড়িয়ে আছে, গ্রেটকোট পরা সশস্ত্র সৈনিকরা চড়ছে তাতে। রোলস-রয়েসের সামনে এবং পিছনে মটরসাইকেল আউটরাইডাররা সবাই যে-যার আসনে বসে অপেক্ষা করছে। ইতিমধ্যে ডিকানডিয়া বাহিনীর শিফটাদের মধ্যে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা মিশনে পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে, প্রতিপক্ষরা সংখ্যায় তাদের চারগুণ এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। মেস সার্জেন্ট নাকি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে দু’হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কান্নাকাটি করেছেন কাউন্ট ডিকানডিয়া, জুনিয়র অফিসারদের সঙ্গে মদ্যপানের সময় তিনি নাকি তাঁর ভাবাবেগ চেপে রাখতে পারেননি। ওই মদ্যপানের আসরেই ব্যাটালিয়ানের স্লোগান নির্বাচিত হয়েছে-‘সম্মান হারানোর আগে মৃত্যুও শ্রেয়’।

রোদ উঠবার পর গ্রেটকোট খুলে ফেলতে হলো, সৈনিকদের

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়বার অবস্থা, অথচ এখনও যাত্রা শুরু
আদেশ আসছে না। কে যেন একবার বলেছিল, যুদ্ধ হলো শতকরা
নিরানব্বুই ভাগ একঘেয়েমি, এক ভাগ চরম আতংক। থার্ড
ব্যাটালিয়ান নিরানব্বুই ভাগের যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

সময় গড়িয়ে চলল। দুপুরের দিকে তৃতীয় বারের মত
কর্নেলের কোয়ার্টারে মেসেঞ্জার পাঠাল মেজর রাকা। এবারই প্রথম
একটা উত্তর পেল সে—কাউন্ট নাকি সত্যি সত্যি বিছানা ত্যাগ
করেছেন, এবং প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার অবশ্যাপালনীয়
কাজটি প্রায় শেষ করে এনেছেন। একটু পরই তিনি থার্ড
ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে যোগ দেবেন।

অবশেষে উদিত সূর্যের মত কাউন্টের আগমন ঘটল—চেহারা
উত্তেজনা উদ্ভাসিত, বুক ফুলে আছে গর্বে। তার দু'পাশে দু'জন
ক্যাপটেন, সামনে একজন রাইফেলধারী সৈনিক। জুনিয়র
অফিসারদের আলিঙ্গন করল কাউন্ট ডিকানডিয়া, চটপট কয়েকটা
ছবি তুলে ফেলল সাতা। সিনিয়র নন কমিশনড অফিসারদের
আলিঙ্গন নয়, তাদের শুধু পিঠ চাপড়ে দিল কাউন্ট, আর সাধারণ
শিফটা সৈনিকদের দিকে ফিরে উপহার দিল উষ্ণ হাসি। সবশেষে
মেজরের দিকে ফিরে বলল, 'সুশৃংখল বীর যোদ্ধাদের দেখে আমার
গান গাইতে ইচ্ছে করছে।'

আঁতকে উঠল মেজর রাকা। কাউন্টের প্রায়ই গান গাইতে
ইচ্ছে করে। ইটালির বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা তাকে গান শিখিয়েছেন,
পঁচিশ কি ত্রিশ বছর আগে, শিশু কাউন্টের তখন ভারি ইচ্ছে হত
অপেরায় যোগ দেবে। চর্চা না থাকায় তার গলা আর ভেড়ার ডাকে
এখন আর তেমন কোন পার্থক্য নেই।

সম্মান হারানোর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়, এই শিরোনামে একটা
গানও লিখে ফেলেছে কাউন্ট। বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী সে,

রণক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতির বিশাল অঙ্গন, সবখানে
তার অনায়াস পদচারণা। সে গাইল, তার সঙ্গে অফিসারসহ ছশো
নব্বুইজন শিফটাও গাইল।

গান থামবার সঙ্গে সঙ্গে খাপে ভরা ছোরার হাতলে হাত রেখে
চৌচিয়ে উঠল কাউন্ট, 'যথেষ্ট হয়েছে! যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত।
ম্যাপটা কোথায়?' ম্যাপ কেস নিয়ে ছুটে এল একজন অধস্তন।

'কর্নেল, স্যার,' লুইগি রাকা কৌশলে বাধা দিল, 'রাস্তা
আমাদের সবারই চেনা, সাইনপোস্টও আছে...'। সৈনিকরা
বেশিরভাগ হয় ইরিত্রিয়া নয়তো ইথিওপিয়ায় জন্মেছে, চোখ বুজে
চিনে নিতে পারবে পথ।

মেজরকে পান্তা না দিয়ে রোলস-রয়েসের বনেটের উপর সদ্য
ভাঁজ খোলা ম্যাপের দিকে ঝুঁকে পড়ল কাউন্ট। কয়েক সেকেন্ড
পর মুখ তুলল সে, ক্যাপটেন দুজনের দিকে তাকাল। 'তোমরা
দুজন আমার দু'দিকে দাঁড়াও। মেজর রাকা, তুমি এখানে।
চেহারা এমন ভাব ফোটাও যাতে দেখে মনে হয় তুমি একটা
নির্দয় গোঁয়ার। কিন্তু খবরদার, ক্যামেরার দিকে তাকাবে না!
সাতা!'

বানানটো সাতা ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। ফটো তুলবার
পর রওনা হলো ট্রাক বহর। কলামের সামনে রোলস-রয়েস,
দু'পাশে মটরসাইকেল আউটরাইডার।

কিন্তু দেড় মাইল এগোবার পর কাউন্টের নির্দেশে দাঁড়িয়ে
পড়ল রোলস-রয়েস। কারণ আর কিছুই নয়, রাস্তার ধারে
ক্যাসিনোর উপর চোখ পড়েছে তার। রোলস-রয়েসের সঙ্গে
দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনের ট্রাক বহরও।

সবাই জানে কয়েকজন ইটালিয়ান চালায় ক্যাসিনোটা, কিন্তু

খুব কম লোকই জানে ওটার মালিক আসলে আবদেল কাদের ফাদ। ছ'মাসের চুক্তিতে ইটালি থেকে যুবতী মেয়েদের নিয়ে আসা হয়, অতি ব্যবহারে বিধ্বস্ত মেয়েগুলোর মধ্যে থেকে খুব কম সংখ্যকই চুক্তি নবায়নে রাজি হয়। তবে এই ছ'মাসে যৌতুক দেওয়ার মত যথেষ্ট টাকা জমা হয় তাদের হাতে, দেশে ফিরে স্বামী খুঁজবার জন্য অস্থির হয়ে থাকে।

ক্যাসিনোয় ঢুকে বার-এ আসন গ্রহণ করল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকেরেক। হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এল ম্যানেজার। বারকয়েক গোঁফ মুচড়ে কাউন্ট তাকে বলল, 'তুমি জানো আমি কি চাই।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিজেদের কামরা থেকে বেরিয়ে এল মেয়েগুলো। খানিক পর দেখা গেল তাদের মাঝখানে অদৃশ্য হয়েছে ডিকানডিয়া, নারীদেহের কোমল স্তূপে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে সে।

এক ঘণ্টা পর ক্যাসিনো থেকে কাউন্টের একটা মেসেজ পেল মেজর লুইগি রাকা। আঁকাবাঁকা হরফে কাউন্ট লিখেছে, 'এই মুহূর্তে আমি ভয়ানক ব্যস্ত। কাল ভোরে আবার আমরা অগ্রসর হব।'

পরদিন সকাল দশটায় আবার থার্ড ব্যাটালিয়ান যাত্রা শুরু করল। কাউন্ট স্বকণ্ঠে কোন নির্দেশ দিতে পারছে না, কারণ কাল রাতে দীর্ঘ সময় গান গাওয়ায় তার গলা ভেঙে গেছে, কথা বলতে চেষ্টা করলে হাঁদুরের ডাক ছাড়া কিছুই বেরচ্ছে না। আকার-ইঙ্গিতে কাজ সারছে সে। এই মুহূর্তে তাকে খানিকটা অপ্রকৃতিস্থও বলা যায়, কারণ গান গাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাতভর মদ্যপান করেছে সে। তা ছাড়া, শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বলও হয়ে পড়েছে-দুটো মেয়েকে দু'পাশে নিয়ে শুলে যা হয়, তাও আবার ইটালিয়ান মেয়ে!

খানিকটা মাতাল হলেও, অতীত বিস্মৃত হয়নি কাউন্ট। শিফটাদের নেতা হলে কী হবে, সম্মুখসমরে কখনও অংশগ্রহণ করেনি সে। ডাকাতি করতে গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে লড়েছে তার বাহিনী, সে পিছনে থেকে ওদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছে। তবে যারা লড়ে তাদের অবস্থা কী হতে পারে সে-সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা আছে। আদিবাসী গালা বা রাসটাফারিয়ানরা শিফটাদের একবার বন্দী করতে পারলে হয়, প্রচুর সময় নিয়ে তারা ওদের টেসটিকুল কাটে, তারপর ছেড়ে দেয়।

দ্বিতীয়বার রওনা হবার দু'ঘণ্টা পর নিজের কণ্ঠস্বর খানিকটা ফিরে পেল কাউন্ট ডিকানডিয়া। 'স্টপ!' চিৎকার করল সে। 'এই মুহূর্তে থামো!'

ট্রাক বহর দাঁড়িয়ে পড়ল। জুনিয়র অফিসাররা হৈ-চৈ শুরু করল। তাদেরকে পিছনে ফেলে রোলস-রয়েসের দিকে ছুটে এল মেজর লুইগি রাকা। কাউন্টের তরফ থেকে তাকে জানানো হলো, যুদ্ধযাত্রার কৌশলে টেকনিক্যাল পরিবর্তন আনবার জন্য নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কাউন্ট এখন আর থার্ড ব্যাটালিয়ানের সামনে থাকবে না, ট্রাক বহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করবে সে, রোলস-রয়েসের দু'পাশে থাকবে ছ'জন মটরসাইকেল আউটরাইডার।

নতুন আয়োজন সম্পূর্ণ হতে এক ঘণ্টার মত লাগল। আবার অগ্রসর হলো থার্ড ব্যাটালিয়ান। রোলস-রয়েসের নরম আসনে গা এলিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কাউন্ট ডিকানডিয়া। তার তলপেটের কাছে এখন আর কোন রকম অস্বস্তিকর অনুভূতি নেই।

পরদিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে ডিকানডিয়া বাহিনী ধু-ধু মরণভূমির

কিনারা থেকে আবার যাত্রা শুরু করল। সামনের মাটি পাথরের মত শক্ত আর অসমান, এখানে সেখানে কিছু বিবর্ণ শুকনো ঘাস ছাড়া গাছপালার কোন চিহ্ন নেই। মরুভূমির দূর প্রান্ত ক্রমশ উঁচু হয়ে দিগন্তরেখার সঙ্গে মিশেছে, ফলে কাউন্টের মনে হলো তারা যেন বিশাল একটা পিরিচের মাঝখানে রয়েছে। লালচে পাথুরে মাটিতে মস্ত কোন থাবার আঁচড় যেন পথটা, এতই গভীর যে মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা অংশের সঙ্গে রোলস-রয়েসের চেসিস খানিক পরপরই ঘষা খাচ্ছে। কনভয়টা পিছনে ফেলে আসছে লালচে ধুলোর বিশাল মেঘ।

ধু-ধু মরুপ্রান্তরে বিপদের কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে সাহস ফিরে এল কাউন্টের মনে। ‘কলামের মাথায় চলো,’ ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সে। কলামের মাঝখান থেকে বেরিয়ে ট্রাক বহরকে পাশ কাটাতে শুরু করল দ্রুতগতি রোলস-রয়েস। খানিক পর সামনে দেখা গেল মেজর রাকাকে, রোলস-রয়েস তাকে তীরবেগে পাশ কাটাল, স্যাঁলুটের জবাবে মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট। তার জানার কথা নয়, মনে মনে তাকে গাল দিচ্ছে মেজর, ‘বানচোত!’

আবার কাউন্টের কাছে পৌঁছুতে দু’ঘণ্টা লাগল মেজরের। সে দেখল, রোলস-রয়েসের বনেটে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে কাউন্ট, চোখে বিনকিউলার, আক্ষরিক অর্থেই বনেটের উপর ধেই ধেই করে নাচছে সে, বানানটো সাতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে, ‘রাইফেল, আমার রাইফেল!’

লেদার কেস থেকে ম্যানকিলার নাইন পয়েন্ট থ্রি এম এম স্পোর্টিং রাইফেলটা বের করল সাতা, ওটার বাঁট ও স্টক সীজন করা ওয়ালনাটের তৈরি, আর নীল ইস্পাতের গায়ে চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে রচিত হয়েছে শিকারের কিছু খুদে দৃশ্য-ঘোড়সওয়ার

শিকারী, শিকারী কুকুর ধাওয়া করছে হিংস্র সিংহকে। চোখ থেকে বিনকিউলার না নামিয়েই মেজর রাকাকে নির্দেশ দিল কাউন্ট। ‘রেডিওর এরিয়াল লম্বা করো, জেনারেল ফাদকে মেসেজ পাঠাও। সারডি গিরিসংকটে পৌঁছানোর সব ক’টা পথ অচিরেই আমরা দখল করে নেব।’ মেজরকে আরও একটা কাজ করতে হবে। ক্যাসিনো থেকে কাঠের মিহি গুঁড়োয় মুড়ে কয়েক মণ বরফ নিয়ে আসা হয়েছে, তা থেকে খানিকটা বের করে এক বালতি পানি ঠাণ্ডা করা হোক। কাউন্টের ধারণা, পরবর্তী পদক্ষেপ যেটা সে নিতে যাচ্ছে, তাতে বেশ খানিকটা ঘাম ঝরবে তার, ফলে পিপাসা মেটানোর জন্য ঠাণ্ডা পানির দরকার হবে।

মেটে রঙের একদল মরু হরিণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কাউন্ট। এক মাইল দূরে ওগুলো, তাপ-তরঙ্গের ভিতর ঝাপসা দেখাচ্ছে, শান্ত ভঙ্গিতে ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে ঝাঁকটা। দূর আকাশের গায়ে খাড়া শিংগুলোই শুধু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কাউন্ট।

কাউন্টকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রোলস-রয়েস, ইতিমধ্যে তার হাতে রাইফেলটা ধরিয়ে দিয়েছে সাতা। দূরত্ব কমে সিকি মাইলটাক দাঁড়াল, তবে ধাওয়া করা হচ্ছে বুঝতে পেরে হরিণের দলটাও ছুটেতে শুরু করেছে। ড্রাইভারকে ফাঁসিতে লটকানো হবে, বারবার ঘোষণা করল কাউন্ট, মৃত্যুদণ্ড পেয়েও আরও জোরে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করল লোকটা। কাউন্ট ভীষণ উত্তেজিত, আফ্রিকায় আসবার পর এই প্রথম সে বড় একটা কিছু শিকার করবার সুযোগ পেয়েছে। মোট আটটা হরিণ, ঝাঁকের সামনে রয়েছে দুটো মর্দা, মাদী আর বাচ্চারা রয়েছে পিছনে। দূরত্ব ক্রমশ কমে এল। সামনের একটা খাড়ি কে জানে কেন পিছিয়ে পড়েছে দল থেকে,

সেটাকেই ধাওয়া করবার জন্য বেছে নিল কাউন্ট। হরিণটার বিশ গজ পাশে চলে এল গাড়ি। ওদের দিকে ওটা একবারও তাকাল না, তবে প্রাণপণে ছুটছে।

‘হল্ট!’ গর্জে উঠল কাউন্ট, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল ড্রাইভার ডিনো। ধুলোর পাহাড় তুলল রোলস-রয়েস, ঢাকা পড়ে গেল গাড়ি। ধুলো সরে যাবার পর দেখা গেল ধাড়ি হরিণটা প্রায় তিনশো গজ দূরে সরে গেছে, এখনও দলের অনেক পিছনে ওটা, তবে আগের মতই ছুটছে। শক্ত মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল কাউন্ট ডিকানডিয়া, রাইফেলটা হাত থেকে ছিটকে পড়ছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, রাইফেলের খোঁজে চরকির মত ঘুরল বার কয়েক। সেটা তুলে যখন সে গুলি করবার জন্য তৈরি হলো, হরিণটা তখন চারশো গজ দূরে-রেঞ্জের প্রায় বাইরেই বলা যায়। তবু গর্বিত ভঙ্গিতে গুলি করল কাউন্ট, সঙ্গে সঙ্গে রিকয়েলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল সে।

ছিটকে পড়ল হরিণটাও। পড়েই লাফ দিল ওটা, শুকনো একটা নালা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল উঁচু পাড়ের ওদিকে। পেলভিসের কয়েক ইঞ্চি সামনের স্পাইনাল কলাম গুঁড়ো হয়ে গেছে ওটার, শরীরের পিছনের দিকটায় কোন সাড়া নেই, ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে।

নালা পেরিয়ে উঁচু পাড়ের কিনারা দিয়ে উঁকি দিতেই হরিণটাকে পড়ে থাকতে দেখল কাউন্ট। তাড়াতাড়ি সেটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে, দাঁতে দাঁত চেপে তাড়া লাগাল সাতাকে। ডিকানডিয়ার হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এল, নাটকীয় ভঙ্গিতে শিংসহ মাথার দিকে সেটা তাক করে পোজ নিল সে। ছবি তুলবার জন্য মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল সাতা।

ঠিক এই সংকটময় মুহূর্তে নড়ে উঠল হরিণটা, বসবার ভঙ্গিতে

উঁচু হলো, ঘোলাটে দৃষ্টি তুলে তাকাল কাউন্টের দিকে। স্থানীয়ভাবে ওগুলোকে বেইসা বলা হয়, আফ্রিকার হিংস্রতম প্রজাতির অন্যতম, লম্বা শিং দিয়ে এমনকী প্রাপ্তবয়স্ক সিংহকেও বধ করতে পারে। এই ধাড়িটার ওজন চারশো পঞ্চাশ পাউন্ড, কাঁধ পর্যন্ত চার ফুট লম্বা, তার উপর আরও তিন ফুট লম্বা তার শিং।

আহত হরিণটা নাক টানল, পোজ দেওয়ার কথা বেমালাম ভুলে গিয়ে ডাইভ দিল কাউন্ট, মাটিতে পড়ে ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে ছুটল গাড়ির দিকে। তাকে ধাওয়া করল হরিণটা।

দৌড় প্রতিযোগিতায় হুঁইঞ্চি এগিয়ে থাকল কাউন্ট, রোলস-রয়েসের ব্যাকসিটে উঠে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল সে, দু’হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল, চোখ বন্ধ। গাড়ির গায়ে গুঁতো মারল হরিণ, ভিতর দিকে তুবড়ে গেল একটা দরজা, শিঙের খোঁচায় গা থেকে রঙ উঠে গেল।

শুধু শরীরের চাপ দিয়ে ধরণীর ভিতর সঁধিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বানানটো সাতা, হুবহু সাইরেনের মত ওঁয়া-ওঁয়া আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার, কিন্তু পরবর্তী ধাক্কায় উইন্ডশীল্ডে লেগে তার মাথা কেটে গেল। রক্তাক্ত ড্রাইভার কাঁদো কাঁদো সুরে অনুনয় করল, ‘ওটাকে মারুন, মাই কাউন্ট! গুলি করুন, প্লিজ! দানবটাকে হত্যা করুন!’

কাউন্টের উর্ধ্বাঙ্গ আকাশমুখী হয়ে রয়েছে। গাড়ির পিছনের সিটের উপর তার শুধু ওইটুকু অংশই দেখা যাচ্ছে। তবে তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সবাই, ‘রাইফেল, আমার রাইফেল!’

বুলেটটা মেরদণ্ড গুঁড়ো করে দিয়ে ফুসফুসটাকেও ফুটো করেছে, ছোটোছুটি করায় হঠাৎ ওটার একটা বড় শিরা ছিঁড়ে গেল। যন্ত্রণায় কাতর একটা শব্দ করে কাত হয়ে পড়ে গেল ওটা, নাকের

ফুটো দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরল।

নির্জন মরুপ্রান্তরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। অনেকক্ষণ পর পিছনের দরজার পাদানির কাছে কাউন্টের ফ্যাকাসে মুখ দেখা গেল, চোখে আতংক নিয়ে মৃত হরিণটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা নড়ছে না দেখে আশ্বস্ত হলো সে। সতর্কতার সঙ্গে রাইফেলটার খোঁজে এদিক ওদিক হাত বাড়াল। এতই কাঁপছে তার হাত, এত কাছে থেকেও ছাঁটার মধ্যে দুটো গুলি লাগাতে পারল না। তার মাথায় এই চিন্তাটা একবারও ঢুকল না যে মরাটাকে মারছে সে। লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট দুটো একটুর জন্য মাটিতে পড়ে থাকা সাতার গায়ে লাগল না।

রাইফেল ফেলে দিয়ে হন্যে হয়ে এদিক ওদিক কী যেন খুঁজল কাউন্ট। খানিকটা সামনে ছোট একটা ঝোপ দেখতে পেয়ে সেদিকে হাঁটা ধরল সে। হাঁটছে দু'পা ফাঁক করে, ভঙ্গিটা ভারি আড়ষ্ট। অবশ্য তার একটা কারণ আছে। মরে গেলেও কথাটা কারও কাছে স্বীকার করবে না কাউন্ট ডিকানডিয়া। মনোগ্রাম করা তার সিদ্ধ আভারওয়্যার নোংরা হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে ওটাকে বিসর্জন না দিলেই নয়।

সাত

পাপাগোয়াকে সামলানোর দায়িত্ব মুসলিম নাবিকদের উপর ছেড়ে দিয়ে ক্যাপটেন কোস্টাস অ্যারোনিকাস পরপর পাঁচদিন তার কেবিন থেকে প্রায় বেরলোই না, মেজর মাইকেল সেভারসের সঙ্গে রামি খেলায় মশগুল হয়ে থাকল। 'জীবনে আর আছে কী,' প্রস্তাবটা মাইকেলই তাকে দেয়, 'এসো, সমুদ্রভ্রমণের একঘেয়েমি

দূর করার জন্যে খানিকটা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা যাক।' এক পাটি তাস সব সময় তার পকেটেই থাকে।

পাঁচ দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় অ্যারোনিকাসের মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। ভাল কার্ড বারবার শুধু মেজরই পাবে কেন? কিন্তু সর্বনাশ যা ঘটবার তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, আর কিছু করার নেই। এমনও নয় যে চৌর্যকর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে, কীসের উপর ভিত্তি করে প্রতিবাদ জানাবে সে?

ঠিক হয়েছিল কার্গো ও আরোহীদের ভাড়া বাবদ ক্যাপটেনকে এক হাজার তিনশো স্টার্লিং দিতে হবে। পুরোপুরি এক হাজার তিনশো স্টার্লিং জিতবার পর ক্যাপটেনের মুখের উপর গাল ভরা বিজয়ীর হাসি ছুঁড়ে দিয়ে মাইকেল বলল, 'তুমি কী বলো, কোস্ট, ওল্ড স্পোর্ট, সাময়িক বিরতি দিলে হত না? ডেকে গিয়ে একটু হাত-পা নাড়া যেত?'

খেলতে বসবার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ায় খোলা ডেকে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে আছে মাইকেল, ওখানে অ্যানি উইসপার আর মাসুদ রানার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার মাত্রা তার মানসিক প্রশান্তির জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য যতবারই ক্যাপটেনের কেবিন থেকে সে খোলা ডেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, প্রতিবার ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছে। শুধু একসঙ্গে দেখিনি, হো-হো হি-হি করে হাসতেও শুনেছে-আরও খারাপ লক্ষণ হলো, রানার চেয়ে বেশি হেসেছে অ্যানি, শরীর কাঁপানো স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। রানাকে বেশিরভাগ সময় কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছে মাইকেল। হয়তো আর্মারড কারগুলো স্টার্ট দিয়ে পরীক্ষা করছে, না চাইতেই সাহায্যের জন্য ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে অ্যানি, যন্ত্রপাতি এগিয়ে

দিয়েছে। আবার কখনও নেই কাজ তো খই ভাজ, মাঝখানে আব্বাসকে নিয়ে ডেকের উপর বসেছে দু'জন, গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে অ্যামহারিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা চলেছে। সন্দেহের কাঁটা খচ খচ করে বিঁধছে মাইকেলের মনে, না জানি আরও কত কী করছে ওরা!

তবে কোন্ কাজটা কতটুকু জরুরী মাইকেল জানে, জানে কোনটা আগে সারতে হবে। প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল কোস্টাস অ্যারোনিকাসের কাছ থেকে ভাড়ার টাকাগুলো উদ্ধার করা। সেটাতে সফল হওয়ায় এখন সে অ্যানি উইসপারের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে। রানার কাছ থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনা তার জন্য কোন সমস্যাই নয়। অবশ্য মেয়েটা খুব কঠিন পাত্রী, নিজের ফাঁদে ঠিকমত ফেলতে হলে আদাজল খেয়ে লাগতে হবে। কাজটায় খাটনি আছে, তবে পুরস্কারের কথাটাও ভাবো একবার—গাছ ভর্তি ডাঁসা পেয়ারা।

‘তোমার সাথে খেলে সত্যি ভারি মজা পেলাম, কোস্টা,’ চেয়ার ছেড়ে উঠল মাইকেল, পুরোপুরি সিধে হতে সময় নিচ্ছে সে—নোটগুলো তাড়াতাড়ি দু’হাত দিয়ে দু’পকেটে ভরছে।

ক্যাপটেনও তার ঢোলা জোব্বার নীচে হাত গলিয়ে দিল। হঠাৎ বেরিয়ে এল অলংকৃত হাতলসহ লম্বা একটা ছুরি, মাথার দিকটা বিপজ্জনক আকৃতি নিয়ে বাঁকানো। হাতের তালুতে ছুরিটা নিয়ে একচোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফেলল মাইকেলের দিকে। ‘তাস বাঁটো,’ হিসহিস করে উঠল সে।

নির্ভয়ে হাসল মাইকেল, তবে ধপ্ করে আবার বসে পড়ল চেয়ারটায়। তাস তুলে নিয়ে সশব্দে ফাঁটতে শুরু করল সে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ছুরিটা, যদিও মাইকেলের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে অ্যারোনিকাস।

‘সত্যি কথা বলতে কি, আরও দু’চার হাত খেলার ইচ্ছে রয়েছে আমার,’ বিড়বিড় করল মাইকেল। ‘তুমি বোধহয় সামান্য উত্তেজিত হয়ে আছ, কী?’

কোর্স বদলে গালফ অভ এডেনে ঢুকছে পাপাগোয়া। আরও পাঁচশো মাইল যেতে হবে ওদেরকে।

চেহারায় সন্তুষ্ট ভাব নিয়ে ভিতরে ঢুকল হিন্দু একজন মেট, ক্যাপটেনের কানে ফিসফিস করল সে।

‘ওর সমস্যাটা কী?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

‘ওর ভয়, আমরা না নৌ-টহলের সামনে পড়ে যাই।’

‘সে ভয়ে আমিও তো কাঁপছি,’ বলল মাইকেল। ‘আমাদের বোধহয় ডেকে যাওয়া উচিত।’

‘বাঁটো!’ চাপা গলায় গর্জে উঠল অ্যারোনিকাস।

হঠাৎ করে এঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেল, থরথর করে কাঁপতে শুরু করল জাহাজ। ফুলস্পীডে ছুটছে ওরা। সবগুলো পালও তোলা হয়েছে, গালফ অভ এডেন ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি লোহিত সাগরে ঢুকে পড়তে চায় মেট। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, পশ্চিম আকাশে মেঘের ভেলাগুলো টকটকে লাল। বুদ্ধি করে গালফের ঠিক মাঝখান দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছে মেট, ডান দিক থেকে আরব জাহান ওদেরকে দেখতে পাবে না, বাম দিক থেকে আফ্রিকাও দেখতে পাবে না। আশাতীত অনুকূল বাতাস পাওয়ায় পাপাগোয়ার গতি এখন পঁচিশ নট। তার সেরা একজন লোককে টেলিস্কোপ ধরিয়ে দিয়ে মাস্তুলের মাথায় তুলে দিল মেট। মেয়ে পাচারের অভিজ্ঞতা আছে তার, জানে নৌ-টহলের হাতে ধরা পড়লে কীভাবে ছাড়া পেতে হয় বা ছাড়া না পেলে কী শাস্তি ভোগ করতে

হয়। কিন্তু অস্ত্র পাচার সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। ধরা পড়লে আইনে কী শাস্তির কথা লেখা আছে তাও তার অজানা। কাজেই সাবধানের মার নেই ভেবে মাস্তুলের মাথায় একজনকে পাহারায় বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

প্রায় নাক বরাবর সামনে সূর্য, ডুবতে যন্ত্রণাকর দীর্ঘ সময় নিচ্ছে। বাতাসের গতিবেগও বাড়তির দিকে, ঢেউয়ের মাথা থেকে পাপাগোয়াকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে নীচের গভীর গহ্বরে।

হামাগুড়ি দিয়ে নিতম্বিনীর এঞ্জিন হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এল রানা, অ্যানি উইসপারের চোখে চোখ রেখে হাসল। আর্মারড কারের মাথায় বসে আছে সে, ঝুলে থাকা পা দুটো দোল খাচ্ছে অলসভঙ্গিতে, টানা বাতাসে পতাকার মত উড়ছে সোনালি চুল। গত ক'দিনের রোদে তার গায়ের রঙ আরও গাঢ় হয়েছে, চেহারার স্নান ভাবটুকুও এখন আর নেই। কিশোরী স্কুলছাত্রীর মত লাগছে তাকে, হাসিখুশি আর ছটফটে, দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ এখনও যাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

‘সাধ্যমত করলাম,’ বলল রানা, অ্যামোনিয়ায় ভেজানো বুরুশ দিয়ে হাত থেকে গ্রিজ পরিষ্কার করল। ‘ভবিষ্যতের কথা জানি না, এখন তো বেশ ভালই চলছে এঞ্জিনটা।’ অ্যানির হাঁটু রানার চোখের সঙ্গে একই সরলরেখায় রয়েছে, দুধ-আলতা রঙের উরুর অনেকটা উপরে উঠে গেছে তার স্কার্ট। সেদিকে চোখ পড়তে, দম বন্ধ হয়ে এল রানার। ওর দৃষ্টি কোন্ দিকে টের পেয়ে গেল অ্যানি, ঝট করে দুই হাঁটু এক করল সে, যদিও ক্ষীণ একটু হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। হালকা লাফ দিয়ে ডেকে নামল সে, কাত হতে শুরু করা ডেকে স্থিরভাবে দাঁড়ানোর জন্য রানার হাতের শক্ত পেশীতে আঙুল পঁচাল।

সুদর্শন একজন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি দারণ উপভোগ করছে

অ্যানি উইসপার, একটানা পাঁচ দিন মাইকেল সেভারসের অনুপস্থিতিতে একঘেয়েমির শিকার হতে হয়নি তাকে। ধীর ভঙ্গিতে ঘাড় একটু বাঁকা করে রানার দিকে ফিরে হাসল সে। রানা লম্বা, তা সত্ত্বেও মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল কান দুটো প্রায় ঢেকে রাখায় চেহারায় বালকসুলভ একটা ভাব এনে দিয়েছে। সুগঠিত পুরুষালি চোয়াল, চোখের কোণে সূক্ষ্ম কুঞ্চনের সমষ্টি অবশ্য সে-ভাবটুকু স্নান করে দেয়।

একেবারে হঠাৎ করেই বুঝতে পারল অ্যানি, চুমো খাওয়ার জন্য ওর দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছে রানা। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করল সে। তার জানা আছে, ক্ষীণতম উৎসাহ পেলে মাইকেল সেভারসের সঙ্গে ঘোরতর সংঘর্ষের পথে ধাবিত হবে রানা, ফলে গোটা অভিযান এমনকী ভণ্ডুলও হয়ে যেতে পারে, প্রাণ হারাতে হতে পারে দু'জনের একজনকে, কিংবা দু'জনকেই, সেই সঙ্গে এত ঝুঁকি নিয়ে এদের সঙ্গে অভিযানে তার অংশগ্রহণের আসল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে রানার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য তার চোখে ধরা পড়ল। সুদর্শন জানা ছিল, কিন্তু জানা ছিল না কাছ থেকে ওর চোখ জোড়া এমন মায়াজাল বিস্তার করতে পারে। ঠোঁটের এমন নিখুঁত আকৃতি আর কোন পুরুষের মধ্যে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না সে। একদিন না কামানোতেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে সারা মুখে, দাড়ির গোড়াগুলো তামাটে চামড়ার গায়ে সবুজ হয়ে আছে। তার কোমল মসৃণ মুখে ওই দাড়িগুলোর প্রথম স্পর্শ কর্কশ আর বৈদ্যুতিক ধাক্কার মত লাগবে, সারা শরীরে শিরশিরে একটা অনুভূতি নিয়ে উপলব্ধি করল সে। আচমকা তার ইচ্ছে হলো, ওই স্পর্শটুকু তার চাই। সামান্য চিবুক তুলল সে, জানে তার চোখে

জ্বলতে থাকা বাসনার অস্থির আলোর ভিতর ইচ্ছেটা পড়তে পারবে রানা।

মাস্তুলের মাথা থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল, পরমুহূর্তে পাপাগোয়ার চারদিকে ছোটোছুটি পড়ে গেল। মাস্তুলের মাথায় প্রহরী লোকটা মুসলমান, প্রথমে সে আল্লাহকে ডাকল, তারপর আরবী ভাষায় হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করল। কালো খুলির নীচে তার চোখ দুটো অক্ষিকোটরের ভিতর ঘুরছে, এত বড় হাঁ করে আছে যে নীচে থেকেও তার আলাজিভ পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। ডেক থেকে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল হিন্দু মেট।

‘কী ব্যাপার, রানা? কী হয়েছে?’ জানতে চাইল অ্যানি, এখনও তার একটা হাত রানার বাহুতে।

‘বিপদ।’ রানা গম্ভীর। পূপ কেবিনের দরজা দড়াম করে খুলবার শব্দে দু’জনেই ওরা ঘাড় ফেরাল সেদিকে। একটা মাত্র চোখ ঘন ঘন পিটিপিট করছে ক্যাপটেনের, ডান হাতে এখনও শক্ত করে ধরে আছে কার্ডগুলো, ছিটকে বেরিয়ে এল খোলা ডেকে।

‘আর একটা মাত্র কার্ড পেলে অল থ্রি মারতাম,’ তিক্ত কণ্ঠে হতাশা প্রকাশ করল অ্যারোনিকাস, বাতাসে ছুঁড়ে দিল কার্ডগুলো। হিন্দু মেটের বুকের কাছে শার্টটা খপ করে খামচে ধরে ঝাঁকি দিল সে, শুদ্ধ কিন্তু এখনও হাঁ করা লোকটার মুখের সামনে দুর্বোধ্য গ্রীক ভাষায় চিৎকার জুড়ে দিল।

হিন্দু মেট আঙুল তুলে মাস্তুলের মাথাটা দেখিয়ে দিল ক্যাপটেনকে। তাকে ছেড়ে মুসলমান মেটের দিকে মুখ তুলল অ্যারোনিকাস, আরবীতে চৈচামেচি শুরু করল। দ্রুত কথা বলল ওরা, মন দিয়ে শুনবার চেষ্টা করল রানা।

‘পুরনো একটা ডেস্ট্রয়ার! ওমানের পতাকা চিনতে পেরেছে

মেট,’ বিড়বিড় করে বলল ও।

‘তুমি আরবী বোঝো?’ জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

মৃদু একটু হাসল রানা, উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। মন দিয়ে শুনছে ও।

খানিক পর অ্যানির দিকে ফিরল রানা। ‘ডেস্ট্রয়ার থেকে ওরা দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে। কোর্স বদলে বাধা দিতে আসছে।’ চট করে দিগন্তরেখার কাছাকাছি সূর্যের দিকে তাকাল ও, চিস্তার রেখা ফুটে উঠল কপালে।

‘তোমরা দু’জন খুব মজা লুঠছ, তাই না?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল সেভারস। হাসছে বটে, কিন্তু রানার বাহুতে অ্যানির হাত লেগে রয়েছে দেখে দৃষ্টিতে ঠাণ্ডা একটা ভাব ফুটে উঠল। সাপের মত নিঃশব্দে পূপ ডেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

যেন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে অ্যানি, সাঁাৎ করে হাতটা নামিয়ে নিল সে, বোকামি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে পরমুহূর্তে তিরস্কার করল নিজেকে। মাইকেল সেভারসের প্রতি কোনভাবেই ঋণী নয় সে, ওর সঙ্গে তার কোন বিশেষ সম্পর্কও নেই। রানার দিকে আবার ফিরবার আগে মাইকেলের ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে-ও ফিরিয়ে দিল। ফিরে দেখল, চলে গেছে রানা।

‘কী ব্যাপার, কোস্টা?’ পূপ ডেক থেকে হাঁক ছাড়ল মাইকেল।

‘তোমাদের কার্গো আমার সর্বনাশ ডেকে আনছে!’ খেঁকিয়ে উঠল ক্যাপটেন, উত্তর দিগন্ত লক্ষ্য করে ঘুসি তুলল সে। ‘ওমানের একটা ডেস্ট্রয়ার, অ্যারোহেড, এদিকেই ছুটে আসছে। এখন উপায়?’

‘উপায় একটা তোমাকেই খুঁজে পেতে হবে,’ নির্বিকারচিত্তে বলল মাইকেল। ‘নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার শর্তে টাকা

নিয়েছ তুমি। ডেস্ট্রয়ার? ঠিক জানো? এদিকে ওটা কী করছে?’

‘ডেস্ট্রয়ার, ঠিক জানি। মাস্কাতা আমলের অচল মাল, নিলামে কিনেছিল, মেরামত করে চালাচ্ছে। এদিকে টহল দেয়, কেন আমি তার কী জানি।’

মুচকি হেসে মাথা বাঁকাল মাইকেল। ‘জানো-জানো, ভাল করেই জানো। নারী-পাচারকারীদের ধরার জন্যে টহল দেয় ওরা, তাই না? ওই কাজের ওস্তাদ তুমি, জানবে না কেন! কোথায় ওটা?’

‘এখনও দিগন্তরেখার ওদিকে, শুধু মাস্টহেড দেখতে পাচ্ছে। একেবারে ধেয়ে আসছে, যে-কোন মুহূর্তে ডেক থেকেও দেখতে পাব আমরা।’ মাইকেলের দিকে পিছন ফিরল অ্যারোনিকাস, তীক্ষ্ণকণ্ঠে নির্দেশ দিল কয়েকটা, সঙ্গে সঙ্গে মেইন ডেকের দিকে ছুটল তার ত্রুরা, ঘিরে দাঁড়াল প্রথম আর্মারড কার অর্থাৎ চঞ্চলাকে।

‘মানে!’ মাইকেল বিস্মিত। ‘কী করতে চাও তুমি?’

‘অস্ত্রসহ ধরতে পারলে ওরা আমাকে বাঁশ দেবে,’ ব্যাখ্যা করল অ্যারোনিকাস। ‘নো আর্মস, নো ট্রাবল।’ সাদা রঙ করা গাড়িটাকে মোটা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, বাঁধনগুলো খুলতে শুরু করল ত্রুরা। ‘বিপদের সময় মেয়েগুলোকে নিয়েও এই করি আমরা, লোহার চেইন থাকায় ভারি পাথরের মত ডুবে যায় তারা।’

‘এক মিনিট, এক মিনিট! কার কার্গো ওগুলো যে ফেলে দিতে চাইছ পানিতে? এর জন্যে ভাড়া দেয়া হয়েছে তোমাকে!’

‘ভাড়ার টাকাটা এই মুহূর্তে কার কাছে, মেজর?’ তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করল অ্যারোনিকাস। ‘আমার পকেটে কিছুই নেই-তোমার পকেট কী বলে?’ নিজের লোকদের দিকে ফিরে তাড়া লাগাল সে।

ভারি ধাতব শব্দের সঙ্গে হঠাৎ খুলে গেল চঞ্চলার টারিট,

ভিতর থেকে খাড়া হলো রানার মাথা আর কাঁধ, বাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে, দু’হাতে একটা ভিকার্স মেশিনগান। টারিটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে নিজেকে স্থির করল ও, ভিকার্সটাকে বাঁ হাতের ভাঁজে নিল, অপর হাতে শক্ত করে ধরল পিস্তল গ্রিপ। অ্যামুনিশনের ভারি বেল্টটা কাঁধ থেকে বুলছে।

এক পশলা গুলি ছুঁড়ল রানা, বুলেটগুলো সাদা অগ্নিশিখার মত অ্যারোনিকাসের মাথার দশ ইঞ্চি উপর দিয়ে সরলরেখা তৈরি করে ছুটে গেল। ডাইভ দিয়ে ডেকের উপর পড়ল ক্যাপটেন, আতংকে গোঙাচ্ছে, তার ত্রুরা সম্ভ্রান্ত মুরগিছানার মত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কৃত্রিম গান্ধীর্যের সঙ্গে সবার উপর একবার চোখ বুলাল রানা, একচোখো ক্যাপটেনের দিকে স্থির হলো দৃষ্টি। ‘পরস্পরকে এবার বোধহয় চিনতে পারছি আমরা, কী বলো, ক্যাপটেন? গাড়িগুলোকে ভুলেও কেউ ছুঁতে যেয়ো না। বিপদ এড়াতে হলে একটাই পথ খোলা আছে তোমার সামনে-লেজ তুলে দৌড় দাও, ডেস্ট্রয়ার যেন ধরতে না পারে।’

‘কিস্তি কীভাবে!’ ডেকের উপর বসল অ্যারোনিকাস। ‘ডেস্ট্রয়ারের স্পীড ত্রিশ নট!’

‘কথা বলে সময় নষ্ট করো না, কাজে নেমে পড়ো,’ পরামর্শ দিল রানা। ‘আর বিশ মিনিট পর সম্ভা। কোর্স বদলাও, অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাও খেলাটা-লুকোচুরি তুমি ভালই খেলতে জানো।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল অ্যারোনিকাস, চোখটা পিট পিট করছে, হাত কচলাচ্ছে ঘন ঘন।

‘ধরতে পারলে ওরা তোমাকে কী যেন দেবে বলছিলে?’ হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল রানা। ‘হ্যাঁ, মনে পড়েছে-বাঁশ।’ ক্যাপটেনের

মাথার উপর দিয়ে আরও এক পশলা গুলি ছুঁড়ল ও। ‘কিন্তু ধরা পড়ে তুমি যদি আমাদের ডোবাও, আমি কি দেব বুঝতে পারছ?’

আবার ডেকে শুয়ে পড়েছে ক্যাপটেন, শুয়ে শুয়েই তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল সে, কোর্স বদল করবার নির্দেশ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল নাবিকরা। ডেস্ট্রয়ার আর পাপাগোয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। পাপাগোয়া কোর্স বদলানোর পর দুটো জলযান একই দিকে ছুটছে এখন।

হাতছানি দিয়ে মাইকেলকে কাছে ডাকল রানা, মেশিনগানটা ধরিয়ে দিল তার হাতে। ‘শয়তান গ্রীকটার ওপর নজর রাখছি আমি, তুমি বাকিগুলোকে কাভার দাও। অ্যানি আর আব্বাসকে বলো, ক্ল্যাম্প লাগিয়ে সব ক’টা গাড়ির হ্যাচ কাভার বন্ধ করতে হবে।’

‘এটা তুমি পেলে কোথায়?’ হাতের মেশিনগানটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মাইকেল। ‘সবগুলোই তো বাক্সের ভেতর ছিল বলে আমার ধারণা।’

‘বাক্স থেকে বেরিয়ে তোমার হাতেও চলে আসত একটা, তুমিও যদি আমার মত বীমার ভক্ত হতে।’

কেস থেকে দুটো চুরুট বেছে নিল মাইকেল, দুটোই ধরাল, একটা গুঁজে দিল রানার ঠোঁটে। ‘ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে,’ বলল সে। ‘তোমাকে পার্টনার হিসেবে নিয়েছিলাম বলে সত্যি নিজেকে আমার গুণী লোক বলে মনে হচ্ছে।’

ঠোঁটের কোণে চুরুট নিয়ে টান দিল রানা, নীল ধোঁয়া ছেড়ে নিঃশব্দে হাসল। মুখ তুলে মেইন মাস্টহেডের দিকে তাকাল ও। ‘আমার আরও কাজ আছে। নীচে থাকো তোমরা, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে। ডেস্ট্রয়ারটা যদি ধরেই ফেলে আমাদের, ওদের সাথে ক্যাপটেনকেই কথা বলতে দিয়ো, তবে আড়াল থেকে

মেশিনগানটা তাক করে রেখো তার মাথার দিকে-তাকে জানিয়ো। আর, হ্যাঁ, অ্যানির দিকে লক্ষ রেখো।’

‘তোমার শেষ কথাটা শ্রেফ শব্দের অপচয়,’ মুচকি হেসে বলল মাইকেল। ‘এমন একটা মুহূর্তের কথা বলতে পারো, যখন ওর উপর আমার নজর নেই?’

‘এতটা আবার বাড়াবাড়ি,’ মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করল রানা। ‘সবারই কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে, বিশেষ করে মেয়েদের-সেদিকেও যদি কেউ নজর দেয়, তাকে আমরা কী বলি?’

‘পীপিং টম,’ হাসিমুখে বলল মাইকেল। ‘কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে কি যে তুমিও ওর ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছ না?’

‘যদি রেখেও থাকি, সেটা আমার মুদ্রাদোষ নয়,’ বলল রানা। ‘ওর নিরাপত্তার জন্যে আমার দৃষ্টি পাহারাদার হিসেবে কাজ করে।’

‘বাহ, দু’জনের উপলব্ধি দেখছি একইরকম-আমার দৃষ্টির পাহারাও ওর নিরাপত্তার জন্যে দরকার। অ্যানি আমার নয়, কিন্তু অ্যানি তোমারও নয়, কী? তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো এসো টস করি...।’

‘যারা মেয়ে বেচাকেনা করে, তুমি আমাকে তাদের পর্যায়ে নামতে বলো? তারচেয়ে সিদ্ধান্তটা ওকেই নিতে দাও না কেন?’

‘ইতিমধ্যে ওর মন জয় করার জন্যে যার যেমন যোগ্যতা আর ক্ষমতা, চেষ্টা চালিয়ে যাব আমরা, কী?’

‘চেষ্টা বলতে তুমি যা বোঝো আমি হয়তো তা বুঝি না। তুমি চেষ্টা করো, তাতে আমার কী। আমি কী করব, সেটা আমার ব্যাপার।’

‘ভয় পাচ্ছ, ওল্ড চ্যাপ? প্রতিযোগিতায় নামতে ডরাও?’ হাসছে মাইকেল।

‘হ্যাঁ। কারণ জানি, আমি হেরে গেলে কার হাতে পড়বে বেচারি।’ মাইকেলের দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল রানা।

‘ভাল হয়ে যাব,’ বলল মাইকেল। ‘অ্যানিকে পেলে আমি ভাল হয়ে যাব।’

ঝট করে ঘুরল রানা। ‘কী বললে?’

‘বিলিভ মি.,’ মাইকেল গম্ভীর।

‘অনেস্ট?’

‘অনেস্ট।’ কী ভেবে কে জানে হাসি গোপন করছে মাইকেল।

‘তোমার জন্যে এটুকু অন্তত করতে পারি আমি,’ বলল রানা।

‘তোমাদের দু’জনের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিলাম নিজেকে। চেষ্টা করে দেখো।’

‘উই-উই!’ মাথা নাড়ল মাইকেল। একজন অনিষ্টকারীর ধূর্ত হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠেই দ্রুত মিলিয়ে গেল। ‘কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারলে, সে জিনিস আমার ভাল লাগে না। তুমি যদি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াও, অ্যানি উইসপার আমাকে এক বিন্দু আনন্দ দিতে পারবে না। মনে হবে অ্যানিকে আমি জয় করিনি, তোমার দয়ার দান হিসেবে পেয়েছি।’

‘তারমানে ওকে তুমি ভালবাস না।’

‘বাসি, ওল্ড চ্যাপ। তবে আমার ভালবাসা একটু অন্যরকম, আর কারও সাথে মেলে না। শেষ কথাটা বলি শোনো-শেষ পর্যন্ত অ্যানিকে আমিই জয় করব। চ্যালেঞ্জটা দিয়ে রাখলাম, গ্রহণ করা না করা তোমার ব্যাপার। চেষ্টা করে দেখতে পারো আমার কাছ থেকে ওকে তুমি ছিনিয়ে নিতে পারো কিনা।’

মুদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা, কী বোঝাতে চাইল ও-ই জানে, ঘুরে

দাঁড়িয়ে চলে গেল নিজের কাজে। ঠোঁটের কোণে চুরট নিয়ে ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মাইকেল সেভারস, চোখে কৌতুক ভরা দৃষ্টি।

মেইন মাস্টের ডগার কাছাকাছি ক্রসট্রি-তে রয়েছে রানা, পেটের ভিতর শিরশিরে অনুভূতি নিয়ে জাহাজ আর মাস্তুলের সঙ্গে দোল খাচ্ছে। চোখে টেলিস্কোপ, গাড় রঙের কাঠামোটাকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখছে ও। যুদ্ধজাহাজ, মাত্র দশ মাইল দূরে হলেও, সন্ধ্যার ঘনায়মান কালিমায় ক্রমশ আকৃতি হারাচ্ছে সেটা, এরইমধ্যে আবছা দেখাচ্ছে।

হঠাৎ আবছা আকৃতিটা থেকে উজ্জ্বল আলোর একটা রেখা বেরিয়ে এল, সংকেতের মাধ্যমে পরিচয় জিজ্ঞেস করছে ডেস্ট্রয়ার।

‘আর্মস স্মাগলার!’ আপনমনে হাসল রানা, ডেস্ট্রয়ার থেকে পাপাগোয়াকে কেমন দেখাচ্ছে কল্পনা করবার চেষ্টা করল।

আবার সংকেত দিল ডেস্ট্রয়ার। ‘জাহাজ থামাও, তা না হলে গুলি করব।’

‘করবেই তো!’ ব্যঙ্গ করল রানা। মুখের সামনে হাত দিয়ে চোঙ তৈরি করল, চোঁচিয়ে বলল, ‘পাল নামাও!’ অনেক নীচে ডেক, ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে গ্রীক অ্যারোনিকাস। মুখ নামিয়ে ক্রুদের নির্দেশ দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে পাল খুলবার জন্য মাস্তুল বেয়ে উঠতে শুরু করল ক্রুরা।

সীমাহীন সাগরের বুকে কালো একটা খুদে ছায়ার মত লাগছে ডেস্ট্রয়ারটাকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা, লাল আলোর বালক দেখতে পেল। ভয়ের একটা শ্রোত পোকাকার মত কিলবিল করতে

করতে শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল পিঠে। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে আকাশে উঠে এল শেলটা, তারপর পাপাগোয়ার দিকে নামতে শুরু করল।

ওটার ছুটে আসবার আওয়াজ পেল রানা, তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, পাপাগোয়ার আধ মাইল সামনে ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে। আকাশের গায়ে উঁচু হলো ছলকে ওটা পানির স্তম্ভ, তীব্র বাতাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল স্তম্ভটা।

হাত থেমে গেছে ক্রুদের, স্তব্ধ বিস্ময়ে পাপাগোয়ার সামনের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। ক্যাপটেনের হুংকার শুনে আবার তারা যার-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। দেখতে না দেখতে বলমলে সাদা ক্যানভাস অদৃশ্য হলো জাহাজের মাথা থেকে।

আবার ডেস্ট্রয়ারের দিকে ফিরল রানা, দু'সেকেন্ড লাগল খুঁজে পেতে। পাল অদৃশ্য হতে দেখে ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন কী ভাবছে কে জানে। হয়তো ধরে নিয়েছে ওদের নির্দেশ মত থামছে পাপাগোয়া, জানে না জাহাজটার ডিজেল এঞ্জিনও আছে। তবে একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, পাল নামিয়ে নেওয়ায় ডেস্ট্রয়ার থেকে এখন আর পাপাগোয়াকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর যখন অন্ধকারে হারিয়ে গেল ডেস্ট্রয়ার, মাস্টহেড থেকে গ্রীক ক্যাপটেনকে নির্দেশ দিল, ‘আবার আগের কোর্স ধরো। আমাদের খোঁজে সোজা আসবে ডেস্ট্রয়ার, এসে পাবে না।’

দেখতে না দেখতে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। স্বর্গ জুড়ে জ্বলজ্বল করছে তারার অসংখ্য মালা। ক্রসট্রি-তে দাঁড়িয়ে আছে রানা, অন্ধকারের ভিতর দৃষ্টি হেনে ডেস্ট্রয়ারটাকে খুঁজছে। ওর ভয় কাটেনি এখনও, জানা নেই ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন কী ভাবছে। লোকটা যদি সন্দেহ করে থাকে? সে-ও যদি কোর্স বদলে ওদের

পিছু নিয়ে থাকে? অন্ধকারের ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আকাশ ছোঁয়া ইস্পাতের খোল পাপাগোয়ার উপর চড়াও হলে একটুও অবাক হবে না ও। কিংবা একেবারে কাছ থেকে জ্বলে উঠতে পারে সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো সাদা আলো। কানের পর্দা ফাটিয়ে বেজে উঠতে পারে বুল হর্ন।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পর, স্বস্তির একটা বিরাট ধাক্কায় সঙ্গে, সাদা আলোর দীর্ঘ আঙুল সাগরের গায়ে নড়ে উঠতে দেখল রানা। অন্তত ছ'মাইল পিছনে, ঠিক যেখানে পাল নামিয়েছিল পাপাগোয়া। ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন টোপ গিলেছে, তার নির্দেশে পাপাগোয়া থেমেছে ধরে নিয়ে অপেক্ষা করছে সে।

তবে ভুল ভাঙতে দেরি হবে না ক্যাপটেনের। নির্দিষ্ট একটা সময় পেরিয়ে যাবার পর সে বুঝতে পারবে, পাপাগোয়া ডেস্ট্রয়ারের দিকে আসছে না। তখনই শুরু হবে সার্চ।

আবার অ্যারোনিকাসকে নির্দেশ দিল রানা। পাল তোলো, কোর্স ঠিক রাখো, ফুলস্পীডে ছোটো। মিনিট পনেরো পর ডেস্ট্রয়ারের সার্চলাইট আবার জ্বলে উঠতে দেখল ওরা, ডেস্ট্রয়ার থেকে ওটার দৌড় মাত্র এক মাইল। নিয়মিত একটা ছক ধরে খুঁজবার পালা শুরু হলো।

দু'ঘণ্টা পর নতুন একটা ভয় ছেকে ধরল রানাকে। ডেস্ট্রয়ারও দিক বদলেছে, ধাওয়া করে ইতিমধ্যে পাপাগোয়ার অনেকটা কাছে চলে এসেছে। সার্চলাইটের আলোর ডগা আর মাত্র এক মাইল দূরে।

পরের বার আলোটাকে দেখা গেল অনেক বাঁ দিকে, কোর্স বদলে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে ডেস্ট্রয়ার। মাস্টহেড থেকে তবু নামল না রানা, অন্ধকারে দৃষ্টি হেনে অপেক্ষা করতে লাগল। সময়

গড়িয়ে চলল। এক সময় ক্ষীণ আলো ফুটল পূব আকাশে। চোখে টেলিস্কোপ তুলে চারদিকের দিগন্তরেখায় দৃষ্টি বুলাল ও। অথৈ জলরাশির মাঝখানে কোথাও কোন জাহাজ নেই।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপ ধরে গেছে রানার, মাস্তুলের মাথায় নড়াচড়া করবার সুযোগ না থাকায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশী, ধীরে ধীরে নীচে নামবার সময় ভয় হতে লাগল হাত ফসকে পড়ে না যায়।

অ্যারোনিকাস ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানাল, ওর নাকে-মুখে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে, রসুনের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল রানার। ওকে নামতে দেখে আগেই স্টোভ জ্বেলেছে অ্যানি উইসপার, মগভর্তি গরম কফি নিয়ে এল সে, নতুন দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে, সে-দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাতর-কোমল একটা ভাবও যেন লুকিয়ে আছে। মাইকেল এতক্ষণ একটা আর্মারড কারের ভিতর পাহারায় ছিল, অ্যানির হাত থেকে কফি নেওয়ার জন্য সে-ও হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল, এক গাল হাসি নিয়ে রানার ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল সদ্য ধরানো একটা লম্বা চুরুট। রানার হাত ধরে রেলিঙের দিকে সরে এল সে।

‘তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল,’ নিঃশব্দে হাসল মাইকেল। ‘কালো আদমী, ধরেই নিয়েছিলাম বুদ্ধিশুদ্ধি কম হবে। এখন দেখছি তুমি একটা বিরাট সম্পদ, কী?’

‘কিন্তু সাবধান,’ রানাও সহাস্যে বলল, ‘আমাকে পুঁজি করে জমজমাট কোন ব্যবসা ফাঁদার কথা ভেবো না-বিরাট লোকসান দিতে হবে।’ দু’জনেই একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা, যদিকে বসে আছে অ্যানি উইসপার। ডিম ভেঙে একটা বাটিতে রাখছে সে। পরস্পরকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল ওরা।

দুপুরের দিকে ধাক্কা দিয়ে ওদের দু’জনের ঘুম ভাঙল অ্যানি। একটা আর্মারড কারের ছায়ায়, যার যার চাদরের উপর উঠে বসে চোখ কচলাতে লাগল, যেন একজোড়া ঘুমকাতুরে শিশু। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ায় মেজাজ তিরিক্ষি, কিন্তু রাগ করতে পারছে না, কারণ ঘুমটা ভাঙিয়েছে ওদের খেলার সাথী। বিনা প্রতিবাদে অ্যানির পিছু নিয়ে বো-র দিকে চলে এল ওরা, চোখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে নিচু উপকূলরেখা দেখতে পেল, রঙটা অবিকল সিংহের গায়ের মত, রেখার মাথায় সাদা ফেনা যেন কোমল ক্রীম, তার ঠিক উপরে নীল আকাশ এত বেশি জ্বলজ্বলে ভাব নিয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে যে ব্যথা করে ওঠে চোখ।

আকাশ আর মাটিকে আলাদাভাবে চিনবার জন্য মাঝখানে পরিষ্কার কোন রেখার অস্তিত্ব নেই, তাপ-তরঙ্গ আর মিহি ধুলোর ভিতর সিংহের হলুদ কেশরের মত কাঁপছে উপকূলরেখা। দৃশ্যটা অ্যানির কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, আকর্ষণহীন আর বৈরী। নিজের ভাঙার থেকে শব্দ বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে তার মনে, ভাবছে ঠিক কীভাবে বর্ণনা করলে পাঠকরা দৃশ্যটা হুবহু কল্পনা করতে পারবে।

একজন আফ্রিকান যোগ দিল ওদের সঙ্গে-আব্বাস খায়ের। সে তার পশ্চিমা ড্রেস বাদ দিয়ে আলখেল্লা পরেছে, ভিতরে আঁটসাঁট পা’জামা। চকলেট-ব্রাউন মুখে সগর্ব গান্ধীর্ষ ফুটে আছে, কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল সোঁটে আছে খুলির সঙ্গে, আদিবাসীদের একজন পণ্ডিত ও যোদ্ধা দেশে ফিরছে। ‘পাহাড়গুলো আপনারা দেখতে পাবেন না, কুয়াশা বেশ ঘন,’ ব্যাখ্যা করল সে। ‘তবে কোন কোনদিন ভোরে বাতাস যখন ঠাণ্ডা থাকে...’ পশ্চিম দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকল, তরল জ্যোতির মত দুই চোখে ভাবাবেগ উথলে

উঠছে, পাথরখোদাই ঠোট দুটো কাঁপছে একটু একটু।

দীর্ঘগতিতে তীরের দিকে এগোল পাপাগোয়া, অগভীর পানি এত স্বচ্ছ যে ত্রিশ ফুট নীচে ডুবে থাকা পাহাড়ের চূড়া আর ঢাল পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা, বহুবর্ণ প্রবালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে রঙচঙে সামুদ্রিক মাছের ঝাঁক ছুটোছুটি করছে।

তীর আরও কাছে সরে এল, পাথুরে কিনারা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা, কিনারা ভাঙা ফাঁকের ভিতর সোনা রঙ সৈকত, চিকচিক করছে বালি। আরও সামনে উঁচু হয়ে উঠে গেছে মরু-নির্জন, ফাঁকা, অনুর্বর; মাঝে মধ্যে বিবর্ণ কিছু কাঁটাঝোপ আর শুকনো ঘাস ছাড়া দৃষ্টি কাড়বার মত কোথাও কিছু নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক তীর ঘেঁষে সমান্তরাল রেখা ধরে এগোল পাপাগোয়া, মাঝখানে এক হাজার ফুট ব্যবধান; রেলিঙে দাঁড়িয়ে অজানা ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা। দলে শুধু রানা অনুপস্থিত, কার্গো আনলোড করবার প্রস্তুতি নিতে গেছে ও। তবে একটু পরই ফিরে এল আবার, ঠিক তখনই ওদের সামনে গভীর একটা উপসাগর উন্মুক্ত হলো।

‘দ্য বে অভ চেইনস,’ বলল আব্বাস, সেই সঙ্গে নামকরণের কারণটাও ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বে-র শেষ মাথায় দু’দিকে উঁচু হয়ে রয়েছে উপকূল, দু’পাশের বাতাস থেকে রক্ষা করছে তীরের খানিকটা অংশকে, পানির উপর জেগে থাকা পাহাড় চূড়া ঠেকিয়ে রেখেছে সাদা ফেনা, নাক বরাবর সামনে প্রাচীন নগরী মণ্ডির ধ্বংসাবশেষ-এক সময় লোহার চেইন পরা ক্রীতদাসদের নিলামে তোলা হত এখানে।

বিধ্বস্ত শহরটা আব্বাস দেখিয়ে দেওয়ায় চিনতে পারল ওরা। তীরের কিনারায় কিছু সমতল, মসৃণ পাথরের স্তূপ দেখে কার সাধ্যি বোঝে এখানে একটা সময় শহর ছিল। আরও কাছে এসে

জ্যামিতিক ধাঁচের ছক দেখে রাস্তা, ছাদহীন দেয়াল ইত্যাদি চিনতে পারল ওরা।

নোঙর ফেলল পাপাগোয়া। কার্গো নামানোর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে রেলিঙে মাইকেলের কাছে চলে এল রানা। ‘দু’জনের একজনকে লাইন নিয়ে সাঁতরাতে হবে।’

‘এসো টস করি,’ প্রস্তাব দিল মাইকেল, রানা প্রতিবাদ করবার আগেই তার হাতে বেরিয়ে এল শিলিংটা।

‘হেডস!’ হাল ছেড়ে দেওয়ার সুরে বলল রানা।

‘মন্দ কপাল, ওল্ড চ্যাপ। হাঙরগুলোকে আমার হুহে জানিয়ো।’ সহাস্যে বলল মাইকেল, মোচড় দিল গাঁফে।

ডেরিকে চড়িয়ে ভেলাটা নামিয়ে দেওয়া হলো পানিতে, ভেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টান টান রশি ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল রানা। গর্ভবতী জলহস্তীর মত বেচপ ভেলাটা ঢেউয়ের মাথায় দুলতে লাগল। রেলিঙে ভর দিয়ে সাগ্রহে নীচে তাকিয়ে রয়েছে অ্যানি উইসপার, মুখ তুলে হাসল রানা।

‘যদি ভয় করো তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে, বা যদি মনে করো চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, অন্যদিকে তাকাতে পারো।’ রানার কথা এক মুহূর্ত বুঝল না অ্যানি। কিন্তু শার্ট খুলে রানা যখন ট্রাউজারের বোতামে হাত দিল, নিঃশব্দে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

কোমরে হালকা লাইন জড়িয়ে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, লাফ দিল রানা ভেলা থেকে। শেষ পর্যন্ত অদম্য কৌতূহলেরই জয় হলো, চোখ নামিয়ে আবার রানার দিকে তাকাল অ্যানি। ট্রাউজার খোলা অবস্থায় একজন পুরুষকে ভারি অসহায় আর ছেলমানুষ লাগে, উপলব্ধি করল সে। পানির নীচে ডুবে রয়েছে রানার শরীর, মাঝে মধ্যে শুধু নিতম্ব আর কাঁধ দুটো জেগে উঠছে পানির উপর, যদিও

পানির নীচেও পুরো শরীরটা দেখতে পাচ্ছে অ্যানি। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মাইকেল সেভারস, ঠোঁটের কোণে ঝলছে ব্যঙ্গাত্মক একটুকরো ধারাল হাসি, উঁচু হয়ে কপালে উঠে গেছে একটা ভুরু। মাইকেলের হাত দুটো অবশ্য থেমে নেই, রানা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে লাইন ছাড়ছে সে। লজ্জায় লালচে হয়ে উঠল অ্যানি, তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে নিতম্বিনীর দিকে এগোল—দেখে নেওয়ার দরকার ওর ব্যাগ আর টাইপরাইটার গাড়িটায় তোলা হয়েছে কিনা।

পানির নীচে মাটিতে পা পড়ল রানার, হেঁটে তীরে উঠল ও, লাইনটা একটা বড়সড় পাথরে জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধল। ইতিমধ্যে ডেরিকের সাহায্যে বড় ভেলাটায় নামানো হয়েছে প্রথম আর্মারড কার। লাইন টেনে তীরে ভেড়ানো হলো ভেলাটাকে, খুলে দেওয়া হলো গাড়িটার বাঁধন। তীরের কিনারা থেকে বালিময় হলুদ সৈকত ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, সেদিকে একটা উদ্ভিন্ন চোখ রেখে স্টার্ট দিল রানা, ভেলা আর সৈকতের মাঝখানে শক্ত আর মোটা কাঠের তক্তা ফেলে সিঁধে হলো আব্বাস। ভেলা বিপজ্জনকভাবে দুলছে, এঞ্জিনের আওয়াজ বাড়ল একটু, ভেলা থেকে তক্তার উপর উঠে এল কার। প্রায় অনায়াসে সৈকতে পৌঁছুল রানা, ওয়াটার-মার্ক ছাড়িয়ে এসে দাঁড় করাল গাড়ি। আব্বাসকে নিয়ে ফিরে গেল ভেলা, দ্বিতীয় গাড়িটা নিয়ে আসবে।

প্রায় নিঃশব্দে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ সারল ত্রুরা, তবু ফুয়েলের ড্রাম আর কাঠের বাক্সগুলো নিয়ে ভেলাটা যখন শেষবারের মত তীরে ভিড়ল, সূর্য পশ্চিম দিগন্তের কিনারায় পৌঁছে গেছে। ভেলার শেষ আরোহী হিসাবে কাঠের একটা বাক্সের উপর একা বসে রয়েছে অ্যানি উইসপার, মুখে স্থির হয়ে আছে আড়ষ্ট হাসিটুকু।

ভেলাটা জাহাজের গা থেকে সরতে না সরতে ডিজেল এঞ্জিন জ্যাঁস্ত হয়ে উঠল, নোঙর তুলবার নির্দেশ দিল কোস্টাস অ্যারোনিকাস, ভেলার সঙ্গে বাঁধা লাইনটা খুলে নেওয়া হলো। ভেলা থেকে লাফ দিয়ে তীরে নামল অ্যানি, ইতিমধ্যে নাক ঘুরিয়ে বে-র প্রবেশ পথের দিকে ছুটে শুরু করেছে পাপাগোয়া, ত্রুরা পাল তুলবার কাজে ব্যস্ত সবাই। সন্ধ্যা নামছে, সৈকতে দাঁড়িয়ে চারজন ওরা তাকিয়ে আছে দ্রুতগতি পাপাগোয়ার দিকে। কেউ ওরা হাত নাড়ল না, তবু কী যেন একটা হারানোর ব্যথা সবাই ওরা অনুভব করল। জাহাজটা অবৈধ মালামাল পাচার করে, ত্রুরা নোংরা, ক্যাপটেন লোকটা বিবেকহীন, তবু সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে পাপাগোয়াই ছিল ওদের সর্বশেষ যোগসূত্র। সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে বে থেকে বেরিয়ে গেল পাপাগোয়া, অদৃশ্য হয়ে গেল সীমাহীন সাগরে।

নিমন্ত্রণ আর একাকীত্ব থেকে ওদেরকে উদ্ধার করল রানা। ‘মন খারাপ করে লাভ কী, এসো তাঁবু ফেলা যাক।’

বিধ্বস্ত শহরের মাঝখানে, একজোড়া নিচু দেয়ালের সামনে থামল ও, তাঁবু ফেলবার জন্য জায়গাটা ওর পছন্দ হলো। একেবারে খোলা জায়গায় ফেলে না রেখে, এক এক করে গাড়িগুলোকেও সৈকত থেকে ধ্বংসাবশেষের ভিতর নিয়ে এল ওরা। বাড়ি-ঘরের ভাঙাচোরা কাঠামোয় কাঁটারোপ গজিয়েছে, পাথরের স্তূপগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে আছে বালিতে। রাস্তাগুলো সরু, কর্কশ ঝোপ আর বালিতে ঢাকা। আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িগুলোর ঢাকা আর ফুয়েল পরীক্ষা করছে রানা, একটা দেয়ালের গোড়ায় কিছু ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরবার চেষ্টা

করছে মাইকেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও, শহর দেখতে একাই বেরিয়ে পড়ল অ্যানি।

খুব বেশি দূর গেল না সে। হাঁটবার গতি শ্লথ হয়ে এল তার, পা উঠতে চায় না। ক্রীতদাসদের হাত-পায়ে লোহার চেইন, বানবান শব্দ করছে। বাতাসে চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ। রক্তাক্ত কালো-মানুষদের আর্তনাদ। লাফ দিয়ে ঝলসে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা, গোটা শহর পুড়ছে। দেড়-দুশো বছর আগে ঠিক যা ঘটছিল, সব যেন জ্যাক্ত হয়ে উঠল অ্যানি উইসপারের চোখের সামনে। পোকার মত কিলবিল করছে তার চামড়া, ভয়ে আর উত্তেজনায় পা উঠতে না চাইলেও কীসের এক দুর্নিবার টানে সম্মোহিতের মত সামনে এগিয়ে চলেছে সে। সর্ব গলির মাথা থেকে চওড়া একটা উঠন মত জায়গায় বেরিয়ে এল, আন্দাজ করল প্রাচীন মণ্ডি নগরীর এখানটাতেই মানুষ বেচাকেনার হাট বসত। লোহার শেকল পরা অনাহারক্লিষ্ট মানুষ ধুকছে, কল্পনা করে শিউরে উঠল সে। পরমুহূর্তে তিরস্কার করল নিজে, অতীতের কথা ভেবে এভাবে কাতর হয়ে পড়বার কোন মানে হয় না। বর্তমানকে নিয়েই তার কারবার, যেখানে যা দেখে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলে সচেতন পাঠককে জানানোর জন্য লিখে ফেলে। আজ আর মানুষ বেচাকেনা হয় না, ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেছে...কিন্তু সত্যিই কি তাই? আপনমনে মাথা নাড়ল অ্যানি উইসপার। কম দিন তো হলো না এই গ্রহে বসবাস করছে মানুষ, কিন্তু আজও কি সমাজ তাদের সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পেরেছে? মানুষকে মানুষ আজও কিনে নিয়ে নিজের খুশিমত কাজে লাগাচ্ছে, বদলে গেছে শুধু ধরনটা। ক্রীতদাস প্রথা আজও আছে, পাল্টেছে শুধু তার সংজ্ঞা। অসৎ আর নির্দয় মানুষের কজায় ছিল প্রাচীন দুনিয়া, আজও কূটকৌশলী আর স্বার্থপর

একদল মানুষের হাতে দুনিয়াটা জিম্মি হয়ে আছে। হঠাৎ করেই অ্যানি উইসপার উপলব্ধি করল, সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে আসলে সে একজন যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ-যুদ্ধ সম্মুখসমরে বন্দুক নিয়ে প্রাণসংহারের যুদ্ধ নয়। তার অস্ত্র ভাষা, অবহেলিত মানুষের দুর্দশা সচেতন পাঠককে জানানোর দায়িত্বটাই তার কাছে যুদ্ধ। ইথিওপিয়ার যেখানে সে যাচ্ছে, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেখানে-অশুভ শক্তি দুর্বল মানুষের উপর চড়াও হচ্ছে। নির্যাতিত আদিবাসীদের কথা অবশ্যই লিখবে অ্যানি উইসপার।

খসখস একটা শব্দে সংবিৎ ফিরল তার, চোখ নামিয়ে তাকাতেই আতংকে পিছিয়ে এল এক পা। তিন ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁকড়া-বিছে, সড়সড় করে তার পায়ের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে হাঁটা ধরল সে, ক্যাম্পের দিকে ফিরছে।

ভয়টা তখনও কাটেনি, কাজেই দেয়ালের গোড়ায় উজ্জ্বল আগুন জ্বলতে দেখে সোজা সেদিকেই এগোল অ্যানি, হাঁটু মুড়ে আগুনের পাশে বসবার সময় তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মাইকেল। হাত দুটো বাড়িয়ে আগুনের উপর ধরল অ্যানি।

‘এক্ষুনি তোমাকে খুঁজতে বেরাচ্ছিলাম। একা কোথাও যাওয়া ঠিক না।’

‘নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় আমার জানা আছে,’ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অ্যানি, গলার ঝাঁঝটুকুর সঙ্গে আগেই পরিচয় ঘটেছে মাইকেলের।

‘আমি একমত,’ নরম হাসি ফুটল মাইকেলের মুখে। ‘মারো মধ্যে মনে হয়, কাজটায় অতিমাত্রায় দক্ষ তুমি।’ পকেটে হাত ভরল সে। ‘আগুন জ্বালার জন্যে মাটি খুঁড়ছিলাম, জিনিসটা

পেলাম।’ পকেট থেকে বের করে ভাঙা একটা ধাতব চাকতি ধরল অ্যানির সামনে, আগুনের আলোয় চকচক করছে। চাকতির গায়ে একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে, দেহটা কুণ্ডলী পাকানো।

অস্বস্তি আর অকারণ রাগ কর্পরের মত উবে গেল, উত্তেজনা খাড়া হয়ে গেল অ্যানির শিরদাঁড়া। ‘ওহু, মাইক!’ প্রায় ছোঁ দিয়ে চাকতিটা তুলে নিল সে। ‘ওমা, কী সুন্দর! সোনা, তাই না?’

‘সন্দেহ করছি,’ মুচকি হেসে মাইকেল ভাবল, উপহারের জন্য সবাই ওরা লালায়িত। ‘ওটা এক রাজকুমারীর ছিল,’ হালকা সুরে বলল সে। ‘রাজকুমারীকে দিয়েছিল তার পাণিপ্রার্থী এক রাজকুমার। কাজেই আমার তরফ থেকে উপহার হিসেবে ওটা তোমাকে দিলে ব্যাপারটা বেশ মানানসই হবে, কী?’

‘ওহু!’ আনন্দের আতিশয্যে হাঁপিয়ে উঠল অ্যানি। ‘আমার জন্যে!’ আকস্মিক আবেগে ভেসে গেল সে, মাইকেলের কপালে চুমো খাওয়ার জন্য ঝুঁকল। কিন্তু থতমত খেয়ে গেল, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছে মাইকেল, অ্যানির ঠোঁট মাইকেলের ঠোঁটের সঙ্গে সঁটে গেল। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল অ্যানি, কিন্তু ততক্ষণে ওর মাথার দু’পাশ হাত দিয়ে চেপে ধরেছে মাইকেল।

চঞ্চলার এঞ্জিন বনেটের উপর বড়সড় স্কেল ম্যাপ খুলেছে রানা, পাশে আব্বাস; ল্যাম্পের আলোয় মরুভূমির গতিপ্রকৃতি বুঝবার চেষ্টা করছে। কোন্ রুট ধরে অ্যাওয়াস নদীর দিকে যাবে ওরা, খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে আব্বাস। তার অভিযোগ: ম্যাপটা নিখুঁত নয়, গুরুত্বপূর্ণ অনেক জায়গা এতে চিহ্নিত করা নেই। ‘দলে আমি না থাকলে এই ম্যাপ ধরে যেতেন আপনারা,’ বলল সে, ‘নির্ঘাত পথ হারাতেন।’

ম্যাপ থেকে হঠাৎ মুখ তুলেই আগুনের আভায় দুটো মূর্তিকে

সরে এসে এক হতে দেখল রানা। ঘাড়ের পিছনে উত্তপ্ত রক্ত যেন ছলকে উঠল, বুকের খাঁচায় হাতুড়ির বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ড। ‘কফি বানাবে, আব্বাস?’ ঘড়ঘড় করে উঠল ওর গলা।

‘একটু পর, মাসুদ ভাই!’ প্রতিবাদের সুরে বলল আব্বাস। ‘স্যান্ড ডেজার্টটুকু ঠিক কোথায় পেরোব আমরা সেটা আগে দেখাই আপনাকে...’ সামনের দিকে ঝুঁকে একটা আঙুল রাখল ম্যাপে, জানে না কেউ তার পাশে দাঁড়িয়ে নেই। ওদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য আগুনের দিকে রওনা হয়ে গেছে রানা।

আট

ভোরের ক্ষীণ আলো ইতস্তত করেছে পূব দিগন্তে, ঘুম থেকে জেগে উঠে অ্যানি বুঝতে পারল, বাতাস থেমে গেছে। রাতে যতক্ষণ জেগে ছিল সে, সন্ধ্যা বিলাপের মত আওয়াজ শুনেছে, বাতাস নয়, যেন বিধবস্ত নগরীর আনাচে-কানাচে ক্রীতদাসদের অতৃপ্ত আত্মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। গা থেকে চাদর সরাবার সময় চারদিকে চিকচিকে ধুলো-বালি উড়ল, কিচকিচ করে উঠল দাঁত। উঠে বসে পুরুষ তিনজনের দিকে তাকাল সে। চাদর ঢাকা তিনটে লম্বা বস্তার মত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে রয়েছে ওরা, একজন নাক ডাকছে। কে, বুঝতে পারল না অ্যানি। মাথায় হাত দিয়ে আঙুলের ডগায় বালি পেল সে। কারও ঘুম ভাঙবার আগে গোসলটা সেরে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

টয়লেট ব্যাগ, তোয়ালে আর আভারঅয়্যার নিয়ে দেয়ালের ফাঁক গলে বেরিয়ে এল অ্যানি, বালিয়াড়ি টপকে নেমে এল

সৈকতে। পিছন ফিরে একবার তাকাল-না, কেউ পিছু নিয়ে আসছে না।

সুন্ধ ভোর, লুকিয়ে থাকা সূর্যের আভায় বে-র পানি লালচে সাটিনের মত মসৃণ। চারদিকে জমাট নিস্ক্রান্ত, এই নিস্ক্রান্ত শুধু মরুভূমিতেই আশা করা যায়-পশু বা পাখি, বাতাস বা ঢেউ, মানুষ বা সরীসৃপ, কারও দ্বারাই বিদ্যমান হচ্ছে না। বেঁচে থাকা বড় সুখের, শরীরে অদ্ভুত একটা ভাললাগার অনুভূতি নিয়ে ভাবল অ্যানি উইসপার। কালকের হতাশা আজ ওকে স্পর্শ করতে পারল না।

এক এক করে কাপড় খুলে বিবস্ত্র হলো অ্যানি, ভিজে বালির উপর দিয়ে লম্বা লম্বা সতর্ক পা ফেলে সাগরের দিকে এগোল। পানিতে পা দিতেই হিম শীতল শিরশিরে ভাব কাঁপিয়ে দিল শরীরটাকে, দু'হাত বাড়িয়ে সাগরকে আলিঙ্গন করবার জন্য ঝাঁপ দিল সামনের দিকে।

আপনমনে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল সে, গুনগুন করে গান গাইছে। ঠিক সচেতনভাবে নয়, অনেকটা অন্যমনস্কভাবে, রানা আর মাইকেলের কথা পালা করে ভাবল সে। আনন্দ, কৌতুক, রোমাঞ্চ আর খুনসুটির অফুরন্ত একটা উৎসের নাম করো। মাইকেল সেভারস। ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ববোধ, রহস্য আর নিরাপত্তার উৎস কী? মাসুদ রানা।

সাগর থেকে যখন উঠল অ্যানি, দিগন্তের তরল মাথায় মুকুটের মত শোভা পাচ্ছে সূর্য। আলোর ধরন এই অল্প সময়ের মধ্যে বদলে গেছে, ভোরের কোমলতাকে হটিয়ে দিয়ে কর্কশ উজ্জ্বলতা নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে আফ্রিকার কাঠফাটা দিন।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরা শেষ করল অ্যানি, পরিত্যক্ত আভার-অয়্যারটা তোয়ালের ভিতর জড়িয়ে নিয়ে বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এল, এক হাতে চিরুনি চালাচ্ছে মাথায়। ভাঙা দেয়ালের কাছে

ফিরে এসে দেখল আগুনের ধারে বসে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে রানা। ডিম, মাখন, রুটি, ফল-চারজনের জন্য চারটে প্লেট সাজিয়েছে ও।

‘আর কী পারো তুমি?’ হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল অ্যানি। ‘না, ভুল হলো-জিজ্ঞেস করা উচিত, কী তুমি পারো না?’

‘ব্রেকফাস্টের জন্যে পাঁচ মিনিট বরাদ্দ করা হয়েছে,’ কফির জন্যে আগুনে পানি বসিয়ে বলল রানা। ‘রোদ এড়াবার জন্যে একবার ভেবেছিলাম রাতে রওনা হব, কিন্তু না-দুর্গম পথ, অন্ধকারে গাড়ি চালালে বারোটা বাজবে ওগুলোর।’ একটা প্লেট অ্যানির দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

প্লেটটা নিয়ে রানার সামনে একটা বাক্সের উপর বসল অ্যানি, মাথা নিচু করে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে শুরু করল। খানিক পর একবার মুখ তুলল মাইকেলকে আসতে দেখে। সদ্য দাড়ি কামিয়েছে মাইকেল, পোশাক দেখে কে বলবে মরুভূমিতে রয়েছে সে! ঘিয়ে রঙের ওপেন-নেক শার্ট পরেছে, দামী টুইডের ট্রাউজার, কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো জোড়া আয়নার মত চকচক করছে পায়ে। আঙুলের ডগা দিয়ে সযত্নে সোনালি গৌঁফ জোড়া সমান করল সে, রানাকে হো হো করে হেসে উঠতে দেখে উঁচু হলো একটা ভুরু।

‘চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ?’ আওয়াজ থামলেও, হাসি থামেনি রানার। ‘নাকি কোন মেয়ের সাথে ডেটিঙে বেরুবে?’

‘দেখো রানা, ওল্ড চ্যাপ,’ প্রথমে নিজের পোশাক, তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রানার মলিন শার্ট আর ট্রাউজারের দিকে তাকাল মাইকেল, ‘তুমি কে, সেটা তোমার পোশাকেই জানিয়ে দেয়। আফ্রিকায় আছি, শুধু এই কারণে নেংটি পরে জংলী সাজতে হবে,

কী?’ তারপর তার নজর পড়ল আব্বাসের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। ‘নো অফেন্স, অফকোর্স। বলতে বাধ্য হচ্ছি, দেশীয় পোশাকে রীতিমত রাজপুত্রের মত লাগছে তোমাকে।’

খাবার প্লেট থেকে মুখ তুলে নড়েচড়ে বসল আব্বাস খায়ের, পরনের আলখেল্লা টেনে-টুনে ঠিক করল, তারপর সে-ও হাসল। ‘ইস্ট ইজ ইস্ট, অ্যান্ড ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট,’ বলল সে।

‘বুড়ো ওয়ার্ডসওয়ার্থ খাঁটি কথা লিখে গেছে,’ সায় দিল মাইকেল, বাস্তবের উপর অ্যানির পাশে ছোট্ট জায়গাটা দখল করে হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ‘দাও, ওল্ড চ্যাপ-খাবারে বিষ মেশানোর এই সুযোগ তুমি ছেড়েছ বলে মনে হয় না, কী?’

গায়ে-গতরে বোঝা নিয়ে কিছুতকিমাকার চেহারা পেয়েছে কারগুলো, পরস্পরের ধুলো এড়ানোর জন্য প্রতিটির মাঝখানে দুশো গজ ব্যবধান, উপকূলীয় বালিয়াড়ি উপকে বেরিয়ে এল খাঁ খাঁ মরতে। একটানা অবিরাম তীব্র বাতাস বইলেও, হু-হু করে বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা, গাড়ির ভিতর দরদর করে ঘামছে ওরা।

কম্পাসে চোখ রেখে কলামের মুখ সামান্য দক্ষিণ দিকে তাক করেছে রানা, আব্বাসের পরামর্শ না পেলেও তাই করত ও। এই পথটা ধরায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সল্ট প্যানগুলোকে এড়ানো সম্ভব হবে। আব্বাস ওকে জানিয়েছে, ভুল করে কেউ যদি ওদিকে গিয়ে পড়ে, অপেক্ষাকৃত ভাল পথে ফিরে আসতে তিন-চার দিন সময় লেগে যাবে।

প্রথম দু’ঘন্টা বালি মেশানো হলদেটে নরম মাটি তেমন গুরুতর কোন সমস্যার সৃষ্টি করল না, শুধু ভারি চাকা মাঝে মধ্যে

দেবে যাওয়ায় এগোনোর গতি ঘন্টায় দশ মাইলের উপরে তোলা গেল না। লো গিয়ারে রয়েছে পুরানো এঞ্জিনগুলো, পরিশ্রমে ধুকছে।

তারপর ওরা শক্ত মাটিতে উঠে এল, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে পাথর। বহুযুগ ধরে বাতাস ওগুলোকে পালিশ করেছে, আকৃতি বদলে দিয়ে প্রায় প্রতিটি পাথরকে গোল করে তুলেছে, আকারে পেঁপের দানা থেকে শুরু করে রাজহাঁসের ডিম, সব ধরনেরই আছে। ঝাঁকি খেতে শুরু করল গাড়ি, গতি আরও একটু কমল। কালো পাথর থেকে অদৃশ্য তাপ ছিটকে উঠে এসে পুড়িয়ে দিল ওদের চোখ-মুখ। রানার নির্দেশে প্রতিটি গাড়ির সবগুলো হ্যাচ আর এঞ্জিন লুভর খুলে রাখল ওরা। প্রত্যেকে গায়ের কাপড় খুলে শুধু আভারওয়্যার পরে আছে, অ্যানি উইসপারও ব্যতিক্রম নয়। তবু প্রতিমুহূর্তে ঘামছে ওরা, লোমকূপ থেকে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা শুকিয়েও যাচ্ছে। গাড়ির ইস্পাতে, যেখানে রোদ লাগছে, সাদা রং থাকা সত্ত্বেও, ছুঁলেই ফোসকা পড়ে যাবে চামড়ায়। মাথার উপর উঠে আসছে সূর্য, সেই সঙ্গে এঞ্জিনের তাপ আর গরম তেলের গন্ধে ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টে বসে থাকা অসহনীয় একটা শাস্তি হয়ে দাঁড়াল।

দুপুরের ঘন্টাখানেক আগে প্রথম প্রতিবাদ জানাল চঞ্চলা, তার রেডিয়েটরের ভালব বিস্ফোরিত হলো, সশব্দে আকাশে নিক্ষিপ্ত হলো গরম বাষ্প। ম্যাগনিটো নিউট্রাল করে সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলাকে থামাল রানা। অর্ধনগ্ন, ঘামে চকচক করছে গা, টারিটের উপর উঠে দাঁড়াল ও, চোখে হাতের ছায়া ফেলে তাপ-তরঙ্গের ভিতর নৃত্যরত ধু-ধু প্রান্তরের দিকে তাকাল। অস্পষ্টতার ভিতর দিগন্তরেখার কোন অস্তিত্ব নেই, মাত্র কয়েকশো গজ সামনের দৃশ্যও পরিষ্কার

নয়। এমনকী পিছনের আর্মারড কারগুলোকেও চেনা কঠিন, দানবীয় আর অবাস্তব লাগল চোখে।

গাড়িগুলো কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর সবাইকে ডেকে বলল, ‘এঞ্জিন বন্ধ করো। এই অবস্থায় এগোনো সম্ভব নয়—এঞ্জিন অয়েল পানির মত পাতলা হয়ে যাচ্ছে, চালালে সবগুলো বেয়ারিং নষ্ট হবে। একটু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।’

কৃতজ্ঞচিত্তে গাড়ি থেকে নেমে এল ওরা, হামাগুড়ি দিয়ে যে যার গাড়ির পাশে ছায়ায় পৌঁছল। দৌড়ে আসা কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে সবাই। ওদের সবার সামনে দিয়ে হেঁটে এল রানা, প্রত্যেকের হাতে একবার করে ধরিয়ে দিল পাঁচ গ্যালন পানি ভর্তি ক্যানটা। যার যতটুকু খুশি পানি খেয়ে নেতিয়ে পড়ল ওরা। সবশেষে পানি খেলো অ্যানি, তার হাত থেকে গ্যালনটা নিয়ে একপাশে নামিয়ে রাখল রানা, তারপর ঢলে পড়ল অ্যানির পাশে চাদরের উপর। ‘এই গরমে আমার গাড়ির কাছে হেঁটে যেতে হলে মারা পড়ব,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। ছোট করে মাথা ঝাঁকাল অ্যানি, চেহারায় বিরূপ কোন ভাব ফুটল না, আধ খোলা ব্লাউজের আরও একটা বোতাম লাগাল। পানিতে রুমাল ভিজিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। সেটা নিয়ে ঘাড় আর মুখ মুছল অ্যানি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ‘এই গরমে শুতে পারব না,’ বিড়বিড় করে বলল সে। ‘আমাকে খানিকটা আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করো, রানা।’

‘শোনো মেয়ের কথা!’ রানার হাসিতে কোন শব্দ নেই, কিন্তু অ্যানির হাসি ঠিকই শুনতে পাওয়া গেল।

‘বললাম বড় বেশি গরম। এসো গল্প করি।’

‘কী নিয়ে?’

‘তোমাকে নিয়ে। নিজের কথা বলো—কোথেকে, কেন, কোথায়

যাচ্ছ তুমি, ইত্যাদি।’

‘আমি বাঙালী, ভবঘুরে—ব্যস, নটে গাছটি মুড়াল, আমার গল্পও ফুরাল।’

‘ধ্যেৎ! কেন, বলতে বাধা কীসের? তুমি যে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র, সে তো বোঝাই যায়। পালাচ্ছ, তাই না? নিজের কাছ থেকে? কেউ ছাঁক দিয়েছে? নাকি...’

‘আমার সম্পর্কে অনেক দূর ভেবেছ দেখছি!’ মনে মনে অবাক হলো রানা। ‘পালাচ্ছি? কেন, এ-কথা কেন মনে হলো?’

‘ভুলে যাচ্ছ কেন আমি একজন সাংবাদিক,’ স্মিত হাসি ফুটল অ্যানির ঠোঁটে। ‘খবর সংগ্রহ করাই আমার কাজ। তোমার মনের খবর খানিকটা হলেও আন্দাজ করতে পারি বৈকি।’

‘এসো, কমপ্রোমাইজ করি। যতটুকু স্বীকার করব, তার বেশি তুমি জানতে চাইবে না, রাজি?’

‘রাজি।’

‘আমি পালাচ্ছি না,’ বলল রানা। ‘বলতে পারো, কিছু দিনের জন্যে সরে আছি।’

‘কারও কাছে বাঁধা আছে?’ অ্যানির চোখে গভীর আগ্রহ, সেটা লক্ষ করেই প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত অর্থ ধরে ফেলল রানা।

‘না। অনেকে কাছে এসেছে, কিন্তু ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেনি—টের পেয়ে যায়, আমাকে ধরে রাখা যাবে না।’

‘ধরে রাখা যাবে না...দায়ী কে—পেশা, না প্রকৃতি?’

‘বোধহয় দুটোই।’

‘স্বপ্নের কথা বলো, রানা,’ স্নান হেসে প্রশঙ্গ পাল্টাল অ্যানি উইসপার।

‘স্বপ্ন?’

‘সবারই একটা স্বপ্ন থাকে, তোমারটা কী?’

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকবার পর রানা বলল, ‘স্বপ্ন আমার একটা আছে বটে, কিন্তু দুঃখিত, সেটা রোমান্টিক কোন ব্যাপার নয়—অনেকের কাছে অবাস্তবও মনে হতে পারে। তবু স্বপ্নটা আমি মনের গভীরে বেশ কিছুদিন থেকে লালন করছি।’

‘কী সেই স্বপ্ন?’

‘তুমি সাংবাদিক, বাংলাদেশের কথা তোমাকে ব্যাখ্যা করে না বললেও চলবে, তাই না? আমার স্বপ্ন হলো একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। সে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী হয়ে আসবে, যদি না আসে বেঁধে নিয়ে আসা হবে, অযোগ্য আর দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতারা। তাদের পড়াবে কে জানো? কমপিউটার, বেত আর গ্রাম্য চাষী। কমপিউটার তাদের শেখাবে কীভাবে জনসাধারণের টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে ও দিতে হয়। বেত যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করবে। আর গ্রাম্য চাষীর কাছ থেকে ওরা শিখবে কীভাবে দেশকে, দেশের মাটিকে ভালবাসতে হয়। আমার স্কুলে ছাত্র হতে হবে লোভী ব্যবসায়ী, ঘুষখোর আমলা, অল্প জ্ঞানী অধ্যাপক আর মধ্যসত্ত্বভোগী টাউটদের। ব্যবসায়ীদের ক্লাস নেবে ভূমিহীন কৃষক আর বেকার যুবকরা, ঘুষখোর আমলাদের শিক্ষা দেবে আমার স্কুল থেকে ইতিমধ্যে পাশ করা ধর্ম-ব্যবসায় ভণ্ড মৌলভিরা, আর মেয়েরা...’ ভাষণ দেওয়া হয়ে যাচ্ছে ভেবে হঠাৎ চুপ করে গেল রানা, কয়েক সেকেন্ড পর মৃদুকণ্ঠে বলল, ‘দুঃখিত, অ্যানি। ভেবো না শখ করে নাটুকে চরিত্র হয়ে উঠছি—এ হলো অক্ষমের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু, আরে, এ-সব তোমাকে কেন শোনাচ্ছি আমি?’

রানার কথা শুনতে শুনতে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা তুলেছে অ্যানি, অপলক চোখে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি, হঠাৎ যেন আরেক মাসুদ রানাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে। ঈশ্বর

রক্ষা করুন, মনে মনে প্রার্থনা করল অ্যানি উইসপার, বুকে এত ক্ষোভ নিয়ে লোকটা মারা পড়বে যে! আন্তরিক উৎসাহ দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, বাধা দিল রানা।

‘না, আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো। তোমার স্বপ্ন।’

হালকা সুরে হেসে উঠল অ্যানি।

‘না, আমি শুনতে চাই,’ জেদ ধরল রানা।

‘একটা বই। উপন্যাস, রানা। সেই জ্ঞান হবার পর থেকে ওটা নিয়ে ভাবছি আমি। মনে মনে অন্তত একশোবার লিখে ফেলেছি, এখন শুধু সময় করে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই হয়ে যায়...’ হঠাৎ থেমে আবার হেসে উঠল অ্যানি উইসপার। ‘...তা ছাড়া, অবশ্যই, ছেলেমেয়ে আর ঘর-সংসারের স্বপ্ন দেখি আমি। এই অল্প বয়েসে বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়েছি আমি, বারবার—অথচ ফেরার কোন জায়গা নেই আমার, আমার নিজের আপনজন বলতে কেউ নেই।’

‘তোমার স্বপ্নটা সুন্দর, আশা করা যায় জীবনে তুমি খুব সুখী হবে,’ বলল রানা।

‘তোমার স্বপ্নটা আমাকে নাড়া দিয়েছে, তার কারণ আমি যে উপন্যাসটা লিখব বলে ভেবেছি সেটারও বিষয় ক্ষোভ, ঘৃণা, বিদ্রোহ, ভালবাসা আর দেশপ্রেম।’

ওদের কথা আর হাসি অস্পষ্টভাবে হলেও, শুনতে পাচ্ছে মাইকেল সেভারস। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে একবার খানিকটা মাথাও তুলল। কালো পাথরের উপর দিয়ে বারো-তেরো গজ দূরত্ব, গুরুত্বের সঙ্গে ভাবল যাবে কিনা। কিন্তু অসহ্য গরম লাগায় ইচ্ছেটা জোরাল হতে পারল না, ভাবল থাক ওরা শুয়ে। চাদরে আবার ঢলে পড়ল সে, পেপারওয়াইট সাইজের একটা পাথর গুঁতো

মারল কিডনিতে, নিঃশব্দে অভিশাপ দিল ও।

বিকেল পাঁচটার দিকে রানা সিদ্ধান্ত নিল আবার চালু করা যায় এঞ্জিন। ক্যান থেকে ফুয়েল ভরা হলো ট্যাংকগুলোয়, আবার কলামের আকৃতি নিয়ে রওনা হলো চারটে আর্মারড কার। গতি খুব মস্তুর, হেঁটেও এরচেয়ে দ্রুত এগোনো যায়। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেলো গাড়ি, অবস্থা কাহিল হলো ড্রাইভারদের।

দু'ঘণ্টা পর হঠাৎ করেই কালো পাথরের এলাকা থেকে বেরিয়ে এল ওরা, সামনে লাল বালি ঢাকা নিচু পাহাড়, একটার পর একটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। স্পীড বাড়াল রানা, অন্তিম সূর্যের দিকে মুখ করে ছুটল কলামটা। দিগন্তের কাছে ধুলোভরা আকাশে বিদায়ী সূর্য যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, দেখতে দেখতে আগুনটা রঙ বদলাতে শুরু করল—কোথাও হালকা লাল, কোথাও গোলাপি, কোথাও টকটকে রক্তবর্ণ, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দিল অর্ধেক আকাশ। থমকে গেছে মরু-বাতাস, সারাদিনের তাপের স্মৃতি নিয়ে স্থির আর ভারি হয়ে আছে পরিবেশ। প্রতিটি গাড়ি পিছনে ঘন আর লম্বা ছায়া ফেলছে, ছায়ার উপর পাক খেতে খেতে মাথাচাড়া দিচ্ছে লাল ধুলোর মেঘ।

রাত নেমে এল হঠাৎ করে, গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। আগেই হিসাব করেছে রানা, সারা দিনে ওরা বিশ মাইলও এগোতে পারেনি। চাকার নীচে মাটি বা বালি অনুকূল, এঞ্জিনের গোঙানি অনেক কমে গেছে, গাড়ির ভিতর এখন আর গরমে সেক্ষ হুচ্ছে না ড্রাইভাররা—কাজেই থামবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। আকাশে মুখ তুলে কালপুরুষের উপর দৃষ্টি রাখল ও, কম্পাসের কাঁটা অ্যাডজাস্ট করল, হেডলাইটের সুইচ অন করে পিছনে তাকাল বাকি সবাই দৃষ্টান্তটা অনুকরণ করছে কি না দেখবার জন্য। চঞ্চলার সামনে একশো গজ লম্বা উজ্জ্বল আলোর

একটা পথ তৈরি হলো, এতে করে ঘন কাঁটারোপ আর মরু খরগোশগুলোকে এড়ানোর সময় পাবে রানা। ধূসর রঙা খরগোশগুলোর চোখ হীরের মত জ্বলজ্বলে। হেডলাইটের আলো ওগুলোকে সম্মোহিত বা অবশ করে ফেলে, আলোর পথ থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে সরতে পারে না।

খানিক পর পানাহারের জন্য থামবার কথা ভাবল রানা, পরে আবার রাত গভীর হবার আগেই রওনা হওয়া যাবে। এই সময় লাল বালি ঢাকা শেষ পাহাড়টা উপকে এল গাড়ি, হেডলাইটের আলোয় সমতল সাদা বালির মসৃণ চকচকে বিস্তৃতি দেখতে পেল রানা। রওনা হবার পর এই প্রথম উপ গিয়ার দিল ও, ব্যতীত সঙ্গে সামনের দিকে লাফ দিয়ে ছুটল চঞ্চলা—একশো গজের মত—তারপরই সল্ট প্যানের শক্ত মোটা ছাল ধসে গেল, পেট পর্যন্ত দেবে গেল চঞ্চলার ভারি চেসিস। গতি অকস্মাৎ রুদ্ধ হওয়ায় সামনের দিকে ছিটকে পড়ল রানা, ইস্পাতের মুখোশের ভিতর খেঁতলে গেল কপালের চামড়া, ব্যথা পেল কাঁধের হাড়।

থুটল বন্ধ করে এঞ্জিনের গর্জন থামাল রানা, টারিট থেকে বেরিয়ে এসে থামবার সংকেত দিল পিছনের গাড়িগুলোকে। সাবধানে গাড়ির পাশে নামল ও, কী ধরনের গাভডায় পড়েছে বুঝবার চেষ্টা করল, এই সময় তুষার ধবল প্যানের উপর দিয়ে হেঁটে এল মাইকেল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করল ওরা।

‘বাজে কোন কথা বলে দেখুক!’ মনে মনে বলল রানা। রাগ আর হতাশায় কাঁপছে ও, পাকানো মুঠো হাতুড়ির মত শক্ত।

‘চুরট?’ রানার সামনে বাক্সটা খুলে ধরল মাইকেল।

রাগের মাত্রা সামান্য কমল।

‘ক্যাম্প করার জন্যে জায়গাটা কিন্তু মন্দ না, কী?’ বলে চলল মাইকেল। ‘সকালে দেখব কীভাবে তোলা যায় ওটাকে।’ রানার কাঁধে মৃদু চাপড় দিল সে। ‘এসো, তোমাকে বিয়ার খাওয়াব।’

‘আমি অপেক্ষা করছিলাম, তুমি অন্য কিছু বললে এক হাত হয়ে যেত,’ বলল রানা, ঠোঁট মেলে হাসল, মাথা নাড়ল—ওর তুঙ্গে ওঠা মেজাজ মাইকেল আগেই বুঝতে পারায় বিস্মিত হয়েছে। ‘ভেবেছ বিয়ার খাওয়াতে চেয়েছি শুধু শুধু?’ পাল্টা হাসি উপহার দিল মাইকেল সেভারস। ‘তোমার সাথে মারামারি? কল্লনাও করতে পারি না, ওল্ড চ্যাপ। আমরা দুই যমজ ভাই, মনে আছে, কী?’

মাঝরাতের পরপরই ঘুম ভেঙে গেল অ্যানি উইসপারের, নিশীথের অসাড় নিশ্চল গভীর নিস্তর্রতা ভয় পাইয়ে দিল ওকে, কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে, দ্বিতীয়বার চোখ মেলতে পারল না। তারপর অস্পষ্ট আওয়াজটা শুনতে পেল ও। কার যেন নাক ডাকছে। পরিচিত আওয়াজ, কিন্তু তিনজনের মধ্যে কার, তা এখনও জানবার সুযোগ হয়নি। ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু অনেক সময় এ-ধরনের ছোটখাট ব্যাপারও একটা মেয়ের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে—ভেবে দেখো, বাকিটা জীবন পাশে করাতকল নিয়ে ঘুমাতে কেমন লাগবে তোমার!

তবে ঘুমটা নাক ডাকবার আওয়াজে ভাঙেনি। কারণটা হয়তো ঠাণ্ডা। মরুভূমির বৈশিষ্ট্যই তো এই, দিনে আগুন, রাতে বরফ। চাদরটা বুকের উপর টেনে নিয়ে চোখ বুজে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করল অ্যানি। পরমুহূর্তে ঝট করে সটান বসে পড়ল—শিরদাঁড়া খাড়া, চোখ বিস্ফারিত, প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট।

অলৌকিক, অবাস্তব একটা আওয়াজ; জীবনে কখনও শোনেনি

অ্যানি। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড শোনা গেল, অসম্ভব ভরাট, প্রতিমুহূর্তে আরও ভারি হতে হতে গোটা দুনিয়া যেন কাঁপিয়ে দিতে লাগল। আতংকের শ্লথগতি হিমশীতল স্পর্শ ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। চিৎকার করতে চাইল অ্যানি, লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা পুরুষ সঙ্গীদের দিকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো। নড়লে বা চিৎকার দিলে ওর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে ভেবে অনড় বসে থাকল সে, সমগ্র অস্তিত্ব সজাগ হয়ে অপেক্ষা করছে আবার কখন শোনা যাবে গর্জনটা।

‘ভয় পাবার কিছু নেই, মিস উইসপার।’ শান্ত গলা শুনে চমকে উঠল অ্যানি। ‘কয়েক মাইল দূরে ওটা।’ ঘাড় ফিরিয়ে ইথিওপিয়ান যুবক আব্বাস খায়েরকে দেখতে পেল সে, এখনও চাদরের তলায় রয়েছে, বাইরে শুধু মাথাটা দেখা যাচ্ছে, তাকিয়ে আছে তার দিকে।

‘মাই গড, আব্বাস—কী ওটা, কীসের আওয়াজ?’

‘সিংহ, মিস উইসপার,’ ব্যাখ্যা করল আব্বাস, গলার সুরেই বোঝা গেল অতি পরিচিত আওয়াজটা অ্যানি চিনতে না পারায় অবাক হয়েছে সে।

‘সিংহ? ওটা সিংহের গর্জন?’ সিংহ যে এভাবে ডাকে, অ্যানির কল্পনাতেও ছিল না।

‘আমার গোত্রের মুরব্বির বা বলে, এমনকী সাহসী একজন লোকও সিংহকে তিনবার ভয় পায়—প্রথমবার যখন সে ওটার গর্জন শোনে।’

‘বিশ্বাস করলাম,’ ফিসফিস করে বলল অ্যানি। ‘সত্যি বিশ্বাস করি।’ চাদর তুলে উঠে দাঁড়াল সে, সাবধানে হেঁটে এল রানা আর মাইকেল যেখানে শুয়ে আছে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে ওরা। দু’জনের

মাঝখানে ছোট ফাঁকা জায়গাটায় চাদর বিছাল সে, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। মনে খানিকটা সাহস ফিরে এসেছে, সিংহটা এখন শিকার বাহবার সুযোগ পাবে, হামলা করবার জন্য একা শুধু তাকেই দেখতে পাবে না। কিন্তু তবু তার ঘুম এল না।

নয়

হরিণের হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি নিয়ে বিজয়ীর বেশে তাঁবুতে ফিরল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরের, শিফটা সৈনিকরা বীরোচিত সম্বর্ধনা দিল তাকে। কিন্তু তার মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াল জেনারেল ফাদের জরুরী বার্তা। ফাদ সবিনয়ে জানিয়েছে, গন্তব্যে পৌঁছতে কাউন্ট যদি এভাবে অযথা দেরি করে, বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবতে বাধ্য হবে সে। ঘুমাতে যাবার আগে গভীর আন্তরিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল কাউন্ট, কেউ আর তাকে ধরে রাখতে পারবে না, সকাল হওয়ামাত্র ওয়েলস অভ চান্ডি অভিমুখে রওনা হয়ে যাবে সে।

কিন্তু ভোর হবার খানিক আগেই ঘুম ভেঙে গেল কাউন্টের, উপলব্ধি করল কাল রাতে ডিনারের সময় যে কিঅ্যানটি (ইটালিয়ান মদ) গলাধঃকরণ করেছিল সেটা সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মত পেটের ভিতর দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। সাধারণ কোন মানুষ সমস্যাটার সমাধান পাবার জন্য নিঃশব্দে বিছানা ত্যাগ করত, কিন্তু কাউন্ট যে-কোন তুচ্ছ কাজেও জাঁকজমক পছন্দ করে, তা ছাড়া সব কাজে তার নিজস্ব স্টাইলের ছোঁয়াও না থেকে পারে না।

পেটের ব্যথায় একবার বিছানার উপর উঠে বসলেও, করণীয়

www.BanglaBook.org

স্থির করবার পর আবার শুয়ে পড়ল সে, তারপর বাঘের মত একটা হুংকার ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ল্যাম্প হাতে তাঁবুতে ঢুকল বানানটো সাতা, কোমরের কাছে এক হাতে ধরে আছে ট্রাউজার, লাল চোখ ঘুমে এখনও ঢুলুঢুলু। তার পিছু পিছু ঢুকল কাউন্টের ব্যক্তিগত ভৃত্যরা, প্রত্যেকের হাতে ল্যাম্প, অপর হাত দিয়ে সবাই চোখ রগড়াচ্ছে।

শারীরিক অস্বস্তির কথা ব্যক্ত করল কাউন্ট, নিবেদিত প্রাণ দলটা তার বিছানার চারদিকে জড়ো হয়ে উৎকণ্ঠা আর সহানুভূতি প্রকাশ করল। বানানটো সাতা মহাশয়কে দু'হাত দিয়ে তুলে নিল বুকে, সে যেন একটা অথর্ব। মেঝেতে নামানো হলেও, কয়েক জোড়া হাত দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল তাকে, এই সুযোগে নীল চাইনীজ সিন্ধের ড্রেসিং গাউন পরানো হলো। একজন ভৃত্য স্লিপার নিয়ে এসে কাউন্টের পায়ে গলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কাউন্ট তাকে লাথি মেরে ফেলে দিল, সোনালি ছাড়া অন্য কোন রঙের স্লিপার সে পরবে না। ইতিমধ্যে তার ব্যক্তিগত গার্ডদের লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলেছে বানানটো সাতা, তাঁবুর বাইরে সশস্ত্র অবস্থায় তৈরি হয়ে আছে তারা।

তাঁবু থেকে বের হলো কাউন্ট, সঙ্গে সঙ্গে ছোট মিছিলটা ল্যাট্রিনের দিকে রওনা হলো, কাউন্টের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে ওটা।

ল্যাট্রিনের ভিতর প্রথম ঢুকল সাতা; সাপ, ব্যাঙ, বিছে, আরশোলা বা টিকটিকি আছে কিনা দেখবার জন্য। তারপর ঢুকল একজন গার্ড, গুপ্তঘাতকের সম্মানে। সে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করল, ল্যাট্রিন সম্পূর্ণ নিরাপদ। এবার ভিতরে ঢুকল কাউন্ট। তার

এসকট টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বাইরে, সবাই শ্রদ্ধা এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা ছোটখাট কিন্তু ঘন ঘন অবিরাম বিস্ফোরণের শব্দগুলো শুনতে লাগল। তারপর শোনা গেল দুনিয়া কাঁপানো, আকাশ ফাটানো একটা পুরুষ সিংহের গর্জন।

ল্যাট্রিন থেকে বুলেটের মত ছিটকে বেরিয়ে এল কাউন্ট, ল্যাম্পের আলোয় সাদা ধবধব করছে তার চেহারা। ‘মিষ্টি ও দয়াবতী ঈশ্বরের মা!’ প্রায় কেঁদে ফেলল সে। ‘কী ওটা?’

জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, কেউ তার প্রশ্নটাকে গুরুত্বই দিল না। সশস্ত্র গার্ডদের নাগাল পাবার জন্য রীতিমত দৌড় দিতে হলো কাউন্টকে, এরইমধ্যে ক্যাম্পের সীমানায় ফিরে গেছে তারা।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে নিরাপদ বোধ করল কাউন্ট। প্রাণদণ্ডের হুমকি দেওয়ায় স্টাফরাও সবাই আবার তার তাঁবুতে জড়ো হয়েছে। ধীরে ধীরে কাউন্টের পালসরেট স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে এল, মেজর লুইগি রাকা তাকে অভয় দিয়ে জানাল, অপ্রত্যাশিত গর্জনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো ইরিত্রীয় গাইড ফিরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্টটা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে মহা হৈ-চৈ এবং আতংক ছড়িয়ে পড়ল গোটা ক্যাম্পে।

‘সিংহ?’ বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করল কাউন্ট, তারপর আবার বলল, ‘সিংহ?’ অজানা ভয় দূর হয়েছে, তার একটা কারণ ইতিমধ্যে ফর্সা হতে শুরু করেছে পুবের আকাশ। শিকারীসুলভ উত্তেজনায় চকচক করে উঠল কাউন্টের চোখ, ফুলে উঠল বুক।

‘রিপোর্টে আন্দাজ করা হয়েছে, মাই কাউন্ট, মরুভূমিতে আপনার ফেলে আসা হরিণটাকে খাবে বলে রওনা হয়েছে পশুরাজ,’ ইরিত্রীয় গাইডের বক্তব্য ভাষান্তর করে শোনাচ্ছে

মেজর। ‘রক্তের গন্ধ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।’

‘সাতা!’ আদেশ করল কাউন্ট, ‘ম্যানলিকারটা আনো। ড্রাইভারকে বলো এই মুহূর্তে রোলস-রয়েস নিয়ে আমার তাঁবুর সামনে চলে আসুক। আমি শিকারে বেরুব।’

‘মাই কর্নেল,’ প্রতিবাদ জানাল মেজর রাকা। ‘থার্ড ব্যাটালিয়ান, আপনারই নির্দেশে, সকালে মার্চ করার কথা!’

‘নির্দেশ বাতিল করা হলো!’ খেঁকিয়ে উঠল কাউন্ট, এরইমধ্যে সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে সিংহের চামড়াটা তার লাইব্রেরীর ডেস্কে বিছানো রয়েছে। হঠাৎ করে হরিণ শিকারের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেল তার। ‘মেজর,’ হুকুম করল সে, ‘আমি চাই বিশজন সশস্ত্র লোক আমার সঙ্গী হবে। ওদের বাহন হিসেবে একটা ট্রাক দাও। প্রত্যেকের সাথে থাকবে একশো রাউন্ড করে অ্যামুনিশন।’ না, বোকার মত কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয় সে।

এখন তার পূর্ণ যৌবন, বয়স ছয়, মরুভূমিতে বেড়ে ওঠায় জংলী সিংহের চেয়ে আকারে সে অনেক বড়। দাঁড়ানো অবস্থায় কাঁধের কাছে তিন ফুট উঁচু, ওজন চারশো পাউন্ডের কিছু বেশি হবে। ঢলে পড়া সূর্যের তির্যক রশ্মি তার চামড়ার পিচ্ছিল লালচে গেরুয়া রঙ উজ্জ্বল করে তুলেছে, কেশরটাকে পরিণত করেছে স্বর্ণ বলয়ে। ঘন আর দীর্ঘ কেশর, চওড়া সমতল মাথাটাকে ফ্রেমে আটকেছে, কাঁধ ছাড়িয়ে আরও অনেক পিছনে তার বিস্তার, বুক আর পেট থেকে এত বেশি বুলে আছে যে মাটি প্রায় হোঁয় হোঁয়।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে সে, মাথাটা খুব নিচু করা, কষ্টসাধ্য প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে একদিক থেকে আরেকদিকে দুলছে সেটা। চাপা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে প্রতিটি নিঃশ্বাসের

সঙ্গে, মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্ষতস্থানের উপর নীল মেঘের আকৃতি নিয়ে উড়তে থাকা মাছিদের গুঁতো মারবার চেষ্টা করছে মাথা দিয়ে। মাছি তাড়াবার পর ছোট গাঢ় রঙের ফুটোটা চাটছে সে, অনবরত পানির মত স্বচ্ছ রক্ত বেরছে ওটা থেকে। বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসছে ফ্যাকাসে লাল জিভ, ঘোড়ার চামড়ার মত ককর্শ, ঘন ঘন ঘষা খাচ্ছে নরম ক্ষতের গায়ে, ক্ষতের চারদিকে কামানো একটা ভাব এনে দিয়েছে।

ছুটে পালাবার জন্য ঘুরতে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে নাইন পয়েন্ট থ্রি ম্যানলিকার বুলেট জখম করে তাকে। শেষ পাঁজরের দু'ইঞ্চি পিছন থেকে শরীরের ভিতর ঢুকেছে বুলেটটা, নয় টন ওজনের বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছটিকে পড়ে পশুরাজ, স্তান ধুলোর মেঘ তুলে গড়াগড়ি খেতে শুরু করে। তামার জ্যাকেট পরানো বুলেটের মাথায় রয়েছে নরম সীসা, পেটের ভিতরটা ছিন্নভিন্ন করবার সময় চ্যাপ্টা হয়ে আকারে বেড়ে যায় ওটা, নাড়িভুঁড়ি চিরে দেয়, হিঁড়ে ফেলে বড় চারটে শিরা। কিডনির পাশ ঘেঁষে গেছে বুলেটটা, দুটোকেই মারাত্মকভাবে জখম করেছে, তাই থেমে দাঁড়িয়ে যতবারই রক্ত মেশানো প্রস্রাব করবার জন্য পিঠ ধনুকের মত বাঁকিয়ে নিচু হলো, বিরতিহীন ড্রাম পেটানোর গুরুগুর গর্জন বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। সবশেষে পেলভিক বেষ্টনী ভেদ করেছে বুলেট, হাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে রুদ্ধ হয়েছে ওটার গতি।

সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে, কয়েকটা গড়ান দেওয়ার পর, উঠে দাঁড়ায় পশুরাজ। নিচু হয়ে ছুটতে শুরু করে সে, সবচেয়ে খাটো ঝোপটাকে পাশ কাটানোর সময়ও তার পিঠ আর কাঁধ পাতা বা ডালের উপরে ওঠেনি। যদিও আরও প্রায় দশ বারোটা বুলেট তার দিকে ছুটে এসে আশপাশে ধুলো উড়িয়েছে, একটা তো এত কাছে এসে পড়ে যে তার চোখ বালিতে ভরে যায়,

তবে একটাও আর ছুঁতে পারেনি তাকে।

দলে ছিল সাতটা সিংহ। দ্বিতীয় পুরুষটার কেশর ছিল আরও ঘন আর গাঢ় রঙের, ওজনও ছিল অনেক বেশি। গর্ভবতী যুবতী ছিল দুটো। বাকি তিনটে শিশু।

বাঁক বাঁক গুলি বৃষ্টির ফাঁক গলে এই পূর্ণ বয়স্ক সিংহটাই শুধু বেঁচে গেছে। ছুটছে সে, প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে তার পেটের ভিতর থকথকে রক্ত একদিক থেকে আরেক দিকে গড়াচ্ছে, এখনও পুরোপুরি জমাট বাঁধেনি। সারা শরীরে অবসাদ, প্রতি মুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, শুধু অসহ্য পিপাসা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে। অ্যাওয়াস নদীর কিনারা এখনও বারো মাইল দূরে।

ভোরে দেখা গেল চঞ্চলার চারটে চাকাই সল্ট প্যানের পাঁকে ডুবে গেছে। খালি গায়ে অবিরাম কোদাল চালানো রানা, ওকে সাহায্য করল আব্বাস খায়ের। এমনকী কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ ফুলবাবু মাইকেল সেভারসও নিজ উদ্যোগে কখনও কোদাল দিয়ে পাঁক সরাল, কখনও কাঁটাঝোপের মোটা ডাল কেটে এনে জড়ো করল এক জায়গায়।

মনোযোগের অভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, ফলে নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে কাজ করছে রানা, জানে কমপক্ষে পুরো একটা দিন পিছিয়ে পড়ল ওরা। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অসহ্য গরম ওর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়, এই অজুহাত মেনে নিতে না পারায় রাগটা আত্মপীড়নের সমতুল্য হয়ে উঠেছে। আব্বাস তো আগেই ওকে সাবধান করে দিয়েছিল।

সূর্য উঠবার আগে এক ঘণ্টা কাজ করল ও, পাঁচ মিনিট বিশ্রাম

নিয়ে তারপর আরও দু'ঘণ্টা, রোদ আর গরম অসহ্য হয়ে উঠবার পরও কাজ শেষ না করে থামল না।

প্রথমে চার চাকার আশপাশ থেকে পাঁক সরানো হলো। এরপর গাড়ির এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের নীচে সমতল পাথর আর মোটা ডাল ফেলে শক্ত একটা ভিত রচনা করল রানা। ধুলো কাদায় শুয়ে গাড়ির বেস-এ ফিট করা হলো জ্যাকট। ধীরে ধীরে গাড়ির সামনের দিকটা উঁচু করে তোলা হলো। জ্যাকের হাতল পালা করে ঘোরাচ্ছে রানা আর মাইকেল।

সামনের চাকা এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঁচু হলো, আব্বাস আর অ্যানি চার হাতে ওগুলোর তলায় ডালপালা ভরল। কঠিন পরিশ্রমের কাজ, পুনরাবৃত্তি করা হলো পিছনের চাকাতেও।

দুপুর পেরিয়ে যাবার পর প্রাথমিক কাজটা শেষ হলো-ডালপালা আর পাথরের চারটে স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চঞ্চলা। তার পেট সারফেস ছেড়ে উঠে এসেছে।

‘এবার?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল। ‘পিছন দিকে চালাবে?’

‘চাকা একবার ঘুরলেই সমস্ত ডালপালা উড়ে যাবে,’ বিড়বিড় করে বলল রানা, পাকিয়ে গোল করা শার্ট দিয়ে ঘাম মুছল বুকের। মাইকেলের দিকে তাকিয়ে ভারি অস্বস্তি বোধ করল ও, রোদের ভিতর একটানা পাঁচ ঘণ্টা গাধার খাটনি খেটেছে সে, ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে, মাটিতে কাত হয়ে থেকে হাতল ঘুরিয়েছে জ্যাকের, অথচ লোকটা প্রায় ঘামেনি বললেই চলে, তার কাপড়ে কোথাও কোন দাগ নেই-ঈর্ষাবোধ করবার আরও একটা বড় কারণ, তার চুল এমন সুন্দরভাবে সাজানো যেন এইমাত্র চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হয়েছে।

রানার পরামর্শ মত আরও কিছু ডালপালা কেটে আনা হলো, সেগুলো সল্ট প্যানের কিনারায়, শক্ত আবরণের উপর ফেলল

ওরা। নিতম্বিনীকে চালিয়ে সল্ট প্যানের ধারে নিয়ে এল অ্যানি, তিনটে মোটা ম্যানিলা লাইন-এর কয়েল দিয়ে দুটো গাড়িকে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হলো। চঞ্চলার টারিটে উঠে গেল মাইকেল, হুইলের দায়িত্ব নিল সে। আব্বাস আর রানা দুটো মোটা ডাল নিয়ে নীচে থাকল, দরকার হলে চাকা তুলবার কাজে ব্যবহার করবে ওগুলো।

‘প্রার্থনা ইত্যাদির অভ্যাস আছে, মাইকেল?’ হাঁক ছেড়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ওল্ড চ্যাপ, আজও তুমি আমাকে চিনতে পারলে না?’ পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল মাইকেল। ‘আমি কর্ম, কৌশল আর অভিজাত্যে বিশ্বাসী।’

‘তা হলে তোমার অভিজাত ভাগ্যটাকে সাফল্য প্রসব করতে বলো,’ মুখ ভেঙেচাল রানা, দেখল নিতম্বিনীর হ্যাচের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যানির সোনালি মাথা। আগেই এঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে অ্যানি, শব্দটা বাড়ল এবার, পিছনের দিকে এগোল গাড়ি, টান টান হলো লাইনগুলো।

ধীরে ধীরে চঞ্চলাকে টানছে নিতম্বিনী, ডালপালার শক্ত ভিতের উপর দিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পিছু হটছে চঞ্চলা। অবশেষে শক্ত মাটিতে উঠে এল চাকা। স্বস্তি আর বিজয়ের আনন্দে পাগলের মত হেসে উঠল ওরা।

লুকিয়ে রাখা একটা বাক্স থেকে চার বোতল বিয়ার বের করল রানা। বোতলের ভিতর বিয়ার এতই গরম হয়ে আছে যে ছিপি খুলবার সঙ্গে সঙ্গে হুস করে অর্ধেকের বেশি বুদবুদ হয়ে উপচে পড়ল, এক ঢোকের বেশি জুটল না কারও কপালে।

‘সন্ধ্যার আগে আমরা অ্যাওয়াস নদীতে পৌঁছুতে পারব?’

রানার প্রশ্ন শুনে সূর্যের অবস্থান দেখে নিল আব্বাস। ‘আর যদি সময় নষ্ট না করি।’

সল্ট প্যান এড়াবার জন্য নতুন দিক নির্ণয় করা হলো। কলামের আকৃতি নিয়ে আবার রওনা হলো গাড়িগুলো। বিকেলের মাঝামাঝি সময় বালিসর্বশ্ব মরুতে পৌঁছুল ওরা, টাওয়ারের মত উঁচু বালিয়াড়িগুলো নীচের গভীর গহ্বরে লোভনীয় গাঢ় ছায়া ফেলেছে। বালির রঙ কোথাও গভীর লালচে, কোথাও প্রায় বেগুনি, আবার কোথাও হালকা বাদামি ও সাদা, আর বালি এত মিহি ও নরম যে প্রতিটি বালিয়াড়ির চূড়া থেকে ধোঁয়ার মত উড়ছে বাতাসে।

আব্বাসের দিক নির্দেশনায় উত্তর দিকে ঘুরে গেল কলামের নাক, আধ ঘণ্টার মধ্যে নাগাল পাওয়া গেল আয়রনস্টোনের দীর্ঘ বিস্তৃতি, বালিময় মরুকে দ্বিখণ্ডিত করে সরু একটা বাঁধের মত এগিয়ে গেছে। আঁকাবাঁকা পাথুরে বাঁধের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল কলামটা, দু’পাশে ক্রমশ আরও উঁচু হয়ে উঠল বালিয়াড়িগুলো।

ইথিওপিয়ান নিভূমির শুকনো সমতল ঘাস-ঢাকা প্রান্তরে এমন হঠাৎ করে বেরিয়ে এল ওরা, বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খাওয়ার মত অনুভূতি হলো ওদের। অবশেষে মূল মরু পিছিয়ে পড়ল, সামনের ধু-ধু প্রান্তরে গাছ না থাকলেও উঁচু ঝোপ রয়েছে প্রচুর। গোটা প্রান্তর শুকনো ঘাসে মোড়া, যদিও ঘাসের রঙ পুড়ে গেছে রোদে, দেখতে হয়েছে অনেকটা ফ্যাকাসে সাদা বা রূপোর মত। সবচেয়ে যেটা খুশি করল ওদের, ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে ডাকছে দূর দিগন্তের কাছ থেকে গাঢ় নীল পাহাড়শ্রেণী।

নিচু ঘাস, নরম; মহানন্দে ছুটল চার লৌহমানবী। সামনের পিঁপড়ের গর্ত বা উইটিবি পড়লে মাঝে মধ্যে ঝাঁকি খেলো, তবে

www.BanglaBook.org

গুরুতর কোন সমস্যা হলো না। দিন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, যাত্রাবিরতির সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে রানা, এই সময় ওদের সামনের খোলা প্রান্তর ভোজবাজির মত ফাঁক হয়ে গেল। পঞ্চাশ ফুট নীচে অ্যাওয়াস নদীর খাদ দেখতে পেল ওরা, কিনারা থেকে বুকে বড় বড় বোল্ডার নিয়ে প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে ঢাল। ঠিক নদী নয়, বলা চলে নালা-গাড়ি থেকে নেমে সবাই ওরা নালায় ঠোটের কাছে ভিড় জমাল, সবারই হাত পা আড়ষ্ট হয়ে আছে।

‘ওই ইথিওপিয়া, দুশো গজ সামনে। দেশের মাটিতে শেষবার দাঁড়িয়েছি আমি দু’বছর আগে,’ বিড়বিড় করে বলল আব্বাস খায়ের, দিনের শেষ আলোয় চকমক করে উঠল তার বড়সড় চোখ। আদিস আবাবার কাছাকাছি উঁচু একটা উৎস থেকে রওনা হয়ে খাদের ভিতর দিয়ে নিভূমির দিকে চলে এসেছে অ্যাওয়াস নদী। আব্বাস আরও জানাল, ভাটির দিকে খানিকদূর গেলে দেখা যাবে নিচু জলাভূমিতে হারিয়ে গেছে নদীটা। এই মুহূর্তে এখনও ওরা সোমালি প্রজাতন্ত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সামনে ইথিওপিয়া।

‘ওয়েলস অভ চান্ডি আর কতদূর?’ আব্বাসকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল মাইকেল। তার জন্য ওটাই রঙধনুর শেষ প্রান্ত, অর্থাৎ ওখানে পৌঁছলেই সোনায়ে ভরে উঠবে তার ঝোলা।

কাঁধ ঝাঁকাল আব্বাস। ‘আর হয়তো পঞ্চাশ মাইলের মত।’

‘কিন্তু এটা পেরোব কীভাবে?’ বিড়বিড় করে বলল রানা, নীচের অস্পষ্ট নালায় দিকে তাকিয়ে আছে। ছায়ার ভিতর নালায় পানি স্নান রূপোর মত।

‘উজানের দিকে একটা উট চলার পথ আছে, গেছে জিবুতির দিকে,’ বলল আব্বাস। ‘পাড় হয়তো একটু খুঁড়তে হতে পারে, তবে আমার মনে হয় পার হতে পারব আমরা।’

‘তোমার ধারণা যেন সত্যি হয়, বৎস,’ বলল মাইকেল। ‘বাড়ি ফিরতে হলে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।’

দিনের বেলা খাদের গভীরে যে স্বচ্ছ পানির উপর চোখ বুলিয়েছে অ্যানি উইসপার, রাতে সেটা স্বপ্ন হয়ে ফিরে এল তার কাছে। পাহাড়ী ঝর্ণার ফেনাসমৃদ্ধ একটা দুর্বীর প্রবাহের স্বপ্ন দেখল সে, জলপ্রপাত হয়ে লাফিয়ে পড়ছে পাহাড়ের কিনারা থেকে শ্যাওলা মোড়া বড়বড় পাথরের উপর, আরও নীচে জলজ আগাছা নিয়ে ঠাণ্ডা গভীর খুদে একটা লেক, লেকের চারধারে ঘন সবুজ বাঁশঝাড় আর নারকেল গাছ। তারপরই তার ঘুম ভেঙে গেল। অস্থির বোধ করল সে, বুঝতে পারছে ক্লান্ত; ঘামে ভিজে গেছে চুলের গোড়া, ঘাড় আর কপাল। আকাশে সবেমাত্র ভোরের প্রথম প্রতিশ্রুতি ডানা মেলেছে।

মনে হলো সে-ই একমাত্র জেগে আছে। চাদর সরিয়ে সন্তর্পণে গাড়ির কাছে চলে এল অ্যানি, তোয়ালে আর টয়লেট ব্যাগটা নিল। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই ইস্পাতের উপর স্প্যানারের শব্দ হলো, ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে। দেখল, চঞ্চলার এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা।

রানা তাকে দেখতে পাবার আগেই চুপিসারে কেটে পড়তে চাইল অ্যানি, কিন্তু হঠাৎ সিঁধে হলো ও। ‘কোথায় যাচ্ছে?’ গলার আওয়াজ মোটেও নরম নয়। ‘ভেবেছ জানি না? শোনো, অ্যানি, আমি চাই না ক্যাম্পের বাইরে একা একা তুমি ঘুরে বেড়াও।’

‘আমার নিরাপত্তার জন্যে তোমার উদ্বেগ সত্যি প্রশংসনীয়, জনাব মাসুদ রানা। কিন্তু ঘটনা হলো, নিজেকে আমার বড় নোংরা লাগছে। নদীতে যাচ্ছি জানো, কিন্তু জানো কি কেউ আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না?’

ইতস্তত করল রানা, তারপর বলল, ‘তা হলে তোমার সাথে আমাকে যেতে হবে।’

‘থ্যাক্সস, বাট নো থ্যাক্সস,’ হেসে উঠে বলল অ্যানি। ‘আফ্রিকায় এসেছি বটে, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তিগুলোয় অভ্যস্ত হওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। নদীতে আমি যাচ্ছি গোসল করতে, সেখানে তোমার উপস্থিতি আমার কাম্য নয়।’ আবার একবার মৃদু শব্দে হাসল সে।

ইতিমধ্যে জেনেছে রানা, মেয়েটার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, দেখল নালার ঠোঁট থেকে খাড়া ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল সে, একেবারে অদৃশ্য হবার আগের মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল, দুষ্টিমিভরা ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে, যার কোন অর্থ করতে পারল না রানা।

ঝুরঝুরে নরম মাটি, পায়ের ধাক্কায় নুড়ি পাথরগুলো গড়িয়ে পড়ছে নীচের দিকে, অস্থির ভাবটা দমন করে সাবধানে নামতে শুরু করল অ্যানি। খানিকটা নামবার পর সরু একটা পথ পেয়ে গেল সে, পানি খেতে আসা পশুদের আসা-যাওয়ায় তৈরি হয়েছে। ঝুঁকি কমল, নিরাপদ একটা তির্যক কোণ সৃষ্টি করে নেমে গেছে পথটা, স্বস্তির সঙ্গে সেটা ধরে নামতে লাগল অ্যানি। নরম মাটিতে একটা গভীর পদচিহ্ন রয়েছে, পাঁচটা আঙুল নিয়ে পিরিচের চেয়েও বড় আকারের। চোখ নামিয়ে কোথায় পা ফেলছে তাকাল না অ্যানি, তবে তাকালেও কী দেখছে বুঝতে পারত কি না সন্দেহ। আয়নার মত চকচকে নালার পানি হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

খাদের নীচে নেমে অবাক হলো সে, শুকিয়ে এত ছোট হয়ে গেছে নদী যে বুকে স্রোত বলে কিছু নেই। নালার কোথাও পানি

খুব একটা গভীর নয়, এখানে সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে আছে লম্বা সমতল পাথর। কাপড়চোপড় খুলে পানিতে নামল সে, কালকের রোদে গরম হওয়া পানি এখনও পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়নি। পায়ের তলায় সমতল পাথর, পিচ্ছিল লাগল। নালায় দাঁড়িয়ে দু'হাত ভরা পানি ঢালল মাথায় আর মুখে, তারপর গা থেকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করল ধুলো আর ঘাম।

একটু পর নালায় কিনারায় ফিরে এল অ্যানি, টয়লেট ব্যাগ খুলে একটা বডি শ্যাম্পুর বোতল বের করল। আবার কোমর সমান পানিতে ফিরে এসে গায়ে শ্যাম্পু মাখল সে। শারীরিক একটা পুলকে বার বার শিউরে উঠল, আবার একটু ভয় ভয়ও করেছে—এরকম খোলা জায়গায় কখনও গোসল করেনি সে। সারা শরীরে শ্যাম্পু মাখবার পর স্বচ্ছ পানিতে ডুব দিল অ্যানি। পানির উপর মাথা তুলল, আর ঠিক তখুনি তার মনে হলো, কেউ দেখছে তাকে।

ইতিমধ্যে ভোরের আলো ভালভাবেই ফুটেছে, অ্যানি আন্দাজ করল আবার রওনা হবার জন্য ক্যাম্পে ওরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। প্রথমে মাইকেলের কথাই ভাবল সে, পিছু নিয়ে এসে থাকতে পারে। কিন্তু ছেড়ে আসা নালায় কিনারা বা প্রায় খাড়া ঢালে চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখতে পেল না সে।

তবু, সাবধান হওয়া দরকার। ঢালের দিকে পিছন ফিরে আবার ডুব দিল সে। পানির উপর মাথা তুলবার পর আবারও সেই একই সন্দেহ জাগল মনে, কেউ তাকে দেখছে। এবার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল অ্যানি, নালায় অপর পাড়টা ভাল করে দেখবার জন্য সমতল একটা পাথরে উঠে পড়ল, তলপেট আর বুক ঢাকল হাত দিয়ে।

নিষ্ঠুর সোনালি একজোড়া চোখ দেখছে তাকে, চোখের তারা

চকচকে কালো ফাটলের মত, স্থির অপলক দৃষ্টি।

লালচে-সোনালি পশুরাজ নালায় উল্টোদিকের ঢালের মাঝামাঝি একটা সমতল পাথরের উপর বসে আছে। সামনের জোড়া পায়ের উপর চিবুক ঠেকিয়ে রেখেছে, বসে থাকবার ভঙ্গির মধ্যে অনড়-অটল ভাবটুকু রোমহর্ষক, যদিও দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যানি ওটাকে চিনতে পারেনি।

তারপর অত্যন্ত ধীরগতিতে খাড়া হলো কেশর, মাথাটাকে ঘিরে ফুলে উঠল, আকারে আরও বড় হয়ে উঠল সিংহটা। সেই সঙ্গে নড়ে উঠল লেজ, যেন একটা ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে ঢেউ তুলে সামনে-পিছনে আসা-যাওয়া করছে।

হঠাৎ চিনতে পেরে মাথাটা ঘুরে গেল অ্যানির, সেদিন রাতের গুরুগম্ভীর গর্জন আবার ফিরে এল তার কানে। আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ, আত্ননাদ করে উঠল সে।

চঞ্চলার ইগনিশন অ্যাডজাস্ট করছিল রানা, কাজটা শেষ করে হাতে লেগে থাকা গ্রিজ পরিষ্কার করবার জন্য অ্যামোনিয়ার বোতলটা মাত্র ধরেছে, এই সময় অ্যানির আত্মচিৎকার শুনতে পেল। সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ছুটল ও।

চিৎকারটা এত তীক্ষ্ণ আর ভয়ানক, অজানা আশংকায় রানার বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আবার আত্ননাদ শোনা গেল, কোথায় পড়ছে না দেখেই কিনারা থেকে লাফ দিল ও, ঢালে পড়ে পিছলে গেল পা, নরম মাটির উপর একটা ডিগবাজি খেয়ে সিঁধে হলো আবার, কোন বিরতি না নিয়ে সববেগে নেমে এল খাদের নীচে। প্রথম চিৎকারটা শুনবার পর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পেরিয়েছে, নালায় পাশে পাথুরে পাড়ে পৌঁছে গেল ও। পানির

কিনারা থেকে সামান্য দূরে, একটা সমতল পাথরের উপর নগ্ন দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যানি উইসপার, দুটো হাতই মুখের উপর চেপে ধরা। সরু, মেদহীন শরীরের উপর নিজের অজান্তেই চোখ বুলাল রানা। তলপেট এত সরু, রানার মনে হলো দু'হাতের আঙুল লম্বা করে ধরলে তালুর ভিতর চলে আসবে। কোমর থেকে নীচে ও উপরে ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে শরীরটা। সম্ভবত উন্মুক্ত বলেই অস্বাভাবিক লম্বা লাগছে পা দুটো।

‘অ্যানি!’ এত কাছে, তবু চিৎকার করে জানতে চাইল রানা, ‘কী হয়েছে?’

ঝট করে রানার দিকে ঘুরল অ্যানি, লাফিয়ে ওঠায় আবার একবার রানার চোখ গিয়ে পড়ল জোড়া স্তনের উপর। জানে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, তবু চোখ ফেরানো সহজ হলো না। রানাকে চিনতে এক সেকেন্ড সময় নিল অ্যানি, পরমুহূর্তে ছোট একটা লাফ দিয়ে ছুটে এল সে, রানাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য সামনে বাড়িয়ে দিল হাত দুটো। মুখে রক্ত নেই, সোনালি-সবুজ চোখে নগ্ন আতংক। ‘রানা!’ ফুঁপিয়ে উঠল সে। ‘ওহ্ গড, রানা!’ এতক্ষণে রানার নজরে পড়ল নালার উল্টোদিকে কী একটা যেন নড়ছে।

ক্ষতটা শক্ত হয়ে গেছে রাতের মধ্যে, সিংহের পিছন দিকটা এখন প্রায় পঙ্গুই বলা চলে, ছিন্নভিন্ন নাড়িভুঁড়ি থেকে পাঁজরের খাঁচার ভিতর বেরিয়ে আসা দূষিত তরল পদার্থ সারা শরীরে বিষের মত ছড়িয়ে পড়েছে, গুরু হয়ে গেছে সংক্রমণ। মানুষের আকৃতি দেখামাত্র তার যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা তা হলো না-আক্রোশ আর রাগের ভাব কম, তারচেয়েও কম শক্তি-সামর্থ্য। তবু মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে শিকারীদের স্মৃতি ফিরে এল মনে, তারাই তো তার এই যন্ত্রণাকর অবস্থার জন্য দায়ী, আর সেই সঙ্গে ক্রোধে উন্মাদ

হয়ে গেল আহত পশুরাজ।

তারপরই আরও একটা ঘণিত দু'পেয়েকে দেখতে পেল সে। শরীরের দুর্বলতা আর আড়ষ্ট ভাব দূর করবার জন্য আর কিছুই দরকার করে না, চার পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, গরগর করে উঠল।

অ্যানির আলিঙ্গন এড়িয়ে গেল রানা, খপ্প করে তার একটা বাহু চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, ইচ্ছা তাকে ওর পিছন দিকে সরিয়ে দেওয়া। হোঁচট খেতে খেতে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল অ্যানি, রানার আচরণে অবাক হয়ে গেছে। তার পিঠে ধাক্কা দিল রানা, ঢালের গা বেয়ে ঐক্যেঁকে উঠে যাওয়া সরু পথটা দেখিয়ে চিৎকার করে বলল, ‘দৌড়াও! দৌড়াতে থাকো!’ অ্যানিকে ছেড়ে দিয়ে ঝট করে নালার দিকে ফিরল ও, দেখল অপর দিকের ঢাল বেয়ে এরইমধ্যে নালার কিনারায় নেমে এসেছে সিংহটা। যমদূতের মত ছুটে আসছে ওর দিকে।

এই প্রথম খেয়াল হলো রানার, অ্যামোনিয়ার বোতলটা এখনও ওর হাতে। অগভীর নালায় নেমে পড়েছে সিংহ, দু'পাশে পানি ছিটিয়ে তেড়ে আসছে ওর দিকে। আহত হলেও ওটার ছুটে আসবার ভঙ্গিতে কোন জড়তা নেই। এত কাছে এসে পড়েছে, বাঁকা উপরের ঠোঁটের গায়ে গোঁফ জোড়া পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, গলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা চাপা গরগর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ছুটে পালাবে না, ওটাকে আসতে দেবে। কারণ এখন ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা। একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছন দিকের বাতাসে হেলান দিল রানা, মাথার পাশে উঠে গেল বোতল ধরা হাতটা, গায়ের সমস্ত শক্তি

একত্রিত করে ছুঁড়ে দিল সেটা। নিরস্ত্র মানুষের শেষ চেষ্টা, জানে কাজ হবে না, তবু হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস।

সোজা ছুটে গিয়ে সিংহের মাথায় লাগল বোতল, ঠিক কপালের মাঝখানে। পাথরের উপর, অ্যানি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, লাফ দিয়ে সেখানটায় পড়ছে ওটা, এই সময় বোতলটা লাগল। বিস্ফোরিত হলো বোতল, কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল মাথার চারপাশে, কটুগন্ধ তরল অ্যামোনিয়ায় ঢাকা পড়ে গেল দুই চোখ আর নাক, হাঁ করা মুখের ভিতরও ঢুকল খানিকটা। ঘ্রাণশক্তি হারাল সিংহ, চোখ আর গলার ভিতরটা এমন জ্বালা করে উঠল যেন আগুনের ছাঁকা দিয়ে ছাল তুলে নিয়েছে কেউ। গর্জে উঠল পশুরাজ, তার গোটা অস্তিত্ব প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়েছে। পাথরটাকে নাগালের মধ্যে পেল না, ভারি বস্তুর মত ঝপাৎ করে অগভীর পানিতে পড়ল, ডুবে থাকা পাথরে পিঠ দিয়ে ছটফট করতে লাগল।

গড়াতে গড়াতে আরও কম পানিতে সরে এল সিংহ। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল দু'বার, পারল না। তবে তৃতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলো। ছুটল রানা, থামল, ঝুঁকে তুলে নিল ফুটবল আকারের ভারি একটা পাথর। নালার কিনারায় দাঁড়িয়ে পাথরটা ছুঁড়বার জন্য মাথার উপর তুলেছে, দেখল অন্ধ সিংহ সরাসরি ওর দিকে লাফ দিতে যাচ্ছে।

ভয়ে শিউরে উঠল রানা। দু'হাতে ধরা পাথরটা সজোরে ছুঁড়ে দিল উপর থেকে। কামানের গোলার মত ছুটে গেল সেটা, পাথর আর সিংহ শূন্য থাকতেই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো। সিংহের ঘাড় আর শিরদাঁড়া যেখানে এক হয়েছে, ঠিক সেখানটায় চুরমার হয়ে গেল হাড়। গতি রুদ্ধ হলো, ধপাস করে নালার কিনারায়

পড়ে গেল পশুরাজ, কাত হলো ধীরে ধীরে।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, যতটা না পরিশ্রমে তারচেয়ে বেশি ভয়ে হাঁপাচ্ছে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে আঙুলের ডগা দিয়ে ওটার স্নান চোখের পাতা সরাল। তরল গ্যাস এরইমধ্যে চোখের তারা বিবর্ণ করে তুলেছে, রানার স্পর্শেও সেটা নড়ল না। মারা গেছে সিংহ।

ঘুরল রানা, দেখল ওর নির্দেশ অমান্য করে সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি, নগ্ন আর অসহায়। মায়া লাগল রানার, ছুটে এল তার পাশে।

চেহারায় কার প্রতি যেন অকারণ অভিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি, বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে—ঈশ্বর, রানাকে বাঁচাও, রানাকে বাঁচাও! হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে।

রানা জানে, এই আলিঙ্গনের উৎস প্রেম নয়, আতংক। তবু হার্টবিট স্বাভাবিক হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল, নিরেট একটা সুবিধে অর্জন করেছে ও। তুমি যদি কোন মেয়ের প্রাণ বাঁচাও, সে তোমাকে সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য, অন্তত যুক্তি তাই বলে। আড়ষ্ট একটু হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। সমস্ত ভয় নিঃশেষে মুছে গেল মন থেকে, ভুলে গেল সিংহের কথা। ভাবল, এই সুবিধে সে নেবে না। কিন্তু বডি শ্যাম্পুর মিষ্টি গন্ধ পেল ও। কোমল নারীদেহের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ দেহ-মনে পুলক জাগিয়ে তুলল। অ্যানি তাকে এখনও গায়ের জোরে চেপে ধরে রেখেছে। তাকে একটু দূরে সরাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না।

‘ওহ্, রানা!’ ভাঙা গলায় ফিসফিস করল অ্যানি, আর তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর রানাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল এই মুহূর্তে অ্যানি

ওর। অ্যানি চাইছে এখানে, এই মুহূর্তে, নিজের অধিকার আদায় করে নিক রানা।

এখানে, এই খোলা নদীর ধারে? সদ্য নিহত সিংহের পাশে? কেন নয়, কেন নয়, রানা? নিজের সঙ্গে তর্ক করছে ও। এই সময় অনুভব করল, ওকে সাহায্য করবার জন্য ওর বুক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে অ্যানি।

দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল। মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল রানার। দুটো মুখ পরস্পরের দিকে এগোল। অ্যানি মুখ তুলল, রানা নামাল। ওরা চুমো খাবে, ঠিক এই সময় বাধা।

‘নীচে তোমরা করছটা কী শুনি? কী হচ্ছে ওখানে?’ খাদের মাথা থেকে হাঁক ছাড়ল মাইকেল, দাঁড়িয়ে রয়েছে একেবারে ঢালের কিনারায়, হাতের ভাঁজে লী এনফিল্ড বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল। তার ভাব দেখে মনে হলো, ঢাল বেয়ে নামতে যাচ্ছে।

অ্যানিকে ধরে ঘোরাল রানা, নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করল নগ্ন দেহটাকে, তারপর গা থেকে খুলে পরিয়ে দিল লেদার জ্যাকেটটা। অ্যানির উরুর মাত্র অর্ধেকটা ঢাকা পড়ল, আর বগলের কাছে ফুলে থাকল বেচপ আকৃতি নিয়ে। এখনও সে একটু একটু কাঁপছে, যেন ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে একটা অসহায় শিশু। নিঃশ্বাস ফেলছে ভাঙা ভাঙা।

‘আর শুনে কী হবে?’ ঢালের মাথায় দাঁড়ানো মাইকেলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল রানা। ‘যখন দরকার ছিল তখন সুযোগ হারিয়েছ, এখন আর তোমাকে দরকার নেই।’ পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বের করে অ্যানির দিকে বাড়িয়ে দিল ও। আড়ষ্ট, কাঁপা কাঁপা হাসির সঙ্গে সেটা নিল অ্যানি। ‘চোখ মুছে নাও,’ বলল রানা। ‘আমার ধারণা, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে দুনিয়াসুদ্ধ সবাই ছুটে আসবে এখন, তার আগে প্যান্টটা পরে

নাও। নইলে...হাঃ হাঃ হাঃ!’

এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হলো যে কয়েক মিনিট কথাই বলতে পারল না আব্বাস খায়ের। কারও সাহায্য না নিয়ে একা কোন হিংস্র পশুকে বধ করা ইথিওপিয়ায় অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার, গোত্রের লোকেরা রাতারাতি শিকারীর অঙ্ক ভক্ত হয়ে উঠবে। আর পূর্ণ-বয়স্ক একটা পুরুষ সিংহকে খালি হাতে মেরে ফেলা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপ্রত্যাশিত, কেউ যদি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। বীরশ্রেষ্ঠ শিকারী তখন বীরত্বের প্রতীকচিহ্ন হিসাবে নিহত সিংহের কেশর পরিধান করতে পারে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই তাকে শ্রদ্ধা জানায়। যে শিকারী বন্দুক ছুঁড়ে সিংহ মারে সে শ্রদ্ধার পাত্র, যে বর্শা দিয়ে মারে তার সম্মান আরও বেশি-কিন্তু একটা মাত্র পাথর আর এক বোতল অ্যামোনিয়া দিয়ে সিংহ মারা যায় এ-কথা জীবনে এই প্রথম শুনল আব্বাস।

ছালটা নিজের হাতে ছাড়াল সে। কাজটা শেষ করবার আগেই মাথার উপর বৃত্ত রচনা করে চক্র দিতে শুরু করল কালো তীরচিহ্নের মত শকুনের দল। লাশটা নদীর পাড়ে ফেলে এল সে, ভিজে চামড়াটা নিয়ে উঠে এল খাদের উপর, ইতিমধ্যে আবার রওনা হবার প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছে রানা।

চামড়ার ব্যাপারে রানার কোন আগ্রহ নেই শুনে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো আব্বাস। ‘মাসুদ ভাই, কী বলছেন আপনি! এটা সাথে থাকলে আমার গোত্রের লোকেরা আপনার পুজো করবে! যেখানেই যাবেন, লোকজন আপনার দিকে আঙুল তুলে পরস্পরকে দেখাবে।’

‘খুব ভাল কথা। অসুবিধে একটাই—কেউ পুজো-টুজো করতে চাইছে বুঝতে পারলে নিজের ওপর ঘৃণার পরিমাণটা বেড়ে যায়। যাক, সে তুমি বুঝবে না। এবার তৈরি হও...।’

‘কেশর দিয়ে আমি আপনার জন্যে একটা পাগড়ি বানিয়ে দেব, মাথায় জড়িয়ে রাখবেন...,’ চামড়াটা চঞ্চলার উপর নামিয়ে রাখল সে। ‘আপনাকে যা সুন্দর লাগবে না!’

‘পাগড়ি? মাথায় পরবে?’ শুকনো গলায় বলল মাইকেল। ‘তা পরতে পারে, কিন্তু তাতে শুধু ওর চুলের এখনকার স্টাইল একটু উন্নত হবে, তার বেশি কিছু না। স্বীকার করছি, কেশরটার রঙ ভারি চমৎকার, আরও স্বীকার করছি, রানা ছেলে হিসেবে দারুণ—কিন্তু ওর কথার প্রতিধ্বনি তুলে আমিও বলতে চাই, অনেক হয়েছে, এবার তৈরি হয়ে নাও, কারণ তোমরা যা শুরু করেছ তাতে যে-কোন মুহূর্তে আমি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।’

যে-যার গাড়ির দিকে এগোল ওরা, লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত রানার পাশে চলে এল আব্বাস। তামার জ্যাকেট পরানো বুলেটটা রানাকে দেখাল সে, চ্যাপ্টা হয়ে আছে। ফিসফিস করে বলল, লাশটার ভিতর থেকে পেয়েছে সে।

বুলেটটা হাতের তালুতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ভাল করে পরীক্ষা করল। ‘নাইন মিলিমিটার কিংবা নাইন পয়েন্ট থ্রি,’ মৃদু কণ্ঠে বলল ও। ‘স্পোর্টিং ক্যালিবার—মিলিটারি নয়।’

‘ইথিওপিয়ার এদিকে এমন কোন রাইফেল আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না যা দিয়ে এই বুলেট ছোঁড়া যেতে পারে।’ আব্বাস খায়ের গম্ভীর, তার চোখে উদ্বেগ। ‘রাইফেলটা অবশ্যই কোন বিদেশীর।’

‘এখুনি ঢাক-ঢোল পেটাবার দরকার নেই,’ বলে বুলেটটা

আব্বাসকে ফিরিয়ে দিল রানা। ‘তবে কথাটা আমরা মনে রাখব।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলেই যাচ্ছিল আব্বাস, হঠাৎ রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরে নিজের দিকে টানল ওকে, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আলিঙ্গন করল। ‘মাসুদ ভাই,’ পিছিয়ে গিয়ে বলল সে, ‘হোক আহত, তবু প্রায় খালিহাতে একটা সিংহকে মেরে ফেলা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আজ আপনার এই বীরত্ব দেখে আমার সাহস কী পরিমাণে বেড়ে গেছে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আজ আমি শিখলাম সাহস করে রুখে দাঁড়ালে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এতদিন আমরা শুধু শিফটাদের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি, আমাদের এবার রুখে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে...।’

আব্বাসের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে হাসল রানা, ছেলেটার ভাবাবেগ ও উপলব্ধি ওর মনে দোলা দিয়ে গেল। ‘বেঁচে থাকার জন্যেই সাহস দরকার, আব্বাস। তুমি ঠিকই বুঝেছ। শোনো, দ্বিতীয় সিংহটা এলে তাকে বলব, দাঁড়াও, আব্বাসকে খবর দিই—কেমন?’

দশ

বৃষ্ণহীন ধু-ধু প্রান্তরের চারদিক ঘাসে ঢাকা। অ্যাওয়াস নদীর আঁকাবাঁকা পাড় ধরে এগোল ওরা। দূর দিগন্তে অসমান রেখাগুলো পাহাড়, প্রতি ঘণ্টায় দূরত্ব কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের গায়ে উঁচু হতে শুরু করল ওগুলো, ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাথরের দীর্ঘ পাঁচিল আর ঘন বন-জঙ্গলে ঢাকা গভীর খাদগুলো অস্পষ্টভাবে চেনা গেল।

নদীর পাড় ঘেঁষা এই পথ হাজার বছর ধরে মরুভাসীরা ব্যবহার করে আসছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে একা এই পথে কেউ কোন কালে আসেনি-ব্যবসা, যুদ্ধ বা দেশত্যাগের উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু কাফেলার সঙ্গে আসা-যাওয়া করেছে। হঠাৎ করে সামনের পথে একটা ছেদচিহ্ন দেখতে পেল ওরা, নদীর খাড়া পাড় খানিকটা সমতল হয়ে রয়েছে ওখানটায়, ঢালও তত খাড়াভাবে নেমে যায়নি। ঢালের গায়ে অসংখ্য সরু পথ দেখল ওরা, বোঝাবাহী পশুদের এই সব পথ দিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রতিটি পথ লাল মাটির গভীর নালার মত, বড় বড় পাথর আর পাথরের পাঁচিলগুলোকে এড়িয়ে একেবেঁকে নেমে গেছে নদীর দিকে।

পাড় আরও সমতল করা দরকার, খালি গায়ে তিনজনই ওরা কাজে নেমে পড়ল। দেখতে দেখতে মিহি ধুলো লেগে লাল হয়ে উঠল ওদের চুল আর গা। পথগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে চওড়াটা বেছে নিল রানা, সেটাকে আরও চওড়া করবার জন্য গাধার খাটুনি খাটতে হলো। পথের মাঝখানে কোথাও গর্ত রয়েছে, আবার কোথাও ফুলে আছে মাটি, সেগুলো সমান করতে হলো। পথ চওড়া করতে গিয়ে কিছু বড় পাথর সরাল ওরা, ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিল নদীতে। সন্ধ্যার সময় কাজ বন্ধ করল ওরা, সবাই এত ক্লান্ত যে কথা বলবারও শক্তি নেই। রাতে ওরা ঘুমাল মড়ার মত।

ভোর অন্ধকারে আবার ওদেরকে কাজে ফিরিয়ে আনল রানা। আরও প্রায় দু'ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ধারণা করা হলো, এবার বোধহয় গাড়িগুলো নিয়ে নীচে নামা যাবে। প্রথম গাড়িটায় মাইকেল থাকবে, টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, সারা গায়ে লাল ধুলো নিয়ে ভান করছে কায়িক পরিশ্রমে তার মর্যাদা বা ফুলবারু

ভাবটুকু মোটেও ক্ষুণ্ণ হয়নি। রানার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসল সে, নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার করে বলল, 'দুর্ঘটনায় আমি মারা গেলে আমার ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পত্তির মালিক তোমরা,' বলে চট করে একবার অ্যানির দিকে তাকাল সে, পরমুহূর্তে ইস্পাতের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাড়ে উঠে গেল আর্মারড কার, কিনারা থেকে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করবে এবার। সাধ্যমত চওড়া করা হয়েছে পথটা, কিন্তু ঢালু ভাব কমিয়ে যথেষ্ট লেভেল করা যায়নি, দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। সেজন্য অবশ্য সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়েছে। মাইকেলের গাড়ি যদি ছমড়ি খেয়ে বা ডিগবাজি খেয়ে পড়তে শুরু করে, ওটাকে টেনে রাখবে চঞ্চলার সঙ্গে বাঁধা মোটা একাধিক রশি। তবে না, কোন অঘটন না ঘটিয়েই ঢাল বেয়ে নেমে গেল মাইকেল।

নদীর উপরের ঢাল বেয়ে ওঠা তেমন কঠিন হলো না, যদিও সময় লাগল প্রচুর। ওদিকের ঢাল যথেষ্ট চওড়া, তেমন খাড়াও নয়। লাইন ব্যবহার করল রানা, একটা গাড়ি আরেকটাকে টেনে তুলে নিল। রোদে পোড়া ইথিওপিয়ার শক্ত মাটিতে যখন পা রাখল ওরা, বিকেল প্রায় শেষ হতে চলেছে। নিতম্বিনীর ফেলা ছায়ায় বসে হাঁপাতে লাগল তিনজনই, ব্যস্তভাবে ওদেরকে মগভর্তি গরম চা পরিবেশন করল অ্যানি।

গরম চা খেয়ে জিভ পুড়ে গেল আববাসের। 'সামনে আর কোন বাধা নেই,' বলল সে। 'ওয়েলস অভ চান্ডি অর্থাৎ কুয়া পর্যন্ত খোলা মাঠ।' হঠাৎ তিনজনের দিকে পালা করে তাকাল সে, ক্লান্ত চেহারায় উজ্জ্বল হাসি ফুটল। 'ওয়েলকাম টু ইথিওপিয়া!'

'সত্যি কথা বলতে কি, ওল্ড বয়, তোমার এই রোদ আর

বালির বদলে প্যারিসের একটা পানশালাই আমি বেশি পছন্দ করব,’ বলল মাইকেল, মিটিমিটি হাসল। ‘আমার দুধ-সাদা অভিজাত হাতে চকলেট সালে সোনাভর্তি ঝোলাটা ধরিয়ে দিক, পরমুহূর্তে সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে তোমরা।’

আচমকা দাঁড়াল রানা, কপালে হাত রেখে দূরে তাকাল। তাপ-তরঙ্গের ভিতর দূরের মাটি তরল পদার্থের মত টলটল করছে। ছুটল ও, চঞ্চলার কাছে পৌঁছে থামল, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল টারিটে। আবার যখন নেমে এল, হাতে একটা বিনকিউলার রয়েছে। সবাই ঘিরে দাঁড়াল ওকে, দূরে কী যেন দেখবার চেষ্টা করছে ও।

‘ঘোড়সওয়ার!’ বলল রানা।

‘ক’জন?’ দ্রুত জানতে চাইল মাইকেল, মারমুখো চেহারা।

‘মাত্র একজন। এদিকেই আসছে।’

ছুটে গিয়ে লী এনফিল্ড রাইফেলটা তুলে নিল মাইকেল, ব্রিচে কার্টিজ ভরল।

খালি চোখে এতক্ষণে ওরা তাকে দেখতে পেল, তাপ-তরঙ্গের ভিতর লম্বা পতাকার মত কাঁপছে, ঘোড়া আর তার সওয়ার যেন মাটি স্পর্শ না করে উড়ে আসছে ওদের দিকে। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল, ঢাল বেয়ে আবার উঠবার পর আগের চেয়ে অনেক বড় হলো আকার-আকৃতি, ছুটন্ত ঘোড়ার পিছনে অলসগতি মেঘের মত ধুলো ভাসছে। আরও অনেক কাছে চলে আসবার পর ঘোড়সওয়ারের শুধু কাঠামোটা চেনা গেল।

তালুতে সশব্দে চুমো খেয়ে হাতটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল আব্বাস খায়ের, তীক্ষ্ণ একটা উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এল গলা চিরে, রোদে বেরিয়ে এসে ছুটল আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের অত্যাৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করল ঘোড়সওয়ার,

দক্ষতার সঙ্গে অকস্মাৎ বিশাল সাদা স্ট্যালিয়নের লাগাম টেনে ধরল সে, সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হলো ঘোড়া। ঘোড়সওয়ারের সাদা আলখেল্লা ফুলে উঠল তীব্র বাতাসে, ঘোড়া থেকে উড়াল দেওয়ার ভঙ্গিতে শূন্যে লাফিয়ে পড়ল, নামল আব্বাস খায়েরের প্রসারিত দুই বাহুর মাঝখানে।

দুটো মূর্তি পরমানন্দে জোড়া লেগে থাকল, দীর্ঘদেহী আব্বাসের আলিঙ্গনের ভিতর আগন্তুককে হঠাৎ করে ছোট আর ভঙ্গুর লাগল, ওদের হাসি আর অভ্যর্থনা তীক্ষ্ণকণ্ঠ পাখির মত।

পরস্পরের হাত ধরে, একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে গাড়ির পাশে অপেক্ষারত দলটার দিকে এগিয়ে এল ওরা।

‘ঈশ্বরপুত্র যীশু আর মাতা মেরীর কিরে,’ কসম খেয়ে বলল মাইকেল, ‘আরেকটা মেয়ে!’ তার চোখে আনন্দ আর বিস্ময়ের ঢল নেমেছে, হাতের রাইফেল তাড়াতাড়ি একপাশে রেখে দিল।

সবাই ওরা একহারা গড়নের সুশ্রী শ্যামলা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আব্বাসের বয়স যদি আঠারো হয়, তার বয়স সতেরো কিংবা উনিশ হওয়া সম্ভব। সাদার উপর কালো মণি ছটফট করছে, হাসি আর কৌতুকের একজোড়া প্রাণবন্ত উৎস। যার চোখ আছে সে-ই এক পলকে বুঝে নেবে জনের পর থেকে শুধু হাসছে আর হাসছে মেয়েটা, লম্বা পাতার ভিতর বড় বড় চোখে রাজ্যের দুষ্টামি। গায়ের চামড়া চকচকে সিল্ক, নাকটা প্রায় খাড়া, জড়তাহীন হাঁটবার ভঙ্গিতে অপূর্ব একটা ছন্দ ফুটে ওঠে।

‘বানুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি?’ আনুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞেস করল আব্বাস। ‘ও আমার কাজিন, আমার কাকার বড় মেয়ে, এবং কোন সন্দেহ নেই, গোটা ইথিওপিয়ায় ও-ই সবচেয়ে সুন্দরী-রাহেলা বানু।’

‘কী বলছ বুঝতে পারছি,’ বলল মাইকেল। ‘ইথিওপিয়ার একটা দুর্লভ পাখি। সত্যি অত্যন্ত ভাগ্যবান আমরা।’

সবার নাম উচ্চারণ করে পরিচয় জানাল আব্বাস, প্রত্যেকের চোখে সরাসরি তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল বানু, প্রাচীন মিশরীয় রাজকুমারীর মত অভিজাত লম্বাটে চেহারায শান্ত সমাহিত ভাবটুকু ওদের দৃষ্টি কাড়ল। তার হাবভাব আর কথা বলবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো ওরা যেন তার কতদিনের পরিচিত। ‘আমি জানতাম, ঠিক এখানটায় তোমরা অ্যাওয়াস পেরোবে, এটাই তো একমাত্র জায়গা-তাই দেখা করার জন্যে চলে এলাম।’

‘ওর ইংরেজি শুনে অবাক হচ্ছেন?’ সগর্বে বলল আব্বাস। ‘কৃতিত্বটা আমার দাদুর, তাঁর পরিবারের সবাইকে তিনি ইংরেজি শিখতে বাধ্য করেছেন। বানুর কথা অবশ্য একটু আলাদা। আমরা সমবয়সী হলেও, দু’বছর আগেই লন্ডন থেকে বেড়িয়ে এসেছে ও।’

‘বাহু,’ প্রশংসা করল অ্যানি উইসপার, ‘তোমার ইংরেজি উচ্চারণ তো দারুণ ভাল।’

‘আদিস আবাবার মিশনারি স্কুলে পড়েছি,’ এগিয়ে এসে অ্যানির হাত ধরে তার পাশে দাঁড়াল বানু, যেন এতক্ষণে সে তার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেল। ‘ওখানকার সিস্টাররা আমাকে শিখিয়েছে।’ ঘাড় ঘুরিয়ে নানাভাবে অ্যানিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল সে, যেন প্রিয় কোন উপহার নেড়েচেড়ে দেখছে, কোনরকম রাখ-টাক না করে খোলাখুলি বলল, ‘তুমি ভাই সাংঘাতিক সুন্দরী, মাথায় এত সোনা নিয়ে ঘুমোও কী করে? ওমা, তোমার চোখ দুটোও দেখছি অলংকার!’

এ-ধরনের অকপট প্রশংসা শুনে অভ্যস্ত নয় অ্যানি, পুরুষদের চোখের সামনে বেচারি লজ্জায় পড়ে গেল। অস্বস্তি দূর করবার

জন্য হাসল বটে, কিন্তু তার চেহারা সামান্য লালচে হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে রাহেলা বানুর চঞ্চল দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে আর্মারড কারগুলো। ‘ওগুলোও ভারি সুন্দর। সবাই জানে আসছে, কাজেই কারও মুখে অন্য কোন কথা নেই।’ কোমরের ফিতে খুলে ঢোলা আলখেল্লাটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলল সে, আব্বাসের হাতে ধরিয়ে দিল। তার পরনে এখন স্কার্ট আর খাটো ব্লাউজ। প্রাণচঞ্চল কিশোরের মত গাড়িগুলোর দিকে ছুটে গেল সে, নিতম্বিনীর গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল। ‘আর কোন চিন্তা নেই, এগুলো পাওয়ায় এখন আমরা শিফটাদের এক হাত দেখে নেব। আমাদের গোত্রের বীরের কোন অভাব নেই, অভাব ছিল অস্ত্র আর ওঅর মেশিনের।’ পালা করে মাইকেল আর রানার দিকে মনোযোগ দিল সে। ‘আমার গোত্রের তরফ থেকে আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এই উপকারের কথা আমরা কখনও ভুলব না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে...’

‘বাদ দাও, মাই ডিয়ার গার্ল,’ বিড়বিড় করে বলল মাইকেল। ‘গোটা ব্যাপারটাই আনন্দময় অভিজ্ঞতা। যদি জানতাম তুমি এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছ, বিলিভ মি, স্রেফ উড়ে চলে আসতাম।’ তার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, তার বাবা কি মনে করে নগদ টাকা সঙ্গে করে এনেছে? লোভী বা নির্লজ্জের মত শোনাতে ভেবে প্রশ্নটা করল না সে। ‘তোমার গোত্রের লোকজন কি আমাদের জন্যে কুয়ার কাছে অপেক্ষা করছে?’

‘বাবার সাথে আমার সব কাকা আর দাদুও এসেছেন-ওদের সাথে কয়েকশো রাসটা আর হারাবি আছে। মেয়ে-বউ আর পশুদেরও নিয়ে এসেছে তারা।’

‘লে বাবা,’ হেসে ফেলল রানা। ‘এ-ধরনের রিসেপশন

কমিটির কথা জীবনে শুনিনি।’

অভিযানের শেষ রাতটায় একটা কাঁটাগাছের প্রসারিত ডালের নীচে ক্যাম্প ফেলল ওরা, অ্যাওয়াস নদীর কিনারায়। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করল সবাই, আগুনটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসল। দুর্গ প্রাচীরের মত ওদেরকে ঘিরে থাকল চারটে আর্মারড কার। গভীর রাতে থামল গল্প, শান্ত নিস্তর্রতা নেমে এল আগুনের ধারে, নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল অ্যানি উইসপার। ‘একটু হাঁটাহাঁটি করে শুতে যাব আমি।’

তার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল বানুও। ‘আমিও তোমার সাথে হাঁটব।’ এরইমধ্যে রীতিমত ভক্ত হয়ে উঠেছে সে অ্যানির। ‘ভুলে যেয়ো না, আমি তোমার নিরপেক্ষ বন্ধু।’

ক্যাম্পের বাইরে এসে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা, মাথার উপর আকাশ ভর্তি তারা জ্বলজ্বল করছে। আলতোভাবে অ্যানির কজি ধরে মৃদু চাপ দিল বানু।

‘কিছু বলবে?’ জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

অ্যানির দিকে গম্ভীর মুখে তাকাল বানু, তারার আলোয় বিক করে উঠল তার চোখের মণি। ‘ওরা দু’জনেই তোমাকে মারাত্মকভাবে কামনা করে—রানা আর মাইকেল।’

আড়ষ্ট কণ্ঠে হেসে উঠল অ্যানি, বানুর সরাসরি কথা বলবার ধরন দ্বিতীয় বার তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল। ‘কী যা-তা বলছ!’

‘যা-তা নয়, খাঁটি সত্যি কথা। যখনই তুমি ওদের কাছাকাছি হও একজোড়া কুকুরের মত হয়ে যায় ওরা—আড়ষ্ট পিঠ বাঁকা করে পরস্পরকে ঘিরে ঘুরতে থাকে, যেন পরস্পরের লেজ ঝুঁকতে চাইছে।’ চাপা গলায় খিকখিক করে হেসে উঠল বানু, তার সঙ্গে অ্যানিকেও হাসতে হলো।

‘না, মানে, ব্যাপারটাকে এভাবে না দেখে...,’ শুরু করল অ্যানি, কিন্তু বাধা দিল বানু।

‘দু’জনের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ, অ্যানি?’ সিরিয়াস হয়ে জানতে চাইল সে।

‘গড, পছন্দ করতেই হবে এমন কোন কথা আছে?’ অ্যানির মুখে এখনও হাসি।

‘না, বাছ-বিচার না করলেও পারো,’ তাকে আশ্বস্ত করল বানু। ‘ইচ্ছে হলে দু’জনের সাথেই তুমি চালিয়ে যেতে পারো। আমি হলে তাই চালাতাম।’

‘চালিয়ে যেতে পারি...মানে?’

‘মানে প্রেম! এই সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে নাকি! আর শোনো, না বোঝার ভান করো না। ভান জিনিসটা আমি একদম সহিতে পারি না।’

হাসি গোপন করে অ্যানি জানতে চাইল, ‘তুমি হলে তাই করতে? দু’জনের সাথেই চালিয়ে যেতে?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। তা না হলে, তুমিই বলো, কাকে তুমি বেশি পছন্দ করো সেটা বোঝার উপায় কী?’

‘তা সত্যি।’ হাসি চেপে রাখায় দম বন্ধ হয়ে এল অ্যানির, তবে বানুর অদ্ভুত যুক্তি রীতিমত নাড়া দিয়েছে তাকে। ধারণাটার মধ্যে নগ্ন সত্য আর প্রচুর আবেদন রয়েছে, অস্বীকার করা যায় কি?

‘আব্বাসকে বিয়ে করার আগে বিশজনের সাথে প্রেম করব আমি। শুধু এভাবেই জানা সম্ভব কোন কিছু থেকে নিজেকে আমি বঞ্চিত করিনি, বুড়ো বয়সে সেজন্যে আপসোস করতে হবে না,’ ঘোষণার সুরে জানাল বানু।

‘বিশজন কেন, বানু?’ অ্যানিও বানুর মত গলার সুরে গুরুত্ব আর গাম্ভীর্য ফোটানোর চেষ্টা করল। ‘তেইশ বা ছাব্বিশ জন নয় কেন?’

‘ধ্যৎ, কী যে বলো না!’ সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কার করল বানু। ‘লোকে তা হলে আমাকে খারাপ মেয়ে বলবে যে!’ এরপর আর হাসি চেপে রাখা অ্যানির পক্ষে সম্ভব হলো না।

‘কিন্তু তুমি...’, বর্তমানের জরুরী সমস্যায় ফিরে এল বানু, ‘কাকে আগে পরীক্ষা করার কথা ভাবছ?’

‘তুমিই না হয় আমার হয়ে একজনকে বাছো,’ আমন্ত্রণ জানাল অ্যানি।

‘কাজটা কঠিন,’ স্বীকার করল বানু। ‘একজন ভাব দেখায় সে অতি সাধারণ, তারমানে তার হৃদয়টা বিশাল। অপরজন ভাব দেখায় সে অভিজাত, তারমানে তার রয়েছে দক্ষতা আর শক্তি।’ মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ‘না, সত্যিই ভারি কঠিন। উঁহু, না ভাই, এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি শুধু কামনা করতে পারি, তুমি সুখী হও।’

যতটুকু বুঝতে পারল, আলোচনাটা তারচেয়ে বেশি নাড়া দিয়ে গেছে অ্যানিকে। সারাটা দিন পথে থাকায় চরম ক্লান্ত হলেও, ঘুমাতে পারল না সে। পাথরের মত শক্ত মাটিতে একটা মাত্র চাদর বিছিয়ে শুয়েছে, শুধু এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকল-নিষিদ্ধ, চিন্তারও অতীত ধারণাটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারছে না। সমস্যাটা আগেও ছিল, বানু সেটাকে তার মনের গহীন গহ্বর থেকে তুলে এনে দেখিয়ে দিয়েছে শুধু। সত্যিই তো, জীবনসঙ্গী বাছবার আর কী উপায় আছে? পশ্চিমা জগতে মেয়েদের প্রায় অবাধ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের অনেককেই সারা জীবন ভুগতে হয়। কেউ কেউ ডিভোর্স করে ভুল সংশোধনের

চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ডিভোর্সের পরিণতিই বা ক’জনের জন্য সুখকর হয়? খুব ভাল হত যদি প্রথমবার বাছাই করবার সময় যাচাই করে নেওয়া যেত। আর যাচাই করতে হলে সম্ভাব্য সবরকমভাবে একাধিক পুরুষকে পরীক্ষা করা দরকার। হঠাৎ অ্যানির চিন্তায় বাধা পড়ল।

আস্তে আস্তে গা থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসল রাহেলা বানু। সাবধানে দাঁড়াল, তার ধারণা কেউ জেগে নেই। মাইকেলের দিকে এগিয়ে গেল সে। আবছা অন্ধকারে বিস্ফারিত হয়ে উঠল অ্যানির চোখ। ওখানে কে শুয়ে আছে, মাইকেল নাকি রানা?

ঘুমন্ত লোকটাকে টপকাল বানু, নিঃশব্দ পায়ে আব্বাসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে বসল সে, আব্বাসের বুকে হাত রেখে মৃদু ধাক্কা দিল। বোধহয় অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে আব্বাস, একবার ধাক্কা খেয়েই উঠে বসল সে। অ্যানি দেখল, কোমরে স্কার্ট থাকলেও বানুর গায়ে ব্লাউজ নেই, শুধু ব্রেসিয়ার পরে রয়েছে সে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল দু’জন। আকাশে সদ্য ওঠা চাঁদের আলোয় নগ্ন নারীমূর্তির মত আকর্ষণীয় লাগল বানুকে। তার কাঁধে একটা হাত রাখল আব্বাস, দু’জন বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্প থেকে।

ওদেরকে এভাবে যেতে দেখে আরও অস্থির হয়ে উঠল অ্যানির মন। রাতের মরুতে অচেনা কতরকম শব্দ, কান পেতে শুনতে লাগল সে। একবার মনে হলো মানুষের নরম গলা শুনছে, কে যেন ফুঁপিয়ে উঠল কোথাও। তবে দূর থেকে ভেসে আসা শিয়ালের ডাকও হতে পারে। ওরা দু’জন ফিরে আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল অ্যানি উইসপার।

জেনারেল ফাদের জরুরী তলব পেয়ে আসমারায় ফিরে এল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকেরেক। ওদের বৈঠকে তৃতীয় একটা পক্ষ উপস্থিত থাকল—মি. এক্স। কথা যা বলবার জেনারেল ফাদ আর মি. এক্সই বলল, সম্মতি জানিয়ে বারবার শুধু মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট।

ওয়েলস অভ চান্ডিতে পৌঁছতে থার্ড ব্যাটালিয়ান অস্বাভাবিক দেরি করছে। মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট—হ্যাঁ, দুঃখিত। ‘জোর গুজব ছড়িয়েছে, ওয়েলস অভ চান্ডি রক্ষার জন্য প্রতিপক্ষরা অস্ত্র আর লোকবল একত্রিত করছে। রিপোর্ট করা হয়েছে, আপনার শিফট সৈনিকরা যাবার পথে একাধিক গ্রাম লুণ্ঠ করেছে।

‘যদি করেও থাকে,’ কাউন্ট বলল, ‘মিছিলের লেজে যারা ছিল তারাই দায়ী।’

সিদ্ধান্ত দিল মি. এক্স। আপাতত বিশজন ভাড়াটে সৈনিক যোগাড় করা গেছে, পঞ্চাশজন শিফটাকে বাদ দিয়ে তাদেরকে থার্ড ব্যাটালিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। বিনা প্রতিবাদে সিদ্ধান্ত মেনে নিল কাউন্ট ডিকানডিয়া। তার কী, ওদেরকে সামলানোর দায়িত্ব তো মেজর লুইগি রাকার উপর। ‘জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী,’ জেনারেল ফাদকে আশ্বাস দিল সে, রোলস-রয়েসে চড়ে আসমারা ত্যাগ করল।

ইথিওপিয়ার বিশাল পার্বত্য এলাকা জুড়ে প্রতি বছর তুমুল বৃষ্টিপাত হয়, সেই পাহাড়ী ঢল লক্ষ লক্ষ জলপ্রপাত আর নালা বেয়ে নেমে আসে উপত্যকা আর নিভূমিতে। মাটির উপর পানির এই প্রবাহ বেশিরভাগটাই অবশেষে সাড জলাভূমির নিষ্কাশন ধারার সঙ্গে মিশে যায়, সেখান থেকে গিয়ে পড়ে নীল নদে, তারপর উত্তরে এগিয়ে মিশর হয়ে বিলীন হয়ে যায় ভূমধ্যসাগরে।

সামান্য কিছু পানি পথ ভুলে চোরা বা একমুখো নদীতে গিয়ে

পড়ে, তারই একটা হলো অ্যাওয়াস। কিছু পানি পথ ভুল করলেও, শেষ পর্যন্ত কোন নদীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না—নরম মাটি, বৃক্ষহীন প্রান্তর বা মরুভূমি শুষে নেয়।

স্বতন্ত্র কিছু ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতির কারণে এই সাধারণ নিয়ম লংঘিত হয়, এর জন্য দায়ী স্ফটিক শিলার একটা স্তর। স্তরটা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বিস্তৃত হয়ে সমতলভূমির লাল মাটির তলায় পৌঁছে একটা অগভীর পিরিচের আকৃতি নিয়েছে। পাহাড়ী ঢলের একটা অংশ এই স্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তৈরি করেছে সরু আর লম্বা একটা আভারথ্রাউন্ড রিজারভয়ার, সারডি গিরিসংকটের গোড়া থেকে শুকনো উত্তপ্ত বৃক্ষহীন প্রান্তরের নীচে বিস্তৃত হয়ে আছে একটা আঙুলের মত।

পাহাড়ের কাছাকাছি পানির গভীরতা বেশি, মাটি থেকে কয়েকশো ফুট নীচে। কিন্তু তারপর, মাটি যেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে তেমনি ওই শিলা স্তরও ক্রমশ উঁচু হয়েছে, ফলে পানির স্তর উঠে এসেছে—মাটি থেকে মাত্র চল্লিশ ফুটের মধ্যে।

হাজার হাজার বছর আগে দলবদ্ধ বুনো হাতিদের বিচরণক্ষেত্র ছিল এলাকাটা। কীভাবে যেন পাতাল লেকের সন্ধান পেয়ে যায় ওরা। পা আর দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে পৌঁছে যায় পানির সারফেসে। শিকারীরা হাতির বংশ প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে, কিন্তু তাদের কুয়া আজও খোলা রেখেছে অন্যান্য পশুরা—বুনো গাধা, হরিণ, উট, আর হাতি নিধনযজ্ঞের হোতা মানুষ।

কুয়াগুলো, দু’তিন মাইলের মধ্যে বারো-তেরোটা হবে, লাল মাটিতে গভীর গর্তের মত। প্রতিটি কুয়ার গা বেয়ে সরু আঁকাবাঁকা পথ নেমে গেছে, এত খাড়াভাবে যে পানির উপর সূর্যের আলো পৌঁছায় না বললেই চলে।

পাতাল লেকের পানিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি, দেখতে সবুজ দুধের মত, খেতেও বিশ্বাস লাগে, তবু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিপুল সংখ্যক প্রাণীকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তরের এই একটা মাত্র এলাকাতেই ঘন হয়ে গাছপালা জন্মেছে, চারদিকে সবুজের ছড়াছড়ি।

কুয়াগুলো ছাড়িয়ে, পাহাড়ের দিকে এগোলে যে এলাকাটা সামনে পড়বে, সেটা ভাঙাচোরা আর এলোমেলো-অসংখ্য চৌকো টিলা আর নদী-নালায় ভর্তি। টিলাগুলো একেবারে নিচু, আর বৃষ্টি না হলে শুকনো থাকে নদী-নালা। যুগ যুগ ধরে যে-সব রাখাল পশুর পাল নিয়ে কুয়ার উদ্দেশ্যে এসেছে, ওই টিলা আর নালায় পাড়ে গুহার ভিতর বিশ্রাম নিয়েছে বা রাত কাটিয়েছে তারা। এলাকা জুড়ে গুহা আর সুড়ঙ্গই শুধু দেখা যায়।

প্রকৃতি যেন কুয়াগুলোকে শান্তিপূর্ণ এলাকা বলে ঘোষণা করেছে। মানুষ আর পশু এখানে সতর্কতার সঙ্গে শান্তিচুক্তি মেনে চলে, আশ্চর্যকর অর্থেই এক ঘাটে পানি খায়, প্রায় কখনোই শান্তি ভঙ্গ করে না। তামাটে সবুজ ঘন কাঁটাগাছের ফাঁকে বিভিন্ন জাতের হরিণ, ছাগল, গাধা, উট ইত্যাদি অবাধে বিচরণ করে।

সুন্ধ দুপুরে পুর্ব থেকে এগিয়ে এল চারটে আর্মারড কারের কলাম, অপেক্ষারত জনগোষ্ঠীর কানে দূর থেকে ভেসে এল এঞ্জিনের কর্কশ গর্জন।

কলামের সামনে রয়েছে রানা, আগের মতই তার ঠিক পিছনে নিতম্বিনীতে রয়েছে অ্যানি, তারপর আব্বাস আর বানু, ওদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বানুর স্ট্যালিয়নও আসছে। সবার পিছনে রয়েছে মাইকেল। হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল বানু যে সব ক'টা এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল আওয়াজটা, সবুজ ঝোপ আর কাঁটাগাছ ঢাকা নিচু উপত্যকার দিকে হাত তুলল সে। কলাম দাঁড়

করাল রানা, টারিটের উপর উঠে দাঁড়াল।

চোখে বিনকিউলার তুলে খোলা বনভূমিটা দেখল রানা। হঠাৎ অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়তে প্রায় আঁতকে উঠল। যেন ধুলোর ডানায় ভর করে ছুটে আসছে ঝাঁক ঝাঁক ঘোড়সওয়ার। ‘মাই গড!’ বিস্ময় ধরে রাখতে পারল না ও। ‘কয়েকশো মানুষ!’ অস্বস্তি বোধ করেছে, তার কারণও আছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওদেরকে কচু-কাটা করতে আসছে।

পরমুহূর্তে ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। ঝট করে তাকাতেই দেখল, তীরবেগে ওকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল স্ট্যালিয়নটা, শিরদাঁড়া খাড়া করে ওটার খালি পিঠে বসে রয়েছে রাহেলা বানু, রোদের ভিতর তীব্র বাতাসে ফুলে আছে তার সাদা আলখেল্লা। আগন্তুক ঘোড়সওয়ারদের দিকে ছুটে যাচ্ছে বানু, বিরতিহীন তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, যেন একটা উন্মাদিনী খেপে গেছে। তার আচরণ খানিকটা আশ্বস্ত করল রানাকে। কলামটাকে এগোবার সংকেত দিল ও।

প্রথম সারির লোকগুলো পৌঁছল ঘোড়া আর উটের পিঠে চড়ে। কালো চেহারা সবার, কুৎসিতই বলা যায়, হিংস্র আর নির্দয় ভাব স্থায়ী ছাপ ফেলে রেখেছে মুখে। প্রত্যেকের পরনে নোংরা ঢোলা পোশাক, গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা-সাদা, কালো, লাল সব রঙেরই আছে। কারও হাতে তরোয়াল আর ঢাল, কেউ মাথার উপর তুলে ধরেছে বর্শা, অনেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও দেখা গেল। প্রায় সবার মাথায় কিছু না কিছু আছে-হয় পাগড়ি, নয় হেলমেট, অথবা বহুবর্ণ টুপি। পিতলের চাকতি দিয়ে তৈরি করা মালা পরেছে অনেকে, কারও গলা থেকে রঙচঙে কাপড়ের তৈরি অসংখ্য ফিতে ঝুলছে। অনেকের হাতে লাল কাপড়ের পট্টিও দেখা গেল।

কাছাকাছি এসে প্রথম সারির লোকগুলো ঘিরে ধরল আর্মারড কারের ড্রাইভারদের। চারদিকে ধুলোর পাহাড় সৃষ্টি হলো। মানুষ আর পশুর ভিড়ে দম আটকে মারা যাওয়ার অবস্থা।

বেশিরভাগ লোকের দাড়ি রয়েছে, মাথাতেও কেউ কেউ লাল কাপড়ের পট্টি বেঁধেছে, দু'একজন মাথায় জড়িয়েছে সিংহের কেশর। উলুবনে শিয়াল যেমন রাজা, ইথিওপিয়ার এদিকটায় জংলী এই লোকগুলো তেমনি বীরযোদ্ধা। রানা আর ওর সঙ্গী-সামান্যদের ঘিরে নৃত্য শুরু করে দিল তারা, লু-লু চিৎকারে কাঁপিয়ে তুলল আকাশ-বাতাস।

আর্মস স্মাগলিঙের অভিজ্ঞতা রয়েছে মাইকেলের, অস্ত্র আর গোলাবারুদ সম্পর্কে রানার রয়েছে ভাল ধারণা, জংলী যোদ্ধাদের সংগ্রহ দেখে রীতিমত তাজ্জব বনে গেল দু'জনেই। প্রতিটি অস্ত্র অত্যন্ত পুরানো হলেও, অস্তুত বিশ রকমের আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে তারা। কয়েক ধরনের মার্টিনি হেনরি কারবাইন থেকে শুরু করে লম্বা মাজল টাওয়ার, কী নেই! মাউজার, লী-মেটফোর্ডসও সংখ্যায় কম নয়। নৃত্য-গীত খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ফাঁকা গুলিবর্ষণের উদ্দাম প্রতিযোগিতা। কালো ধোঁয়ার রেখা দাগ কাটল সন্ধ্যার স্নান আকাশে, বিস্ফোরণের অবিরাম আওয়াজের সঙ্গে আবার শুরু হলো অভ্যর্থনাসূচক লু-লু চিৎকার।

দ্বিতীয় সারির লোকজন এল গাধা, উট আর খচ্চরের পিঠে চড়ে। তারা ধীরগতিতে এলেও, কর্ণপীড়ন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকল না। তাদের ঠিক পিছু পিছু এল পদাতিক বাহিনী, ভিড়ের সঙ্গে মিশে আছে মেয়েলোক, শিশু-কিশোর আর কয়েক ডজন সরব কুকুর।

ছুতুস্ত মিছিলের পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হলো এক মহিলা, তারপর তার পেটে উটের পা পড়ল। মহিলার কোল থেকে আগেই

ছিটকে পড়েছে দুধের বাচ্চাটা। সেদিকে ছুটে যাওয়ার সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো রানার, নিরেট পাঁচিলের মত সচল ভিড় বাচ্চা আর তার মাকে কোথায় যে হিঁচড়ে নিয়ে গেল তাও জানবার কোন উপায় থাকল না। এভাবে আরও কত যে প্রাণহানির আশংকা দেখা দিত বলা যায় না, ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বিপদটা টের পেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করল রাহেলা বানু। প্রথম সারির সামনে থেকে স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণস্বরে নির্দেশ দিল সে, ধীরে ধীরে স্থির পাথর হয়ে গেল উল্লাসে উন্মত্ত জনতা। জংলীদের আনুগত্য প্রকাশের এই দৃষ্টান্ত মুগ্ধ করল রানাকে। বুঝতে পারল গোত্রপ্রধানদের একজন হিসাবে বানুকে তারা কী পরিমাণ সম্মান করে। এরপর রানার উদ্দেশ্যে চিৎকার করল বানু।

আবার রওনা হলো কলাম। চঞ্চলার সামনে থাকল আদিবাসীদের নৃত্যরত মিছিল, নেতৃত্ব দিয়ে কুয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বীরঙ্গনা রাহেলা বানু। সামনে ঘন বনভূমি, কুয়াগুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বনভূমি ভেদ করে বেরিয়ে এল মিছিল, এবার পথ করে নিতে হবে একটা অগভীর পাথুরে নালার ভিতর দিয়ে—নীচটা শুকনো খটখটে, দু'পাশে প্রায় খাড়া তার গা।

এখানে পৌঁছে সামনে এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। গোটা নালা মানুষের নিরেট আবরণে ঢাকা পড়ে গেল, এমনকী মাটি আর পাথরের খাড়া গায়ে ও মাথার উপর সরু কার্নিসে এমন গিজগিজ করছে মানুষ যে কম ভাগ্যবানরা ঠেলাঠেলি সামলাতে না পেরে টপাটপ গড়িয়ে পড়তে লাগল নীচে। যন্ত্রণাকাতর চিৎকার আর প্রতিবাদের কঠিন ভাষা মহা শোরগোলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

প্রতিটি টারিট থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল ড্রাইভাররা, যেন গর্ত থেকে সন্ত্রস্ত হুঁদুর মাথা তুলছে। পরস্পরের সঙ্গে অসহায় সংকেত বিনিময় করল ওরা, এই হাঙ্গামার মধ্যে অন্য কোনভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

আবারও উদ্ধারকারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো রাহেলা বানু। ইতিমধ্যে রানার একটা ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। স্ট্যালিয়ন থেকে লাফ দিয়ে রানার গাড়ির সামনের বনেটে নামল বানু, আদিবাসীদের মধ্যে যারা গাড়ির গায়ে ঝুলছে বা উপরে উঠতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্যে এলাপাতাড়ি কিল-ঘুসি চালাল সে। তার আগে আধ ঘণ্টা ধরে বহু চেষ্টামেচি করেছে সে, কেউ তার কথায় কান দেয়নি। জংলী কি আর সাথে বলা হয়, কখন যে ওরা সুবোধ বালক আর কখন যে বেয়াড়া আচরণ করবে কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। তবে একটা ব্যাপারে রানার কোন সন্দেহ নেই, অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানটা দারুণ উপভোগ করছে বানু। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে, সেখানে নগ্ন রণোন্মাদনা ঝিলিক মারছে। ইতিমধ্যে ভোজবাজির মত তার হাতে একটা চাবুক চলে এসেছে, অক্লান্ত উৎসাহের সঙ্গে উত্তেজিত জনতার পিঠে হরদম চালাচ্ছে সেটা। রানার একবার ইচ্ছে হলো বানুকে বাধা দেয়, কিন্তু তারপর অত্যন্ত বিপজ্জনক ভেবে বাতিল করে দিল ধারণাটা। তার বদলে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনার হাত থেকে বাঁচবার অন্য কী বিকল্প উপায় করা যায় ভাবতে লাগল। এদিক-ওদিক তাকাতে এই প্রথম নালার গায়ে গুহাগুলো দেখতে পেল ও।

অনেকগুলো গুহা থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে আদিবাসীরা। কেউ অশ্বারোহীর আঁটসাঁট পোশাক পরে আছে, কারও পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, প্রায় সবারই বুকে ঝুলছে অ্যামুনিশন বেল্ট, হাঁটুর নীচে লাল পট্টি বাঁধা, খালি পা। দু'হাতে

ধরে মাথার উপর মাউজার রাইফেল ঘোরাচ্ছে বন বন করে। এদের অনেকের মাথাতেও লাল কাপড়ের পট্টি দেখল রানা। উৎসাহের সঙ্গে উপভোগে এরাও বানুর চেয়ে কম যাচ্ছে না, তবে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার কাজে অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে।

‘ওরা আমার দাদুর গার্ড,’ রানার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করল বানু, শরীরের উপর দিয়ে এইমাত্র বিরাট ধকল যাওয়ায় হাঁপাচ্ছে সে, কিন্তু আনন্দঘন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। ‘সত্যি আমি দুঃখিত, রানা,’ আবার বলল সে, রানা যেন তার কতদিনের পুরানো আর সমবয়সী বন্ধু। ‘আমার লোকজন মাঝে-মধ্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।’

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘আমিও তাই লক্ষ্য করছি।’ একটু পর রানা জিজ্ঞেস করল, ‘মাথায় আর পায়ে, কারও কারও হাতেও, কী ওগুলো? লাল কাপড়ের পট্টি...?’

‘ওরা কমিউনিস্ট, সম্রাট হাইলে সেলাসিকে উৎখাত করতে চায়,’ বলল বানু। ‘যদিও কমিউনিস্টদের কোন সংগঠন এদিকে এখনও গড়ে ওঠেনি। আমার দাদু লোকমুখে শুনেছে কমিউনিস্টদের প্রতীক চিহ্ন হচ্ছে লাল, ব্যস, নিজের লোকদের লাল পট্টি ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে সে। কিন্তু আমার বাবা আর কাকারা কমিউনিস্টদের তেমন একটা সমর্থন করে না। এখনও ওরা সম্রাটের দলে। তবে শিফটাদের বিরুদ্ধে সম্রাট সেনাবাহিনী না পাঠালে এবার ওদের দল বদল করতে হবে।’

উল্টো করা রাইফেল হাতে গার্ডরা তেড়ে আসায় গাড়িগুলোর সামনে থেকে ভিড় খানিকটা কমল। শোরগোলের মাত্রা কমে যা দাঁড়াল তার সঙ্গে মাঝারি ধরনের পাহাড় ধসের তুলনা করা চলে।

ক্লাস্ত চারজন ড্রাইভার নেমে এল গাড়ি থেকে, গুহাগুলোর সামনে খোলা একটা জায়গার দিকে সতর্কতার সঙ্গে নিরেট স্তম্ভের আকৃতি নিয়ে এগোল তারা। প্রতিরক্ষা জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে রানা আর মাইকেলের মাঝখানে থাকল অ্যানি, তার পিছনে দুর্গপ্রাচীরের মত রয়েছে আব্বাস। পুরুষদের বগলের তলা দিয়ে সাঁাৎ করে বেরিয়ে তার পাশে এসে হাত ধরল বানু, নিজেকে আরও খানিক নিরাপদ মনে হলো অ্যানির।

‘প্লিজ, ঘাবড়িয়ে না,’ ফিসফিস করে অভয় দিল বানু। ‘আমরা সবাই তোমার বন্ধু।’

‘উল্টোটা বলে অনায়াসে আমাকে বোকা বানাতে পারতে, লক্ষ্মী বোনটি!’ বানুর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে পাণ্টা হাসল অ্যানি। ঠিক এই সময় একটা গুহা থেকে ছোট মিছিলটা বেরিয়ে এল।

মিছিলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তালগাছের মত সরু আর লম্বা এক বৃদ্ধ, ঠিক যেন মানুষের আকৃতি নিয়ে একটা ক্যারিকেচার। শক্ত, হাড়সর্বশ্ব কাঠামোয় লাল হলুদ ডোরাকাটা ঢোলা আলখেল্লা বুলছে। তার হাঁটবার সঙ্গে আলখেল্লার গায়ে ফুটে উঠছে পায়ের আকৃতি, এতই সরু যে হাড়ের উপর কোন মাংস আছে কিনা সন্দেহ। গাঢ় রঙের মাথায় কোন চুল নেই, মুখে নেই কোন দাড়ি-গোঁফ বা ভুরু।

বুলে থাকা কোঁচকানো আর বিবর্ণ চামড়ায় তার চোখ দুটো প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে। মুখের ভিতর একটা দাঁতও অবশিষ্ট নেই, ফলে দু’দিকের চোয়াল ভিতর দিকে সঁধিয়ে গেছে, ভাঁজ করে রেখেছে গোটা মুখটাকে। সব মিলিয়ে যে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হলো অশীতিপর বৃদ্ধ তিনি, কিন্তু পরমুহূর্তে ধারণাটা মিথ্যে হয়ে যায় তাঁর হাঁটবার ভঙ্গিটা লক্ষ করলে। বুক ফুলিয়ে হাঁটছেন, প্রাণ-চঞ্চল যুবকের মত দীর্ঘ পদক্ষেপে, কারুকার্য করা

বাঁটসহ রাইফেলটা অনায়াসে বহন করছেন কাঁধে, চামড়া ঢাকা লম্বাটে গর্তের ভিতর থেকে শকুনের দৃষ্টি হানছেন চারপাশে। অথচ তবু রানার মনে হলো, ভদ্রলোকের বয়স আশির কম তো হতেই পারে না।

ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে বৃদ্ধের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল আব্বাস খায়ের, সালাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

ফিসফিস করে ওদেরকে জানাল বানু, ‘উনি আমার দাদু, কামাল হাসান। দাদু ইংরেজি জানেন না, তবে জানেন সারা দুনিয়ায় ইংরেজির কদর আছে। আজও তিনি বীরযোদ্ধা হিসেবে নিজের খ্যাতি ধরে রেখেছেন—শুধু যে গোত্রপ্রধান তাই নয়, গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে সাহসীও বটেন।’

ড্রাইভার চারজনের ওপর চোখ বুলালেন বৃদ্ধ কামাল হাসান, ধুলো আর কাঁটাবিহীন টুইডের সুট পরা মাইকেল সেভারসকে তাঁর পছন্দ হলো। সামনের দিকে লাফ দিলেন তিনি, মাইকেল এড়িয়ে যাবার আগেই তাকে বলিষ্ঠ আলিঙ্গনের ভেতর নিয়ে পিষতে শুরু করলেন, মাইকেলের নাকে পিঁয়াজ-রসুন আর তামাক থেকে শুরু করে ঘাম ও ধুলোময়লার বিভিন্ন পদের গন্ধ ঢুকল। ‘হাউ ডু ইউ ডু?’ সিংহের মত গর্জে উঠলেন তিনি, তাঁর ইংরেজি জ্ঞান এই একটি মাত্র বাক্যে সীমিত।

‘আগেই শুনেছ, আমার দাদু ইংরেজির ভারি ভক্ত,’ সগর্বে ওদেরকে জানাল আব্বাস। ‘সেজন্যেই তো ছেলে আর নাতি-নাতনিদের ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন।’

‘দাদুর বুকে যে পদকগুলো দেখছ ওগুলো সম্রাট হাইলে সেলাসি নিজের হাতে ওঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন,’ বলল বানু। ‘সম্রাটকে উনি পছন্দ না করলে কী হবে, পদকগুলো ওঁর খুব প্রিয়।’

বেশিরভাগই সোনার চাকতি, দু'একটা পিতলও রয়েছে।

মাইকেলের সংগ্রাম চলছে, বৃদ্ধ কামাল হাসানের আলিঙ্গন থেকে এখনও সে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। বানুর হাবভাব থেকে আলোচ্য বিষয় আন্দাজ করতে পারলেন বৃদ্ধ, মাইকেলকে ছেড়ে দিলেন, ওরা সবাই যাতে তাঁর বুকে লটকানো পদকগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে পারে। ওদেরকে গাইডও করলেন—প্রতিটি পদকের দিকে সর্গর্বে আঙুল তাক করলেন তিনি।

‘অদ্ভুত সুন্দর, ওল্ড বয়, সত্যি অদ্ভুত সুন্দর,’ ঐকমত্য ঘোষণা করল মাইকেল, হাত দুটো জ্যাকেট আর মাথার চুল ঠিকঠাক করায় ব্যস্ত।

বৃদ্ধের বক্তব্য ভাষান্তর করে ওদেরকে শোনাল বানু। ‘দাদু তোমাদেরকে ইথিওপিয়ায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। বলছেন, যদিও ইংরেজরা আগের জেনারেশনে অত্যাচারী ছিল, আর এ-যুগেও তারা কালো মানুষদের ঘৃণা করে, তবে কীর্তিমান একজন ইংরেজ ভদ্রলোককে আলিঙ্গন করার সুযোগ পেয়ে তিনি ভারি গর্ববোধ করছেন। বাবার মুখে তোমার কথা আগেই শুনেছেন দাদু, জানেন তুমি একজন বীরযোদ্ধা...।’

ঠিক সেই মুহূর্তে বানুর কাকাদের সঙ্গে প্রিন্স হাসান সালে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। ‘আমার বাবা জানতে চাইছেন,’ সহাস্যে মাইকেলকে বলল হাসান সালে, ‘ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থাকার সময় তুমি যে পদকগুলো পেয়েছ সেগুলো সাথে করে এনেছ কিনা। বাবা চান ওগুলো পরেই তুমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।’

মাইকেলের চেহারা এক নিমেষে কালো হয়ে গেল। ‘খামো, ব্যস করো!’ চাপা স্বরে হিস হিস করে উঠল সে। বিস্তর টাকা কামানো ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা ভাবতেই পারে

না মাইকেল। সংকটময় মুহূর্তটি অবশ্য কেটে গেল, গোত্রপ্রধান কামাল হাসান গলা চড়িয়ে কাদের যেন ডাকাডাকি শুরু করলেন।

এগিয়ে এল কৃষ্ণবর্ণ যুবতীর দল, প্রত্যেকের হাতে ফুলের মালা, সবাই দীর্ঘ ওড়না দিয়ে মুখের বেশিরভাগ ঢেকে রেখেছে। ড্রাইভারদের নয়, মালা দিয়ে বরণ করা হলো আর্মারড কারগুলোকে।

এই সুযোগটা কাজে লাগাল বানু, অ্যানির হাত ধরে একটা গুহার ভিতর চলে গেল সে। ‘আমার চাকর তোমার জন্যে গোসলের পানি নিয়ে আসবে,’ বলল সে। ‘উৎসব অনুষ্ঠানে তোমাকে সাংঘাতিক সুন্দর দেখানো চাই। আমরা হয়তো আজ রাতেই ঠিক করে ফেলব তোমার জন্যে ওদের মধ্যে কাকে বাছা যায়।’

গাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কামাল হাসানের অনুসারীরা মূল নালায় শৃংখলা বজায় রেখে জড়ো হলো। যারা গোত্রপ্রধানের প্রিয় বা সম্মানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী অথবা যারা ভিড়ের গায়ে ঠালা-গুঁতো দিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে পারল তাদের জায়গা হলো মাঝখানের সবচেয়ে বড় গুহাটায়। বাকি সবাই উপত্যকা জুড়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে বসল। চারদিকে আলখেল্লা পরা কালো মূর্তি গিজগিজ করছে। গোল হয়ে বসে আগুন জ্বালল প্রতিটি দল, একশোরও বেশি অগ্নিকুণ্ডের আলো প্রতিফলিত হলো রাতের আকাশে ভাসমান সাদা মেঘের গায়ে।

রাতের আকাশে হালকা গোলাপি আভা, বিশ কিলোমিটার দূর থেকে সেটা দেখতে পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল মেজর লুইগি রাকা।

থার্ড ব্যাটালিয়ানকে থামবার নির্দেশ দিল সে, একটা ট্রাকের ছাদে উঠে রহস্যটা কী বুঝবার চেষ্টা করল, সন্দেহ হচ্ছে সদ্য অস্ত্র যাওয়া সূর্যের অলস কোন আভা কি না। কিন্তু না, ব্যাপারটা সেরকম মনে হলো না।

লাফ দিয়ে নীচে নামল সে, ড্রাইভারের দিকে আঙুল তাক করে বলল, ‘অপেক্ষা করো।’ ক্যানভাস ঢাকা ট্রাকগুলোকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোল সে, কমান্ড কারের দিকে যাচ্ছে।

‘মাই কর্নেল!’ রোলস-রয়েসের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ভিতরে তাকাল সে।

গাড়ির পিছনের সিটে হেলান দিয়ে রয়েছে কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক, চোখ দুটো বন্ধ। জেনারেল ফাদ আর মি. এক্সের শীতল আচরণ তার অহমিকা, আভিজাত্য আর গর্বে আঘাত করেছে, সেটা এখনও ভুলতে পারছে না সে। মেজর রাকার উপস্থিতি টের পেলেও এমন কোন ভাব দেখাল না যাতে বোঝা যায় জেগে আছে। তবে মেজরের কথা শেষ হতে নিস্তেজ গলায় বলল, ‘পরিস্থিতি বুঝে যা ভাল মনে হয় করো। শুধু একটা ব্যাপারে লক্ষ রেখো, সকালের আগেই ওয়েলস অভ চান্ডি যেন আমাদের দখলে চলে আসে।’

পরিস্থিতি বুঝে মেজর রাকা থার্ড ব্যাটালিয়ানকে সেই মুহূর্তে পূর্ণ সতর্কবস্থায় থাকবার নির্দেশ দিল। কোন অবস্থাতেই আলো জ্বালা চলবে না, এমনকী জোরে কথাও বলা নিষেধ। এরপর সামনে বাড়বার নির্দেশ দিল সে, তবে আস্তে-ধীরে। ট্রাক বহর শমুকগতিতে এগোল, এঞ্জিনের আওয়াজ যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখা হলো। সৈনিকরা সবাই যে যার অস্ত্র নিয়ে তৈরি অবস্থায় থাকল।

অবশেষে এক সময় ইরিত্রীয় গাইডরা হাত তুলে ওদের নীচে অগভীর উপত্যকাটা দেখাল মেজরকে। চাঁদের আলোয় উপত্যকার

গাছপালা প্রায় পরিষ্কারই দেখা গেল। দশ মিনিট পর রণকৌশল স্থির করে ফেলল মেজর রাকা। কোথায় মোটর পুল থাকবে, কোথায় রাত কাটাতে সৈনিকরা, মেশিনগান বসানোর জায়গা, রাইফেল ট্রেনের নির্দিষ্ট স্পট, এক এক করে সব ঠিক করে ফেলল সে। ভাল করে কিছু না দেখেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাকে সমর্থন জানাল কাউন্ট ডিকানডিয়া। শান্তভাবে কয়েকটা নির্দেশ দিল মেজর, ফলে পরিষ্কার হয়ে গেল রাতে সৈনিকরা ঘুমানোর সময় পাবে না। ‘আর যদি কারও হাত থেকে শাবল পড়ে যায় বা কেউ যদি হাঁচি দেয়, তাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাব-তারই নাড়ি গলায় বেঁধে।’

বড় গুহাটার ভিতর বাতাস এত ভারি আর গরম, যেন ভিজে একটা উলেন কম্বলের নীচে চাপা পড়েছে ওরা। আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, যতদূর দেখা যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। দানবীয় ছায়া ফেলে ছোটোছুটি করছে চাকর-বাকররা। অভিযাত্রী, অতিথি বা সৈনিকরা মুহূর্তের জন্যও মুখের কামাই দিচ্ছে না, অনর্গল বক বক করে চলেছে, সেই সঙ্গে সবজাতার ঢঙে মাথা ঝাঁকানোর কোন বিরাম নেই। খানিক পরপরই গুহার বাইরে থেকে একটা করে আতংকিত ঝাঁড়ের ডাক ভেসে আসছে। হঠাৎ করে থামছে সেই ডাক, বুঝতে অসুবিধে হয় না কসাই তার ছোরাটা এতক্ষণে ঠিকমত চালাতে পেরেছে ওটার গলায়। তারপরই আরেকটাকে মাটিতে ফেলার আওয়াজ ভেসে আসছে, গুহার অদৃশ্য দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে আওয়াজটা। পশু ধরাশায়ী হওয়ায় উল্লাসে মাতামাতি করছে দর্শকরা। জবাই হলেই দশ-বারো জন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাল ছাড়াতে লেগে

যাচ্ছে, রক্তাক্ত মাংসের ফালি মাটির বড় বড় পাত্রে তোলা হচ্ছে।

পাত্রগুলো নিয়ে হেঁচট খেতে খেতে গুহায় ঢুকছে চাকররা, মাংসের ফালি তখনও কাঁপছে একটু একটু, ধোঁয়াটে ভাপও উঠছে সামান্য। প্রতিটি পাত্র নামাতে যা দেরি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সেটার দিকে। রক্ত ঝরা ফালি ছোঁ দিয়ে তুলে নিচ্ছে তারা, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে একটা প্রান্ত আটকাচ্ছে, অপরপ্রান্তটা টান টান করে এক হাতে ধরে থাকছে, আরেক হাতে ধরা ছুরি দিয়ে নাকের ডগার কাছাকাছি থেকে কেটে নিচ্ছে ফালিটা। উষ্ণ রক্ত ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, টুকরোটা একটা মাত্র ঢোকের সাহায্যে নেমে যাচ্ছে গলা দিয়ে।

আদিবাসীদের মধ্যে যারা মুসলমান তারা প্রকাশ্যে আগুনের মত গরম চা খাচ্ছে, আর খ্রীস্টানরা খাচ্ছে গ্রাম থেকে তৈরি করে আনা মদ, স্থানীয় ভাষায় ওরা সেটাকে তেজ বলে। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, প্রত্যেক মুসলমানের রয়েছে একজন করে খ্রীস্টান বন্ধু। অপ্রকাশিত চুক্তি অনুসারে মুসলমান বন্ধুর চায়ের মগে তেজ ঢেলে দিচ্ছে খ্রীস্টান দোস্তু, মুসলমান বন্ধুরা ভান করছে ঘটনা সম্পর্কে কিছুই তাদের জানা নেই। গোত্রপ্রধান কামাল হাসান নিজে মদ্যপান করেন না, তবে তিনি জানেন তাঁর ছেলেরা বা প্রজারা লুকিয়ে-চুরিয়ে এক-আধটু খায়। যুদ্ধকালীন সময়ে ব্যাপারটা তিনি দেখেও না দেখবার ভান করেন, আর শান্তিকালীন সময়ে কেউ মাতলামি করলে তার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেন। জ্ঞানবৃদ্ধ কামাল হাসান প্রায়ই একটা কথা বলে থাকেন, তোমার যদি কোন দুর্বলতা থাকে সেটা গোপন রাখো, গোপন থাকলে এমনকী পাপও ক্ষমা পায়।

তেজ তৈরি করা হয় কড়া মধু মিশিয়ে, সোনালি আগুনের মত তার রঙ, পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত ঝাঁড়ের মত গুঁতো মারে।

যারা শ্রদ্ধার পাত্র তাদের সঙ্গে বসবার সুযোগ হয়েছে মাইকেলের, বৃদ্ধ কামাল হাসান আর প্রিন্স হাসান সালের মাঝখানে। অপেক্ষাকৃত কম সম্মান যাদের তাদের সঙ্গে বসেছে রানা আর অ্যানি, মাইকেল আর ওদের মাঝখানে বিভিন্ন সম্মানের আরও পাঁচ-ছয়টা দল রয়েছে। ওরা বিদেশী বলে কাঁচা মাংসের বদলে রান্না করা খাসী আর মুরগি পরিবেশন করা হলো, সঙ্গে শূকরের মাংসও প্রচুর। প্রতিটি মাংসের পাত্রে এত বেশি মশলাবহুল ঝোল যে কেউ পড়ে গেলে তাকে বোধহয় ডুবুই মরতে হবে। বিদেশীদের জন্য শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়েছে, পরিবেশনের দায়িত্ব পেয়েছে মাইকেল। মাঝে মাঝেই গুহার ছাদের দিকে আঙুল তুলে প্রিন্স হাসান সালেকে জিজ্ঞেস করছে সে, 'ওটা কী বলো তো, চকলেট সালে?' প্রিন্স উৎসাহের সঙ্গে সেদিকে মুখ তুলছে, সেই ফাঁকে তার চায়ের মগে শ্যাম্পেন ঢেলে দিচ্ছে মাইকেল।

খেতে বসবার আগে বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান তাঁর টাক মাথা সিংহের কেশর দিয়ে ঢেকে নিয়েছেন। কেশরটার চেহারা খুব করুণ, যেন পোকায় খেয়েছে, তার কারণ প্রথমবার ওটা মাথায় পরবার পর পেরিয়ে গেছে চল্লিশটা বছর।

হঠাৎ করে দাঁতহীন মাড়ি বের করে আপনমনে হাসতে শুরু করলেন কামাল হাসান। হাতে বানানো রঙটিতে শূকরের লম্বা মাংস ভরে রঙটিটা গোল পাকালেন তিনি, আকারে সেটা হাতানা চুরুটের মত হলো, ঝর ঝর করে ঝোল ঝরছে, হঠাৎ সেটা মাইকেলের অপ্রস্তুত মুখের ভিতর সোঁধিয়ে দিলেন।

'তোমাকে ওটা হাতের সাহায্য না নিয়ে গিলতে হবে,' তাড়াতাড়ি প্রথাটা ব্যাখ্যা করল প্রিন্স সালে। 'এটা একটা খেলা,

বাবা খুব পছন্দ করেন।’

মাইকেলের চোখ ফুলে উঠল, দম নিতে না পারায় টকটকে লাল হয়ে উঠল তার মুখ, মরিচের অসম্ভব ঝাল জিভের চামড়া পুড়িয়ে দিল। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোক গিলল সে, চিবালা-এতকিছুর মাঝেও চেহারায় ধরে রাখবার চেষ্টা করছে হাসিখুশি অভিজাত ভাবটা।

কামাল হাসান সপ্রশংসদৃষ্টিতে অবলোকন করছেন, তাঁর ফোকলা মুখ থেকে ঝোল গড়াচ্ছে, বলিরেখাগুলো কুঁচকে সরু আর গভীর হয়ে উঠল অর্থাৎ নিঃশব্দে হাসছেন তিনি, আর মাঝে মাঝে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে একই কথা বারবার উচ্চারণ করে প্রেরণা যোগান দিচ্ছেন মাইকেলকে, ‘হাউ ডু ইউ ডু? হাউ ডু ইউ ডু?’

অবশেষে আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রেখে মাংসের টুকরোটা গিলে ফেলতে পারল মাইকেল। যেমে গোসল হয়ে গেছে সে। বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান আবার একবার তাকে বন্ধুসুলভ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। ঠোঁটে সহানুভূতিসূচক হাসি নিয়ে মাইকেলের জন্য তার গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল প্রিন্স সালে।

কিন্তু কারও কৌতুকের শিকার হওয়া মাইকেলের ধাতে নয় না। গোত্রপ্রধানের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, ঠেলে সরিয়ে দিল গ্লাসটা, হাতছানি দিয়ে একজন চাকরকে কাছে ডাকল। মাটির চওড়া পাত্র থেকে কাঁচা মাংসের একটা ফালি তুলে নিল সে। ফালিটা প্রায় তার কজির মত মোটা, লম্বায় তার হাতের চেয়ে সামান্য একটু যদি ছোট হয়। বিনা নোটিসে ফালির একটা প্রান্ত গোত্রপ্রধানের দাঁতহীন মাড়ির মাঝখানে ঠেসে ধরল সে। শান্ত গলায়, হাসতে হাসতে বলল, ‘খাও বাপ, দেখো কেমন লাগে!’

বিস্ফারিত রক্তচক্ষু মেলে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে থাকল

বৃদ্ধ। গুহার ভিতর ভীতিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল। যে-কোন মুহূর্তে একটা কল্পনাভীত অঘটন ঘটে যেতে পারে। তারপর, যদিও মাংসের ফালিটা ফুলে ওঠা বিশাল জিভের মত মুখে ঝুলে থাকায় গোত্রপ্রধান হাসতে পারলেন না, তাঁর চোখের চারপাশে আরও কুঁচকে উঠল চামড়া, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল উল্লাস। তাঁর চোয়ালের কাজ দেখবার মত হলো, যেন একটা অজগর গোটা একটা ছাগল গিলবার চেষ্টা করছে। ঢোক গিললেন তিনি, ফালির এক ইঞ্চি অদৃশ্য হলো মুখের ভিতর। আরেকটা ঢোক গিললেন, আরেক ইঞ্চি মাংস ভিতরে ঢুকল। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মাইকেল, প্রতিটি ঢোকের সঙ্গে মাংসের ফালিটা আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোত্রপ্রধানের মুখ খালি হয়ে গেল, চোখ বুজে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি, চায়ের মগটা ধরবার জন্য হাতড়াতে শুরু করলেন। এই সুযোগে তাঁর মগে দুই আউন্সের মত শ্যাম্পেন ঢেলে দিল মাইকেল। ঠাণ্ডা চায়ের সঙ্গে সেটা এক ঢোকে খেয়ে ফেললেন কামাল হাসান, ঠোঁট আর মুখ থেকে কাঁচা রক্ত মুছলেন। তারপর দড়াম করে চাপড় মারলেন মাইকেলের পিঠে। পরস্পরের হাত থেকে খেয়েছে ওরা, কাজেই ওদের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

ওদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা খুঁটিয়ে লক্ষ করল আব্বাস খায়ের। বিদেশীদের পেয়ে দাদু যে খানিকটা বাড়াবাড়ি করবেন তা সে আগেই আন্দাজ করেছিল। তবে কল্পনাও করেনি একা শুধু শ্বেতাঙ্গ মাইকেলই তাঁর দৃষ্টি কাড়বে। যাকে যার পছন্দ, এ-ব্যাপারে করবার কিছু নেই। কিন্তু এ-কথাও তো সত্যি যে মাত্র ক’দিনের পরিচয়ে তারও পছন্দ হয়ে গেছে মাসুদ রানাকে। তার হিরোকে অবহেলা করা হবে, আর সে তা মুখ বুজে সহ্য করবে? কক্ষনো

না! বেশি চিন্তা-ভাবনা করতে হলো না, দাদুর সম্পূর্ণ মনোযোগ কাড়বার উপায় পেয়ে গেল আব্বাস। লোকে লোকারণ্য গুহা থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এল সে, আবার যখন ফিরে এল তখন তার হাতে সিংহের ছালটা রয়েছে। মরু গরম বাতাস পেয়ে ইতিমধ্যে শুকনো খটখটে হয়ে গেছে সেটা।

ছালটা মাথার উপর তুলে ধরে গুহায় ঢুকল সে, তারপরও মেঝের একদিকে ঘষা খেলো নাকের দিক, আরেক দিকে লেজের দিক। মাইকেলের কাঁধে হাত রেখে খোশগল্পে মেতে ছিলেন কামাল হাসান, ছালটা দেখে আশ্রয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন তিনি। তাঁর সামনে চামড়াটা বিছিয়ে দিল আব্বাস।

উত্তর শুনে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, নাতির হাত ধরে ঘন ঘন ঝাঁকি দিলেন বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য। দাদুর মেজাজ বুঝে রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা বর্ণনা করল আব্বাস, অঙ্গভঙ্গি করে দেখাল ঠিক কীভাবে আক্রমণ করেছিল সিংহটা, কীভাবে পাথর ছুঁড়ে তার ঘাড় চুরমার করা হয়।

গুহার ভিতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা। কাছ থেকে ভাল করে শুনবার জন্য লোকজন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আব্বাস থামতে উঠে দাঁড়ালেন গোত্রপ্রধান, সরাসরি রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। যাবার পথে কোথায় পা ফেলছেন দেখলেন না, ফলে তাঁর পায়ের ধাক্কায় উল্টে পড়ল ঝোল আর মাংসসহ কয়েকটা পাত্র, তেজ ভর্তি মাটির একটা কলস লাথি মেরে ভেঙে ফেললেন। রানার মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল ধরে টান দিলেন তিনি, ব্যথা পাবার আগেই তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

‘হাউ ডু ইউ ডু?’ জিজ্ঞেস করলেন কামাল হাসান, প্রচণ্ড ভাবাবেগে কাঁপছেন— খালি হাতে একজন লোক একটা সিংহকে মেরে ফেলেছে শুনে মুগ্ধ বিস্ময় আর আনন্দে তাঁর চোখে পানি

এসে গেছে। চল্লিশ বছর আগে চওড়া ফলা লাগানো তিনটে বর্ষা ভাঙবার পর চতুর্থটা তিনি হারামজাদা সিংহের হৃৎপিণ্ডে গাঁথতে পেরেছিলেন।

‘হাউ ডু ইউ ডু,’ মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, আনাড়ির মত দাঁড়িয়ে থাকল। তারপরই যন্ত্রণাকাতর চাপা শব্দ বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান ওকে বুকে টেনে নিয়ে পিষতে শুরু করেছেন।

ভাগ্য ভাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওকে মুক্তি দিলেন কামাল হাসান। ওর হাত ধরে প্রথমশ্রেণীর মর্যাদাসূচক বসবার জায়গাটির দিকে এগোলেন। তাঁর এক কনিষ্ঠ সন্তানের পাঁজরে লাথি মারলেন মৃদু, সরে গিয়ে রানাকে বসবার জায়গা করে দিল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানির দিকে একবার তাকাল রানা, অসহায় ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল। ইতিমধ্যে রুটির উপর রান্না করা মস্ত এক টুকরো খাসীর মাংস ফেলে সেটা গোল পাকিয়ে ফেলেছেন কামাল হাসান। সেটা দেখতে হলো হুবহু একটা টর্পেডোর মত, অনায়াসে একটা যুদ্ধ-জাহাজকে ঘায়েল করতে পারবে। গভীর শ্বাস টেনে যতটা সম্ভব হাঁ করল রানা, নিজের হাতে তৈরি টর্পেডো তরোয়ালের মত মাথার উপর উঁচু করে ধরলেন কামাল হাসান। ‘হাউ ডু ইউ ডু?’ জিজ্ঞেস করলেন তিনি, একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে রানার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন সেটা।

এগারো

কাউন্ট অভিযোগ করল, একটানা দীর্ঘ সময় গাড়িতে বসে থাকায় তার নিতম্ব প্রদেশ ব্যথা করছে। মেজর লুইগি রাকাকে ডেকে সে আরও বলল, ওয়েলস অভ চাল্ডিতে পৌঁছে সে যেন দেখতে পায় তার তাঁবু ফেলা হয়েছে এবং তাঁবুতে খানাপিনা আর বিছানার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কাউন্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে বলে নত মস্তকে প্রতিশ্রুতি দিল মেজর। মনে মনে কাউন্টকে মা-বাপ তুলে গাল দিলেও, মুখে কিছু বলবার সাধ্য তার নেই। জেনারেল ফাদ তাকে বলে দিয়েছে, কোন অবস্থাতেই কাউন্টকে চটানো যাবে না। কাউন্টকে তোয়াজ করবার অন্তর্নিহিত কারণটা অবশ্য আন্দাজ করতে পারে মেজর রাকা। জেনারেল ফাদকে মি. এক্সের মাধ্যমে যারা আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিচ্ছে তাদের পরিচয়ও তার অজানা নয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সি.আই.এ. এবং মাফিয়া একযোগে কাজ করছে এখানে। ইটালিয়ান মাফিয়ার যে চক্রটি এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, তাদের নেতা কাউন্ট ডিকানডিয়ার শ্যালক, তার সুপারিশে ও তাকে খুশি করবার জন্য ওয়েলস অভ চাল্ডি দখল করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাউন্টকে।

ভাড়াটে সৈনিক বলেই নিজের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় মেজর রাকাকে। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে এমন একটা খবর পেয়েছে সে, কাউন্ট ডিকানডিয়া যা কল্লনাও করতে পারবে না। ওয়েলস অভ চাল্ডি আসল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপার হলো আদিস আবাবায় সম্রাট হাইলে সেলাসিকে উৎখাত

www.BanglaBook.org

করবার জন্য কমিউনিস্টরা যে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে তাতে নাক গলানো। জেনারেল ফাদকে সাহায্য করা হচ্ছে একটি মাত্র শর্তে, গেরিলাদের ঠেকানোর কাজে সম্রাটের অনুগত বাহিনীকে সাহায্য করবার জন্য পাঠাতে হবে থার্ড ব্যাটালিয়ানকে। তারমানে ওয়েলস অভ চাল্ডি দখল করা অভিযানের মাত্র প্রথম অংশ, তারপর রাজধানী আদিস আবাবার দিকে মার্চ করবে থার্ড ব্যাটালিয়ান। এখন পর্যন্ত এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না কাউন্ট।

উপত্যকায় পৌঁছে তাঁবুতে আশ্রয় নিল কাউন্ট, ভৃত্যরা রিপোর্ট করল ভরপেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

মেজর রাকা তার বারোটা মেশিনগান বসাল উপত্যকার ঢালু গায়ে, যেখান থেকে বিশাল জায়গা জুড়ে তিনদিকেই গুলিবর্ষণ করা যাবে। তার একটু নীচে তৈরি করা হলো রাইফেল ট্রেঞ্চ। বালি মেশানো বুরবুরে মাটি, গর্তের ভিতর পজিশন নিয়ে থাকল রাইফেলম্যানরা। ইতিমধ্যে মেশিনগান আর ট্রেঞ্চগুলোকে রক্ষার জন্য বালির বস্তা ফেলে পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। মর্টার কোম্পানীকে অনেকটা পিছনে রাখল সে, রাইফেল ট্রেঞ্চ আর মেশিনগান নেস্ট ওটাকে রক্ষা করবে। সুরক্ষিত অবস্থান থেকে ওয়েলস অভ চাল্ডির গোটা এলাকার উপর মর্টার বোমা ফেলতে পারবে তারা।

পেশাদার সৈনিক বলেই আক্রমণের প্রস্তুতিতে কোন ত্রুটি রাখবার পক্ষপাতী নয় মেজর রাকা। সম্রাট হাইলে সেলাসি জানেন থার্ড ব্যাটালিয়ান কেন বা কোথায় যাচ্ছে, কাজেই তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য অবশ্যই তিনি সেনাবাহিনী পাঠাবেন না। আর ইথিওপিয়ার এদিকটায় গেরিলাদের কোন তৎপরতা বা ঝাঁটি নেই। বাধা দেবে শুধু আদিবাসীরা, কিন্তু তারা প্রায় সবাই হয় মারা

পড়বে, নয়তো জান নিয়ে পাহাড়ে পালাবে, কারণ থার্ড ব্যাটালিয়ানকে ঠেকাবার সামর্থ্য তাদের নেই। তবে মন খুঁত খুঁত করবার একটা কারণ অবশ্য আছে। বিশ্বস্ত কোন সূত্রের খবর না হলেও, গুজবটা মেজরের কানে এসেছে। আদিবাসীরা নাকি বাইরে থেকে সাহায্য পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিছু সাহায্য নাকি তারা পেয়েওছে। বিশ্বাস্য মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই।

তার লোকজন কাজ করছে, মেজর রাকা ব্যক্তিগতভাবে ডিফেন্সের সামনে দিয়ে বার কয়েক হেঁটে গেল, লক্ষ করল রঙ করা মেটাল মার্কারগুলোর পজিশন। তার সশরীর উপস্থিতিতে সারারাত ধরে চলল যুদ্ধ-প্রস্তুতি।

মদ এবং মাংস দুটোই বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, ফলে মাইকেলের পেটটাই যে শুধু অসভ্যের মত ফুলে উঠল তাই নয়, চোখেও সে খানিকটা ঝাপসা দেখছে।

ওদিকে রানা আর কামাল হাসানের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, ভাষার ব্যবধান কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। গোত্রপ্রধানের ধারণা, রানা যেহেতু খালি হাতে একটা সিংহকে বধ করতে পেরেছে, বিদেশী হলেও গোত্রের নিয়ম অনুসারে স্বল্প-মেয়াদী অন্তত চারটে বিয়ে করবার অধিকার রানার পাওয়া উচিত। ওকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হলো, এ-সব বিয়েতে শুধু মজা আর আনন্দ আছে, কোন রকম খরচাপাতি নেই বা কোন রকম বাঁধনেও জড়িয়ে পড়তে হবে না। গোত্রের কুমারী মেয়েরা তাকে দু'চার দিনের জন্য স্বামী হিসাবে পেলে নিজেদের জীবন সার্থক হয়েছে বলে মনে করবে, কারণ এমন একজন বীরের সন্তান গর্ভে ধারণ করবার সুযোগ ভবিষ্যতে আর কখনও তারা না-ও পেতে পারে।

‘রাজি হয়ে যাও, ওল্ড চ্যাপ,’ ফিসফিস করে রানাকে পরামর্শ দিল মাইকেল। ‘আমার কপালে যখন নেই, দেখে অন্তত সাধ মেটাই। কথাতাই তো আছে, ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজন।’

খ্রিস্ট সালে জানাল, ‘বাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলে অনর্থ ঘটবে।’

মাইকেলের উদ্দেশ্যে চোখ রাঙালেও, বৃদ্ধের দিকে ফিরে অমায়িক হাসল রানা, অনেক আগেই অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। হাত নেড়ে, আকার-ইঙ্গিতে পাল্টা একটা প্রস্তাব দিল ও, ওর উদারতা লক্ষ করে রাগে-দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল মাইকেলের।

গোত্রপ্রধানকে রানা জানিয়ে দিল, চারটে বিয়ে করবার অধিকার পেয়ে যারপরনাই খুশি সে। তবে আরও বেশি খুশি সে কামাল হাসানকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে। তাই তার পাওয়া চারটে বিয়ে করবার অধিকার সে গোত্রপ্রধানকে দান করতে চায়। রানাকে আগেই জানানো হয়েছে কামাল হাসানের যুবতী স্ত্রীর সংখ্যা এত বেশি যে হঠাৎ কেউ গুণতে চাইলে তার ভুল হয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বন্ধুর ঔদার্যে আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না কামাল হাসান, রানাকে টেনে প্রায় কোলে তুলে ফেললেন।

পরিবেশে উত্তেজনা আর আনন্দের খোরাক এত বেশি যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তুলতে মাইকেলও লজ্জা পেল। কয়েক ঘণ্টা ধরে অনেকগুলো প্রশ্ন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তার জিভ পুড়িয়ে দিচ্ছে। শেষমেশ বলে ফেলল, ‘চকলেট, ওল্ড বয়, আমাদের জন্যে টাকা-পয়সা সব রেডি করে রেখেছ তো?’

মনে হলো মাইকেলের কথা শুনতে পায়নি খ্রিস্ট সালে, তবে

তার গ্লাসটা শ্যাম্পেনে ভরে দিল সে, তারপর রানার একটা কৌতুক অনুবাদ করে শোনানোর জন্য ঝুঁকে পড়ল তার বাবার দিকে। অগত্যা বাধ্য হয়ে তার একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরতে হলো মাইকেলকে।

হিস হিস করে বলল সে, ‘টাকার কথা বলছি, চকলেট। সব বুঝে পেলো আর তোমাদের কষ্ট দিতে চাই না। কাল ভোরে নাচ-গানের মাধ্যমে তোমরা আমাদের বিদায় দেবে, কী?’

‘প্রসঙ্গটা তোলায় সত্যি আমি খুশি হলাম,’ চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাল প্রিন্স সালে, খুশির ভাবটুকু ছাড়া আর সব কিছুই রয়েছে তার চেহারায়ে। ‘কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা দরকার।’

‘দেখো, চকলেট, ওল্ড বয়, এটা আলোচনার কোন ব্যাপার নয়। আলোচনা যা হবার তা অনেক আগেই হয়ে গেছে।’

‘মাথা গরম করো না, প্লিজ। আমি তোমাকে উদ্ভিন্ন হতেও নিষেধ করছি।’

দেনাদার টাকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে উদ্ভিন্ন বোধ করা মাইকেলের একটা স্বভাব। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলোচনার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে কীভাবে টাকা শোধ না দিয়ে পারা যায়। কঠিন ভাষায়, চড়া গলায় প্রতিবাদ করতে যাবে মাইকেল, এই সময় উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুরু করলেন কামাল হাসান।

উঠে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু তাঁর পা কাঁপতে লাগল, মনে হলো টলে পড়ে যাবেন।

‘আরেকটু কম খাওয়ালেও পারতে!’ গম্ভীর, অসন্তুষ্ট চেহারা নিয়ে অভিযোগ করল প্রিন্স সালে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাইকেলের দিকে।

শুধু কাঁধ ঝাঁকাল মাইকেল, কোন জবাব দিল না, কারণ ইতিমধ্যে ভাষণ শুরু হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

দু’জন গার্ড শক্ত করে ধরে রাখল কামাল হাসানকে। তিনি কাঁপছেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে কথা বলে গেলেন। অবশ্য শেষ দিকে তাঁর গলা ভাবাবেগে বুজে এল। তাঁর ভাষণ বিদেশী অতিথিদের জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করল প্রিন্স সালে।

প্রথম দিকে, রানার মনে হলো, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান তাঁর বক্তব্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন। প্রথম সূর্য-রশ্মির পাহাড়চূড়া স্পর্শ করবার কথা বললেন তিনি, বললেন ভরদুপুরে মরু-বাতাসের একখানি পা যখন একজন মানুষের মুখে পড়ে তার কী অনুভূতি হয়, তারপর তিনি ওদেরকে মনে করিয়ে দিলেন ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই প্রথম সম্ভানের কান্না তার বাপের কানে কী রকম শোনায়, আরও স্মরণ করতে বললেন, লাঙ্গলের আঘাতে এলোমেলো হওয়া মাটির গন্ধ। ধীরে ধীরে অবিশ্বাস্য নিশ্চরতা নেমে এল গুহার ভিতর, সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে বক্তব্য শুনছে তাঁর।

এই পর্যায়ে আপন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন কামাল হাসান, ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিলেন গার্ডদের হাত, এখন আর তিনি টলছেনও না। তাঁর কণ্ঠস্বর আবেদন আর আবেগে ভরে উঠল। প্রিন্স সালে অনুবাদ না করলেও রানার বুঝতে অসুবিধে হত না যে গোত্রপ্রধান পুরুষমানুষের গর্ব এবং তার স্বাধীনতা ভোগ করবার অধিকার নিয়ে কথা বলছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন, একজন সত্যিকার পুরুষ কি তার সেই স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ দেবে না? প্রাণ দেবে না তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয় বন্ধু, স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের জন্য?

‘খবর এসেছে শিফটারা এবার হামলা চালাবে বিদেশীদের সাহায্য নিয়ে। তারা নাকি এবার শুধু লুণ্ঠপাট করেই ফিরে যাবে না, আমাদের এই প্রিয় জন্মস্থান দখল করে নিজেদের কজায়

রাখতে চায়। শোনা যাচ্ছে ছয় ডজন মেশিনগান, তিন ডজন মর্টার, দশ-বিশটি ট্যাংক আর হাজার হাজার রাইফেল নিয়ে রওনা হয়ে গেছে তারা। হ্যাঁ, ওরা শক্তিশালী। কিন্তু বাছারা, আমার প্রিয় শিষ্যরা, আমরাও অসহায় বা শক্তিহীন নই। খোদার অপার মেহেরবাণী, বিদেশী সাহায্য আমরাও পেয়েছি। তারা আমাদের জন্যে যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে এসেছেন, তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবেন। শত্রুদের দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে...।’

কী? ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। বিদেশী সাহায্য? মর্টার, মেশিনগান, ট্যাংক-ডজন ডজন? হাজার হাজার রাইফেল? সঙ্গত কারণেই হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। হঠাৎ করে একটা অপরাধবোধ জাগল মনে। অস্ত্রের যে চালান ওরা আদিবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছে সে-সব ওদের প্রায় কোন কাজেই আসবে না। জানে, ওরা চলে যাবার এক হপ্তার মধ্যে অচল হয়ে পড়বে আর্মারড কারগুলো, কামাল হাসানের অনুসারীরা লৌহমানবীদের মেজাজের সঙ্গে কোনভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে না নিজেদের। তা ছাড়া, ট্যাংক বা মর্টারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওগুলোর কর্ম নয়।

শংকিত বোধ করল রানা। বোকার মত এ কোথায় এসে পড়েছে ও, যেখানে প্রায় নিরস্ত্র একটা গোষ্ঠী অশুভ শক্তির কাছে মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে? কোন সন্দেহ নেই, এটাই হবে কামাল হাসান আর তাঁর প্রজাদের শেষ যুদ্ধ।

তারপর রানা নিজেকে বুদ্ধি দিল, ভুলে যাও। এটা ওদের যুদ্ধ, ওরাই সামলাক। এভাবেই তো হাজার হাজার বছর ধরে অত্যাচার সহ্য করেছে ওরা, তোমার একার সাধ্য কী ওদের বাঁচাতে পারো। এই সময় ওর চোখ পড়ল দূরে বসা অ্যানি উইসপারের দিকে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে, চেহারা উত্তেজনা নিয়ে, কামাল

হাসানের ভাষণ যেন গিলছে সে, পাশে বসা রাহেলা বানুর একটা কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে।

অ্যানিও বুঝতে পারল, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। ঘাড় ফেরাল সে, চোখাচোখি হলো দু’জনের। মৃদু হেসে, ঘন ঘন মাথা বাঁকাল সে, যেন বলতে চাইল রানা কী ভাবছে বুঝতে পেরেছে।

পাওনা টাকা নিয়ে চলে যাবে তুমি? নিজেকে প্রশ্ন করল রানা। অসহায় লোকগুলোকে বিপদের মধ্যে ফেলে? অ্যানি উইসপারকে রেখে? জানা কথা, ওদের সঙ্গে অ্যানিকে ফিরে যেতে বাধ্য করা যাবে না। তার জন্য এখানে একটা রিপোর্ট তৈরি হতে যাচ্ছে, এরইমধ্যে তার জড়িয়ে পড়া সম্পূর্ণ হয়েছে, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে সে। আর শেষটা যে কী রকম হবে ভাল করেই উপলব্ধি করতে পারছে রানা।

বুদ্ধিমানের কাজ হবে ফিরে যাওয়া, বোকামি হবে আরেকজনের যুদ্ধ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া, গুরু হবার আগেই যে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে।

হঠাৎ থামলেন বৃদ্ধ কামাল হাসান, মৃদু হাঁপাচ্ছেন তিনি, ঘামে চকচক করছে তাঁর মুখ। শ্রোতারা এখনও তাঁর দিকে সম্মোহিতের মত অপলক তাকিয়ে আছে। গলা চড়িয়ে একটা নির্দেশ দিলেন গোত্রপ্রধান, দু’ধারী একটা তরোয়াল চলে এল তাঁর হাতে, ফলাটা লম্বা আর নগ্ন। পরমুহূর্তে কোথেকে যেন অনেকগুলো ড্রাম নিয়ে আসা হলো, বেজে উঠল রণডঙ্কা। প্রথমে এল কামাল হাসানের পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী ড্রাম। শুধু বড় ধরনের যুদ্ধ বা উৎসবের সময় বের করা হয় ওটা, শত শত বছর ধরে বংশপরম্পরায় হাতবদল হয়ে কামাল হাসানের হাতে পড়েছে। মাগডালায় নেপিয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বাজানো হয়েছে এই ড্রাম,

বাজানো হয়েছে অ্যাডোয়ায় ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসহ আরও কয়েকশো যুদ্ধের সময়।

একেকটা ড্রাম কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, ড্রামাররা ড্রামের ব্যারেল নিজেদের দুই হাঁটুর মাঝখানে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে গম্ভীর আর ভরাট আওয়াজ যে ড্রামের সেটা মন্তরগতি একটা হৃন্দের সঙ্গে বাজতে লাগল, বাকি ড্রামগুলো একজোড়া ভরাট শব্দের মাঝখানে গুড়-গুড় আওয়াজ তুলল। ক্রমেই দ্রুত হলো হৃন্দ, সেই সঙ্গে আরও ভরাট হয়ে উঠল আওয়াজ। কাঁপতে শুরু করল মাটি, ধাক্কা লাগল বৃকে। তারপর মনে হলো গোটা দুনিয়া ড্রামের উন্মাদ করা গর্জনে ঝাঁকি খাচ্ছে। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। লক্ষ করল, ড্রামের তালে তালে দুলতে শুরু করেছে আদিবাসীদের মাথা আর কাঁধ।

তরোয়ালের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন কামাল হাসান। তাঁর মাথাটাও নুয়ে পড়েছে তরোয়ালের হাতলের উপর। ড্রামের হৃন্দ এক সময় তাঁকে নাড়া দিল, ঝাঁকি খেতে শুরু করল তাঁর কাঁধ, তারপর হঠাৎ তিনি এক ঝটকায় উঁচু করলেন মাথা। সাদা একটা পাখি যে ভঙ্গিতে উড়াল দেয়, ঠিক সেভাবে লাফ দিয়ে ড্রামারদের সামনে পড়লেন, বিশাল তরোয়ালটা মাথার উপর বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে নাচতে শুরু করলেন।

প্রিন্স সালের একটা কজি চেপে ধরল মাইকেল, ড্রামের বজ্র-নিনাদের সঙ্গে পাগ্লা দেওয়ার জন্য গলা চড়াল, ফিরে গেল ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনায়। ‘চকলেট, তুমি আমাকে টাকা প্রসঙ্গে কী যেন বলছিলে।’

তার কথা শুনতে পেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, প্রিন্স সালে কী বলে শুনতে চায়। কিন্তু প্রিন্স সালে চুপ করেই থাকল, বাবার

লক্ষ্যবাস্তব তার মনোযোগ ধরে রেখেছে।

‘অক্ষত অবস্থায় আমরা তোমাকে মাল ডেলিভারি দিয়েছি, ওল্ড বয়। চুক্তি চুক্তিই, কী?’

‘আশি হাজার পাউন্ড,’ থমথমে চেহারা নিয়ে বিড়বিড় করে বলল প্রিন্স সালে।

‘হ্যাঁ,’ একমত হলো মাইকেল।

‘বিপজ্জনক একটা অংক,’ প্রিন্স সালের গলা আরও খাদে নেমে গেল। ‘এরচেয়ে আরও অনেক কম টাকার জন্যে কত মানুষ খুন হয়েছে।’

ওরা কোন মন্তব্য করল না।

‘বুঝতেই পারছ আমি তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছি,’ বলে চলল হাসান সালে। ‘তোমাদের নিরাপত্তা আর আমার গোত্রের অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনা। দেখাশোনার জন্যে একজন মেকানিক না থাকলে, কী দাম গাড়িগুলোর? নতুন অস্ত্র কীভাবে চালাতে হয় তা যদি আমার লোকদের শেখানোর জন্যে কেউ না থাকে, কী হবে ওগুলো দিয়ে? পুরো টাকাটাই কি পানিতে ফেলা হবে না?’

‘তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে—সত্যি হচ্ছে, ওল্ড বয়,’ নিশ্চয়তা দিয়ে বলল মাইকেল। ‘প্যারিসের কাফে রয়্যালের বসে ডিনার খাওয়ার সময় তোমার জন্যে চাই কি দুফোঁটা চোখের পানি ফেলতেও আমি রাজি আছি। তবে কি জানো, এ-সব কথা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।’

‘আরে, কী বলো, ভাবিনি মানে? মাই ডিয়ার মাইকেল, বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ সময় গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছি আমি।’ এই প্রথম মাইকেলের দিকে ফিরল প্রিন্স সালে, হাসল নিঃশব্দে।

‘ভেবেছি, দুনিয়ার কোথাও এমন বোকা নেই যে ইথিওপিয়ার বন-জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ী এলাকায় এসে, সাথে মোটা অংকের টাকা নিয়ে নিরাপদে ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারে—কামাল হাসানের ব্যক্তিগত অনুমতি এবং প্রোটেকশন ছাড়া।’

দু’জনেই ওরা তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

‘টাকা নিয়ে কোন দিকে যেতে চাও তোমরা? রাজধানী আদিস আবাবার দিকে? পথে গেরিলারা আছে, জানো? যদি ভেবে থাকো ওরা তোমাদের জামাই আদর করবে, ভুলে যাও। টাকা তো টাকা, প্রাণটাও হারাতে হবে। তা ছাড়া শুধু কি গেরিলা, ওদিকে শিফটাদেরও ছোট ছোট দল আছে—স্রেফ আগুনে পুড়িয়ে তোমাদের খেয়ে ফেলবে—হ্যাঁ, এখনও একটু অসভ্য রয়ে গেছে লোকগুলো। ভুলে যেয়ো না, তোমরা আফ্রিকায় রয়েছ।’

‘ওরা জানবে, অবশ্যই, তাই না?’ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আমার ভয় হচ্ছে, অজ্ঞাত সূত্র থেকে খবরটা ওরা পেয়েও যেতে পারে,’ রানার দিকে ফিরল প্রিন্স সালে।

‘আর আমরা যদি যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে যেতে চাই?’

‘পায়ে হেঁটে মরু পেরোনো কি সম্ভব?’ হাসল হাসান সালে।

‘পাওনা টাকা পেলে তা থেকে উট কেনার জন্যে খরচ করতে পারব,’ সম্ভাবনার কথা বলল রানা।

‘আমার সন্দেহ হচ্ছে, মাইকেল,’ কলেজ জীবনের বন্ধুর দিকে ফিরল প্রিন্স, ‘উট কেনা তোমাদের জন্যে সাংঘাতিক কঠিন হবে। আমার আরও সন্দেহ হচ্ছে, সোনালি টহল পুলিশকেও তোমাদের ফেরার কথা জানানো হবে।’

ওরা দেখল বৃদ্ধ কামাল হাসান এখনও বিপুল বিক্রমে ড্রামারদের মাথার ছ’ইঞ্চি উপরে বন বন করে তরোয়াল

ঘোরাচ্ছেন।

‘গড!’ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মাইকেল। ‘তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম, চকলেট। মানে কথার মূল্য আর মর্যাদা, পুরনো বন্ধুর ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি...।’

‘মাই ডিয়ার মাইকেল, অত্যন্ত দুঃখের সাথে তোমাকে আমি মনে রাখতে বলছি, এটা ইটনের খেলার মাঠ নয়।’

‘তবু ঘুণাঙ্করেও আমি ভাবিনি তুমি আমার টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করবে।’

‘ওহ্ ডিয়ার, কী লজ্জা! মাইকেল, আমি তোমার টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করছি না! যদি চাও এখন, এই মুহূর্তে তোমার টাকা তুমি পেতে পারো।’

‘ঠিক আছে, প্রিন্স,’ বাধা দিল রানা, ‘বলো আর কী চাও তুমি আমাদের কাছে? খোলাখুলি বলো, টাকা নিয়ে এখন থেকে ফিরে যাওয়ার নিরাপদ কোন উপায় সত্যি আছে কি?’

স্মিত হেসে রানার হাতে মৃদু চাপড় মারল প্রিন্স। ‘হুজুত-হাঙ্গামা পছন্দ করো না, সত্যিকার কাজের মানুষ, তোমাকে আমার ভারি পছন্দ...।’

‘আমি একটা প্রশ্ন করেছি,’ বিরক্তবোধ করল রানা।

‘তোমরা যদি দু’মাসের একটা চুক্তিতে আমাদের সাথে কাজ করো, আমার বাবা চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।’

‘দু’মাস কেন?’ কারণটা কী শুনতে চাইল মাইকেল।

‘ততোদিনে হয় আমরা হারব নয়তো জিতব।’

‘বলে যাও,’ রানার তাগাদ।

‘এই দু’মাস তোমরা তোমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে ব্যবহার করবে—শেখাবে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা বড়

বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে কীভাবে আমরা বেঁচে থাকতে পারি।
গাড়িগুলোর রক্ষাবেক্ষণ, মেরামত এবং চালানোর দায়িত্ব
নেবে...।’

‘তার বদলে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘রাজকীয় বেতন, ইথিওপিয়া থেকে নিরাপদে ফিরে যেতে
দেয়ার প্রতিশ্রুতি। টাকাগুলো আগেই লন্ডনের একটা ব্যাংকে
পাঠিয়ে দেয়া হবে তোমাদের নামে।’

‘রাজকীয় বেতন বলতে কী বোঝাতে চাও?’ তিক্তকণ্ঠে
জানতে চাইল মাইকেল। ‘জন্মদের ছোরার নীচে মাথা পেতে দেব,
ন্যায্য ক্ষতিপূরণ কী হতে পারে?’

‘লক্ষ করেছ, আমাদের এক একটা মেয়ের গায়ে কী পরিমাণ
সোনা আছে?’ হাসল প্রিন্স। ‘বেতন পাবে টাকায়—প্রতি মাসে ত্রিশ
হাজার পাউন্ড। সাথে করে নিয়ে যাবে এক সের সোনা। এটা
আমাদের কোষাগার থেকে দিতে হবে না, প্রজারাই দান করবে।’

ঢিল পড়ল দু’জনের পেশীতে, নিজেদের মধ্যে দ্রুত দৃষ্টি
বিনিময় হলো।

‘ষাট হাজার পাউন্ড, এক সের সোনা—প্রত্যেকে?’ রুদ্ধশ্বাস
মাইকেলের প্রশ্ন।

‘প্রত্যেকে,’ বলল হাসান সালে।

‘চুক্তিপত্র তৈরি করার জন্যে আমার লইয়ারকে পাওয়া গেলে
ভাল হত,’ খেদ প্রকাশ করল মাইকেল।

‘তার দরকার নেই,’ হেসে উঠল প্রিন্স সালে, মাথা নাড়ল,
আলখেল্লার ভিতর হাত গলিয়ে বের করে আনল দুটো এনভেলোপ।
‘ব্যাংকের গ্যারানটি দেয়া চেক—লন্ডনের লয়েডস ব্যাংক। ডিজ-
অনার হওয়ার কোন আশংকাই নেই, তবে তারিখ দেয়া আছে
দু’মাস পরের।’

www.BanglaBook.org

কৌতূহলের সঙ্গে চেক দুটো নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল
মাইকেল। সত্যি তাই, আজ থেকে দু’মাস পরের তারিখ লেখা
রয়েছে। এরপর সে টাকার অংকটা দেখল। প্রতিটি ষাট হাজার
পাউন্ডের চেক। ঝট করে মুখ তুলল সে। ‘কিন্তু আমাদের আর্মস
আর ভেহিকেলের দাম?’

আলখেল্লার ভিতর থেকে আরও দুটো এনভেলোপ বের করল
প্রিন্স সালে, তার চেহারায় হাসির বহর দেখে মনে হলো ওদের
সঙ্গে সময় নিয়ে খেলছে সে। নতুন দুটো চেকও পরীক্ষা করল
মাইকেল। একটায় আর্মসের দাম দেওয়া হয়েছে, অপরটায়
ভেহিকেলের।

‘সম্পূর্ণ?’ তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল হাসান সালে।

‘আর সোনা?’ সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল মাইকেল। ‘এ-
ব্যাপারে তোমার প্রস্তাব কী হবে?’

‘বললাম না, ওগুলো তোমরা যাবার সময় সাথে করে নিয়ে
যাবে?’

‘কিন্তু, ধরো, যুদ্ধে তোমরা হেরে গেছ—কার কাছ থেকে
চাইব?’ মনের আশংকা প্রকাশ করল মাইকেল।

‘বলতে চাইছ যদি আমরা মারা যাই?’ হাসান সালে গম্ভীর।
‘আমরা মারা গেলেও তোমরা বেঁচে থাকবে, এমন কোন নিশ্চয়তা
তুমি দিতে পারছ?’

‘তোমার এই স্বভাবটা কিন্তু ইটনে আত্মপ্রকাশ করেনি,’ বলল
মাইকেল। ‘কথার প্যাঁচ দেখছি ভালই শিখেছ। ওসব ধানাইপানাই
বাদ দিয়ে পরিষ্কার করে বলো, সোনা ঠিক কবে পাব আমরা।’

‘সংগ্রহ করতে যে ক’দিন লাগে,’ বলল প্রিন্স। ‘এই ধরো এক
দেড় হপ্তা। ওগুলো তোমাদের কাছেই থাকবে, যাবার সময় নিয়ে

যাবে।’

সবিস্ময়ে রানার দিকে ফিরল মাইকেল। ‘নির্দিষ্ট তারিখ, নির্দিষ্ট টাকার অংক-বুঝতে পারছ, ওল্ড চ্যাপ? চকলেট সালে সব আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছিল। চিন্তা-চেতনার দিক থেকে কয়েক হুঁপা এগিয়ে ছিল আমাদের চেয়ে। এ-সম্পর্কে তোমার বিচক্ষণ মন্তব্য শুনতে পেলে খুশি হতাম।’

‘আমি বলব, এভাবে ক্ল্যাকমেইলিঙের পথ না ধরলেও চলত,’ শান্তকণ্ঠে বলল রানা। ‘প্রিসের উচিত ছিল মানবিকতার দোহাই দিয়ে সাহায্য চাওয়া। অন্তত আবেদন জানিয়ে দেখতে পারত আমরা কী করি।’

প্রিসের দিকে ফিরল মাইকেল। ‘গুড গড, চকলেট!’ তার বিস্ময় এখনও কাটেনি। ‘আমি আতংকিত ও হতভম্ব! আমি স্তম্ভিত!’

‘তার মানে কি তুমি প্রত্যাখ্যান করছ, মেজর সেভারস?’

চট করে আরেকবার রানার দিকে তাকাল মাইকেল, সম্মতির একটা নিঃশব্দ বার্তা বিনিময় হলো। নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মাইকেল। ‘বলতে বাধ্য হচ্ছি, মাদ্রিদে আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সময় মত পৌঁছুতে না পারলে বিজনেসটা হারাব। কিন্তু...,’ থেমে ব্যাংকের চেকগুলোর উপর আবার একবার চোখ বুলাল সে, ‘...কিন্তু বিজনেস আর যুদ্ধ দুটো প্রায় একই ব্যাপার-আরও কথা হলো, তুমি আমাকে শক্তিশালী কিছু হেতু দিয়েছ থেকে যাওয়ার পক্ষে।’ মানিব্যাগটা পকেট থেকে বের করে চেকগুলো সযত্নে রাখল তাতে। ‘তারমানে কিন্তু এই নয় যে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আমার বিস্ময় আর আতংক তিল পরিমাণ কমল।’

‘আর তুমি, মি. রানা?’ জানতে চাইল প্রিস।

www.BanglaBook.org

কী বলবে রানা? বলবে এই আনাড়ি, অসভ্য, অশিক্ষিত জংলীগুলোকে তার ভাল লেগে গেছে? বলবে অত্যাচারিত অসহায় একটা জনগোষ্ঠীর মাঝখানে হঠাৎ এসে পড়ে, তাদের বিপদ বুঝতে পেরে, তার মহৎ হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে? স্নান, বিষণ্ণ একটু হেসে শুধু মাথা ঝাঁকাল ও, বলল, ‘আমার পার্টনার যা বলল আমি তার সাথে একমত।’

মাথা ঝাঁকাল প্রিস, আর তারপরই তার হাবভাব বদলে গেল, চেহারা যুটে উঠল ঠাণ্ডা নিষ্ঠুর একটা ভাব। ‘আমি তোমাদেরকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, দয়া করে বোকার মত চুক্তির সময় পেরোনোর আগেই ইথিওপিয়া ত্যাগ করার চেষ্টা করো না। আমার বাবার প্রশাসন সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই, কথার সামান্য হেরফের হলেও জ্যান্ত কবর দেয়ার রীতি এখনও তিনি চালু রেখেছেন।’

ঠিক সেই মুহূর্তে আলোচ্য ভদ্রলোক মাথার অনেক উপরে তুলে ধরলেন তাঁর তরোয়াল, তারপর সবেগে নামিয়ে এনে দু’পায়ের মাঝখানে নরম মাটিতে ঘাঁচ করে গাঁথলেন ডগাটা। তরোয়ালের হাতল ছেড়ে দিলেন তিনি, গায়ে আগুনের প্রতিফলন নিয়ে কাঁপতে লাগল লম্বা ফলাটা, হোঁচট খেতে খেতে তাঁর নিজের জায়গায় অর্থাৎ রানা আর মাইকেলের মাঝখানে ফিরে এলেন।

দু’জনের কাঁধে হাড্ডিসার হাত রেখে নিজের পাঁজরের সঙ্গে ওদেরকে চেপে ধরলেন কামাল হাসান, চিৎকার করে বললেন, ‘হাউ ডু ইউ ডু?’

দম ফেলবার ফুরসৎ পেয়েই চোখ কুঁচকে বৃদ্ধের দিকে তাকাল মাইকেল। ‘রামি খেলায় আপনার ভাগ্য খুলে যেতে পারে, শিখবেন নাকি, ওল্ড বয়?’ দু’মাস যথেষ্ট লম্বা সময়, একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত

থাকা দরকার, আর সেটা থেকে যদি কিছু লাভের মুখ দেখা যায়, মন্দ কী?

বারো

গুরুগম্ভীর ড্রাম পেটানোর শব্দে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠছে কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরের। ষোঁৎ ষোঁৎ করে উঠে পাশ ফিরল সে, শুনল কিছুক্ষণ, ভরাট একঘেয়ে আওয়াজ আর মৃদু কাঁপুনি তার কাছে পৃথিবীর পালস্ বলে ভ্রম হতে লাগল। পুরোপুরি সজাগ হলো অকস্মাৎ, একলাফে বিছানা থেকে নেমে তাঁবুর ভিতর সম্ভ্রান্ত ইঁদুরের মত ছুটোছুটি শুরু করল। ড্রাম পেটানোর এই বিশেষ ছন্দটা তার অত্যন্ত পরিচিত, আদিবাসীরা যুদ্ধযাত্রার সময় বাজায়।

কাউন্টের আর্তনাদ শুনে আশপাশে যারা ছিল তাদের সবার ঘুম ভেঙে গেল। বানানটো সাতা তাঁবুর ভিতর ঢুকে যত না লজ্জা পেল তারচেয়ে বেশি পেল ভয়। তাকে দোষ দেওয়া যায় না, এ-ধরনের একটা দৃশ্য দেখে যে কেউ লজ্জা আর ভয় দুটোই পাবে। সাতা দেখল তার প্রভু সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে তাঁবুর মাঝখানে সঙের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখ বিস্ফারিত, এক হাতে হাতির দাঁতের তৈরি বাঁটসহ বেরেটা, অপর হাতে অলংকৃত ছোরা।

ড্রামের শব্দ শুরু হওয়ামাত্র দেরি করেনি মেজর লুইগি রাকা, কাউন্টের তাঁবুর দিকে রওনা হয়ে গেছে, কারণ তার জানা আছে ভাঁড়টার কাছ থেকে ঠিক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করা যায়। তাঁবুতে ঢুকে কর্নেল ডিকানডিয়াকে পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় পেল সে। কাউন্ট ইতিমধ্যে পঞ্চাশজন বডিগার্ডকে ঘুম থেকে তুলে নিজের পাহারায় নিয়োগ করেছে। রোলস-রয়েস স্টার্ট

দেওয়া হয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে তাতে চড়ে বসবে কাউন্ট।

মেজরকে দেখে মোটেও খুশি হতে পারল না সে, তার ইচ্ছে ছিল লোকটা বাধা দেওয়ার জন্য এসে পৌঁছানোর আগেই বিপজ্জনক এলাকা ছেড়ে কেটে পড়বে। ইচ্ছেটা আগের মতই জোরাল থাকল, দু'সেকেন্ড চিন্তা করে একটা অজুহাত খাড়া করতে হলো তাকে, এই যা। 'মেজর, তুমি এসে ভলই করেছ। শোনো, কমান্ড করার অধিকার তোমার ওপর ছেড়ে যাচ্ছি আমি। সশরীরে উপস্থিত হয়ে জেনারেল ফাদকে রিপোর্ট করতে আসমারায় যাচ্ছি আমি।' কথা শেষ করবার আগেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, অপেক্ষারত গাড়ির দিকে এগোল।

তার পথরোধ করল মেজর রাকা, ঠকাস করে স্যালাউট ঠুকে গোপন করবার চেষ্টা করল তার উদ্দেশ্য। 'মাই কর্নেল, ওয়েলস অভ চান্সির ডিফেন্স আমরা সম্পূর্ণ করেছি,' রিপোর্ট করল সে। 'গোটা এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, আমরা সবাই এখানে নিরাপদ।'

'জেনারেল ফাদকে আমি রিপোর্ট করব, আমাদের চেয়ে বিশিষ্ট সৈন্য নিয়ে হামলা করেছে শত্রুপক্ষ,' গর্জে উঠল কাউন্ট, মেজরের বগলের তলা দিয়ে বাউলি কেটে গাড়ির দিকে এগোতে চেষ্টা করল সে।

দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে কাউন্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিল মেজর রাকা। তারপর এক পা সামনে বাড়ল সে। 'আপনার বাহিনী নিরাপদ পজিশন নিয়ে রয়েছে, সবাই সুস্থ এবং উৎসাহী...'

'আমার অনুমতি দেয়া থাকল, যখন দেখবে রক্তপিপাসা নিয়ে শত্রুপক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, দেরি না করে প্রত্যাহার করে নিয়ো বাহিনীকে।' কাউন্টের তরফ থেকে এটা একটা ঘুষ বা

টোপ, যুদ্ধ না করে পালানোর লোভ দেখাচ্ছে। তারপরই সে মেজরকে পাশ কাটিয়ে রোলস-রয়েসের নাগাল পাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু মেজর রাকা মামবার মতই ক্ষিপ্ৰগতি, এক লাফে আবার কাউন্টের সামনে চলে এল। এভাবেই শুরু হলো ব্যাপারটা। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা অফিসার আর সৈনিকরা অবাক বিস্ময়ে দেখল কাউন্ট আর মেজর পালার করে লাফ দিয়ে একবার সামনে বাড়ছে, একবার পিছু হটছে, ঠিক যেন একজোড়া শিকারী মোরগের লড়াই চলছে দু'জনের মধ্যে। জনসমর্থন অবশ্য কাউন্টের তরফেই ভারি, কারণ ভাড়াটে সৈনিকরা যুদ্ধ না করলেও বেতন পাবে, আর শিফটা সৈনিকরা ডাকাতি করতে অভ্যস্ত, যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা তাদের নেই। কাউন্ট গাড়ি নিয়ে পালাতে সমর্থ হলে, তার পিছু নিয়ে তারাও ভেগে যেতে পারে।

‘কোথায় শত্রু? ড্রাম যখন বাজছে, কিছু লোকজন থাকতে পারে ওদিকে,’ বলল মেজর রাকা, ‘কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে আসছে বলে মনে হয় না।’ কাউন্টের হস্তিত্ব তার ধমকে চাপা পড়ে গেল। ‘সে যাই হোক, এই মুহূর্তে আমার কর্নেলকে আমি বাহিনী ছেড়ে কোথাও যেতে দিতে পারি না। শিফটা সৈনিকরা আপনাকে ভয় পায়, আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আপনার বীরত্বের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। শত্রু হামলা করুক বা না করুক, বিজয় আমাদেরকে ছিনিয়ে আনতে হবে, কাজেই আপনার শারীরিক উপস্থিতি এবং কমাণ্ড একান্ত দরকার আমাদের।’ কথা বলছে, সেই সঙ্গে এক পা এক পা করে সামনে বাড়ছে মেজর। ‘সত্যি যদি আক্রমণ হয়ই, কাউন্ট তথা নেতৃত্ববিহীন থার্ড ব্যাটালিয়ান এতিম হয়ে পড়বে, তখন কে তাদেরকে পথ দেখাবে?’ পিছু হটতে হটতে হঠাৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছল কাউন্ট, ব্যাপারটা তার জন্য অপমানকর হয়ে

দাঁড়াচ্ছে, কাজেই সে এবার দাঁড়িয়ে পড়ল, ফলে বিশালদেহী মেজরের পেট তার পেটের সঙ্গে এক হলো, প্রায় এক হলো দুটো নাকও। ‘ভুলে গেলে চলবে না, এটা ফরম্যাল কোন যুদ্ধ নয়। আমরা এমনকী কোন দেশেরও প্রতিনিধিত্ব করছি না। তাই দুর্নাম, পরাজয়, দুর্ভোগ যদি কপালের লিখন হয়—কর্তাব্যক্তির সাথে একযোগে ভাগ করে নেয়ার পক্ষপাতী আমরা।’

দাঁড়িয়ে পড়বার সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল, উপলব্ধি করে আবার পিছু হটতে গেল কাউন্ট, অনুভব করল তার পিঠে কী যেন ঠেকছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সৈন্য বোঝাই একটা ট্রাক রয়েছে পিছনে।

‘ওরা ভাড়াটে সৈনিক, আমার বাছাই করা,’ ফিসফিস করে বলল মেজর। ‘রোলস-রয়েস কোথাও যাচ্ছে দেখলে ওই ট্রাক নিয়ে ধাওয়া করবে ওরা। অনুমতি দেয়া আছে, থামাতে না পারলে গাড়িটার ওপর দিয়ে চালানো হবে।’

কাউন্ট চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল, ‘বিদ্রোহী! নরাধম! আমি তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাব!’

মেজর যেন কাউন্টের কথা শুনতে পায়নি। ‘আর এক ঘণ্টা পর ভোর। দিনের আলো ফুটলে পরিস্থিতি আঁচ করা সম্ভব হবে।’

এই সময় ড্রামের আওয়াজ থেমে গেল। উপত্যকার উপরদিকে গোত্রপ্রধান বৃদ্ধ কামাল হাসান প্রতিরক্ষাসূচক নৃত্য খামিয়েছেন। নিস্তব্ধতা নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কাউন্ট ডিকানডিয়ার চেহারা, শিরদাঁড়া খাড়া করে সিঁধে হলো। রক্তচক্ষু মেলে মেজরের দিকে তাকাল সে। ‘মেজর রাকা! বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চিও পিছু হটব না আমরা। থার্ড ব্যাটালিয়ানকে নির্দেশ দাও, সামনের সমস্ত বাধা খড়-কুটোর মত উড়িয়ে দিয়ে

অগ্রসর হতে হবে। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী! মেজর ভিটোরী, এখানে উপস্থিত ডিটাচমেন্টের কমান্ড তোমার হাতে তুলে দেয়া হলো। বাধার প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে ওদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হও তুমি। বাকি সবাই আমার চারপাশে থাকো। সবাই দেখো, আমার যুদ্ধযাত্রা শুরু হলো।’

সশস্ত্র সৈনিকদের তৈরি ঘেরের মধ্যে অবস্থান নিয়ে উপত্যকা থেকে নামতে শুরু করল কাউন্ট। নীচের দিকে আগেই মেজর রাকার তত্ত্বাবধানে মেশিনগান আর মর্টার বসানো হয়েছে।

কামাল হাসানের অসংখ্য সহিসের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটার বয়স মাত্র পনেরো। আগের দিন গোত্রপ্রধানের প্রিয় একটা ঘোড়াকে পানি খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছিল সে, রশি ছিঁড়ে ছুট দেয় ঘোড়া, গিয়ে পড়ে খাঁ খাঁ মরতে। পুরোটা দিন আর রাতের অর্ধেকটা ঘোড়ার পিছু পিছু চক্কর খায় ছেলেটা, অবশেষে ক্লান্ত ঘোড়ার লম্বা রশিটা নাগালের মধ্যে পায় সে।

সারাদিন খাওয়া নেই, রোদের মধ্যে ছোটোছুটি করেছে, তার উপর রাতের ঠাণ্ডা বাতাস, ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেচারা একেবারে নেতিয়ে পড়ল। বাহনের কেশর ধরে ঘাড়ের উপর মাথা রাখল সে, ঘুম এসে গেল চোখে। জানে একবার যখন ধরা দিয়েছে, পথ চিনে নিজেই পানির কাছে পৌঁছে যাবে তার ঘোড়াটা। কিন্তু ওটা যে হাঁটতে হাঁটতে শত্রুঘাঁটির ভিতর ঢুকে পড়বে তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

নার্ভাস একজন সেন্সিটিভ হেঁড়ে গলায় চ্যালেঞ্জ করল, চমকে উঠে ছুট দিল ঘোড়া, সেই সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল সহিসের। অন্ধকারের ভিতর সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক আর সামরিক তাঁবুগুলোকে চিনতে পেরে ছানাবড়া হয়ে গেল তার চোখ। ঘোড়ার পিঠে লম্বা

হয়ে সঁটে থাকল সে, আল্লাহ আল্লাহ করছে। তারার আলোয় চকচকে একটা স্তূপ দেখতে পেল। স্তূপটার একেবারে গা ঘেষে ছুটল ঘোড়া। জিনিসগুলো চিনতে পেরে দম বন্ধ হয়ে এল তার। একসঙ্গে এতগুলো রাইফেল এই প্রথম দেখল সে। ঘাঁটি থেকে বেরুবার মুখে হেলমেট পরা আরেকজন সেন্সিটিভ চ্যালেঞ্জ করল তাকে। হাতের ফাঁক দিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই ঝলসে উঠতে দেখল রাইফেলের মাজল। সহিসের নিচু করা মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। পা আর হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পিঠে গুঁতো মারল সে।

গভীর নালায় সহিস যখন ফিরে এল, কামাল হাসানের বেশিরভাগ অনুসারী রাতব্যাপী উৎসব শেষে ক্লাস্তিতে নেতিয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাদের অনেকে এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়েছে ঘুমানোর একটা জায়গা পাবার আশায়, বাকিরা যেখানে বসে খেয়েছে সেখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। অল্প কয়েকজন যুবক অবশ্য তখনও সমানে চালিয়ে যাচ্ছে, মাংস আর মদ দুটোই। আগুনের ধারে বসে আস্তে ধীরে খাচ্ছে তারা, স্বর্ণালংকার পরা যুবতী মেয়েদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে—সদ্য ঘুম থেকে উঠে সকালের নাস্তা তৈরি করতে বসেছে তারা।

গুহামুখের কাছে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে একজন প্রহরীর ঘাড়ে চড়াও হলো কিশোর সহিস। দু’জনেই ধরাশায়ী হলো সশব্দে। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ গলায় প্রলাপ বকতে শুরু করল সহিস। ভাগ্যিস উপস্থিত রয়েছে প্রিন্স হাসান সালে, কাজ হলো তার ধমকে।

ইতিমধ্যে আদিবাসীদের মধ্যে মহা শোরগোল পড়ে গেছে। ঠিক কী দেখেছে সহিস তা একমাত্র প্রিন্স বুঝতে পারল, বাকিরা

যতটুকু শুনল তারচেয়ে বেশি নিজেদের মনমত বানাল। একদল আদিবাসী চিৎকার করে আরেক দলকে জানাল, এভাবে সবগুলো গুহা আর গোটা নালায় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা, বিকৃত হয়ে। দেখতে না দেখতে গোটা এলাকা জুড়ে শুরু হয়ে গেল অবিশ্বাস্য ছুটোছুটি।

ঘুম থেকে জেগে উঠল সবাই, প্রতিটি পুরুষ যে যার অস্ত্রে সজ্জিত হলো। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও কৌতূহলী, এমনকী শিশুরাও তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। ছোট বড় সব ক’টা গুহা থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল তারা, বেরিয়ে এল তাড়াহুড়োর সঙ্গে খাড়া করা তাঁবুগুলো থেকে। এমন একজন কেউ নেই যে ওদেরকে বুদ্ধি দেবে বা সতর্ক করবে, ভাল-মন্দ বিবেচনাবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, ঝাঁক ঝাঁক মাছের মত সবাই একদিকে ছুটল।

একদিকে ছুটল একটা মাত্র উদ্দেশ্যে। ছড়িয়ে পড়া খবরটা সম্পর্কে সবাই যে যার বিজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করছে, তর্কেরও বিরাম নেই, এমনকী বুড়োরা পর্যন্ত শত্রুকে কীভাবে নিধন করবে অঙ্গভঙ্গি সহকারে বর্ণনা করতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। বোধবুদ্ধিহীন জনতার ঢল এগিয়ে চলেছে, হাঁটতে হাঁটতেই তারা কজিতে বেঁধে নিচ্ছে লাল কাপড়ের পট্টা, বর্ষার ফলায় আঙুল ঠেকিয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছে ধার, মান্ধাতা আমলের আগ্নেয়াস্ত্রে বুলেট ভরছে। মায়ের কোলে খিলখিল করে হাসছে শিশুরা, যারা হাঁটতে পারে তারা বড়দের চারদিকে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মশগুল, বুকে কাল্পনিক বর্ষা নিয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। এভাবেই তারা ভাঙাচোরা এবড়োখেবড়ো নালা থেকে বেরিয়ে নেমে এল ওয়েলস অভ চান্ডির পিরিচ আকৃতির উপত্যকায়।

বড় গুহাটায় প্রিন্স হাসান সালে এখনও বিদেশীদের উদ্দেশ্যে সহিসের গল্পটা ব্যাখ্যা করছে, উত্তর দিচ্ছে তাদের প্রশ্নের। গোত্রপ্রধান কামাল হাসানও উপস্থিত রয়েছেন, কিন্তু তিনি ঠিক

মনোযোগী হতে পারছেন না, কারণটা মাইকেলই ভাল বলতে পারবে। বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল একা শুধু রানা।

‘শিফটারী যদি কুয়া দখল করতে এসে থাকে, ধরে নিতে হয় ওরা তৈরি হয়ে আছে। ওরা হামলা করার অজুহাত খুঁজছে, প্রিন্স। তোমার লোকদের কড়া নির্দেশ দাও, ভুলেও যেন ওদিকে কেউ না যায়। প্রথমে পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে আমাদের...।’

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভোরের প্রথম আভাস এখনও অস্পষ্ট, এ-সময়ের ক্ষীণ আলো মানুষের চোখের সঙ্গে ভৌতিক চাতুর্য নিয়ে খেলা করে—প্যারাপেটের কিনারায় উঁকি দিয়ে থাকা থার্ড ব্যাটালিয়ানের সেন্দ্রিরা দেখল অন্ধকারের ভিতর মানুষের একটা সচল পাঁচিল অসমান নালা থেকে উপত্যকায় বেরিয়ে আসছে। এখনও অস্পষ্ট, তবু শত শত মানুষের সম্মিলিত হৈ-হল্লাও শুনতে পেল তারা।

রাতে ড্রামের শব্দ যখন শুরু হয়, কালো শার্ট পরা অনেক সৈনিক যে যার ট্রেঞ্চের ফায়ারিং স্টেপ-এর নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ তার আগে সারাটা দিন মার্চ করে এখানে পৌঁছেছে তারা, তারপর গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। সেন্দ্রির দায়িত্ব পালন করছে ভাড়াটে সৈনিকরা, লাথি মেরে শিফটা সৈনিকদের ঘুম ভাঙাল তারা, ঠ্যালা-গুঁতো দিয়ে সবাইকে দাঁড় করাল প্যারাপেট বরাবর সার সার পজিশনে। চোখে ঘুম নিয়ে নীচের উপত্যকার দিকে তাকাল শিফটারী।

মেজর রাকা আর মেজর ভিটোরাকে নিয়ে থার্ড ব্যাটালিয়ানে পুরোদস্তুর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে খুব বেশি হলে ত্রিশ-বত্রিশজনের, বেশিরভাগই তারা ভাড়াটে সৈনিক। তাদের মধ্যে

কয়েকজন সেন্ত্রির দায়িত্ব পালন করছে, বাকি সবাইকে নিজের চারদিকে আটকে রেখেছে কাউন্ট ডিকানডিয়া। সদ্য ঘুম থেকে উঠবার পর শিফটারা হতচকিত, তা ছাড়া এমনিতোও তো রাতের শেষ প্রহরে মানুষের দেহ ও মনে সবচেয়ে বেশি জড়তার ভাব থাকে, তার উপর মরু থেকে ছুটে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করছে ওরা। ভোরের অনিশ্চিত উপত্যকার আলোয় বেরিয়ে আসা লোকগুলোকে মরুর বালির মত অগুণতি বলে মনে হলো, প্রতিটি লোক ওদের চোখে ধরা পড়ল একেকটা দানব হিসাবে।

ঠিক এই সময় উত্তেজনা আর পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে, সর্ব কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ থেকে উদয় হলো কাউন্ট ডিকানডিয়া। কামান বসানো মঞ্চে হোঁচট খেতে খেতে উঠল সে, দাঁড়াল ফায়ারিং প্ল্যাটফর্মে। সার্জেন্ট-ইন-কমান্ড তাকে চিনতে পেরেই স্বস্তিসূচক একটা চিৎকার ছাড়ল। ‘মাই কর্নেল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি এসেছেন।’ পদ আর সম্মানের কথা ভুলে কাউন্টের একটা কজি চেপে ধরল সে।

সার্জেন্টের নোংরা ঘর্মাক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কাউন্ট। বিশ সেকেন্ড পর আংশিক সফল হয়েছে সে, এই সময় তার নজর পড়ল উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়া জনারণ্যের দিকে। ‘দয়াবতী ঈশ্বরের মা!’ আঁতকে উঠল সে। হাঁটুতে একদম জোর পাচ্ছে না, পেটের ভিতর নাড়িভুঁড়ি সব যেন তরল পদার্থে পরিণত হলো। ‘সব শেষ! আমরা হেরে গেছি! ওরা চড়াও হয়েছে আমাদের ওপর!’ কাঁপা হাতে হোলস্টারের ফ্ল্যাপ খুলল সে, পিস্তল হাতে চলে আসবার আগেই মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে নিচু হলো, এক হাতে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম ধরে থাকল। ‘ফায়ার!’ নির্দেশ দিল। ‘ওপেন ফায়ার!’ প্যারাপেটের কিনারা থেকে অনেক নীচে মাথা নামিয়ে গুলি করল সে, সরাসরি ভোরের আকাশে।

প্যারাপেট বা নিচু পাঁচিলের পিছনে শিফটারদের মোট সংখ্যা চারশোরও বেশি, তাদের মধ্যে সাড়ে তিনশো রাইফেল চালাতে জানে, প্রত্যেকের হাতে রয়েছে ম্যাগাজিন ভরা বোল্ট-অ্যাকশন আগ্নেয়াস্ত্র। আরও ষাটজন রয়েছে মেশিনগানের দায়িত্বে, পাঁচজন করে বারোটা দলে ভাগ হয়ে।

শুধু যে পরিশ্রমে তা নয়, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকবার কারণে এবং নানা ধরনের অবিশ্বাস্য গুজব কানে আসায় সবাই ওরা টেনশনে ভুগছে। রাতে ড্রামের শব্দ ওদেরকে প্রায় অবশ করে তুলেছিল। যে যার অস্ত্রের পিছনে হুমড়ি খেয়ে থাকল ওরা, ট্রিগারে আঙুল, বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই।

কাউন্টের আর্তচিৎকার আর পিস্তলের আওয়াজটাই যেন দরকার ছিল ওদের, সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে গেল ভয়ের যে বাঁধনটা ওদেরকে পঙ্গু করে রেখেছিল। গুলিবর্ষণ শুরু হলো কাউন্টের চারধার থেকে, কারণ আশপাশে যারা রয়েছে তারাই শুধু শুনতে পেয়েছে কর্নেলের নির্দেশ। উপত্যকার সামনের ঢালে দীর্ঘ একটা রেখা ধরে বলসে উঠল মাজলগুলো, তারই সঙ্গে গর্জে উঠল তিনটে মেশিনগান। কাপড় ছিঁড়বার একটানা শব্দ তুলে তির্যক পথ ধরে ছুটল মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, রাইফেল বা অন্যান্য ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল, ট্রেসার বুলেটগুলো সাঁ সাঁ করে উঠে গেল উপত্যকার মাথায়, বিস্ফোরিত হয়ে আলোকমালায় পরিণত হলো।

পাশের ঢাল থেকে গুলিবর্ষণ হতে দেখে জনতার ঢলে ভাঙন ধরল, আহত সঙ্গী-সাথীদের মাড়িয়ে উপত্যকার দূরবর্তী অন্ধকার নিস্তর্র ঢালের দিকে স্রোতের মত ধাবিত হলো তারা—চোখ ঝাঁধানো ট্রেসার আর রাইফেল ফায়ারের লাল সারি থেকে দূরে সরে যেতে

চাইছে। পিছনে পড়ে থাকল নিহত ও আহতরা, যারা জীবিত তারা ছড়িয়ে পড়ল উপত্যকার চওড়া মেঝেতে।

দূরবর্তী ঢালে গানাররা চুপচাপ রয়েছে, তাদের দিশেহারা ও বিমূঢ় ভাব আরও কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো, তারপর যখন দেখল আদিবাসীরা এবার সরাসরি তাদের জন্য হুমকি হয়ে ছুটে আসছে, কোন নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে তারাও ফায়ার ওপেন করল।

শুরু হলো খোলা উপত্যকায় পাইকারী নিধনযজ্ঞ। পিছনের মেশিনগানগুলো এখনও রেঞ্জের মধ্যে পাচ্ছে আদিবাসীদের, তারা সামনের মেশিনগানের রেঞ্জের ভিতরও চলে এসেছে। সামনে থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ল সবাই, জানে না কোথায় যাবে, কোথায় গেলে নিরাপদ আশ্রয় পাবে। শিশুদের বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে ছুটোছুটি শুরু করল মায়েরা, অল্প কয়েকজন আদিবাসী যোদ্ধা মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে পাল্টা গুলি করল ঢাল লক্ষ্য করে, কিন্তু ট্রেঞ্চের ভিতর পজিশন নিয়ে থাকায় তাদের একটা বুলেটও শত্রুপক্ষের কারও গায়ে লাগল না। লাভ হলো শুধু এই যে শিফটারা গুলিবর্ষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

নিয়ন্ত্রণবিহীন জনতার ঢল নিজেদের চারদিকে চক্রর দিতে শুরু করল। দ্রুত মস্তুর হয়ে এল তাদের গতি। এক সময় থেমে গেল তারা। নিরস্ত্র মায়েরা এখনও যারা বেঁচে আছে, যার যার নিজের বাচ্চাকে মাটিতে শুইয়ে পরনের ঢোলা কাপড় দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করল, নিজেদের শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখল বুকের মাণিককে। পুরুষরাও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, গুলি করল এলোপাতাড়ি ঢালের গায়ে লাল হয়ে ফুটে থাকা ঝলসানো মাজল লক্ষ্য করে। অবশ্য লাল আগুনের বালক আগের চেয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, দিগন্তরেখার কাছে উঁকি দিতে যাচ্ছে দিনের প্রথম সূর্য।

বারোটা মেশিনগান, একেকটা প্রতি মিনিটে সাতশো করে বুলেট ছুঁড়ছে, তার সঙ্গে তিনশো পঞ্চাশটা রাইফেল বুলেটের চাদর বিছিয়ে দিল উপত্যকার উপর। মিনিটের পর মিনিট ধরে অব্যাহত থাকল তুমুল গুলিবর্ষণ, উপত্যকার নীচে এখনও যারা বেঁচে আছে, ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকা দিনের আলো তাদের নড়াচড়া ফাঁস করে দিতে থাকল নিষ্ঠুরের মত।

আক্রমণকারীদের মেজাজ বদলে গেল। এত সহজে, ট্রিগার টিপলেই, এতগুলো লোককে একসঙ্গে মেরে ফেলতে পারে দেখে ভয় কেটে গেল তাদের। বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ল শিফটারা, আরও নির্দয় হয়ে উঠল। নীচের খোলা উপত্যকায় মাস্কাতা আমলের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এখনও যারা পাল্টা গুলিবর্ষণের চেষ্টা করছে তারা সংখ্যায় এতই কম যে শিফটারাদের মধ্যে একজনও এতটুকু ভয় পেল না। এমনকী কাউন্ট ডিকানডিয়া পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিস্তল নেড়ে চিৎকার করছে সে, ‘শত্রুদের আমি শেষ দেখতে চাই! ফায়ার!’ সতর্কতার সঙ্গে প্যারাপেটের কিনারা দিয়ে উঁকি দিল সে। ‘খুন করো ব্যাটারদের। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।’

সূর্যের প্রথম রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে, ধরাশায়ী অসাড় মানুষ আর লাশে ফুলে উঠেছে উপত্যকার মেঝে। এদিক সেদিক নিঃসঙ্গভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তারা, যেন নিষ্কন মার্কেটে এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা পুরানো কাপড়ের একেকটা স্তূপ।

উপত্যকার মাঝখানে এখনও বেঁচে আছে কিছু মানুষ। মাঝে মধ্যে হঠাৎ লাফ দিয়ে সিঁধে হলো দু’একজন, পিছনে ঢোলা কাপড় উড়িয়ে খিঁচে দৌড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু নিল মেশিনগান, ধুলোর বিস্ফোরণ দ্রুত বৃত্ত রচনা করল তার ছুটন্ত পায়ের

চারদিকে, বুলেটের আঘাতে সেই ধুলোর মধ্যে আছাড় খেলো লোকটা, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত আর ধুলো মিশে একাকার হয়ে গেল, ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল এক সময়।

আদিবাসী যোদ্ধারা, যারা এখনও পুরানো রাইফেল আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছে, কালো মুখ ঢালের দিকে তোলা, হাত পাকানোর জন্য শিফটা রাইফেলধারীদের আদর্শ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো। ভাড়াটে ক্যাপটেন বা সার্জেন্টের তীক্ষ্ণকণ্ঠ নির্দেশ পেয়ে রাইফেলধারীরা টার্গেটের উপর নিশানা স্থির করল যথেষ্ট সময় নিয়ে। একেকবার একেকজন রাইফেলধারীকে সুযোগ দেওয়া হলো, লক্ষ্যভেদের সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ল শিফটা সৈনিকরা। দীর্ঘ কয়েক হণ্ডার ট্রেনিং বৃথা যায়নি, অবশেষে ডাকাত থেকে যোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছে তারা।

প্রথম গুলিবর্ষণের পর প্রায় বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, যাকে গুলি করা যায় এমন কেউ উপত্যকায় নেই বললেই চলে। মেশিনগানের মাজল আগ্রহ আর প্রত্যাশা নিয়ে একদিক থেকে আরেক দিকে আসা-যাওয়া করছে, আর কিছু না পেয়ে অকারণে গুলি করছে লাশের স্তূপে, কিংবা বুলেট ছুঁড়ে ধুলো ওড়াচ্ছে গভীর কুয়াগুলোর গোলাকৃতি ঠোঁটের চারপাশে, শুধু ওগুলোর আড়াল থেকেই মাঝে মধ্যে এখনও পাল্টা জবাব দিচ্ছে আদিবাসীরা।

‘মাই কর্নেল।’ কাউন্ট ডিকানডিয়ার মনোযোগ আকৃষ্ট করবার জন্য তার হাত স্পর্শ করল মেজর লুইগি রাকা।

দু’তিনবার ডাকবার পর অবশেষে মেজরের দিকে ফিরল কাউন্ট, তার চোখ আনন্দে আর উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। ‘দেখছ, মেজর? দেখছ কী একখানা বিজয় তোমাদেরকে আমি

উপহার দিলাম? গ্রেট ভিক্টরি, তাই না? আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে ওদের আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।’

‘কর্নেল, আমি কি যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেব?’ জিজ্ঞেস করল মেজর।

কাউন্ট ভাব দেখাল সে তার কথা শুনতে পায়নি। ‘এখন ওরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে কী ধরনের যোদ্ধা আমি। এই বিজয়ের পর অবশ্যই ইটালিতে আমার ফিরে যাওয়া উচিত—,’ মাফিয়া চক্রের নেতা, তার শালা, দুলাভাইয়ের এই কৃতিত্ব আর বীরত্বকে ছোট করে দেখতে পারবে না, চক্রের নেতৃস্থানীয় একটা পদ দাবি করলে প্রত্যাখ্যান করবার উপায় কী তার?

‘কর্নেল! কর্নেল! এই মুহূর্তে গোলাগুলি থামানো উচিত আমাদের। যুদ্ধ কোথায়, এ তো নিরীহ মানুষকে একতরফাভাবে খুন করা হচ্ছে। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ওয়েলস অভ চান্ডি দখল করার পর সামনে যতদূর পারা যায় এগিয়ে যাওয়া...।’

মেজরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল কাউন্ট, রাগে তার চেহারা লাল হয়ে উঠল। ‘এই ব্যাটা, হাঁদারাম!’ গর্জে উঠল সে। ‘এটা যুদ্ধ নয়?’

‘ঠিক আছে, যুদ্ধই,’ সময় বাঁচানোর জন্য তর্ক এড়াতে চাইল মেজর রাকা। ‘কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, শত্রুরা প্রায় সবাই মারা পড়েছে, এবার আমাদের উচিত...’

‘উচিত চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা,’ চোঁচিয়ে উঠল কাউন্ট। ‘জানো না শত্রুর শেষ রাখতে নেই? প্রমাণ করতে হবে আমি অজেয় অমর! তোমার এত সাহস, বীরত্ব প্রদর্শনের এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও? দেখতে পাচ্ছ না, কুয়াগুলোর আড়ালে জড়ো হয়েছে শত্রুরা? ওদেরকে বের করে

এনে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে! মর্টার, লুইগি, মর্টার! কামান দাগো, ওদের বাপের নাম ভুলিয়ে দাও! বুঝিয়ে দাও, কার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে ওরা!’

না, ব্যাপারটার ইতি ঘটানোর কোন ইচ্ছে তার নেই। এটা তার জীবনের গভীরতম তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা। এই যুদ্ধ তাকে এতদিনে উপলব্ধি করতে শেখাল যুগ যুগ ধরে কেন কবিরী বীরশ্রেষ্ঠদের জয়গান গেয়ে গেছে। যুদ্ধ, সে তো সত্যিকার একজন পুরুষ মানুষের প্রিয়তম নেশা, আর কাউন্ট ডিকানডিয়া জানে তার জন্মই হয়েছে এই নেশায় বঁুদ হয়ে থাকবার জন্য।

দুঃসাহসের সঙ্গে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল মেজর রাকা, ধমকের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করল কাউন্ট, ‘আমার নির্দেশ তুমি অমান্য করতে চাও? এই মুহূর্তে কামান দাগো!’

‘এই মুহূর্তে,’ তিক্তকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল মেজর, ঘুরে দাঁড়ানোর আগে দীর্ঘ এক সেকেন্ড ধরে পাথুরে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল কাউন্টের দিকে।

প্রথম মর্টার বোমাটা পরিষ্কার মরুপ্রভাতের উঁচু আকাশে উঠে গেল, বাঁক নেওয়া শেষ করে উপত্যকায় নামতে শুরু করল খাড়াভাবে। সবচেয়ে কাছের কুয়ার ঠোঁটে বিস্ফোরিত হলো ওটা। ধোঁয়া আর ধুলো লাফিয়ে উঠল, তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল বোমার টুকরোগুলো। দ্বিতীয় বোমাটা নিখুঁতভাবে গভীর গোলাকৃতি গর্তের ভিতর পড়ল, বিস্ফোরিত হলো দৃষ্টিপথের বাইরে। কুয়ার ভিতর থেকে উথলে উঠল কাদা আর ধোঁয়া, ভিতরের গায়ে আশ্রয় নিয়ে থাকা আদিবাসী যোদ্ধারা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল খোলা মাটিতে, তাদের নোংরা সাদা আলখেল্লা পতাকার মত উড়ছে বাতাসে।

সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান আর রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল,

www.BanglaBook.org

তাদের চারদিকে বিস্ফোরিত ধুলোর ঘূর্ণি সৃষ্টি হলো, ধুলো শান্ত হবার পর কাউকে নড়তে দেখা গেল না।

চারদিকে থুথু ছিটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল কাউন্ট ডিকানডিয়া। যুদ্ধ জেতা পানির মত সহজ আর আনন্দদায়ক। ‘বাকি গর্তগুলোয়, লুইগি!’ নির্দেশ দিল সে। ‘বের করো শালাদের! সব ক’টাকে!’

প্রতিবার একটা করে কুয়া লক্ষ্য করে কামান দাগা হলো। দু’একটা কুয়া থেকে কেউ বেরল না, ভিতরে পড়ে লোকজনের উপরই বিস্ফোরিত হলো গোলা। বাকি প্রায় সবগুলো থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল অসহায় আদিবাসীরা, বোমার টুকরো অর্থাৎ ধারাল ছোট ছোট ইস্পাত তাদের সারা শরীরে গাঁথে আছে। বেরিয়ে এসে পাঁচ গজও এগোতে পারল না কেউ, অপেক্ষারত রাইফেল আর মেশিনগান ঝাঁঝরা করে দিল তাদের।

সাহস বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছুল, উপত্যকা আর কুয়াগুলো ভাল করে দেখবার জন্য প্যারাপেটের উপর উঠে দাঁড়াল কাউন্ট ডিকানডিয়া, বাকি কুয়াগুলোর দিকে হাত তুলে গানারদের দিক-নির্দেশ দিচ্ছে।

পরবর্তী টার্গেট নাগার কাছাকাছি, অসমান মাটির সামনে, উপত্যকার একেবারে শেষ মাথায়। প্রথম বোমাটা বিস্ফোরিত হলো, স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে উঠল স্নান অগ্নিশিখা আর ধুলো। দ্বিতীয় বোমাটা পড়বার আগে, কুয়ার ঠোঁট থেকে লাফ দিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো এক যুবতী, ছুটল, জানে নাগার মুখে একবার পৌঁছুতে পারলে নিরাপদ আড়াল পেয়ে যাবে।

তার পিছনে দুই কি তিন বছরের একটা নগ্ন বাচ্চা। বাচ্চাটার পা দুটো বাঁকা, সম্ভবত জন্ম থেকেই, আর পেটটা ধূসর রঙের বেলুনের মত ফোলা। তার হাত ধরে ছুটছে মা, সঙ্গে করে নিয়ে

আসতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সমান তালে অতটুকু বাচ্চা ছুটে পারবে কেন, হেঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে, কিন্তু তার মা তাকে ছাড়ল না।

বাচ্চাটা যন্ত্রণাকাতর চিৎকার জুড়ে দিল, তার মা তাকে একটা বস্তার মত মাটির সঙ্গে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছে। যুবতী মায়ের কোমর দু'পায়ে জড়িয়ে আরেকটা দুধের বাচ্চা সঁটে রয়েছে বুকের সঙ্গে। সে-ও নগ্ন, সে-ও তারস্বরে চিৎকার করছে।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ভারবাহী ছুঁত মায়ের দিকে কোন বুলেট ছুটে এল না। যখন এল তখন ঝাঁক বেঁধে এল, আর লাগল মাত্র একটা, প্রথম বাচ্চার কর্জি ধরে থাকা হাতের কনুই চুরমার হয়ে গেল। হাড় গুঁড়িয়ে গেল, কনুইয়ের কাছ থেকে নীচের দিকে হাতটা ঝুলে থাকল শুধু চামড়া আর শিরার সঙ্গে। পরবর্তী ঝাঁকটা এল সঙ্গে সঙ্গেই, অনেকগুলো ঝাঁকি খেলো যুবতী, একটা বুলেট দ্বিতীয় শিশু আর মায়ের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

আবার শুরু হয়ে গেল মেশিনগান আর রাইফেল। মায়ের লাশের পাশে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে প্রথম বাচ্চাটা।

আবার তার কান্না শুরু হলো, ঝাঁক পা নিয়ে টলতে টলতে দাঁড়াল সে, শক্তভাবে ফুলে থাকা গালে মুক্তোর মত দু'ফোঁটা পানি, গলা থেকে পেটে নেমে এসেছে নীল পুঁতির মালা।

নালার মুখ থেকে ভোজবাজির মত উদয় হলো ছুঁত একটা ঘোড়া। মেদহীন, পেশীবহুল সাদা স্ট্যালিয়ন, বালি মেশানো অসমান মাটির উপর দিয়ে তীরবেগে উড়ে গেল সেটা, তার কাঁধ আঁকড়ে ধরে পিঠে লম্বা হয়ে প্রায় শুয়ে রয়েছে এক নারীমূর্তি। পিছনে পতপত করে উড়ছে কালো একটা আলখেল্লার দীর্ঘ প্রান্ত। ঘোড়সওয়ার তার স্ট্যালিয়ন নিয়ে ছেলেটা যদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সেদিকে ছুটে চলেছে। কী ঘটছে গানাররা ভাল করে বুঝে

উঠবার আগেই খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে গেল সে।

প্রথম মেশিনগান বিস্ফোরিত হলো, কিন্তু বুলেটগুলো উড়ে গেল স্ট্যালিয়নের মাথার অনেকটা উপর দিয়ে, একটাও লাগল না। এই সময় বাচ্চাটার কাছে পৌঁছে গেল ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার হ্যাঁচকা টান দিল লাগামে, অকস্মাৎ বাধা পেয়ে পিছনের পায়ে খাড়া হলো স্ট্যালিয়ন, আর ঘোড়সওয়ার সঁ্যাৎ করে নিচু হলো ছেলেটাকে ছোঁ দিয়ে তুলবার জন্য।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্থির টার্গেট লক্ষ্য করে একসঙ্গে গর্জে উঠল আরও দুটো মেশিনগান।

তেরো

সমর উপকরণে সুসজ্জিত হয়ে নিঃশব্দে কুয়ার কাছে চলে এসেছে শিফটা বাহিনী, এটা উপলব্ধি করবার সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হয়ে উঠল রানা। আদিবাসীরা শুধু যে আনাড়ি তাই নয়, তাদের শৃংখলাঙ্গান বলতেও কিছু নেই। শিফটাদের সামনে পড়লে সব কচু-কাটা হয়ে যাবে। এই আত্মহত্যার পথ থেকে ওদেরকে সরিয়ে আনবার একটাই মাত্র পথ আছে।

অস্ত্র আর গোলাগুলির যুদ্ধ কখন শুরু হবে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু এদিকে কথার যুদ্ধ থামবার কোন লক্ষণ নেই। মহা শোরগোলের মধ্যে যতই গলা ফাটাক রানা, কেউ ওর কথা শুনতে পাবে না। কামাল হাসানের পঞ্চাশজন সশস্ত্র সহচর যোদ্ধা ভাবাবেগে আপুত হয়ে পড়েছে, অ্যামহারিক ভাষায় একযোগে চিৎকার করছে তারা, উদ্দেশ্য আশু করণীয় সম্পর্কে গোত্রপ্রধানকে

পরামর্শদান। আশ্চর্য, এই কণ্ঠশক্তি প্রতিযোগিতার মধ্যে কামাল হাসানের গলাও শোনা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে, তিনিও নির্দেশ দিচ্ছেন কাকে কী করতে হবে। সমস্যা একটাই, কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না।

রানার একজন দোভাষী দরকার। ভিড় ঠেলে সামনে এগোল ও, খপ করে আব্বাস খায়েরের কজি ধরল, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল গুহার বাইরে। যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করতে হলো রানাকে, কারণ আর সবার মত আব্বাসও নিজের কথা বাতাসে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেঁচা চালিয়ে যাচ্ছিল, ভয়ানক উত্তেজনায় পাথুরে স্তম্ভের মত নিরেট আর শক্ত হয়ে আছে তার শরীর।

গুহার বাইরে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে দেখে অবাক হয়ে গেল রানা, ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগল, এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল রাতটা! ভোর হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। গুহার বাইরে মরুর ঠাণ্ডা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিল ও।

ম্লান আকাশ আর ক্যাম্প ফায়ারের আলোয় দেখতে পেল, জনতার ঢল নালা থেকে নেমে কুয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই এত হাসিখুশি আর উত্তেজিত, যেন সামনে কোথাও মেলা বসেছে।

‘ওদের থামাও, আব্বাস,’ জরুরী ভঙ্গিতে বলল রানা। ‘এসো, ওদের বাধা দিই।’ আব্বাসের হাত ধরে ছুটল ও।

‘কী ব্যাপার, মাসুদ ভাই?’

‘নালা থেকে নেমে কোথায় ওরা গিয়ে পড়বে, বুঝতে পারছ না?’ ছুটে ছুটেই বলল রানা। ‘শিফটারা শ্রেফ কচু-কাটা করবে ওদের।’

লোকারণের পিছনে পৌঁছুল ওরা, ভিড়ের নিরেট পাঁচিল ভেদ করে ভিতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কনুই আর হাঁটু চালাল

ওরা, যাকে সামনে পেল তারই চুল বা জামা মুঠোর মধ্যে নিয়ে টান দিল হ্যাঁচকা। ‘পিছোও, পিছু হটো, ফেরত যাও!’ অ্যামহারিক ভাষা কিছুই জানে না রানা, ও শুধু আব্বাসের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

আব্বাসকে পাশে নিয়ে নালার সরু মুখে পৌঁছুল ও। মুখটা লম্বা, শেষ মাথায় কুয়াগুলোকে বুকে নিয়ে পিরিচ আকৃতির উপত্যকা। পরস্পরের একটা করে হাত ধরে পাঁচিল তৈরি করল ওরা, জনস্রোত ঠেকানোর এটাই একমাত্র উপায়। বিশ কি ত্রিশ সেকেন্ড থেমে থাকল মিছিলের গতি। বাধা পেয়ে যারা দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছন থেকে জনতার নিরেট চাপ পড়ল তাদের পিঠে। ইতিমধ্যে আদিবাসীদের মেজাজ বদলে গেছে, হাসিখুশি মানুষগুলো খেপে গিয়ে একবাক্যে রায় দিল সামনের বাধা উপড়ে ফেলো। কয়েকশো আদিবাসী ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে উপত্যকায়, বাকি সবাই তাদের সঙ্গে মিলিত হতে চায়।

জনতার চাপ ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হলো ওরা, পিছু হটছে। যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে দু’জনেই, অসংখ্য পায়ের তলায় পিষে মারা যাবে। ঠিক এই সময় উপত্যকার উঁচু ঢাল থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল মানুষের ঢল, থেমে গেল চেঁচামেচি।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, নালার খাড়া গা বেয়ে খানিকটা উঠল উপত্যকায় কী ঘটছে ভাল করে দেখবার জন্য।

নালার সরু মুখের কিনারায় শুয়ে আদিবাসীদের নিধনযজ্ঞ চাক্ষুষ করল ও। মিনিটের পর মিনিট ধরে চলল অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ড, চোখের সামনে দ্রুত বদলে যেতে লাগল দৃশ্যগুলো। নিজের অসহায়ত্ব এতই প্রবল হয়ে উঠল যে বমি পেল ওর, নিষ্ফল

আক্রোশে অসুস্থবোধ করল। অসহায় মানুষের দুর্গতি যেখানেই দেখুক রানা, অদ্ভুত একটা অভিমান হয় ওর, কার প্রতি জানে না-নিজেকে সামলানোর সময় পায় না, তার আগেই পানি এসে যায় চোখে। সেজন্যই, মাঝে মাঝে নিজেরই সন্দেহ হয়, মনের গহীনে কোথাও বোধহয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ও। কিন্তু আজ কোন অভিমান নয়, চোখও ভিজে উঠল না, প্রচণ্ড আক্রোশের অদৃশ্য আগুনে পুড়ে ছাই হতে থাকল শুধু, টেরও পেল না কেউ একজন ওর কাঁধ খামচে ধরেছে, শার্ট ভেদ করে মাংসের ভিতর দেবে গেছে তার নখগুলো।

আরও প্রায় দু'মিনিট পর রানা দেখল ওর পাশে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে মাথা ভর্তি সোনালি চুল নিয়ে অ্যানি উইসপার। মাত্র এক পলক তাকাল, তারপর আবার রক্তাক্ত উপত্যকায় ফিরে গেল ওর চোখ, যেখানে মানুষের দয়া-ধর্ম-শুভবুদ্ধি-বিবেক-মহত্ত্ব ইত্যাদি বোধ আর অনুভূতিগুলোকে চরমভাবে অপমানিত করে পুনর্মঞ্চস্থ হচ্ছে 'জোর যার মুল্লুক তার' নাটকটি।

অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল রানা, ওর পাশে ফোঁপাচ্ছে অ্যানি। আক্রোশে প্রায় অন্ধ হলেও, উপত্যকার পরিধি আর শিফটাদের পজিশনগুলো খুঁটিয়ে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মনে গেঁথে নিল রানা। ওর আরেক পাশে রয়েছে আব্বাস, বিড় বিড় করে প্রার্থনা করছে সে, পরিচিত শব্দগুলো মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ-নিঃশ্বাসের মত বেরিয়ে আসছে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক গলে।

'ওহ্ গড!' কামান দাগা শুরু হতে রুদ্ধকণ্ঠে ফিসফিস করল অ্যানি। খোলা উপত্যকায় সম্ভ্রান্ত ইঁদুরের মত প্রাণভয়ে ছোটোছোট করে মানুষ, কিন্তু নাগালের মধ্যে কোন আশ্রয় নেই। 'ওহ্ গড, রানা, কী করব আমরা?'

রানার কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। অ্যানিকে ও সান্ত্বনা

দেবে কী, নিজেকে সান্ত্বনা দেবারও তো কিছু নেই। আরও অনেকক্ষণ ধরে চলল নির্মম হত্যাযজ্ঞ, তারপর ওরা দেখতে পেল যুবতী মা আর তার দুই বাচ্চাকে। ওদের কাছ থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরে, কুয়ার আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়।

'ওহ্ গড! ওহ্ প্লিজ, জেসাস!' ফুঁপিয়ে উঠল অ্যানি। 'দয়া করো, থামাও এবার! প্লিজ, এটা ঘটতে দিয়ো না, প্লিজ!'

মেশিনগানের বুলেট খুঁজে নিল যুবতী মাকে, নিস্পলক চোখে তাকে ওরা মরতে দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াল বাচ্চাটা, চেহারা হারিয়ে যাওয়া ভাব, ভয়ে-বিস্ময়ে হতভম্ব, পাশে মায়ের লাশ পড়ে আছে। ওদের পিছনে, নীচ থেকে ভেসে এল ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। ঝট করে ঘাড় ফেরাল আব্বাস, চোঁচিয়ে উঠল, 'বানু! না!' নালার খাড়া গা একলাফে পেরিয়ে গেল স্ট্যাণ্ডালিয়ন, ওদের মাথার উপর দিয়ে। ঘোড়ার পিঠে লম্বা হয়ে সোঁটে রয়েছে ঘোড়সওয়ার। বোধহয় সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে রাহেলা বানু, আলখেল্লাটা ভাল করে বাঁধা হয়নি কোমরে, পিঠটা সম্পূর্ণ উদোম-সাদা বিশাল ঘোড়ার পিঠে খুদে একটা গাঢ় রঙের মূর্তি।

ভয়ে নয়, আশংকায় নয়, প্রশংসা আর মুগ্ধবিস্ময়ে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে বানু, জানে, কিন্তু কে অস্বীকার করবে এ-ধরনের অন্ধ ভাবাবেগই যুগে যুগে মানবকল্যাণে অবদান রেখেছে?

'বানু!' আবার চোঁচিয়ে উঠল আব্বাস, লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছুটল সে-ও। ডাইভ দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরল রানা, ধপাস করে পড়ে গেল দু'জনেই। মাটিতে পড়ে ধস্তাধস্তি শুরু করল ওরা। রানার একটা চড় খেয়ে শান্ত হলো আব্বাস।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেটবৃষ্টির ভিতর দিয়ে ছুটে গেল বানু, শরীরে আঁচড়টিও লাগল না, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে এল অ্যানি উইসপারের। বাচ্চাটার কাছে পৌঁছে আবার ফিরে আসবে বানু, এ অসম্ভব একটা ব্যাপার। সাংঘাতিক একটা বোকামি করে ফেলেছে বানু, যে বোকামির কোন সংশোধন হয় না—চিন্তাটা অ্যানির মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। তবে রানার মত দৃশ্যটার সৌন্দর্য তাকেও অভিভূত করল, কী অপরূপ সাহসের সঙ্গে নিজের মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে তরলী মেয়েটা। আবেগে আর কান্নায় কাঁপতে লাগল অ্যানির শরীর। এমনকী এই মুহূর্তে যখন বানুর অকুতোভয় আচরণে একজন নারী হিসাবে সে-ও গর্বিত, তিক্ত বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করল, তার দ্বারা এই আত্মত্যাগ কখনোই সম্ভব হবে না।

দেখল পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হলো স্ট্যালিয়ন, বাচ্চাটাকে ছৌঁ দিয়ে তুলবার জন্য নীচের দিকে ঝুঁকল বানু। দেখল মেশিনগানের বুলেট অবশেষে ভেদ করেছে লক্ষ্য, টিঁ-হিঁ-হিঁ করে উঠে শূন্যে ডিগবাজি খেলো স্ট্যালিয়ন, চার পা আকাশের দিকে তুলে ধরাশায়ী হলো, তার নীচে চাপা পড়ল বানু আর বাচ্চা। দেখল তারপরও ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ওদের চারপাশে ধুলো ওড়াচ্ছে, সশব্দে ঢুকে যাচ্ছে স্ট্যালিয়নের নিখর গায়ে।

ইতিমধ্যে আবার নালার খাড়া গা বেয়ে উঠবার জন্য মোচড় খেতে শুরু করেছে আব্বাস, রানার আরেকটা চড় খেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল সে। ‘স্টপ দ্যাট!’ খেঁকিয়ে উঠল রানা, নিজের উপর অকারণ রাগ ওকে নিষ্ঠুর করে তুলেছে। ‘বুঝতে পারছ না, একবার বেরুলে আর ফেরা সম্ভব নয়?’

‘কিস্তি বানুকে...’ কথা বলতে পারছে না অ্যানি, হাঁপিয়ে উঠছে, ‘...বানুকে ফেরত আনতে হবে না, রানা? প্লিজ, রানা!’

আমাকে বাধা দিয়ো না, প্লিজ!’ নিজেও বোধহয় জানে না কী করছে সে, রানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল, অদ্ভুত এক শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পা বাড়াল উপত্যকার দিকে।

ধমক দিল রানা, ‘আগে দেখো আমি কী করি!’ হ্যাঁচকা টানে আব্বাসকে দাঁড় করাল ও, তার পিঠে কনুইয়ের নিষ্ঠুর গুঁতো দিয়ে নামিয়ে আনল নালার গা থেকে, এক হাতে কজি ধরে টেনে আনছে অ্যানিকে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল অ্যানি, রানার হাত থেকে ছাড়া পেতে চাইছে, ঘাড় ঝাঁক করে তাকিয়ে আছে উপত্যকার দিকে, ঝুরঝুরে মাটিতে বারবার পিছলে যাচ্ছে অনিচ্ছুক পা। ‘রানা, ছাড়ো আমাকে! ছাড়ো, প্লিজ! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে? কী করতে চাও তুমি?’

‘তোমরা সাহায্য করবে,’ বলল রানা, ‘তা হলে সময় খুব কম লাগবে—কারে ভিকার্স তুলব।’ গুহাগুলোর সামনে রয়েছে আর্মারড কারগুলো, রাগ আর আক্রোশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি করেছে ও। ‘অ্যানি, আমার গাড়িটা তুমি চালাবে, মেশিনগানের দায়িত্ব আমার। আব্বাস, মাইকেলের গাড়িটা তুমি চালাবে।’

ওর কথা শুনে পিছন থেকে পাশে চলে এল অ্যানি, তিনজনই ওরা ছুটতে শুরু করল।

‘তোমরা দু’জন ছাড়া আমাদের ড্রাইভার নেই—একটা গাড়ি ড্রাইভারশন হিসেবে ব্যবহার করব। মাইকেলকে নিয়ে তুমি যাবে দক্ষিণ দিকে, রিজ-এর পিছন দিয়ে। তোমাদের নিয়ে ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে আমি আর অ্যানি বানুসহ আরও যারা বেঁচে আছে তাদের যে-ক’জনকে পারি তুলে নেব।’

কোন প্রশ্ন নয়, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সমর্থন করল

ওরা। নালার অনেকটা ভিতর চলে এসেছে, এই সময় আবার এক পশলা মেশিনগানের গুলি হলো উপত্যকায়, পরমুহূর্তে দু’তিনবার গর্জে উঠল শিফটাদের কামান। কাউকে লক্ষ্য করে নয়, সম্ভবত সমাপ্তিসূচক বা সতর্কতামূলক বার্তা প্রচার করা হলো।

নালার শেষ বাঁকটা ঘুরল তিনজন, সেই সঙ্গে যেন কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করল। গোটা নালা আদিবাসীদের ভিড়ে গিজগিজ করছে। এরা সবাই ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে শিফটাদের হাত থেকে। ভয়ানক ব্যস্ত তারা, কারও দিকে তাকানোর এক মুহূর্ত সময় নেই কারও। যে-যার জিনিস-পত্র বেঁধে-ছেঁদে জড়ো করছে এক জায়গায়, গাধা আর খচ্চরের পিঠে তুলছে। গুটানো তাঁবু কাঁধে করে নিয়ে আসছে কিছু লোক, কিছু লোক এরই মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গেছে গ্রামের পথে। উটের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সদ্য বিধবারা, চারদিক থেকে তারস্বরে চিৎকার করছে গাধা আর খচ্চরগুলো, ভয় পেয়ে ব্যা ব্যা করছে ছাগলের পাল, পায়ের তলা দিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে গলায় রশি বাঁধা বানর। বাচ্চা কোলে ছুটোছুটি করছে মায়েরা, স্বামীদের খুঁজে পাচ্ছে না। আর এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এখনও এখানে-সেখানে কাল রাতের আগুনগুলো জ্বলছে, ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে গোটা নালা।

ভিড়ের ফাঁকে চকচকে সাদা গাড়িগুলো দেখতে পেল ওরা, সাদার উপর জ্বলজ্বল করছে লাল ক্রস-চিহ্ন।

কনুই চালিয়ে, ধমক দিয়ে ভিড়ের ভিতর পথ করে নিল ওরা। সবচেয়ে কাছের গাড়ির পাশে পৌঁছে অ্যানির কোমরে দুই হাত রাখল রানা, তুলে দিল গাড়ির উপর। এক মুহূর্তের জন্য নরম হলো ওর চেহারা। ‘তুমি ইচ্ছে করলে না গেলেও পারো, অ্যানি। তখন কিছু না ভেবেই চাইছিলাম তুমিও যাবে। তোমাকে গাড়ি চালাতেই হবে এমন কোন কথা নেই, মাইকেল আর আমি একটা

গাড়ি নিয়েও কাজটা করতে পারব।’

রাত জেগেছে অ্যানি, উপত্যকার নারকীয় দৃশ্য দেখে কেঁদেছে, স্নান আর নোংরা হয়ে আছে তার চেহারা। সবেগে মাথা নাড়ল সে। ‘কী বলছ! কেউ না গেলেও আমি যাব!’ এমন বাঁঝের সঙ্গে বলল, রানা যেন তাকে অপমান করেছে। ‘তোমার গাড়ি আমিই চালাব।’

‘লক্ষ্মী মেয়ে,’ বলল রানা। ‘ট্যাংক ভর্তি ফুয়েল দরকার হবে আমাদের, আব্বাসকে সাহায্য করো।’ ঘুরে দাঁড়াল রানা, আব্বাসকে চিৎকার করে বলল, ‘নিতম্বিনী আর ভাগ্যদেবীকে নিচ্ছি আমরা...অ্যানি তোমাকে সাহায্যে করবে।’

কামাল হাসানের দেহরক্ষীদের কয়েকজন এরইমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ভরা কাঠের বাক্সগুলো একটা গুহা থেকে বের করে এনে এক জায়গায় জড়ো করছে, এই সময় ওখানে পৌঁছল রানা। একেকটা বাক্স চারজন দেহরক্ষী ধরাধরি করে হাঁটু মুড়ে থাকা উটের পিঠে তুলছে, তুলবার পর কুঁজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হচ্ছে বাক্সগুলো।

‘এই যে, তোমরা!’ চারজনের একটা দলকে দেখে ডাকল রানা, ভিকার্স ভরা একটা বাক্স বয়ে নিয়ে আসছে তারা। ‘গুটা নিয়ে আমার সাথে এসো।’ দলটা দাঁড়িয়ে পড়ল, রানার ভাষা বুঝতে পারছে না। হাত নেড়ে, ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করল ও। এই সময় কোথেকে একজন আদিবাসী যোদ্ধা ছুটে এল, দেহরক্ষীদের উপর হস্তিতম্বি করতে দেখে বোঝা গেল কামাল হাসানের ঘনিষ্ঠ কেউ হবে। চারজনের দলটাকে রানার পিছু নিতে বাধা দিল সে, অঙ্গভঙ্গি করে দেখাল বাক্সটা কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না, উটের পিঠেই তুলতে হবে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল

রানা, কিন্তু কেউ কারও ভাষা না জানায় সমস্যার কোন সুরাহা হলো না; লোকটা গোঁয়ার, এদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে।

‘দুগ্ধখিত, বন্ধু,’ ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ধাঁ করে লোকটার কানের পাশে ঘুসি মারল রানা, লোকটা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তর্কাতর্কিরও সমাপ্তি ঘটল। ‘এসো তোমরা,’ দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিল ও। ভিড় ঠেলে হন হন করে এগোল গাড়িগুলোর দিকে। উপত্যকায় আহত হয়ে পড়ে আছে বানু, এই চিন্তাটা উন্মাদ করে তুলছে ওকে। কল্পনায় দেখতে পেল রক্তক্ষরণে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা, বালি মেশানো মাটি শুষে নিচ্ছে তাজা লাল রক্ত।

ফিরে এসে দেখল নিতম্বিনীর ক্র্যাক্স হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে আব্বাস। প্রথমবারেই স্টার্ট নিল কার। আশ্তে করে ইগনিশন টেনে নিল অ্যানি।

‘মাইকেল কোথায়?’ চিৎকার করল রানা।

‘কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না,’ জবাব দিল আব্বাস। ‘একটা গাড়ি নিয়ে যেতে হবে...।’ হঠাৎ হাসির শব্দে দু’জনেই ওরা ঘাড় ফেরাল।

শিথিল ভঙ্গিতে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল সেভারস্। সম্পূর্ণ শান্ত সে, আগের মতই ধোপদুরন্ত-চুলগুলো পরিপাটি করে ব্রাশ করা, সুটের ভাঁজ এত নিখুঁত, যেন এইমাত্র দর্জির দোকান থেকে ডেলিভারি আনা হয়েছে।

‘তা হলে এই ব্যাপার!’ বলে ভুরু নাচিয়ে হাসল সে, কৌতুক ভরা মুখটা ঠোঁটের ফাঁকে ধরা চুরটের নীল ধোঁয়ায় মুহূর্তের জন্য ঢাকা পড়ে গেল। ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ রানা আর তার দুই হাঁসের ছানা শিফটা বাহিনীর সাথে লড়াইতে যাচ্ছে?’

ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে মাথা বের করল অ্যানি। চিৎকার করে বলল, ‘তোমাকে আমরা কখন থেকে খুঁজছি!’

‘নাও,’ হালকা সুরে রসিকতা করল মাইকেল, ‘এবার গার্লস গাইড এসোসিয়েশনের তরফ থেকে ভাষণ শোনো!’

‘নালা থেকে বেরিয়ে গেছে বানু!’ এক ছুটে মাইকেলের সামনে চলে এল আব্বাস। ‘আমরা তাকে তুলে আনতে যাচ্ছি। আপনি আর আমি এক গাড়িতে থাকব, মাসুদ ভাই আর অ্যানি...’

আব্বাসের কথা শেষ হলো না, বাধা দিল মাইকেল। ‘কেউ আমরা কোথাও যাচ্ছি না।’ মাথা নাড়ল সে।

আবেগের বশে মাইকেলের বুকের কাছে কোট ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল আব্বাস। ‘বানু! বানু! আপনি বুঝতে পারছেন না! বানু আহত হয়েছে! উপত্যকায়! ওকে আমাদের তুলে আনতে হবে!’

‘জিজ্ঞেস করি, ওন্ড বয়, কোট থেকে হাত সরাতে বললে তুমি কিছু মনে করবে?’ বলে আব্বাসের হাতটা সরিয়ে দিল মাইকেল বুক থেকে। ‘হ্যাঁ। বানুর ব্যাপারটা আমরা জানি। কিন্তু...’

ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে চোঁচিয়ে বলল অ্যানি, ‘বাদ দাও, আব্বাস। ভীতু কোন লোককে দিয়ে আমাদের কাজ হবে না। চলে এসো...।’

গাড়ির গা থেকে পিঠ তুলে এক ঝটকায় সিধে হলো মাইকেল, এক নিমেষে থমথমে হয়ে উঠল চেহারা, চোখে ধারাল দৃষ্টি। ‘বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে আমাকে, মাই ডিয়ার লেডি। স্বীকার করি, তার মধ্যে কিছু কিছু সঙ্গত ছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে কাপুরুষ বলে ডাকেনি!’

‘কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন, সবার জন্যেই প্রথমবার বলে একটা ব্যাপার থাকে!’ রাগে লালচে হয়ে উঠল অ্যানির মুখ, চোখ থেকে

গড়ানো পানি শুকিয়ে যাওয়ায় নোংরা দাগ ফুটে উঠেছে তার গালে, বাতাসে উড়ে এসে চোখে লাগছে সোনালি চুল। মাইকেলের দিকে তর্জনী তাক করে আবার বলল, ‘তোমার জন্যে এটা প্রথমবার!’

পরস্পরের দিকে দীর্ঘ দুই সেকেন্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ওরা, এই সময় দৃঢ় পায়ে দু’জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল প্রিন্স হাসান সালে, তার গাঢ় চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব। ‘মেজর সেভারস আমার নির্দেশ পালন করছে, মিস উইসপার। আমি অর্ডার দিয়েছি, গাড়িসহ আমার বাবার বাহিনী ইমিডিয়েটলি পিছু হটবে।’

‘গুড গড, ম্যান!’ অ্যানির সমস্ত রাগ দিক বদলে এবার প্রিন্সের উপর পড়ল। ‘ওখানে তোমার মেয়ে পড়ে আছে!’

‘হ্যাঁ,’ হাসান সালে নরম সুরে বলল। ‘এক দিকে আমার মেয়ে, আরেক দিকে আমার দেশ। কোন সন্দেহ নেই কোনটা আমি বেছে নেব।’

‘নিজেও জানো না তুমি কী বলছ!’ গলা ভেঙে গেল অ্যানির।

‘আমার বিশ্বাস, জানি।’ ওর দিকে ঘুরতেই লোকটার চোখে যন্ত্রণাদগ্ধ একজন বাবার সমস্ত কষ্ট আর অসহায়ত্বের গাঢ় ছায়া দেখতে পেল রানা। ‘আমার হাত-পা বাঁধা, শিফটাদের উসকানি দেওয়া হয় এমন কিছুই আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। সেটার অপেক্ষাতেই আছে ওরা। একটা অজুহাত পেলে সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের উপর বাঁপিয়ে পড়বে। এই মুহূর্তে অবশ্যই আমরা আরেক গাল বাড়িয়ে দেব, এই বর্বর নৃশংসতাকে ব্যবহার করব আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের কাজে।’

‘কিন্তু বানু,’ বাধা দিল অ্যানি, ‘তাকে আমরা এক মিনিটের মধ্যে তুলে আনতে পারি!’

‘না।’ প্রিন্স তার চিবুক দৃঢ়ভঙ্গিতে উঁচু করল। ‘শত্রুকে আমি

আমাদের নতুন অস্ত্র দেখতে দিতে পারি না। পাল্টা আক্রমণ করার উপযুক্ত সময় না হওয়া পর্যন্ত ওগুলো অবশ্যই লুকিয়ে রাখতে হবে।’

‘বানু!’ আত্ননাদ করে উঠল আব্বাস। ‘বানুর কী হবে?’

‘আগে এই মেশিন আর নতুন গানগুলো নিরাপদে সারডি গিরিসংকটে ফিরে যাক, আমি নিজে তার লাশ আনার জন্যে যাব,’ শান্ত প্রতিজ্ঞার সুরে বলল প্রিন্স হাসান সালে। ‘কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কর্তব্যটাই আমার কাছে প্রথম বিবেচ্যবিষয়।’

‘একটা গাড়ি,’ মিনতি করল আব্বাস। ‘শুধু বানুর জন্যে!’

‘না, এমনকী একটা কার-ও আমি ব্যবহার করতে দিতে পারি না।’ প্রিন্স তার কথায় অনড়।

‘বেশ, কিন্তু আমি পারি,’ তীক্ষ্ণ বাঁশির মত শোনালা অ্যানি উইসপারের কণ্ঠস্বর, তার এলোমেলো সোনালি চুলসহ মাথাটা হ্যাচের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল, পরমুহূর্তে গর্জে উঠল নিতম্বিনীর এঞ্জিন। মানুষ আর পশুর ভিড়টাকে ছত্রাণ করে দিয়ে বাঁক নিল গাড়ি, দিক বদলে নালার দূরপ্রান্তে অভিমুখে ছুটল।

একা এবং নিরস্ত্র, মেশিনগান আর মর্টারের সামনে দাঁড়ানোর জন্য রওনা হয়ে গেল অ্যানি উইসপার, আর সময় থাকতে ওদের মধ্যে মাত্র একজন লোকই তৎপর হয়ে উঠল।

কাঁধের ধাক্কায় প্রিন্সকে সরিয়ে দিয়ে ছুটল রানা, গাড়ির রচিত অর্ধবৃত্ত শেষ হওয়ার মুহূর্তে পাশে চলে এল ওটার। সরু নালায় নামতে যাচ্ছে নিতম্বিনী, এঞ্জিন কাউলিঙের উপর আঙটাটা ধরে ফেলল ও, কিন্তু পা মাটিতে থাকতেই প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান খেলো। শোল্ডার জয়েন্ট সকেট থেকে যেন বেরিয়ে আসছে, তবু আঙটা না ছেড়ে ছোট্ট এক লাফে গাড়ির গায়ে ঝুলে পড়ল ও।

গাড়ির সঙ্গে ঝাঁকি খেতে খেতে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল রানা, অবশেষে ড্রাইভারের হ্যাচ দিয়ে নীচে তাকাল। ‘তুমি কি পাগল হলে?’

মাথার উপর গর্জন শুনে মুখ তুলল অ্যানি, ক্ষীণ নিঃশব্দ হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, যা সম্ভবত স্বর্গীয় কোন দেবীর মুখেই শোভা পায়। ‘হ্যাঁ, পাগল হয়েছি। তোমার কী খবর?’

মস্ত একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগায় প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো নিতম্বিনী, মুহূর্তের জন্য রানার ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস, জবাব দেওয়া হলো না। তার বদলে নখ দিয়ে টারিটের গা আঁচড়া-আঁচড়ি করে উপরে উঠবার চেষ্টা করল ও, পরের ঝাঁকিটায় আলগা হ্যাচ কাভার সশব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারটে আঙুল প্রায় অকেজো হয়ে গেল।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার সেটাকে তুলল রানা, নেমে এল ক্যাবে। ঘড়ির কাঁটা ধরে একেবারে ঠিক মুহূর্তটিতে পৌঁছল ও, স্থিরভাবে দাঁড়াবার আগেই দেখতে পেল ফুল থ্রটল দিয়ে নিতম্বিনীকে খোলা উপত্যকায় তুলে ফেলেছে অ্যানি।

সূর্য ইতিমধ্যে দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে উঠে এসেছে উপরে, সোনালি বালির বিস্তৃতির উপর ঘন লম্বা ছায়া পড়েছে। রিজ-এর উপর এখনও ভাসছে ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ, খোলা প্রান্তরে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে লাশগুলো। একরঙা মরুর গায়ে মেয়েদের কাপড়গুলো উজ্জ্বল বহুবর্ণের ছিটার মত লাগল।

একটা বিশেষ রিজ অর্থাৎ ঢালের উপর দ্রুত চোখ বুলাল রানা, গোটা উপত্যকা ওখান থেকে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঢালের গায়ে অনেক ট্রেঞ্চ, শিফটারা অনেকেই ট্রেঞ্চ ছেড়ে উঠে এসেছে উপরে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে খোলা কসাইখানার কিনারা ধরে ঘোরাফেরা করছে তারা, হাঁটাচলার

ভঙ্গির মধ্যে আড়ষ্ট ভাব, যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে-ছেঁড়া-ফাড়া শরীর আর ঝাঁঝরা লাশ দেখে এখনও অভ্যস্ত নয় তারা।

আকস্মিক বিস্ফোরণের মত নালা থেকে গাড়টাকে বেরিয়ে আসতে দেখে থ হয়ে গেল শিফটারা। গাড়ির দু’পাশে ধুলোর ডানা গজিয়েছে, সবচেয়ে কাছের কুয়াটা লক্ষ্য করে উড়ে আসছে সেটা। হুঁশ ফিরে পেতে অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে গেল তাদের, তারপর একজন নড়ে উঠতে বাকি সবাই নড়ল, ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে ঝেড়ে দৌড় দিল সবাই-গাঢ় রঙের ইউনিফর্ম পরা ক্ষুদে একদল মূর্তি, বিদ্যুৎবেগে ওঠা-নামা করছে হাত আর পা।

‘গাড়ি ঘোরাও,’ নির্দেশ দিল রানা, ফুলে উঠল গলার রগ। ‘ক্রস-টা দেখাও ওদের।’

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে তীক্ষ্ণ কোণ সৃষ্টি করে বাঁক নিল অ্যানি, কয়েক সেকেন্ড মাত্র দুটো চাকার উপর সচল থাকল গাড়ি, বিশাল লাল ক্রস চিহ্নটা শিফটাদের দিকে ঘুরে গেল।

‘তোমার শার্টটা দাও,’ আবার নির্দেশ দিল রানা, ওদের সঙ্গে ওটাই একমাত্র সাদা কাপড়। ‘শান্তি চাই বোঝাবার জন্যে আমার একটা পতাকা দরকার।’

‘আমার গায়ে শুধু শার্ট,’ পাল্টা চিৎকার করে জানাল অ্যানি। ‘ভেতরে আর কিছু নেই।’

‘লজ্জা ঢাকার বিনিময়ে মরতে চাও?’ ধমক দিল রানা। ‘যে-কোন মুহূর্তে গুলি করবে ওরা।’

স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত তুলে নিল অ্যানি, শার্টের বোতাম খুলল, স্কার্টের ভিতর থেকে শার্টের কিনারা টেনে বের করবার জন্য ঝুঁকে পড়ল সিট থেকে সামনের দিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে শার্টটা গা থেকে নামাল, দলা পাকিয়ে তুলে দিল মাথার দিকে। যতবার

ঝাঁকি খেলো গাড়ি, রাবার বলের মত ওঠা-নামা করল তার স্তন, ভব্যতা আর কর্তব্য ডাক দেওয়ার আগে, সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময় রানার মনোযোগ কেড়ে নিল দৃশ্যটা। টারিটে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, হাত দুটো মাথার উপর ছড়ানো, শার্টটা পতাকার মত বাতাসে ওড়াল, গাড়ির গায়ে হাঁটু ভাঁজ করা পা সাঁটিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে।

ট্রেণের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকশো শিফটা সৈনিকের চোখে দুটো জিনিস বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ধরা পড়ল-রেডক্রস আর সাদা পতাকা। দুটোই এমন শক্তিশালী প্রতীকচিহ্ন, যতই না কেউ রক্তপিপাসু হোক, মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল থাকলেও, গুলি করতে ইতস্তত করবে সে।

‘কাজ হচ্ছে!’ আচমকা গাড়ি ঘোরাল অ্যানি, টারিট থেকে ছিটকে পড়ে যাবার অবস্থা হলো রানার, আগের পথে ফিরে এল নিতম্বিনী।

শার্ট ফেলে দিয়ে টারিটের কিনারা আঁকড়ে ধরল রানা, ডানা মেলা সাদা পাখির মত উড়ে গেল সেটা।

‘ওই যে! ওই যে বানু!’ আবার চেষ্টা করল অ্যানি। নাক বরাবর সামনে সাদা স্ট্যাণ্ডার্ডের লাশ পড়ে রয়েছে। ব্রেক করল সে, পিছলানো চাকায় কয়েক সেকেন্ড সচল থাকল নিতম্বিনী, তারপর ঘোড়াটার পাশে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, লাশের স্তূপ আর শিফটাদের মাঝখানে নিশ্চিন্দ আড়াল তৈরি করল গাড়িটা।

ক্যাবে নামল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে সরে এসে গাড়ির পিছনের ডাবল-ডোর খুলে ফেলল। ‘হ্যাচ কাভার নামিয়ে রাখো, ফর গডস সেক!’ নির্দেশ দিল অ্যানিকে, ‘খোদার দোহাই, মাথা তুলো না!’

‘আমি তোমাকে সাহায্য করব,’ শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল

অ্যানি।

‘তর্ক কোরো না,’ রানার চেহারা মারমুখো, অ্যানির অপূর্ব সুন্দর বুক থেকে জোর করে ছিঁড়ে আনতে হলো দৃষ্টি। ‘ওখান থেকে একচুল নড়বে না-এঞ্জিনটা চালু থাকে যেন।’

দড়াম করে খুলল দরজা, সামনে মাথা দিয়ে গড়িয়ে বুরবুরে মাটিতে পড়ল রানা। থুথুর সঙ্গে মুখভর্তি ধুলো ফেলে সাদা ঘোড়ার দিকে ফ্রল করে এগোল ও। কাছ থেকে পেটটা অস্বাভাবিক ফোলা আর ঢলঢলে লাগল, ঝাঁঝরা শরীর ঘিরে ভন ভন করছে ইস্পাত নীল মাছি। বানুর নীচের দিকটা চাপা পড়ে রয়েছে স্ট্যাণ্ডার্ডের তলায়, মেয়েটার মুখ সঁটে রয়েছে মাটির সঙ্গে।

নগ্ন শিশুর মৃত্যুর কারণ সহজেই অনুমান করতে পারল রানা। তার ছোট্ট খুলির একটা পাশ ভিতর দিকে দেবে গেছে, সম্ভবত ধরাশায়ী হবার সময় ঘোড়ার বিদ্যুৎগতি একটা পা লেগেছিল ওখানে। সে-ও চাপা পড়ে আছে ঘোড়ার নীচে, চ্যাপ্টা হয়ে আছে ছোট্ট বুকটা। বিষণ্ণ মনে বানুর দিকে ফিরল ও।

‘বানু,’ ডাকল রানা, কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা একটু তুলল সে, গভীর কালো বড়বড় চোখে নগ্ন আতংক নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। তার সারা মুখে ধুলো, মাটিতে ঘষা খেয়ে চামড়া উঠে গেছে কপালের। ‘তোমার গুলি লেগেছে?’ তার পাশে পৌঁছল রানা।

‘জানি না,’ স্বর ফুটল কি ফুটল না, খসখসে গলায় বলল বানু।

রানা দেখল বানুর আলখেল্লা আর আঁটো পা জামায় রক্তের ঘন দাগ লেগে রয়েছে। ঘোড়ার লাশে দুটো পা ঠেকাল ও, ঠেলে সরিয়ে ওটার নীচে থেকে মুক্ত করতে চাইল বানুর পা দুটো। কিন্তু লাশটা বিশাল আর অসম্ভব ভারি। রানা বুঝল, ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়াতে

হবে ওকে, যা থাকে কপালে।

দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত হালকা স্পর্শে শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল, ধীরে ধীরে শিফটাদের সবচেয়ে কাছের ট্রেপের দিকে পিছন ফিরল ও, ঘোড়ার উপর ঝুঁকল।

লাশটার লেজ আর পিছনের একটা পা ধরে টানল রানা, চেঁচা করল উঁচু করবার। বানুর পা আর কোমরের পাশটা চাপা পড়ে আছে, ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল সে, ঘাবড়ে গিয়ে থামতে বাধ্য হলো রানা।

কাঁদছে বানু, ধুলো মাখা গালে খুদে নালা তৈরি করে নেমে আসছে পানির দুটো ধারা, অ্যামহারিক ভাষায় কী যেন বলছে সে বিড়বিড় করে।

হাঁপাচ্ছে রানা, চোখে ঘামের ফোঁটা নিয়ে বলল, ‘আরেকবার-দুঃখিত।’ ঝুঁকে আবার ঘোড়ার পা আর লেজ ধরল ও।

ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ি থেকে অ্যানির আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। ‘রানা! ওরা আসছে! জলদি! তাড়াতাড়ি করো! ওহ্ গড! ওহ্ গড!’

চরকির মত আধপাক ঘুরে গাড়ির দিকে ছুটে এল রানা, উঁচু এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের কিনারা দিয়ে উঁকি দিল।

বড়সড় খোলা একটা গাড়ি, পিছনে লম্বা ধুলোর চওড়া লেজ মোচড় খাচ্ছে বাতাসে, ঢালের দিক থেকে খ্যাপা ঝাঁড়ের মত সরাসরি তেড়ে আসছে ওদের দিকে, গাড়ির ভিতর থেকে উপচে পড়ছে সশস্ত্র লোকজন।

‘সর্বনাশ!’ আঁতকে উঠল রানা, কুঁচকে থাকা চোখের পাতা তির্যক সূর্যরশ্মি ঠেকিয়ে রেখেছে। ‘এ কী করে হয়!’ প্রচুর ধুলো, তবু ব্যাপারটা দৃষ্টিভ্রম নয়, ওটা একটা রোলস-রয়েসই বটে।

ব্যাপারটা অবাস্তব বলে মনে হলো রানার, এই বীভৎস আর কদর্যতার মাঝখানে এমন একটা চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্য কীভাবে আসতে পারে।

‘রানা, ঈশ্বরের দোহাই! রানা!’ অ্যানির ব্যাকুল তাগাদা যেন সপাং করে চাবুক মারল রানার গায়ে, এক ছুটে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ও।

লেজ বাদ দিয়ে দুই পা ধরে লাসটাকে চিৎ করবার চেঁচা করল রানা। কাজটায় ওর সাফল্যের উপর নির্ভর করছে তিনজনের জীবনমৃত্যু। শুধু দৈহিক শক্তি নয়, সমস্ত মনোবল একত্রিত করল রানা, ধীরে ধীরে চিত করল ঘোড়াটাকে। একদিকে বানু, আরেক দিকে অ্যানি চিৎকার করছে। এক সময় ভাঁজ করা ঘোড়ার পা বাঁকাভাবে আকাশের দিকে উঠল, আর ঠিক তখন রোলস-রয়েসের এঞ্জিনের আওয়াজ পেল রানা, অস্পষ্টভাবে কানে ঢুকল উত্তেজিত আরোহীদের চৈচামেচি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ইচ্ছেটাকে দমন করল রানা, চিৎ হওয়া লাসটাকে টেনে আরেক দিকে কাত করল, হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটু মুড়ে বসল বানুর পাশে। পায়ের উপর দিকে গুলি খেয়েছে সে, ঢুকবার মুখে বুলেটটা ক্ষত তৈরি করেছে হাঁটু থেকে ছ’ইঞ্চি উপরে। আঙুলের স্পর্শ দিয়ে বুঝবার চেঁচা করল রানা হাড় ভেঙেছে কিনা, মাংসের উপর চাপ পড়তেই ক্ষত থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে এসে রাঙিয়ে দিল আঙুলের মাথা। উরুর পিছনে আরেকটা গর্ত পেল ও, তারমানে বেরিয়ে গেছে বুলেট, কোন হাড় না ছুঁয়েই। তবে এখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে বানু, শরীরে খুব বেশি রক্ত অবশিষ্ট নেই আর।

কালো পা’জামা ছিঁড়ে ক্ষতের উপর পট্টি বাঁধতে বেরিয়ে গেল

মূল্যবান দশ-বারোটা সেকেন্ড, তবে বাঁধনটা এত শক্ত হলো যে সঙ্গে সঙ্গে রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো। কাজ সেরে মুখ তুলল রানা, ধুলোর মেঘ তুলে নিতম্বিনীর সামনে ঘঁচা করে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস-রয়েস।

আরোহীদের মধ্যে কী নিয়ে যেন মহা হাঙ্গামা বেধে গেছে, সে দিকে তাকিয়ে আবার অবাস্তব অনুভূতিটা ফিরে এল রানার মনে। সামনের সিটে ড্রাইভারের একটা হাত স্টিয়ারিঙে, রাইফেলসহ অপর হাতটা ম্যালেরিয়ার রোগীর মত কাঁপছে। তার ফ্যাকাসে চেহারা হয় প্রচণ্ড জ্বরে নয়তো ভয়ংকর আতংকে ভিজে গেছে ঘামে। তার পাশের সিটে কুঁকড়ে বসে আছে বানরের মত ছোটখাট একজন লোক, তার এক কাঁধে রাইফেল অপর কাঁধে ঢোকো আর কালো একটা ক্যামেরা, ক্যামেরার সঙ্গে অস্বাভাবিক বড় লেন্স। রোলস-রয়েসের পিছনের সিটে রয়েছে দীর্ঘদেহী এক যুবক, মুখ নয় যেন গ্র্যানিট পাথর কেটে তৈরি করা অবয়ব, গাম্ভীর্য থমথম করছে। বিপজ্জনক লোক, সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল রানা। ইটালিয়ান সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরে আছে সে, অবশ্যই বেআইনী কাজ, একজন মেজর। তার হাতেও একটা রাইফেল রয়েছে, অপর হাত দিয়ে মাঝারি আকারের এক লোককে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করছে সে। এই লোকটা সুবেশী, সুদর্শনই বলা যায়, তার কালো গ্যাবার্ডিন সুটে মেডেল আর রঙচঙে ফিতের ছড়াছড়ি। মাথায় কালো একটা হেলমেট রয়েছে, কার্নিসবিহীন। এক সেকেন্ডের মধ্যেই রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, মেজর চেষ্টা করলে কী হবে, দাঁড়ানোর কোন ইচ্ছেই নেই লোকটার। সিটের কোণে কুঁকড়ে আছে সে, যদি গোলাগুলি হয় তারই আহত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। মেজরের বাড়ানো চওড়া হাতে ঘন ঘন চাপড় মারছে সে, চাপাকণ্ঠ প্রতিবাদমুখর, অলংকৃত পিস্তল

www.BanglaBook.org

নেড়ে হুমড়ি দিচ্ছে মেজরকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, রোলস-রয়েসে তার উপস্থিতি স্বেচ্ছামূলক নয়।

বানুর দিকে ঝুঁকল রানা, একটা হাত রাখল তার কাঁধের নীচে, অপরটা হাঁটুর পিছনে, সিধে হলো ধীরে ধীরে। শিশুর মত ওকে আঁকড়ে ধরল বানু।

রানার এই নড়াচড়া গম্ভীরমুখ মেজরের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল, ওর দিকে রাইফেল তাক করে কঠিন সুরে একটা নির্দেশ দিল সে। ভাষাটা ইটালিয়ান, বলছে এক চুল নড়লেই গুলি করবে। মুহূর্তের জন্য ভাবল রানা, না বুঝবার ভান করবে কিনা। প্রথমে রাইফেল মাজল, তারপর লোকটার চোখ দেখল ও-না, লোকটা কথা রাখবে। রানা তার নির্দেশ অমান্য করুক, এটাই যেন চাইছে সে, গুলি করবার সুযোগ খুঁজছে। লোকটার অনড়-অটল পাথুরে ভাব এমনই ভীতিকর, যেন অদৃশ্য একটা অশুভ প্রভা ছড়াচ্ছে। বানুকে বুকের কাছে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, হার্টবিট বেড়ে গেল, কথাগুলো গুছিয়ে নিল মনে মনে।

‘আমি একজন বিদেশী,’ দৃঢ়কণ্ঠে বলল ও। ‘বাংলাদেশী ডাক্তার।’ নতুন কোন উপলব্ধির ছাপ মেজরের চেহারায় পড়ল না, তবে ঘাড় ফিরিয়ে অপর অফিসারের দিকে তাকাল সে। সিভিল ড্রেস পরা অফিসার নড়ে উঠল, সিট থেকে মাত্র খানিকটা নিতম্ব তুলল, তারপর আবার কী ভেবে ডুবে গেল নরম সিটে। মেজরের দীর্ঘ দেহের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কথা বলল সে।

‘আপনি আমার বন্দী,’ থেমে থেমে, কাঁপা গলায় ইংরেজিতে বলল সে, বলা যায় আতঁচিংকার করে উঠল। ‘আমি আপনাকে জিম্মি হিসেবে গ্রহণ করলাম।’

‘আপনি আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করছেন,’ বলবার ভঙ্গিতে

কাঠিন্য আর অভিযোগ দুটোই ফোটাতে চেষ্টা করল রানা, অস্থির পা ফেলে নিতম্বিনীর পিছনে খোলা দরজার দিকে খানিকটা এগোল, যেন রাগের মাথায় খেয়াল করেছে না কোন দিকে যাচ্ছে। ‘যদিও সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। কিন্তু আমাকে আটক করার চেষ্টা হলে সেটা জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লঙ্ঘন হবে।’

‘আপনার কাগজ-পত্র পরীক্ষা করতে হবে আমাকে,’ বলল লোকটা, অস্বস্তিবোধ কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে সে, সুদর্শন চেহারায় রঙ ফিরে আসতে শুরু করেছে। ‘আমি, কর্নেল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেরক, আপনাকে আদেশ দিচ্ছি, আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস এই মুহূর্তে আমার সামনে হাজির করুন।’ তার দৃষ্টি ছুটে গেল বিশাল নিতম্বিনীর দিকে। ‘এটা একটা সশস্ত্র যুদ্ধযান। আপনি রঙ লাগিয়েছেন ধোঁকা দেয়ার জন্যে, স্যার।’

কথা বলবার সময়, এই প্রথমবারের মত খেয়াল করল কাউন্ট, মাক্কাতা আমলের গাড়ি বা মাথাভর্তি বাঁকড়া চুল নিয়ে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিদেশী লোকটা কোন অস্ত্র বহন করছে না। গাড়ির টারিটে গান-মাউন্টিং খালি। বাঁধ ভাঙা পানির মত সাহস ফিরে এল তার। এতক্ষণে সে লাফ দিয়ে সিঁধে হলো, সটান দাঁড়িয়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল ফোলানো বুক, এক হাত কোমরে, অপর হাতের পিস্তলটা তাক করল রানার দিকে। ‘আপনি আমার বন্দী,’ আবার দাবি করল সে, তারপর ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে সামনের সিটে বসা বানানটো সাতাকে ফিসফিস করে বলল, ‘সাতা, জলদি! বিদেশী স্পাইকে হাতেনাতে ধরলাম আমি, একটা ছবি তোলো।’

‘জ্বে-আজ্বে, জ্বে-আজ্বে, ইওর এক্সেলেন্সী,’ কাউন্ট মনের সাধ প্রকাশ করবার আগেই চোখে ক্যামেরা তুলেছে সাতা।

‘আমি আপত্তি করছি,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রানা, আড়াআড়িভাবে

আরও খানিকটা এগোল, নিতম্বিনীর খোলা দরজা ব্যাকুলভাবে ডাকছে ওকে।

‘নড়বেন না, খবরদার, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন!’ ধমকে উঠল কাউন্ট, আড়চোখে তাকাল সাতার দিকে। ‘ঠিক আছে?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘বিদেশী ভদ্রলোককে বলুন, একটু যেন ডান দিকে সরে দাঁড়ান,’ জবাব দিল সাতা, এখনও তার চোখ ভিউ ফাইন্ডারে।

‘ডান দিকে সরুন, স্যার,’ ইংরেজিতে বলল কাউন্ট, সেই সঙ্গে পিস্তল নেড়ে দিক নির্দেশ দিল।

মনের আনন্দ চেহারায় ফুটতে না দিয়ে ডান দিকে সরে গেল রানা, নিতম্বিনীর খোলা দরজার আরেকটু কাছে চলে এল। আগের মতই প্রতিবাদমুখর ও। ‘আন্তর্জাতিক রেড ক্রস আর মানবিকতার খাতিরে...’

‘আজই আমি জেনেভায় রেডিও মেসেজ পাঠাব,’ পাল্টা চিৎকার করল কাউন্ট, ‘আপনার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইব...।’

‘একটু হাসুন, মাই কাউন্ট, ইওর এক্সেলেন্সী,’ বলল সাতা।

ক্যামেরার দিকে মুখ খানিকটা ঘুরিয়ে এক গাল হাসল কাউন্ট। ‘তারপর গুলি করে মারব আপনাকে,’ রানাকে বলল সে, বিরামহীন হাসিতে কোন ছেদ পড়ল না।

‘এই মেয়েটা মারা গেলে আপনাকে দায়ী করা হবে,’ কঠিন সুরে বলল রানা। ‘আপনি বর্বরের মত আচরণ করছেন!’

অদৃশ্য হলো হাসি, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রানাকে ভেঙচাল কাউন্ট। ‘আর আপনি, স্যার, হাতেনাতে ধরা পড়েছেন একজন স্পাই! আপনার যথেষ্ট প্যাঁচাল শুনেছি, এবার আত্মসমর্পণ করুন!’

পিস্তল তুলে রানার বুকের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করল সে।

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা, দেখে ফেলেছে রাইফেলের সেফটি ক্যাচ ‘ফায়ার’ পজিশনে নিয়ে এল মেজর, ওর পেটের দিকে তাক করা হয়েছে মাজল।

সংকট যখন তুঙ্গে, ধাতব ঝন ঝন শব্দে ড্রাইভারের হ্যাচ উন্মুক্ত হলো, সবাইকে চমকে দিয়ে নিতম্বিনীর টারিটে মাথা তুলল অ্যানি উইসপার। তার সোনালি চুল বাতাসে উড়ছে, চোখে আগুন, রাগে লাল হয়ে আছে মুখ। ‘আমেরিকান প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বর আমি,’ তার চিৎকারও পুরুষদের চেয়ে কম জোরাল নয়। ‘শতকরা একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এই অন্যান্যের বিশদ বিবরণ বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানানো হবে। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি-,’ ভান নয়, নয় কোন অভিনয়, নির্ভেজাল নির্জলা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চলেছে সে, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, উন্মাদিনীর মত লাফাচ্ছে আর হাত ছুঁড়ছে—বেমালুম ভুলে গেছে যে কোমর পর্যন্ত তার উর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিরাবরণ।

একই ভুল অবশ্য তার দর্শকদের হলো না। হুড তোলা রোলস-রয়েসের প্রতিটি আরোহী এমন একটা দেশের নাগরিক যে-দেশের লোকদের অবসর সময় কাটে সুন্দরী মেয়েদের পিছু ধাওয়া করে। ওদের সবাই এ-ব্যাপারে নিজেকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বলে মনে করে।

উত্তেজনায় আর রাগে কাঁপছে অ্যানি, তারই সঙ্গে কাঁপছে তার সুডৌল বুক, সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ইটালিয়ানরা, চোখগুলোয় যতটা না অবিশ্বাস তারচেয়ে বেশি আনন্দ। উঁচিয়ে ধরা অস্ত্র নামানো হলো, সেই সঙ্গে ভুলে যাওয়া হলো সেগুলোর অস্তিত্ব। সম্মান ও ভব্যতা প্রদর্শনের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা

করল মেজর, যদিও তার সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে আবার তাকে বসিয়ে দিল কাউন্ট। ক্লাচ থেকে পিছলে নেমে গেল ড্রাইভারের পা, ফলে চারপায়ে লাফিয়ে উঠল রোলস-রয়েস, খক খক করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। সাতার গলা চিরে বেরিয়ে এল চাপা গোঙানির শব্দ, প্রশংসাসূচক শপথবাক্যের মত শোনা গেল সেটা। ক্যামেরাটা আবার তুলল সে, তাক করল অ্যানির দিকে, পরমুহূর্তে আবার গুঙিয়ে উঠল—এবার ব্যথায় আর হতাশায়, কারণ ফিল্ম শেষ হয়ে গেছে। অ্যানির উপর চোখ রেখেই ক্যামেরাটা খুলল সে, আনাড়ি ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ফেলে দিল হাত থেকে। ক্যামেরার কথা ভুলে গেল সে, দু’কান বিস্মৃত হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকল মাখন রঙা সুন্দর দৃশ্যটার দিকে।

মাথা থেকে হেলমেট নামাল কাউন্ট, নিজেকে একজন বীরযোদ্ধা বলে ভাবছে সে। সবার চেয়ে উঁচু হবার জন্য সিটের উপর দাঁড়াল, উদ্দেশ্য অর্ধনগ্ন প্রেমের দেবীকে স্যাঁলুট করবে। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল। তার এক হাতে পিস্তল, অপর হাতে হেলমেট, হাতও ওই মাত্র দুটো। অগত্যা এক হাতে দুটো জিনিস ধরতে হলো তাকে, এক হাতে নিয়ে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখল হেলমেট আর পিস্তল, তারপর কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে অ্যানিকে স্যাঁলুট করল। ‘ম্যাডাম,’ কপাল থেকে হাত নামানোর কোন লক্ষণ নেই তার। চোখ বিস্ফারিত, কণ্ঠস্বরে রোমান্টিকতার কোমল রেশ। ‘মাই ডিয়ার লেডি...’

এই সময় আবার গাড়ি থেকে নামবার চেষ্টা করল মেজর, কিন্তু এবারও কাউন্ট তাকে হাঁটুর ঘন ঘন গুঁতোয় বসে থাকতে বাধ্য করল। ওদিকে আগের মতই একনাগাড়ে রাগ ঝাড়ছে অ্যানি,

তার লক্ষ্যবাম্প আর হাত নাড়বারও কোন বিরাম নেই।

ইটালিয়ানরা রানার কথা একেবারেই ভুলে গেছে। হন হন করে এগোল ও। লম্বা কয়েকটা পা ফেলে পৌঁছে গেল নিতম্বিনীর পিছনের দরজায়। ডাইভ দিয়ে ভিতরে ঢুকল, একটা গড়ান দিয়ে বুক থেকে নামিয়ে রাখল বানুকে সিটের পিছনে, ক্ষিপ্ততায় কোন ঢিল পড়তে না দিয়ে লাথি মেরে বন্ধ করল দরজা, নামিয়ে দিল লকিং হ্যান্ডেল। ‘ড্রাইভ!’ অ্যানির উদ্দেশ্যে চিৎকার করল ও, সিটে দাঁড়িয়ে থাকায় তার শুধু পিছন দিকটা দেখতে পাচ্ছে। ‘অ্যানি!’ এক হাতে তার ট্রাইজার ধরে নীচের দিকে টানল, লেদার সিটের উপর ধপ্ করে বসে পড়ল অ্যানি, এখনও অনর্গল চিৎকার করছে শত্রুদের উদ্দেশ্যে। ‘ড্রাইভ!’ তার কানের কাছে গর্জে উঠল রানা। ‘পালাও!’

অ্যানির আকস্মিক অন্তর্ধানে হতাশায় মুষড়ে পড়ল ইটালিয়ানরা, হতাশাজনিত আঘাতের কারণে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড পঙ্গু হয়ে থাকল তারা।

গর্জে উঠল আর্মারড কারের এঞ্জিন, সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এল সেটা, একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘুরে যেতে শুরু করায় ঠিক গুঁতো নয়, ধাক্কা খেলো রোলস-রয়েস। সামনের মাডগার্ড তুবড়ে গেল, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল হেডল্যাম্পের কাচ। ধুলোর ঝড় তুলে ছুটল নিতম্বিনী, ঝড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হতাশাজনিত পঙ্গুত্ব থেকে সবার আগে মুক্তি পেল মেজর লুইগি রাকা। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ধরবার জন্য ছুটল, ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছে এঞ্জিন স্টার্ট দাও। প্রথম বার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাতেই স্টার্ট নিল রোলস-রয়েস, লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডে উঠে পড়ল মেজর।

‘ধরো ওদের!’ ড্রাইভারের কানে গরম সীসার মত আওয়াজ

ছাড়ল সে। ‘ধাওয়া করো!’ ঝুঁকে নিজের সিট থেকে রাইফেলটা তুলে নিল।

সবেগে ছুটল রোলস-রয়েস, তাল সামলাতে না পেরে নরম গদির উপর আছাড় খেলো কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক, মাথায় সদ্য তোলা হেলমেট হড়কে নেমে এল চোখের উপর, পালিশ করা বুট আকাশের গায়ে কিছু আঁকবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, পিস্তল ধরা হাতের অবাধ্য আঙুল চেপে বসছে ট্রিগারের উপর।

বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো বেরেটা, অগ্নের জন্য সাতার কান ছুঁলো না বুলেট। সিট থেকে কাউন্টের পায়ের কাছে ক্যামেরার উপর পড়ে গেল সে, নিতম্বে ব্যথা আর মনে ভয় নিয়ে কেঁদে ফেলল।

‘আরও জোরে!’ ড্রাইভারের কানটাকে একাই দখল করে রেখেছে মেজর। ‘ধরো ওদের! আর্মারড কারকে পিছনে ফেলে বাঁক নিতে বাধ্য করো ওদের!’ প্রতি মুহূর্তে আরও তেজি হলো তার কণ্ঠস্বর, সেই পরিমাণে কর্তৃত্বের সুরও বাড়ল। আর্মারড কারের দুটো মাত্র জায়গা দুর্বল, ড্রাইভারের ভাইজার আর খোলা গান-মাউন্টিং। দুটোর একটাকে সরাসরি দৃষ্টিপথে পেলেই গুলি করবে সে।

‘স্টপ!’ আদেশ করল কাউন্ট। ‘এরজন্যে তোমাকে আমি গুলি করে মারব!’

দুটো গাড়ি পাশাপাশি ছুটছে, মাঝখানের ব্যবধান দশ ফুটেরও কম।

ভাইজারের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রোলস-রয়েসকে দেখতে পাচ্ছে না অ্যানি, ওর চোখের সামনেটা ধরা পড়ছে ছোট্ট খিলান আকৃতি নিয়ে। সেদিকে চোখ রেখে চোঁচাল, ‘কোথায় ওরা?’

নিতম্বিনী ছুটতে শুরু করবার মুহূর্তে এক কোণে ছিটকে পড়েছিল রানা আর বানু, অ্যানির প্রশ্ন শুনে হামাগুড়ি দিয়ে কমান্ড টারিটের দিকে এগোল ও। পাশের রোলস-রয়েসে তৈরি হলো মেজর, শক্ত করল পেশী, হাতের রাইফেল তুলল নিতম্বিনীর দিকে। এত কাছ থেকেও তার পাঁচটা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, আর্মারড কারের খোলে লেগে পিছলে গেল সব ক'টা। মাত্র একটা বুলেট ঢুকল গান-মাউন্টিঙে।

খোলের ভিতর আটকা পড়ে, বুলেটটা ওদের তিনজনকে ঘিরে জ্যাস্ত একটা মোমাছির মত ছুটোছুটি করতে লাগল, যার গায়ে প্রথম বিধবে তারই ভবলীলা সাঙ্গ। অবশেষে পিছন থেকে ড্রাইভারের সিটে ঢুকল ওটা।

টারিট থেকে মাথা তুলে রানা দেখল, ওদের পাশ ঘেঁষে ছুটছে রোলস, ব্যস্ত হাতে রাইফেলটা রি-লোড করছে মেজর, অন্যান্য আরোহীরা গাড়ির সঙ্গে অসহায়ভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে।

‘ড্রাইভার!’ হাঁক ছাড়ল রানা। ‘হার্ড রাইট!’ সঙ্গে সঙ্গে অ্যানি সাড়া দিতে ক্ষণস্থায়ী গর্ববোধ করল ও, মুহূর্তের জন্য উথলে উঠল হুহু। এমন আকস্মিকভাবে বিশাল আর্মারড খোল ঘুরিয়েছে সে, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের সময় পায়নি রোলসের ড্রাইভার। সংঘর্ষের আওয়াজটা হলো দীর্ঘস্থায়ী বজ্রপাতের মত, উজ্জ্বল সাদা আগুনের একরাশ ফুলকি ছুটল।

‘মমতাময়ী ঈশ্বরের মা, আমাদের বাঁচাও!’ শুকনো চোখে কেঁদে উঠল কাউন্ট। ‘আমরা মারা গেছি!’

পিছিয়ে পড়ছে রোলস-রয়েস, তবে এখনও তার গায়ে প্রায় চড়াও হয়ে রয়েছে নিতম্বিনী। দামী গাড়িটার একটা পাশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, প্রায় ঢেঁছে তুলে নেওয়া হয়েছে সব রঙ, তুবড়ে-তাবড়ে যা-তা অবস্থা।

সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে ঢিলেঢালা একটা লাফ দিয়ে ব্যাক সিটে আশ্রয় নিয়েছে মেজর রাকা, সংঘর্ষের পরমুহূর্তে বুঝতে পেরেছে আরেকটু দেরি হলে একটা পা চিরকালের জন্য হারাত সে। তবে ইতিমধ্যে সে তার রাইফেলে গুলি ভরা শেষ করেছে।

‘দূরত্ব চাই, আমি দূরত্ব চাই।’ আবার ড্রাইভারের কানটা দখল করল মেজর রাকা। ‘তা না হলে আমি গুলি করতে পারছি না!’

কিন্তু অবশেষে কাউন্ট তার সাহস এবং ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে, হেলমেটটা চোখ থেকে মাথার উপর তুলল সে। ‘স্টপ, ইউ ফুল! খচ্চরের বাচ্চা, বাপকে চিনতে ভুল করছিস!’ পরিষ্কার গলা তার, অত্যন্ত জরুরী সুর। ‘তোরা না হয় প্রাণের মায়া নেই, ক’পয়সাই বা দাম, কিন্তু আমি একজন কাউন্ট-থাম! থাম! স্টপ!’

পরম স্বস্তির সঙ্গে ব্রেক করল ড্রাইভার, আজ সারাদিনে এই প্রথম হাসল।

‘গাড়ি ছাড়ো! ড্রাইভার, গাড়ি ছাড়ো!’ এবার শুধু গর্জন নয়, ড্রাইভারের কানে রাইফেলের মাজল ঢোকাবার চেষ্টা করল মেজর রাকা। বেচারী ড্রাইভারের হাসি দপ করে নিভে গেল, সামনে এগিয়ে যাওয়া আর্মারড কারের দিকে চোখ রেখে আবার গাড়ি ছাড়ল সে।

‘স্টপ!’ বলল কাউন্ট, টলতে টলতে দাঁড়াল সে, এক হাতে মাথার সঙ্গে চেপে ধরে আছে হেলমেট, অপর হাতে ড্রাইভারের খালি কানটায় পিস্তলের মাজল ঢুকানোর চেষ্টা করছে। ‘আমি, তোমার কর্নেল, আদেশ করছি! থামো!’

‘থামলেই গুলি!’ হুমকি দিল মেজর। ‘যেতে থাকো!’

দুই কানে ধাতব ছিপি থাকায় কারও কথাই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না ড্রাইভার। চোখ বন্ধ করল সে, যা থাকে কপালে। হাত

দুটো স্টিয়ারিঙ থেকে তুলে নিতে সাহস পেল না। তীরবেগে ছুটল রোলস-রয়েস। সামনে পিঠ উঁচু লাল মাটি, ওই প্রায়-খাড়া ঢালই পাহারা দিয়ে রেখেছে নালায় মুখটাকে-প্রতি মুহূর্তে ওদের দিকে ছুটে আসছে সেটা।

রোদে পোড়া মাটির পাঁচিলে রোলস-রয়েস ধাক্কা খেতে যাচ্ছে, তবে তার আগেই উভয়সংকট থেকে রক্ষা পেয়ে গেল ড্রাইভার। আব্বাস খায়ের, সমমনা আরেকজন সঙ্গীর অনুপস্থিতিতে, সে তার যুদ্ধপ্রিয় দাদুর গর্ব আর গৌরবের কাছে ব্যাকুল আবেদন জানাল। পাল্টা কৌতুক করতে গিয়ে মাইকেল সেভারস্ যদিও তাঁকে যথেষ্ট তেজ খাইয়ে দিয়েছে, নাতির আবেদনে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন প্রাচীন বীরযোদ্ধা, দেহরক্ষীদের নিজের চারদিকে জড়ো করে নির্দেশ দিলেন, সবাই তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। নালা ধরে ছোট্ট আরেকটা জনতার ঢল নামতে শুরু করল, সবার আগে কামাল হাসান আর আব্বাস খায়ের।

নালা থেকে বেরিয়ে এল দু'জন, দেখল ধুলোর পাহাড় তুলে আর্মারড কার আর রোলস-রয়েস সরাসরি ওদের দিকেই ছুটে আসছে। যে-কোন দুঃসাহসী প্রেমিকের জন্যও দৃশ্যটা ভীতিকর, ডাইভ দিয়ে লাল মাটির গোড়ায় আশ্রয় নিল আব্বাস। কিন্তু কামাল হাসান তার বরাদ্দের সিংহটা অনেক আগেই বধ করেছেন, তাঁর এমনকী চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না। পুরানো বন্ধু মার্টিনি হেনরি রাইফেলটা তুলে গুলি করলেন তিনি। কামান দাগবার মত আওয়াজ হলো, নীল ধোঁয়ার বিশাল একটা বেলুন ফুলে উঠল, ব্যারেল থেকে ছুটল লম্বা লাল শিখা।

রোলসের উইন্ডস্ক্রীন ভাঙবার দৃশ্যটা দেখবার মত হলো, কাচ নয় যেন বিস্ফোরিত হলো একতাল রূপো, তারই একটা টুকরো

কেটে দিল কাউন্টের একদিকের গাল।

‘ঈশ্বরের নিষ্ঠুর মা, আমি মারা গেছি!’ হাউমাউ করে উঠল কাউন্ট। ‘শেষ পর্যন্ত বেজন্মা ড্রাইভারের জন্যে তাৎপর্যহীন মৃত্যুকে মেনে নিতে হলো...!’ যেন ঠিক এই গুলি আর গালিটার জন্যই অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার, চোখ খুলেই বন বন করে স্টিয়ারিঙ ঘোরাল সে, সগর্জনে বাঁক নিতে শুরু করল রোলস-রয়েস। যথেষ্ট হয়েছে, মেজরের শত হুমকিও এখন আর ড্রাইভারকে দ্বিধায় ফেলতে পারবে না, ঘাঁটিতে ফিরবে সে।

‘মাই গড!’ হাঁপিয়ে উঠে বলল অ্যানি, দেখতে পেল বাঁক ঘুরে ফিরে যাচ্ছে তোবড়ানো রোলস-রয়েস। গাড়ির ভিতর আরোহীরা এখনও পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, আকাশের দিকে মুখ তুলে রয়েছে রাইফেল আর পিস্তলের মাজল, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের চঁচামেচি।

আবার গর্জে উঠল কামাল হাসানের রাইফেল, ইটালিয়ানদের পলায়ন আরও দ্রুতগতি হলো, তার কাছাকাছি এসে নিতম্বিনীর ব্রেক কষল অ্যানি। নীচে নেমে প্রাচীন বৃদ্ধকে গাড়িতে তুলে নিল রানা, তাঁর চোখ রক্ত ভরা দুটো আঙুর যেন, গা থেকে যে গন্ধটা ছড়াচ্ছে তা শুধু মদ চোলাইয়ের কারখানায় পাওয়া যায়, তবে তাঁর জ্ঞানপাপী পুরানো চেহারা শত সহস্র বলিরেখা নিয়ে উজ্জ্বল তৃপ্তিমাখা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ‘হাউ ডু ইউ ডু?’ ভুরু নাচিয়ে পরম আনন্দের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

‘মন্দ নয়, স্যার,’ তাঁকে আশ্বস্ত করল রানা। ‘কোনভাবেই খারাপ বলা যায় না!’

চোদ্দ

দুপুরের খানিক আগে, কুয়াগুলোর বিশ মাইল সামনে ঘাস মোড়া খোলা প্রান্তরে আর্মারড কারগুলো থামানো হলো, পিছিয়ে পড়া আদিবাসীরা যাতে ওদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এখানেই প্রথম সুযোগ পেল অ্যানি বানুর গুরুত্ব করবার। গত এক ঘণ্টায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার পা, ক্ষতের উপর জমাট বেঁধে রয়েছে রক্ত। ক্ষতটা পরিষ্কার করবার সময় বানু প্রতিবাদ না করলেও তার চেহারা ম্লান কাদার মত হয়ে উঠল, কপাল আর ঠোঁটের উপর ঘাম ফুটল বিন্দু বিন্দু। বানুর মন অন্য দিকে ফেরাবার জন্য উপত্যকার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিবরণ দিল অ্যানি।

চুপ করে শুনবার পর বানু বলল, ‘রোগশোক, খিদে আর পাহাড়ে যুদ্ধ করে যুগ যুগ ধরে আমরা শুধু মারাই যাচ্ছি—না আছে কোন উদ্দেশ্য, না কারণ।’ দার্শনিকসুলভ বিষণ্ণ একটা ভাব ফুটল তার চোখে। ‘কিন্তু আজকের ব্যাপারটা আলাদা। আজ যারা মারা গেল তাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল—আমাদের কথা দুনিয়ার লোককে জানিয়ে গেল ওরা।’ ক্ষতের উপর ডিজাইনফেকট্যান্ট জ্বালা করে ওঠায় গুড়িয়ে উঠল সে।

‘দুগ্ধিত,’ তাড়াতাড়ি বলল অ্যানি।

‘ও কিছু না,’ বলল বানু, তারপর কয়েক সেকেন্ড কেউ কথা বলল না। এক সময় জিজ্ঞেস করল সে, ‘বিষয়টা নিয়ে তুমি লিখবে, তাই না, অ্যানি?’

‘অবশ্যই,’ গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল অ্যানি। ‘অবশ্যই লিখব। আচ্ছা বলতে পারো, টেলিগ্রাফ অফিস পাব কোথায়?’

‘সারডিতে আছে একটা,’ জানাল বানু। ‘রেলওয়ে অফিসে।’

ওষুধের বাস্ক থেকে ব্যান্ডেজ বের করে ক্ষতটা বেঁধে দিল

অ্যানি। এক সেকেন্ড ইতস্তত করবার পর বলল, ‘তোমার পরনের পা’জামা খুলতে হবে। এত টাইট পরো কী করে? ঘা হয়ে যায়নি সেটাই আশ্চর্য!’

‘এভাবেই পরার নিয়ম,’ ব্যাখ্যা করল বানু। ‘নিয়ম নয়, বলতে পারো আইন। আমার দাদুর দাদু রাস আবদুল্লাহি আইনটা করে গেছেন।’

‘গুড লর্ড।’ অ্যানি শুধু বিস্মিত নয়, অস্বস্তিও বোধ করল। ‘কিন্তু কেন?’

‘আগেকার দিনে মেয়েরা খুব পাজি ছিল,’ ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে বলল বানু। ‘আর আমার দাদুর দাদু ছিলেন নিতান্ত ভাল মানুষ। পা’জামা খোলা যাতে সহজ না হয় সেজন্যেই এই আইন তৈরি করেন তিনি।’

হেসে উঠল অ্যানি। ‘তার উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? মানে, আজকালকের মেয়েরা কি কঠিন বলে ঘন ঘন পা’জামা খুলবার চেষ্টা বাদ দিয়েছে?’

‘আরে না!’ হেসে উঠল বানুও। ‘তবে কাজটা সত্যিই কঠিন।’ তার সুরটা এমন, যেন অভিজ্ঞতা থেকে বলছে। ‘অবশ্য খোলার সময় তেমন অসুবিধে হয় না—অসুবিধা হয় তাড়াতাড়ি পরার সময়।’

ওষুধের বাস্ক থেকে একটা কাঁচি বের করল অ্যানি। ‘তোমার এটা কেটে নামাতে হবে।’

‘এত সুন্দর একটা জিনিস, কাটো—রানা তো আগেই ওটার বারোটা বাজিয়েছে।’

কাঁচি দিয়ে কেটে পা’জামাটা বানুর কোমর থেকে খসিয়ে আনল অ্যানি। ‘এবার তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।’ তার

গায়ে একটা উলেন আলখেল্লা চাপাল সে, কোমর থেকে নীচের দিকটা নগ্নই থাকল। গাড়ির মেঝেতে, মোটা চটের উপর শুয়ে আছে সে।

পোর্টেবল টাইপরাইটার নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে অ্যানি, পিছু ডাকল বানু, ‘চলে যেয়ো না, ভাই। আমার সাথে আর কিছুক্ষণ থাকো।’

ইতস্তত করে অ্যানি বলল, ‘কিন্তু আমাকে যে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।’

‘এখানে বসে করো। আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।’

‘প্রমিস?’

‘আই প্রমিস।’

কেস থেকে বের করে টাইপরাইটারটা কোলে নিল অ্যানি, লম্বা করে একটার উপর আরেকটা তুলে দিয়েছে পা। মেশিনে নতুন কাগজ ভরে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল সে। তারপর তার আঙুল প্রজাপতির মত ছুঁয়ে যেতে শুরু করল কী-গুলোকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাগ আর ভাবাবেগ ফিরে এল তার মধ্যে, প্রাঞ্জল শব্দের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হলো সব হলুদ কাগজের বুক। তার চেহায়ায় লালচে আভা ফুটল, মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে সোনালি চুল সরাল চোখ থেকে।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকল বানু, নড়ছে না বা কথা বলছে না। তারপর আরেকটা নতুন কাগজ ভরল অ্যানি মেশিনে, এই সময় নিস্তব্ধতা ভাঙল সে। ‘ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করেছি, অ্যানি।’

‘করেছ?’ অ্যানি মুখ তুলে তাকাল না।

‘আমার ধারণা লোকটা মাসুদ রানা।’

‘মাসুদ রানা?’ দ্রুত মুখ তুলল অ্যানি, হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তনের

কারণ বোধগম্য হলো না।

‘হ্যাঁ,’ নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বানু। ‘তোমার প্রথম প্রেমিক হিসেবে রানাকেই আমরা গ্রহণ করব।’ বলবার ঢঙে পরিষ্কার বোঝা যায়, ব্যাপারটাকে দলীয় আয়োজন হিসাবে দেখছে সে।

‘তাই? তোমার বুঝি সেরকম ধারণা?’ ধারণাটা আগেই অ্যানির মাথায় ঢুকেছে, বলা যায় প্রায় শিকড় গেড়ে বসেছে, কিন্তু এরকম একটা ব্যক্তিগত বিষয়ে এত স্পষ্ট রায় আরেকজনের কাছ থেকে আসায় দ্রুত উপেক্ষা করবার একটা প্রবণতা পেয়ে বসল তাকে।

‘সত্যিকার একটা পুরুষ! গায়ে কী জোর! তেমনি সাহস। হ্যাঁ, ওকেই।’ বলে চলেছে বানু, ‘আমার ধারণা, রানাকেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।’ কথাগুলো বলে, রানার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, এক নিমেষে সেটাকে সর্বনির্ন পর্য়ায়ে নামিয়ে দিল সে।

এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে নাক টানল অ্যানি, ঝড় তুলল টাইপরাইটারে। আসলে সে স্বাধীনচেতা মেয়ে-যে কিনা ব্যক্তিগত বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করে।

চেউ খেলানো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে ঘাস মোড়া মুক্ত প্রান্তর পর্যন্ত পশু আর মানুষ গিজগিজ করছে। গোটা এলাকার উপর মিহি ধুলো উড়ছে, রোদ লেগে চারদিকে ঝিক ঝিক করছে বর্ষার ফলা আর তামার ঢাল। গোত্রে যারা প্রভাবশালী শুধু তারা ঘোড়ায় চেপে আসছে, তাদের প্রায় সবার পরনে রঙচঙে সিল্কের আলখেল্লা। মাল-পত্র বয়ে আনছে পশুগুলো, তাদের মধ্যে দূর

দিগন্তের কাছে চেনা যাচ্ছে শুধু উটগুলোকে।

চঞ্চলার টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, হেলমেটের ছায়ায় বিনকিউলারের লেন্স, ধুলোর পাহাড় ভেদ করে দূরে চলে গেছে ওর দৃষ্টি, বিশৃংখল আদিবাসীদের ঘাড়ে চড়াও হবার জন্য শিফটারা ধাওয়া করে আসছে কিনা বুঝতে চায়। খারাপ দিকটা কল্পনা করতেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল ওর। শিফটারা এখন যদি এসে পড়ে, আবার পাইকারীভাবে মারা পড়বে আদিবাসীরা-শিকার হবে ক্রস ফায়ারের।

হঠাৎ রানার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। ওদের অস্ত্রগুলো কখন পৌঁছুবে কে জানে। এই জনারণ্যের ভিতর কোথায় সেগুলো লুকিয়ে আছে তাই বা কে বলবে!

কাঁধে হাত পড়ায় ঘাড় ফেরাল ও। দেখল পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্স হাসান সালে।

‘ধন্যবাদ, মি. রানা,’ শান্ত গলায় বলল প্রিন্স।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার চোখে বিনকিউলার তুলল রানা।

‘ঠিক কাজটি করেছ তা বলি না, তবু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।’

‘কেমন আছে ও?’

‘এইমাত্র মিস অ্যানির সাথে দেখে এলাম, বিশ্রাম নিচ্ছে-তাড়াতাড়িই সেরে উঠবে।’

দু’জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল, তারপর প্রসঙ্গটা তুলল রানা, ‘আমার চিন্তা হচ্ছে, প্রিন্স। একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছি আমরা। শিফটারা যদি ধাওয়া করে, বীভৎস কাণ্ড ঘটে যাবে। অস্ত্রগুলো কোথায় বলতে পারো? ওগুলো আমাদের এখনি দরকার।’

জনারণ্যের বাম দিকের শাখাটির দিকে হাত তুলল প্রিন্স। ‘ওই

তো।’

একদল উটকে এই প্রথম খেয়াল করল রানা, দূরত্ব আর ধুলোর পাহাড় অস্পষ্ট করে রেখেছে, তবে ওগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা হারারি পনিগুলোর চেয়ে অনেক উঁচু। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় অচল নয়, এদিকেই এগিয়ে আসছে।

‘পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা লাগবে,’ বলল প্রিন্স।

খানিকটা স্বস্তিবোধ করল রানা। একটা প্ল্যান তৈরি করল মনে মনে, ভিকার্স গানগুলো তাড়াতাড়ি আর্মারড করে তুলতে হবে। শিফটারা হামলা করলে পাল্টা জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি থাকা চাই ওদের। ওর চিন্তায় বাধা দিল প্রিন্স।

‘মি. রানা, মেজর সেভারসকে কতদিন থেকে চেনো তুমি?’

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে নিঃশব্দে হাসল রানা। ‘কখনও এমনও মনে হয় যেন আগের জন্ম থেকে চিনি ওকে,’ বলেই বুঝল ভুল হয়ে গেছে, কারণ উদ্বেগ ফুটে উঠেছে প্রিন্সের চেহারায়ে। ‘না, ব্যঙ্গ করছি না। ঠাট্টা করছিলাম। ওর সাথে পরিচয় হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি।’

‘ওর সম্পর্কে অত্যন্ত ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর এই দায়িত্বটা দিয়েছি ওকে...।’

‘দায়িত্ব মানে ফাঁদে ফেলে ভাড়া করেছ, আদিবাসীদের ট্রেনিং দেয়ার জন্যে?’

ক্ষীণ একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল প্রিন্স। ‘ঠিক তাই,’ বলল সে। ‘আমরা জেনেছি, বিবেকবর্জিত নিষ্ঠুর লোক সে, নীতির কোন বালাই নেই, কিন্তু আনাড়ি রিক্রুটদের ট্রেনিং দেয়ার কাজে ভারি দক্ষ। এক্সপার্ট উইপন ইনস্ট্রাকটর। মডার্ন আগ্নেয়াস্ত্রের

মেকানিজম আর ব্যবহার সম্পর্কে ভাল জানে।’

‘শুধু ভুল করেও তার সাথে তাস খেলতে বোসো না।’

‘পরামর্শটা মনে থাকবে, মি. রানা।’ একটু হাসল প্রিন্স, পরমুহূর্তে আবার গম্ভীর হলো। ‘মিস অ্যানি উইসপার তাকে কাপুরুষ বলেছে। কথাটা ঠিক নয়। আমার নির্দেশ পালন করছিল মাইকেল, একজন সৈনিকের যেমন করা উচিত।’

‘কী বলতে চাও বোঝা গেল,’ হাসল রানা। ‘তবে আমি সৈনিক নই, স্রেফ সাধারণ একজন মেকানিক।’

‘কী উদ্দেশ্যে বা কারণে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাও তুমি, সেটা আমার কৌতূহলের বিষয় নয়,’ বলল প্রিন্স। ‘তোমার যে সব ব্যাপারেই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে তা বেশ বোঝা যায়। মাইকেলের সাথে তোমাকে উপরি হিসেবে পেয়েই আমি সন্তুষ্ট।’

রানা বিব্রত বোধ করলেও হাসির আড়ালে সেটা চাপা থাকল। ‘আমরা মাইকেল প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম।’

‘হ্যাঁ। মাইকেল তার সামরিক জীবন সম্পর্কে যতই কমিয়ে বলুক তার কৃতিত্ব সম্পর্কে সবই আমি জানি। ট্রেনার হিসেবে ন্যাটোয় ছিল সে। বড় কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তা সত্যি, কিন্তু একাধিক মহড়ায় পদক পেয়েছে সে।’

‘মানুষ হিসেবে নিজেকে সে যতটা ভাল বলে জানে,’ বলল রানা, ‘আসলে তারচেয়ে ভাল সে।’

মাথা ঝাঁকাল প্রিন্স সালে। ‘আমি তার সামরিক অভিজ্ঞতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিই। মাইকেল সত্যি একজন দক্ষ...’

‘হ্যাঁ, তুমি আমাকে কনভিন্স করতে পেরেছ,’ প্রিন্সকে বাধা দিল রানা। ‘সেটাই তো চাইছ, তাই না?’

‘না,’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল প্রিন্স। ‘আশা করছিলাম

তুমি হয়তো কনভিন্স করতে পারবে আমাকে।’ দু’জনেই ওরা হেসে উঠল।

‘বললে আমার সম্পর্কে তোমার কৌতূহল নেই, তারমানে কি খোঁজ নেয়ার চেষ্টাও করোনি?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘করিনি,’ বলল হাসান সালে। ‘তোমার কথা প্রথম আমি দার-এস-সালামে শুনি। তুমি আর তোমার আর্মারড কার-জাদুর একটা বাস্ক হিসেবে গ্রহণ করি আমি।’ একটু থেমে মুখ তুলে সরাসরি রানার চোখে তাকাল সে, নিচু গলায় বলল আবার, ‘রাগটা তোমার ভেতর এখনও রয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি আমি।’

অবাক হয়ে উপলব্ধি করল রানা, প্রিন্স ঠিকই বলছে। এ ধরনের অকারণ মানবহত্যার ঘটনা আর মাত্র একটা চাক্ষুষ করেছে ও। একান্তরে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যখন গণহত্যা চালিয়েছিল। সেটা ছিল ওর প্রিয় দেশকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র। হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল রানা। ভাড়াটে ইটালিয়ান অফিসার আর শিফটাদের প্রতিও সেই একই আক্রোশ জেগেছে ওর মনে। উপত্যকায় যে নির্মম দৃশ্য চাক্ষুষ করেছে আজ, কোনদিন ভুলবে না।

‘আমার বিশ্বাস, আমাদের সাথে সাময়িকভাবে হলেও, একটা বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছ তুমি, মি. রানা,’ নরম সুরে, বিড়বিড় করে বলল প্রিন্স হাসান সালে।

তার গভীর সত্যকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না রানা। এ-ব্যাপারে নিজের প্রতি ওর কোন প্রতিশ্রুতি আছে কিনা এখনও তা পরিষ্কার নয়। আফ্রিকায় পা ফেলবার পর নিজের ছাড়া অন্য কারও সমস্যা নিয়ে এই প্রথম বিচলিত বোধ করেছে ও। কাল পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল, মাইকেল আছে বলে সে-ও

আছে, বিশেষ করে সভ্য দুনিয়া থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যটা যখন পূরণ হচ্ছে। কিন্তু আদিবাসীদের অসহায়ভাবে মরতে দেখবার পর এখানে ওর উপস্থিতি অন্য এক তাৎপর্য বহন করছে। যতদিন দরকার, আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে ওকে। অসহায় মানুষকে ক্রীতদাস হতে দিলে, গোটা মানবকুলকে, মাসুদ রানাকে সহ, অপমানিত হতে দেওয়া হবে, সবার সঙ্গে কেড়ে নেওয়া হবে তারও খানিকটা স্বাধীনতা।

‘নো ম্যান ইজ অ্যান অ্যাইল্যান্ড...’ বলল রানা।

‘...এন্টায়ার অভ ইটসেলফ। এনি ম্যান’স ডেথ ডিমিনিশেস মি, বিকজ আই য়াম ইনভলভড ইন ম্যানকাইন্ড,’ মাথা ঝাঁকিয়ে উদ্ধৃতিটা পূরণ করল প্রিন্স সালে। প্রিন্সের গভীর কালো চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। ‘হ্যাঁ, মি. রানা-জন ডন। তোমাকে পেয়ে সত্যি আমি গর্বিত। তুমি যদি আগুন হও তো মাইকেল সেভারস বরফ। দু’জনেই তোমরা আমার উপকার করবে। আমি বুঝতে পারি, এরইমধ্যে তোমরা দু’জন একটা বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছ।’

‘বাঁধন?’ হেসে উঠল রানা, সামান্য কর্কশ শোনাল, নিরেট কোন সত্য অস্বীকার করতে যাওয়ার ফল কিনা বোঝা গেল না। তবে হাসি থামিয়ে প্রিন্সের কথাগুলো ভাবল ও। যতটুকু আন্দাজ করা যায়, লোকটার উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তার চেয়েও বেশি। অচেনা সত্য উন্মোচিত করে দেখানোর একটা অদ্ভুত শক্তি রয়েছে তার ভিতর।

‘হ্যাঁ, মি. রানা, একটা বাঁধন। আগুন আর বরফ। তুমি দেখো, এক সময় বুঝতে পারবে নিজেই।’

বেশ কিছুক্ষণ ওরা কথা বলল না। চঞ্চলার টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু’জন, গায়ে রোদ, যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন।

এক সময় পশ্চিম দিকে তাকিয়ে একটা হাত তুলল প্রিন্স

সালে। ‘ওই দেখা যায় ইথিওপিয়ার হৃদয়,’ বলল সে। ‘পাহাড়।’ দু’জনেই ওরা আকাশ ছোঁয়া পাহাড়শ্রেণীর দিকে মুখ তুলল।

প্রতিটি মালভূমিকে দু’ভাগ করেছে পাথরের খাড়া পাঁচিল, পাঁচিলের উপর পরবর্তী মালভূমি, উঁচু আর বহুদূরে বলে নীলচে একটা ধোঁয়াটে ভাব ঘিরে আছে, মেঘগুলো যেন মালভূমি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়শ্রেণীর মাথার উপর, পাহাড়ের গায়ে মুখ ব্যাদান করে আছে গিরিসংকটগুলো।

‘এই পাহাড়ই আমাদের রক্ষা করে। দু’দিকে একশো মাইল পর্যন্ত এমন কোন ফাঁদ নেই যেটা দিয়ে ঢুকতে পারবে শত্রু।’ হাত তুলে দক্ষিণ আর উত্তর দিকটা দেখাল প্রিন্স, দু’দিকেই নীলচে অস্পষ্টতার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড়শ্রেণী।

‘কিন্তু ওই যে, সারডি গিরিসংকট রয়েছে,’ বলল রানা, পাহাড়ের গায়ে গভীর চেরা দাগটা পরিষ্কারই দেখতে পেল, চোঙ আকৃতির একটা গহ্বর। দূরে বলে সরু দেখালেও, সবচেয়ে চওড়া অংশটা প্রায় পনেরো মাইলের কম হবে না, তারপর দ্রুত চিকন হয়ে খাড়াভাবে উঠে গেছে, মিলিয়ে গেছে আরও উঁচু অস্পষ্টতার ভিতর।

‘হ্যাঁ, সারডি গিরিসংকট!’ হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল প্রিন্স সালে। ‘সম্রাটের সম্রাট, হাইলে সেলাসি, তাঁর নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্যে উত্তরে সৈন্য মোতায়েন করেছেন। কমিউনিস্টদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে ওখানে। কমিউনিস্টদের বড় একটা দল রওনা হয়েছে। অনেক আগেই, প্রায় দেড় লাখ ইরিত্রীয়। ইরিত্রিয়া প্রায় খালি হয়ে গেছে। আর সেজন্যেই তো শিফটারা এতটা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।’

‘তারমানে সম্রাটের কাছ থেকে তোমরা কোন সাহায্য পাবে

না,’ আশংকা প্রকাশ করল রানা।

‘এখনও আমি হতাশ নই,’ বলল প্রিন্স। ‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখব। যদি ব্যর্থ হই, শেষ উপায় হিসেবে কমিউনিস্টদের ধরব। হয়তো ওরাই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে আমাদের। মোট কথা, কারও না কারও সাহায্য আমাদের পেতেই হবে। কারণ, আমার কাছে গোপন খবর আছে, শিফটাদের আরও অনেক বড় বাহিনী গিরিসংকট পেরিয়ে আসতে পারে এদিকে। আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার, শিফটাদের সঙ্গে নাকি কয়েক হাজার ভাড়াটে সৈনিকও থাকবে। তারা আসবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সম্রাটের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার জন্যে। ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্টদের আমি পছন্দ করি না, তবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কারও সঙ্গে হাত মেলাতেই আমার কোন আপত্তি নেই।

‘সারডি গিরিসংকটে আসার পথটা অত্যন্ত দুর্গম, কিন্তু শিফটারা দুর্গম এলাকায় চলাফেরা করে অভ্যস্ত। তা ছাড়া, তাদের সাথে থাকবে ইটালিয়ান উপদেষ্টা-সেই জুলিয়াস সিজারের যুগ থেকেই এঞ্জিনিয়ারিঙে ওস্তাদ ওরা। গিরিসংকটের মুখে যদি শিফটা বাহিনী পৌঁছুতে পারে, হাইল্যান্ডের ভেতর দিকে পঞ্চাশ হাজার লোক পাঠাতে ওদের খুব বেশি হলে এক হুণ্ডা লাগবে।

‘তার মানে সম্রাটের বাহিনী আর কমিউনিস্টদের পিছনে পৌঁছে যাবে ওরা-সম্রাট আর তাঁর রাজধানী আদিস আবাবার মাঝখানে-শহরে ঢোকার পথটা সম্পূর্ণ খোলা থাকবে তাদের সামনে। এটা যদি ঘটে, শেষ হয়ে যাব আমরা। শিফটারা তা জানে-ওয়েলস অভ চান্ডিতে তাদের উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে। আজ আমরা যাদের সামনে পড়েছিলাম তারা ছিল ছোট অ্যাডভান্স পার্টি। ওদের পিছু পিছু আসছে বিশাল শিফটা বাহিনী। গিরিসংকট পেরিয়ে এদিকে চলে আসবে ওরা...।’

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘ব্যাপারটা সেরকমই মনে হচ্ছে।’

‘সম্রাট আমার সাথে অদ্ভুত এক খেলা খেলছেন,’ বিড়বিড় করে বলল প্রিন্স হাসান সালে। ‘আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সারডি গিরিসংকট রক্ষা করতে হবে। অথচ নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমার গোত্র থেকে যোদ্ধাদের পাঠাতে হবে লেক টানার তীরে-দুশো মাইল পশ্চিমে। কারণ কমিউনিস্টদের সাথে এই মুহূর্তে ওখানে তুমুল লড়াই চলছে সেলাসি বাহিনীর। কিন্তু যোদ্ধার সংখ্যা এমনিতেই কম আমাদের। তোমাদের দু’জনকে আর আর্মারড কারগুলো পাওয়ায় সারডি গিরিসংকট হয়তো রক্ষা করতে পারব আমরা...।’

‘তুমি দেখছি খুব বেশি ভরসা করছ আমাদের ওপর,’ বলল রানা। ‘আর্মারড কারগুলো কিন্তু তেমন কোন কাজে আসবে না...।’

‘আমি জানি, মি. রানা। সেজন্যেই তো পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টাই আমি চালিয়ে যাচ্ছি।’

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা।

দম নিয়ে শুরু করল প্রিন্স, ‘গালা নামে আমাদের চিরশত্রু একটা গোত্র আছে। সারডি গিরিসংকটে শিফটাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে তাদের সাথে হাত মেলাচ্ছি আমি। নূর আয়াঙ গালাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, এখন দেখা যাক সে কী করে। লোকটা আক্ষরিক অর্থেই একটা পিশাচ আর খুনী, তার লোকেরাও শিফটাদের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না, তবে তারা ভাল যোদ্ধা।’

প্রিন্স ওর উপর অনেক বেশি নির্ভর করছে, এটা বুঝতে পেরে আদিবাসীদের সঙ্গে রানার বাঁধনটা আরও যেন জোরাল হয়ে

উঠল। মৃদুকণ্ঠে বলল ও, ‘বিশ্বাস করা যায় না এমন বন্ধু কিন্তু শত্রুর চেয়েও খারাপ।’

‘কার উদ্ভৃতি?’ কৌতূহলে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল প্রিন্স।

‘মাসুদ রানা, মেকানিক।’ হাসল রানা। ‘দেখে শুনে সন্দেহ করার কারণ নেই, কঠিন একটা কাজ পড়েছে আমাদের ঘাড়ে। আমার কী দরকার সেটা বলি-চালাক-চতুর আর স্বাস্থ্যবান কিছু যুবক। যাদেরকে আমি গাড়ি চালানো শেখাতে পারি বা মাইকেল বন্দুক চালানো শেখাতে পারে।’

‘হ্যাঁ, বিষয়টা নিয়ে এরইমধ্যে মেজরের সাথে আলোচনা হয়েছে আমার। সে-ও একই পরামর্শ দিয়েছে। বাছাই করা কিছু ছেলে তোমাদের হাতে তুলে দেব আমি।’

‘কম বয়েসী হওয়া চাই,’ বলল রানা। ‘তাড়াতাড়ি শিখবে।’

ত্রিকালজ্ঞ প্রাচীন শকুনের আকৃতি নিয়ে মাইকেলের গাড়ি গরবিনীর ছায়ায় বসে রয়েছেন কামাল হাসান, চোখদুটো এমন কুঁচকে আছে, ঠিক যেন একজনুাইপারের চোখ; তাঁর ঠোঁট নড়লেও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না, উত্তেজিত হাঁ করা মুখের কোণ থেকে সামান্য লালা ঝরছে। ঝুঁকে পড়ে দাদুর কার্ড দেখবার চেষ্টা করল আব্বাস, কাঁধের ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিলেন কামাল হাসান, কার্ডগুলো হাত দিয়ে বুকের সঙ্গে সঁটে ধরলেন। তাঁর সামনে বসে রয়েছে মাইকেল সেভারস্, সে-ও তার কার্ড জ্যাকেটের সঙ্গে চেপে রেখেছে।

আব্বাস অভিযোগ করল, ‘দাদু বলছেন, আমাকে তাঁর আর দরকার নেই। খেলাটা নাকি এরইমধ্যে শিখে ফেলেছেন।’ এতক্ষণ দোভাষীর দায়িত্ব পালন করছিল সে।

‘ওঁকে বলো, তাস খেলায় উনি সহজাত প্রতিভার অধিকারী।’

ঠোঁটের এক কোণে চুরকট চেপে রেখে অপর কোণ থেকে নীল ঝোঁয়া ছাড়ল সে কামাল হাসানের মুখ বরাবর। ‘বলো, মন্টি কার্লোয় একবার পৌঁছতে পারলে সেটা জুয়াড়ী হিসেবে বরণ করে নেয়া হবে তাঁকে।’

প্রশংসা শুনে দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসলেন কামাল হাসান, তারপর মাইকেল কী কার্ড ফেলে দেখবার জন্য সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

‘বেগম দরকার আছে কারও?’ নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল মাইকেল, হরতনের বিবিটা সিধে করে রাখল অ্যামুনিশন বক্সের উপর।

তাসটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন কামাল হাসান, আনন্দে বগল বাজাতে শুরু করলেন। দুম করে একটা ঘুসি মারলেন বাক্সের গায়ে, তারপর হাতের সব কার্ড সিধে করে মেলে দিলেন দু’জনের মাঝখানে।

‘আবার হেরে গেলাম, মাই গড!’ মাইকেলের চেহারা চরম হতাশায় দুমড়েমুচড়ে বিদঘুটে আকৃতি পেল, আয়না থাকলে নিজের এই বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় দেখে মূর্ছা যেত সে।

আরও খানিকটা লালা ঝরালেন কামাল হাসান। প্রশ্ন করলেন, ‘হাউ ডু ইউ ডু?’

অদম্য হাসিতে হাড্ডিসার বৃদ্ধকে গড়িয়ে পড়তে দেখে মাইকেল বুঝল, হাঁসের গায়ে যথেষ্ট চর্বি জমেছে, এবার ওটাকে জবাই করা যেতে পারে। ‘তোমার ভাগ্যবান দাদুকে জিজ্ঞেস করো, পরবর্তী খেলায় লেনদেনের ব্যবস্থা থাকবে কিনা। একদম খালি হাতে আর কতক্ষণ! আমার কাছে তাঞ্জানিয়ান শিলিং আছে। জিজ্ঞেস করো, উনি কী দিয়ে খেলতে চান।’ প্রস্তাবটা ভাল করে

বোঝাবার জন্য মানিব্যাগ বের করে টাকা দেখাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন কামাল হাসান। অন্তত দশ গেম জিতেছেন তিনি। মানিব্যাগ নয়, তিনি একটা চামড়ার ছোট থলে বের করলেন, ভিতর থেকে বেরুল ইথিওপিয়ান ডলারের গোল পাকানো অনেকগুলো নোট।

লোভে চকচক করে উঠল মাইকেলের চোখ। ‘তাস বাঁটুন, ওল্ড স্পোর্ট, দেরি কীসের?’

কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরের নিজের তাঁবুতে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে, মাঝে মধ্যে থেমে হাত নেড়ে শাসাচ্ছে, গালাগালি করছে মেজর লুইগি রাকাকে। ‘তুমি একটা ইতর, মেজর রাকা। তুমি একটা বেজন্মা, একটা শূয়োরছানা। তোমার অনেক বেয়াদপি আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। তোমাকে বিশ্বাস করে কমান্ডিঙ পোস্টে চাকরি দিয়েছি, কাজেই সব দোষ আমার। হ্যাঁ, নিজেকেই আমি দায়ী করি। সেজন্যই এতদিন তোমাকে আমি কিছু বলিনি, তোমার সমস্ত অবাধ্যতা মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু আজ যা ঘটেছে, এরপর আর তোমাকে ক্ষমা করা যায় না। আমিও একজন সোলজার, লুইগি রাকা, আমার ইউনিফর্মেরও একটা মর্যাদা আছে। কাজেই তোমার অপরাধ আমি দেখেও না দেখবার ভান করতে পারি না। তোমার শাস্তি, রাকা, মৃত্যুদণ্ড। আর শাস্তিটা তোমাকে আমি নিজের হাতে দেব। আমার বাহিনীর জন্য এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আজ সন্ধ্যায়, সূর্য যখন অস্ত যাবে, উপত্যকার কিনারায় দাঁড় করিয়ে আমি নিজের হাতে তোমাকে গুলি করে মারব। তবেই আমার শাস্তি।’

দীর্ঘ বক্তৃতা, তবে অভ্যেস আছে, কাউন্ট হাঁপাল না। বক্তৃতা শেষ করল সে হাত দুটো নাটকীয় ভঙ্গিতে দু’দিকে মেলে দিয়ে,

সামনের আয়নায় পোজটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তাঁবুতে সে একা, কিন্তু কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে হাজার হাজার দর্শক মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, হাততালিতে ফেটে পড়ছে আনন্দমুখের জনতা। হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে হেঁটে এল সে, তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। ‘মেজর লুইগি রাকাকে এই মুহূর্তে ডেকে আনো এখানে।’

‘এই মুহূর্তে, মাই কর্নেল!’ বলল সেন্টি।

পর্দা ফেলে তাঁবুর মাঝখানে ফিরে এল কাউন্ট।

দশ মিনিট পর তাঁবুতে ঢুকল মেজর রাকা, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল সে। ‘আমাকে ডেকেছেন, মাই কর্নেল?’

‘মাই ডিয়ার, রাকা।’ ডেস্কের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল কাউন্ট, সবটুকু সৌন্দর্যসহ তার মধুরতম হাসিটি ফুটিয়ে তুলল চেহারায়, সাগ্রহে এগিয়ে এল মেজরের কাঁধে ঝের হাত রাখবার জন্য। ‘এক গ্লাস ওয়াইন চলবে নাকি, মাই ডিয়ার ফেলো?’

কাউন্ট ডিকানডিয়ার এইটুকু বাস্তব জ্ঞান আছে বৈকি যে মেজর রাকাকে বাদ দিয়ে শিফটা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করা তার একার পক্ষে কোন কালেই সম্ভব নয়। লোকটাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কাউন্ট তার মানসিক চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, এরপর আর মেজরের প্রতি তার কোন বিরূপ মনোভাব থাকবার প্রশ্নই ওঠে না।

‘বসো, বসো,’ বলল সে, ডেস্কের উল্টোদিকে ফেলা ক্যাম্প চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখাল। ‘সিগার রয়েছে, ধরাও না। আরে লজ্জা কী!’ সুহে প্রশয় দিল মেজরকে, একজন বাবা তার বড়ছেলেকে যেমন দিয়ে থাকে। ‘আমি চাই, রিপোর্টটা তুমি পড়ো, পড়ার পর আমার পাশে তুমিও একটা সই করো।’

কাগজগুলো ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল মেজর

রাকা, পড়তে পড়তে বুলডগের মত ভাঁজ হয়ে গেল তার চেহারা।
'মাই কর্নেল, এখানে আপনি লিখেছেন চল্লিশ হাজার মানুষকে
জংলী আমাদের ওপর বাঁপিয়ে পড়েছিল। আমার সন্দেহ আছে...'

'মতভেদ থাকতেই পারে, রাকা। সময়টা ছিল অন্ধকার।
সঠিকভাবে কেউই বলতে পারবে না সংখ্যায় ওরা ক'জন ছিল।' অমায়িক
হেসে আপত্তিটা অগ্রাহ্য করল কাউন্ট। 'এটা স্রেফ একটা
তথ্যভিত্তিক হিসাব-পড়ে যাও। তোমার আচরণ সম্পর্কে ভাল
দু'একটা কথাও লিখেছি।'

আবার পড়া শুরু করল মেজর, কিন্তু আবার হেঁচট খেলো সে।
'কর্নেল, শত্রু হতাহত হয়েছে একশো ছাব্বিশজন, বারো হাজার
হুশোজন নয়।'

'ভুলটা কলমের, রাকা। হেডকোয়ার্টারে পাঠাবার আগে ওই
জায়গাটা মেরামত করে দেব।'

'স্যার, আপনি কোথাও বলছেন না যে শত্রুদের সাথে আর্মারড
ভেহিকেল রয়েছে।'

বৈঠক শুরু হওয়ার পর এই প্রথম কাউন্টের ভুরু কুঁচকে
উঠল। 'আর্মারড ভেহিকেল, রাকা? বুঝতে পেরেছি, আসলে তুমি
অ্যাম্বুলেন্সের কথা বলতে চাইছ।' কাউন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে,
অদ্ভুতদর্শন মেশিনটার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎলাভের ঘটনাটা ভুলে
যাওয়াই সবদিক থেকে ভাল। গোটা ব্যাপারটায় তাদের, বিশেষ
করে তার, কোন কৃতিত্ব একেবারেই ছিল না। প্রসঙ্গটা তোলা হলে
জেনারেল ফাদের মনে অকারণ খটকা সৃষ্টি করা হবে, তা ছাড়া
তার এত সুন্দর রিপোর্টের সৌন্দর্য আর গুণগত মানও ক্ষুণ্ণ হবে।
'শত্রুদের সাথে মেডিকেল সাপ্লাই, বাহন ইত্যাদি তো
থাকবেই-অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। উল্লেখ করার কোন দরকার
নেই। পড়ে যাও! পড়ে যাও! দেখো না, তোমার পদোন্নতির

জন্যেও সুপারিশ করেছি আমি!'

পনেরো

অ্যানির প্রস্তাবে রাজি হলো প্রিন্স হাসান সালে, একটা আর্মারড
গাড়িতে করে বানুকে সারডি শহরে পাঠানো যেতে পারে। ওখানে
একটা ক্যাথলিক মিশন আছে, পরিচালক ভদ্রলোক জার্মান
ডাক্তার। বানুর পায়ের ক্ষত ঠিকভাবে সারছে না, পুঁজ কমা তো
দূরের কথা বরং বাড়ছে, ফোলাটাও যেন আগের চেয়ে বেড়েছে।
এ-সব লক্ষণ দেখে ভারি উদ্বিগ্ন বোধ করছে অ্যানি।

ন্যারো গেজ একটা রেললাইন আছে সারডি পর্যন্ত,
যানবাহনের জন্য আদিস আবাবা থেকে ফুয়েল এসে পৌঁছেছে
সেখানে। কয়েক ড্রাম ফুয়েল গাধা আর উটের পিঠে তুলে
গিরিখাদের খাড়া অংশ থেকে নীচে নামানো হয়েছে। এই মুহূর্তে
গিরিখাদের গোড়ায় ড্রামগুলো অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। ওখানে
দিক বদলেছে সারডি নদী, অ্যাকাইশা বনভূমির ভিতর দিয়ে
এগিয়ে নেমে গেছে ত্রিভুজ আকৃতির একটা উপত্যকায়।
মরুভূমিকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার আগে উপত্যকার মুখটা চওড়ায়
দাঁড়িয়েছে পনেরো মাইল। উপত্যকার মাথায়, শুকনো মাটিতে
শুকিয়ে গেছে নদীটা, ওখান থেকে শুরু হয়েছে তার পাতাল
অভিযান, অবশেষে আবার উদয় হয়েছে ওয়েলস অভ চান্ডির
ছড়ানো ছিটানো কুয়াগুলোয়।

অ্যানির কারে সারডি পর্যন্ত যাচ্ছে প্রিন্স সালে, কারণ ওখানেই
তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা গালা গোত্রের নূর আয়াঙের সঙ্গে।
দুই গোত্র এক হয়ে শিফটাদের আক্রমণ প্রতিহত করবে, গালাদের

সঙ্গে এ ধরনের একটা চুক্তি হয়ে গেলে উভয় পক্ষেরই লাভ। ওখানে যাবার আরও একটা কারণ রয়েছে প্রিন্সের। আদিস আবাবা থেকে সারডিতে একটা প্লেন পাঠানো হবে, যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য লেক টানায় যাবে প্রিন্স-সম্রাটকে বোঝানোর শেষ চেষ্টা করবে সে।

রওনা হবার আগে রানা আর মাইকেলের সঙ্গে নিভূতে আলাপ করল হাসান সালে। এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে তিনজন ওরা হাঁটছে, রাস্তাটা প্রায় খাড়াভাবে গিরিখাদের দিকে উঠে গেছে। পাথরের গা বেয়ে বিপুল বেগে নেমে আসছে সারডি নদীর জলরাশি।

ওদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রিন্স, মুখ তুলে রাস্তার মাথায় তাকাল। প্রথম খাড়া বাঁকটা পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা, পাশেই জলপ্রপাতের আকৃতি নিয়ে সগর্জনে নীচে নামছে নদী। রাস্তার উপর কুয়াশার মত ভাসছে জলকণা।

‘ঢালটা দেখলেই তো ভয় করে,’ বলল রানা। ‘গাড়ি নিয়ে অ্যানি উঠতে পারবে বলে মনে হয়?’

‘তোমরা গাড়িগুলো আনছ এই খবর যখন থেকে জানি, সেই থেকে আমার প্রায় এক হাজার লোক রাতদিন কাজ করছে এই রাস্তার ওপর,’ বলল প্রিন্স। ‘দুর্গম, তা ঠিক, তবে গাড়ি নিয়ে যেতে কোন সমস্যা হবে না।’

‘তোমার কথা যেন সত্যি হয়, চকলেট সালে,’ গম্ভীরমুখে বিড়বিড় করল মাইকেল। ‘পিছিয়ে এসে যে ফাঁদে আমরা ধরা পড়েছি তা থেকে বেরবার এই একটাই তো পথ দেখছি। শিফটারা যদি উপত্যকার প্রবেশপথটা বন্ধ করে দেয়...,’ হাত ইশারায় ওদের নীচে পাহাড় আর প্রান্তরগুলো দেখিয়ে কাঁধ বাঁকাল সে, কথাটা শেষ করবার প্রয়োজন বোধ করল না, তার বদলে দাঁত

দেখিয়ে প্রিন্সের মুখের উপর হাসল। ‘আমরা শুধু তিনজন রয়েছি এখানে, চকলেট, ওল্ড বয়। তোমার বক্তব্য শোনার জন্যে ভয়ানক উদগ্রীব হয়ে আছি। ঠিক কী চাও তুমি আমাদের কাছে? তোমার কী কী কাজ করতে হবে আমাদের? সি.আই.এ., মার্কিনা, ইটালিয়ান আর শিফটা-পাওনা টাকা পাবার আগে এতগুলো বাহিনীকে পরাজিত করতে হবে?’

‘না, সেভারস,’ বলল প্রিন্স। ‘আমি তো আগেই তোমাদের জানিয়েছি সব কথা। সেলাসি বাহিনী আর কমিউনিস্টদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে, এই যুদ্ধ আর শিফটাদের মাঝখানে রয়েছে আমরা। শিফটারা যাচ্ছে সেলাসি বাহিনীকে মদদ দেয়ার জন্যে, যাবার পথে আমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে যাবে-এটা তাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। কারণ প্রথম থেকেই ভাব দেখানো হচ্ছে, এটা নেহাতই শিফটাদের হামলা, যেমন প্রতিবছর হয়ে থাকে, গোত্র গোত্র কলহ বা দাঙ্গা,-উদ্দেশ্য দুনিয়ার লোক যাতে বুঝতে না পারে সম্রাটকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্যে বিদেশী কোন শক্তি সাহায্য করছে বা কমিউনিস্টদের মেরে সাফ করে দেয়া হচ্ছে।

‘সম্রাটের সাথে আমার কথা হবে, তবে লাভ কতটুকু হবে বলতে পারছি না। একটা কথা ঠিক, খালি হাতে ফিরব না আমি। হয় সম্রাট আমাকে সাহায্য করবেন, নয়তো কমিউনিস্ট গেরিলারা। এবার আসল সমস্যায় আসা যাক। শেষ পর্যন্ত, যতই না আমরা চেষ্টা করি, গিরিসংকট পেরিয়ে মালভূমি ও ডেসি আর আদিসের রাস্তায় পৌঁছুবেই শিফটারা, আমরা তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তবে দেরি করিয়ে দিতে পারব। দেরি করাতে হবে, কারণ এখনি বললেই তো আর আমি সম্রাট বা গেরিলাদের

সাহায্য পাচ্ছি না।’

‘কতদিন দেরি করাতে হবে?’ জিঞ্জিষ করল মাইকেল।

‘নির্ভর করছে সাহায্য নিয়ে ক’দিনের মধ্যে আমি ফিরতে পারব তার ওপর।’

‘চকলেট সালে, কাজের তুলনায় তুমি বেতন আমাদেরকে নেহাতই কম দিচ্ছ,’ অভিযোগ করল মাইকেল।

খ্রিস্ট ভাব দেখাল তার কথা শুনে পায়নি। তার পরবর্তী বক্তব্য ওদের মনোযোগ কেড়ে নিল। ‘আর্মারড কারগুলো এখানে আমরা গিরিখাদের সামনে খোলা গ্রাউন্ডে কাজে লাগাব, আর আমার বাবার ট্রুপস তোমাদের সাপোর্ট দেবে।’ থেমে নীচে তাকাল সে, বিশাল জায়গা জুড়ে অ্যাকাইশা গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে থাকা ক্যাম্পগুলোর দিকে তাকাল ওরাও। কামাল হাসানের বাহিনী সবাই এখনও পৌঁছতে পারেনি ওখানে, এখনও ওয়েলস অভ চালন্ডির কিনারা থেকে গোটা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বহু লোক, বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে বা মস্তুরগতি গাধা ও খচরার পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছে। তবে পদাতিক যোদ্ধারা একত্রিত হয়ে কয়েকটা ঝাঁক বেঁধেছে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে ঘোড়সওয়ার পদস্থ সর্দাররা। ‘গালারা যদি আমাদের সাথে হাত মেলায়, আমাদের বারো হাজারের সাথে যোদ্ধার সংখ্যা পাঁচ হাজার বাড়বে। স্কাউট পাঠিয়ে শিফটাদের সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছি—কমবেশি এক হাজার। জানি ওদের অস্ত্রশস্ত্র আধুনিক, তবু এখানে ওদেরকে আমরা বেশ কিছুদিন আটকে রাখতে পারব...।’

‘যদি না ওদের সংখ্যা আরও বাড়বে, বাড়বে ধরে নেয়াই ভাল,’ বলল মাইকেল। ‘কিংবা যদি না আমার পৌঁছায় ওদের হাতে, পৌঁছুবে ধরে নেয়াই ভাল, কী?’

www.BanglaBook.org

‘সেক্ষেত্রে গিরিখাদে পিছিয়ে যাব আমরা, পিছু হটার সময় ব্যারিকেড তুলব রাস্তায়, ভাল আড়াল পেলে দু’এক জায়গায় থেমে বাধা দেব ওদেরকে। যতক্ষণ না সারডিতে পৌঁছাই, আর্মারড কার আর ব্যবহার করতে পারব না। তবে ওদিকটায় পাহাড়ের পেটে খোলা জমি আছে, নড়াচড়ার প্রচুর জায়গা পাওয়া যাবে। ওটা শেষ একটা পয়েন্টও বটে, যেখানে শিফটাদের বাধা দেয়ার জন্যে জুতসই ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।’

খ্রিস্ট থামতেই এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। ওরা দেখল, আর্মারড কার গিরিখাদের গোড়ায় পৌঁছুল। ধীরগতিতে, সগর্জনে উঠে আসছে খাড়া ঢাল বেয়ে। রাস্তাটা সোজা উঠে আসেনি, পাথরের গায়ে চওড়া কার্নিস কোথাও কোথাও চুলের কাঁটার মত বাঁক নিয়েছে।

‘একটা কথা তোমাদেরকে না বললেই নয়,’ নিস্তব্ধতা ভাঙল খ্রিস্ট। ‘আমার বাবা আগের দিনের যোদ্ধা। ভয় কাকে বলে তিনি জানেন না। আধুনিক অস্ত্র সম্পর্কে তাঁর ভাল জানা নেই। বিশেষ করে একটা মেশিনগান পদাতিক বাহিনীর কী সর্বনাশ করতে পারে, তাঁর কোন ধারণা নেই। আমি আশা করব, তিনি অযৌক্তিক কোন সিদ্ধান্ত নিলে তোমরা তাঁকে ঠেকাবে।’

‘তাঁর ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারো,’ মুচকি হেসে বলল মাইকেল। ‘তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, ঠিকই সামলাতে পারব।’ নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে কথাগুলো বলল মাইকেল। মদ আর তাস, তার এই দুটো অস্ত্র খুব কম সময়ই হতাশ করে তাকে। সবাই তো আর মাসুদ রানার মত শক্ত মনের অধিকারী নয়। কামাল হাসান মদ খান না বটে, কিন্তু সেটা কোন বাধাই নয়। এরইমধ্যে মদ্যপানরত মাইকেলের সঙ্গে বসে

ঘন ঘন চাঁ পান করবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাঁর মধ্যে।
কারণটা সহজেই অনুমেয়।

গাড়িটা উঠে এল, সাদা গায়ে এখনও লাল ক্রস জ্বলজ্বল করছে। হ্যাচে অ্যানির মাথা দেখা গেল। নিশ্চয়ই গোসল করবার সুযোগ হয়েছে তার, সদ্য ধোয়া চকচকে চুল মাথার পিছনে সিঁক রিবনের সঙ্গে আটকানো। চুলের সোনালি রঙ রোদ লেগে সামান্য সাদাটে দেখাল, পাকা আপেলের মত গোলাপি আভা ফুটে রয়েছে মুখে। সঙ্গে সঙ্গে রানা আর মাইকেল দ্রুত সামনে বাড়ল, অ্যানির সঙ্গে কেউ কাউকে যেন মুহূর্তের জন্যও একা থাকতে দিতে রাজি নয়।

কিন্তু অ্যানি ব্যস্ত। বানুকে নিয়ে খুবই উদ্ভিগ্ন সে। নরম চামড়া আর কন্ডল দিয়ে ক্যাবের মেঝেতে একটা বিছানা তৈরি করা হয়েছে, তাতে শুয়ে রয়েছে বানু। দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিল অ্যানি, অল্প দু'একটা কাজের কথা বলল শুধু। পিছনের দরজা দিয়ে নিতম্বিনীর ভিতর ঢুকল প্রিন্স সালে, হ্যাচ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যানির মাথা।

খাড়া রাস্তা ধরে আবার রওনা হয়ে গেল আর্মারড কার। সামনে একদল ঘোড়সওয়ার রয়েছে, সবাই তারা প্রিন্সের দেহরক্ষী, চেহারা আর হাবভাব দেখে ওয়েস্টার্ন ছবির পিশাচতুল্য রেড ইন্ডিয়ান বলে মনে হয়। পাহাড়ী ঘোড়াগুলোর গা থেকে অ্যামুনিশন ভরা ব্যাগ, তরোয়াল, বর্শা আর রাইফেল ঝুলছে। তাদের পিছু নিয়ে নিতম্বিনীকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। তারপরও সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও।

টোঁট থেকে চুরট নামিয়ে কাঁধ দিয়ে রানার বাহুতে মৃদু একটা ধাক্কা দিল মাইকেল সেভারস। 'মনটাকে কাছাকাছি কোথাও ফিরিয়ে আনো, ওল্ড চ্যাপ,' ব্যঙ্গ ঝরল তার কণ্ঠে। 'ওটা এখন

তোমার শিফটাদের জন্যে দরকার হবে।'

গিরিখাদের গোড়া থেকে পাহাড় গভীর সমতল জমিটুকুর টোঁট পর্যন্ত দূরত্ব হবে মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ মাইল, কিন্তু রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উঠেছে পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত; কাজেই ওখানে, অর্থাৎ সারডি শহরে পৌঁছুতে ছ'ঘণ্টা গাড়ি চালাতে হলো অ্যানিকে।

প্রিন্সের শ্রমিক বাহিনী রাস্তার উপর এখনও কাজ করছে। ধুলো আর কাদা মেখে ভূতের মত হয়েছে তাদের চেহারা, সবার পরনে ঢোলা আলখেল্লা। পাথুরে কার্নিস যেখানে সর হয়ে আছে সেখান থেকে বোল্ডার সরিয়ে ফেলে দিচ্ছে নীচের গভীর খাদে, আবার কোথাও শাবল দিয়ে খুঁড়ে সমান করছে খানিকটা বিস্তৃতি। দু'জায়গায় কার্নিসের ঢাল এত খাড়া, অ্যানির নির্দেশে রশি দিয়ে বাঁধা হলো নিতম্বিনীকে, শ্রমিকরা ধীরে ধীরে টেনে তুলল ওটাকে, একশো গজ নীচে খরস্রোতা নদী টগবগ করে ফুটছে। কিনারা থেকে খসে পড়তে পড়তেও পড়ল না গাড়ি, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল।

বিকেলের দিকে আকাশ-ছোঁয়া পাথুরে প্রাচীরের আড়ালে পড়ে গেল সূর্য, গিরিখাদে নেমে এল গাঢ় ছায়া, ভারি আর্মারড কারের কন্ট্রোল সামলাতে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সঁাতসেঁতে একটা ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করে শিউরে উঠল অ্যানি। এঞ্জিনের মতিগতি বিশেষ সুবিধের নয়, ওটার আওয়াজে প্রায়ই কোন হৃদ বজায় থাকছে না, বিকট বিস্ফোরণের মত শব্দ তুলে ব্যাকফায়ার করছে মাঝে মধ্যে। আড়ষ্ট দুটো হাত আর পিঠের পেশীগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য একবার থামল অ্যানি, বানুর খবর নিতে গিয়ে দেখল জুরে পুড়ে যাচ্ছে তার গা। চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে, কালো চোখে

অদ্ভুত একটা চকচকে ভাব। বিশ্রামের কথা ভুলে গিয়ে আবার গাড়ি ছাড়ল অ্যানি।

সামনে এক সময় হঠাৎ সরু হতে শুরু করল গিরিখাদ, ফলে মাথার উপর আকাশ সরু নীল ফিতের আকৃতি পেল, দু'পাশের প্রাচীর যেন পাথুরে চোয়াল, হাঁ করে গিলতে চাইছে গাড়টাকে। প্রায় অসম্ভব বলে মনে হলেও, সামনের রাস্তা আরও খাড়াভাবে বাঁক নিয়েছে, ফলে বড় বড় কালো চাকাগুলো পিছলাতে শুরু করল ঘন ঘন, খসিয়ে দিল মুঠো আকৃতির পাথরের টুকরো-কামানের গোলা মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেগুলো, একেবারে কাছ থেকে যারা অনুসরণ করছে ছিটকে সরে যেতে হলো তাদেরকে।

তারপর অকস্মাৎ গাড়ি নিয়ে ঢালের মাথায় উঠে এল অ্যানি, খিলান আকৃতির পাথুরে প্রবেশপথ থেকে বেরতেই সামনে দেখা গেল চওড়া আর খোলা সমতল মাঠ, চারদিকে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়প্রাচীরগুলো বিশ মাইল দূরে। স্থানীয় লোকেরা পাহাড়ের ভিতর এই ফাঁকা জায়গাটাকে প্রকৃতির গর্ভ বলে। কোথাও কোথাও চাষাবাদও করা হয়েছে, গাছের পাতা আর বাঁশ দিয়ে তৈরি কৃষকদের গোলাকার কুঁড়েঘর রয়েছে অনেকগুলো। সারডি নদীর কিনারায় প্রচুর ঘাস জন্মেছে, ছাগল আর গরু চরছে সেদিকে।

ইন্টার তৈরি সাদা চুনকাম করা বেশ কিছু বাড়িঘর নিয়ে শহর, প্রতিটি বাড়ির ছাদ গ্যালভানাইজড করো গেটেড টিন দিয়ে ছাওয়া। পশ্চিম গিরিখাদের ভিতর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ছাদে, রূপোর মত জ্বলছে সেগুলো।

শুধু পশ্চিমেই পিছন দিকে কাত হয়ে রয়েছে পাহাড়গুলো, একটানা দু'হাজার ফুট উঠে গেছে ঢাল, তেমন খাড়া নয়, মিলিত হয়েছে হাইল্যান্ডের সমতল মালভূমির সঙ্গে। লূপ আকৃতির

অসংখ্য বাঁক নিয়ে সরু ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে রেলওয়ে লাইনটা। সমতল মাঠের এক জায়গায় অনেকগুলো দোচালা আর খোঁয়াড়ের মাঝখানে এসে থেমেছে।

শহরের আরও সামনে, পশ্চিম ঢালের উপর ক্যাথলিক মিশনটা। ওটাও ইন্টার তৈরি একটা বাড়ি, মাথায় টিনের ছাদ। চার্চটাই একমাত্র বাড়ি, যেটায় সদ্য চুনকাম করা হয়েছে। খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকবার সময় অ্যানি দেখল, শক্ত কাঠের বেধিগুলো খালি পড়ে রয়েছে, তবে বেদির উপর মোমবাতি জ্বলছে, ফুলদানিতে তাজা ফুলও দেখা গেল।

বারান্দায় প্রায় পঞ্চাশজন লোক মেঝের উপর উবু হয়ে বসে রয়েছে, এরা সবাই চিকিৎসা পাবার জন্য এসেছে এখানে। তাদের নীচে গাড়ি থামাল অ্যানি, কেউ তেমন আগ্রহ নিয়ে তাকাল না।

ডাক্তার ভদ্রলোক মোটাসোটা, বয়স ষাটের কম হবে না। কাঁচাপাকা চুল ছোট করে ছাঁটা, গৌফ নেই, ম্লান নীল চোখ। তিনি ইংরেজি জানেন না, ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানির দিকে তাকিয়ে ছোট করে শুধু মাথা ঝাঁকালেন, তারপর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বানুকে নিয়ে। ডাক্তারের দু'জন সহকারী স্ট্রেচারে তুলল বানুকে, বারান্দায় নিয়ে এসে নামাল। পিছু নিতে যাচ্ছিল অ্যানি, তাকে বাধা দিল প্রিন্স সালে।

‘ভাল লোকের হাতে পড়েছে বানু, আর কোন চিন্তা নেই—এদিকে আমাদেরও তো কাজ আছে।’

রেল স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল টেলিগ্রাফ অফিসে তালা ঝুলছে, তবে প্রিন্সের চেষ্টামেচি শুনে লাইন ধরে কোথেকে যেন ছুটে এল স্টেশন মাস্টার, দেখবার সঙ্গে সঙ্গে হাসান সালেকে চিনতে পারল সে।

অ্যানির রিপোর্টটা দীর্ঘ, টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সেটা পাঠানো স্টেশন মাস্টারের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। এর আগে যে সব মেসেজ পাঠিয়েছে সে, কোনটারই শব্দ সংখ্যা দশ-বারোটার বেশি ছিল না। অনেক শব্দই সে বুঝল না, ঘন ঘন মাথা চুলকাল, বিড়বিড় করল সারাক্ষণ, ভুরুটা স্থায়ীভাবে কুঁচকে থাকল। তার পাশে দাঁড়িয়ে উদ্বেগের সঙ্গে ভাবল অ্যানি, নিউ ইয়র্কে তার সম্পাদকের ডেস্কে না জানি কী এলোমেলো চেহারা নিয়ে পৌঁছুবে রিপোর্টটা।

ওকে টেলিগ্রাফ অফিসে রেখে দেহরক্ষীদের সঙ্গে সরকারী বাসভবনে চলে গেছে প্রিন্স সালে। শহরের এক প্রান্তে সেটা। রিপোর্ট পাঠানো শেষ করতে রাত ন’টা বেজে গেল, ইতিমধ্যে পায়চারি করতে করতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে অ্যানির। পাঁচ হাজার শব্দের রিপোর্ট, স্টেশন মাস্টারকে দোষ দিতে পারল না সে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল পাহাড়ী রাত আলকাতরার মত কালো।

আকাশে কোন তারা নেই, হেডলাইট জ্বলে শহরের ভিতর দিয়ে সরকারী ভবন খুঁজতে বেরল অ্যানি। প্রিন্সের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ নেওয়া ছিল, খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। বেশ বড় একটা বাড়ি, বারান্দাটা লম্বা আর চওড়া, চুনকাম করা দেয়াল আর টিনের ছাদ। বাড়িটার চারদিকে ঘন গাছপালা, অন্ধকার ডাল থেকে ডানা ঝাপটে বাদুড় উড়ে যাওয়ার শব্দ পেল অ্যানি। উঠনের একধারে গাড়ি থামাল সে, গাড়ির চারদিকে অন্ধকারের ভিতর অনেকগুলো ছায়ামূর্তি দেখতে পেল, সবাই সশস্ত্র ও সতর্ক। এরা যে প্রিন্সের দেহরক্ষী নয়, দেখবার সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়েছে অ্যানি। না, রাসট্যাফারিয়ান বা হারারি গোত্রের লোক নয় এরা।

উঠনে অনেক ঘোড়াও রয়েছে। ঝোপ-ঝাড়ের ওদিক থেকে

নারীকণ্ঠ আর শিশুদের গলাও ভেসে এল। বিশাল এলাকা জুড়ে বাড়ি আসলে একটা নয়, অনেকগুলো-এঞ্জিন বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বহু লোকের ভারি একটা গুঞ্জন ঘিরে ধরল অ্যানিকে। একটু ভয় ভয় লাগল ওর। এত লোক কোথেকে এল!

গাড়ি থেকে বেরল সে, সামনে ভিড় অথচ অন্ধকারে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। সাবধানে এগোল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু’পাশে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল লোকগুলো। বারান্দায় উঠে এল অ্যানি।

বারান্দায় কোন আলো নেই, তবু বোঝা যায় লোক গিজগিজ করছে। সামনের ঘরটায় ঢুকল অ্যানি, ভিতরে প্যারামিন ল্যাম্প জ্বলছে, প্রতিটি ল্যাম্প থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে হু-হু করে। ঘরের ভিতর পুরুষমানুষের ঘাম, তামাক, রান্না করা মাংস আর মশলা ও তেজের গন্ধ।

অ্যানি ঢুকতেই বিপজ্জনক একটা নিশ্চিন্ততা নেমে এল কামরার ভিতর, দোরগোড়ায় অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চোখে নগ্ন সন্দেহ আর মারমুখো ভাব নিয়ে বহুলোক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এই সময় কামরার একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে সিঁধে হলো প্রিন্স সালে।

‘মিস উইসপার,’ বলে ভিড় ঠেলে হন হন করে এগিয়ে এল সে, অ্যানির সামনে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরল। ‘তোমার কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছিল। রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে?’ আবার ভিড় ঠেলে নিজের জায়গায় নিয়ে এল তাকে সে, পাশে বসাল, তারপর হাত-ইশারায় সামনে বসা লোকটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ‘গালা গোত্রের প্রধান ও, নূর আয়াঙ গালা।’

ক্লান্ত আর খানিকটা সন্তুষ্ট হলেও, লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল অ্যানি। উঠনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে দেখে যেমন ভয় ভয়

লেগেছিল, এই লোকটাকে দেখেও সেই ভাবটা ফিরে এল মনে। লোকটার চেহারা উৎকট শত্রুতার ভাব ফুটে আছে, লুকিয়ে বা চেপে রাখবার কোন চেষ্টা নেই। সরীসৃপের মত ঠাণ্ডা চোখ, বড়বড় হলেও নেশাশস্তের মত তুলুতুলু, অপলক। প্রথম দর্শনেই লোকটাকে নীচ, ইতর আর নির্দয় বলে মনে হলো অ্যানির। সেজন্য অবশ্য নিজেকে মনে মনে তিরস্কারও করল সে। কারও সম্পর্কে না জেনেই কোন সিদ্ধান্তে আসা কি উচিত?

লোকটার বয়স বেশি নয়, তিরিশের কোঠা এখনও পেরোয়নি। তবে হয় রোগ নয়তো লাম্পটের কারণে তার মুখ আর শরীর কেমন যেন চুপসে আছে, গায়ের চামড়ার নীচে মাংস যেন নরম কাদা। চামড়ার রঙও অনুজ্জ্বল সাদাটে, লোকটা যেন কখনও রোদে বোরোয়নি। ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক ফোলা, কাঁচা মাংসের মত লালচে, ত্বকের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

লোকটার দৃষ্টি একদম সহ্য করতে পারল না অ্যানি। ভব্যতার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। নিজের কুৎসিত ভাব সে গোপন রাখতে অভ্যস্ত নয়। শুধু যে অ্যানির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘন ঘন দৃষ্টি বুলাল তাই নয়, বুকের উপর আর তলপেটের নীচের দিকে একদৃষ্টে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে থাকল। ঘৃণায় রি-রি করে উঠল অ্যানির সারা শরীর। প্রচণ্ড রাগের মধ্যে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করল সে। ওকে এমন নির্লজ্জের মত দেখছে বটে নূর আয়াঙ গালা, কিন্তু তার চেহারা হাঙ্গামা বা প্রশংসার ভাব বিন্দুমাত্র ফুটল না। এমন ভাবলেশহীন চেহারা কল্পনাও করা যায় না।

খক করে একবার কাশল প্রিন্স, তারপরও দীর্ঘ এক মিনিট অ্যানির উপর চোখ বুলাল নূর আয়াঙ গালা। অবশেষে হাসান সালের দিকে ফিরল সে, হরিণের শিং দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড পাইপটা লালচে ঠোঁটে তুলে ঘন ঘন টান দিল, কটুগন্ধী তামাকের ধোঁয়ায়

জায়গাটা ভরে গেল। গন্ধটাই অ্যানিকে বলে দিল লোকটার চেহারা এমন চুপসে আছে কেন। মারিছ্যানা খাচ্ছে সে।

‘সারাদিন তোমার কিছু খাওয়া হয়নি,’ বলল প্রিন্স, চাকর-বাকরদের ডেকে খাবার পরিবেশন করবার নির্দেশ দিল সে। ‘আমাদের ক্ষমা করতে হবে, মিস উইসপার,’ অ্যানির দিকে ফিরে আবার বলল সে। ‘নূর আয়াঙ ইংরেজি বোঝে না, তা ছাড়া আমাদের আলোচনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে—খেয়ে নিয়ে তুমি নিজের ঘরে চলে যাও, তোমার ঘুম দরকার।’

‘কোথায় শোব আমি?’ একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

‘তোমার জন্যে একটা কামরা ঠিক করা হয়েছে, কোন ভয় নেই,’ অ্যানির মনের ভাব বুঝতে পেরে আশ্বস্ত করল প্রিন্স। ‘আমাদের আলোচনা সারারাত ধরে চলবে,’ ক্ষীণ হাসল সে। ‘কথা হবে প্রচুর, সিদ্ধান্ত হবে কিনা বলা মুশকিল—শত বছরের শত্রুতা ভুলে রাতারাতি এক হওয়া সহজ কথা নয়।’ নূর আয়াঙের দিকে ফিরল সে।

গরম, মশলাবহুল খাবার অ্যানির পেটের ফাঁপা আর ঠাণ্ডা খাদ ভরে তুলল, সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিল এক গ্লাস তরল আগুন অর্থাৎ তেজ। সাহস ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকসুলভ কৌতূহল পেয়ে বসল তাকে। নিজের চারদিকে কী ঘটছে জানবার আগ্রহে উঠবার নামটিও মুখে আনল না।

পালা করে কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে। নূর আয়াঙ যখন কথা বলছে, তার শুধু ঠোঁট নড়তে দেখল অ্যানি। শরীর স্থির, হাত অনড়, চোখ অপলক। থেমে থেমে কথা বলল সে, প্রচণ্ড ঝাঁঝের সঙ্গে, মাঝে মধ্যে দু’একটা শব্দ বারবার উচ্চারণ করল, দু’একটা

শব্দ বেরিয়ে এল বিস্ফোরণের মত সগর্জনে। আর প্রিন্স কথা বলল ঠাণ্ডা, মৃদু স্বরে। মাঝে মধ্যে হাত নাড়ল সে, ভুরু কপালে তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দু'চার সেকেন্ড করে বিরতি নিল, কিন্তু নূর আয়াঙ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় শুরু করল আবার।

নূর আয়াঙের দু'পাশে বসে আছে দুই যুবতী গালা। কালো, তবে চেহারায় লাভণ্য আছে। চুলে বোধহয় কখনও চিরুনি পড়েনি, জটা পড়ে গেছে। মেয়েগুলোর চোখ অস্বাভাবিক সরু, এবং আড়চোখে তাকানোর প্রবণতা ভারি অস্বস্তিকর। চেহারায় কোন ভাব নেই, শান্ত পুতুলের মত বসে আছে তারা। অন্যমনস্কভাবে দু'জনের যে-কোন একজনকে আদর করছে নূর আয়াঙ-অনেকটা প্রিয় কুকুরের গায়ে হাত বুলানোর ঢঙে। মাঝখানে একবার অসভ্যতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেল নূর আয়াঙের আচরণ-একটা মেয়ের ব্লাউজের ভিতর হাত গলিয়ে চাপ দিল সে। মেয়েটা ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, ব্যথা পেয়ে একবার শুধু গাল কৌঁচকাল, তা ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার, এমনকী নূর আয়াঙের দিকে তাকালও না, ব্লাউজের ভিতর থেকে তার হাতটা সরিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করল না। গা ঘিন ঘিন করে উঠল অ্যানির, কারণ মেয়েটার ব্লাউজে ভিজে দাগ ফুটে উঠেছে। বোঝা গেল, দুধে ভরে আছে মেয়েটার বুক।

ক্লান্তিহীন সুস্থ থাকবার অনুভূতিটা দ্রুত হারিয়ে ফেলছে অ্যানি। মাথাটা একটু একটু ব্যথা করতে শুরু করছে। ধোঁয়ায় জ্বালা করছে চোখ। দুর্বোধ্য অ্যামহারিক ভাষার একঘেয়ে কথাবার্তা নার্ভের উপর হাতুড়ির বাড়ি মারতে শুরু করল। প্রিন্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়বে বলে ভাবছে, এই সময় কামরার বাইরে কীসের একটা গোলমাল শুরু হলো। প্রচণ্ড ঘৃণা আর আক্রোশের সঙ্গে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ চিৎকার করছে। কামরার

ভিতর কী এক প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠল লোকগুলো, ঝট করে মুখ তুলে ঝগড়াটে গলায় কিছু বলল নূর আয়াঙ।

দু'জন সশস্ত্র গালা এক যুবককে ধরে নিয়ে এল কামরার ভিতর। যুবকের বয়স আঠারো কি উনিশ হবে। তাড়াহুড়ো করে কামরার মাঝখানটা, নূর আয়াঙের সামনে, খালি করা হলো। রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে যুবকের হাত দুটো, কজির চামড়া কেটে ভিতরে ঢুকে গেছে রশি। চরম আতংকে দর দর করে ঘামছে সে, কোটরের ভিতর ছটফট করছে চোখের মণি।

যুবকের পিছু পিছু এল এক বুড়ি, তারস্বরে অবিরাম চিৎকার করছে। তার বয়স আন্দাজ করা অসম্ভব ব্যাপার। সব চুল সাদা হয়ে গেছে, মাড়িতে একটাও দাঁত নেই, দু'পায়ে দাঁড়ানো বাঁদরের মত শরীর, কোমরের কাছে পিছনটা অদ্ভুতভাবে বাঁকা। বার বার বুড়ি লাফ দিয়ে যুবকের মুখ খামচানোর চেষ্টা করল। তার হাত হাড়িডসার, শিরাগুলো ফুলে আছে, প্রতিটি আঙুলে নোংরা নখ এক দেড় ইঞ্চি করে লম্বা। চিৎকার করবার সময় মুখ হাঁ করছে সে, ভিতরটা কুচকুচে কালো আর পিচ্ছিল। তার প্রতিটি হামলা অনায়াসে, সহাস্যে, ব্যর্থ করে দিল সশস্ত্র প্রহরীরা, ঘন ঘন হাত ঝাপটা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখল বুড়িকে।

সামনের দিকে ঝুঁকে আগ্রহের সঙ্গে দৃশ্যটা উপভোগ করছে নূর আয়াঙ গালা, কী এক প্রত্যাশায় চকচক করছে তার চোখ। এতক্ষণে মাত্র একটা প্রশ্ন করল সে।

জবাবে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল বুড়ি তার সামনে। ফাঁকা জায়গাটায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করল সে। নিজের মাথার সাদা চুল ছিঁড়ছে, দাঁতহীন মাড়ির সাহায্যে হাত কামড়াচ্ছে, চড় মারছে নিজের গালে, আর এ-সবের সঙ্গে সমানে চলেছে আতঁচিৎকার।

স্তব্ধ বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেও, হঠাৎ করে অ্যানি উপলব্ধি করল, বুড়ি আসলে নূর আয়াঙের কাছে কিছু একটা চেয়ে আবেদন করছে।

নূর আয়াঙ সিধে হলো। তারমানে প্রত্যাখ্যান করল সে।

ব্যস, পাগল হয়ে গেল বুড়ি। প্রথমে সে আরও দ্রুতবেগে গড়াগড়ি খেলো নূর আয়াঙের পায়ের সামনে, ফলে তার পরনের ঢোলা আলখেল্লা উরুর উপর উঠে গেল। ফড়ফড় করে ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেলল সে, শেষ একটা গড়ান দিয়ে চলে এল নূর আয়াঙের পায়ের উপর। পালা করে গালা প্রধানের পায়ে চুমো খেলো আর মাথা ঠুকল। হেসে উঠে বুড়ির পেটে লাথি মারল নূর আয়াঙ, দূরে ছিটকে পড়ল বুড়ির হালকা শরীর, নূর আয়াঙের চোখে নেচে উঠল অশুভ একটা আলো।

দাঁড়াল বুড়ি, আবার ডাইভ দিয়ে পড়ল নূর আয়াঙের পায়ের সামনে। বারবার একই দৃশ্য-লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ে বুড়ি, আবার ফিরে এসে নূর আয়াঙের পায়ে মাথা ঠোকে। মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করল গালা প্রধান, জবাব এল কখনও গার্ডদের কাছ থেকে, কখনও বুড়ির কাছ থেকে।

‘মিস উইসপার,’ বিড়বিড় করে বলল প্রিন্স। ‘আমার পরামর্শ যদি শোনো, এখুনি তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এরপর যা ঘটবে তা তুমি দেখে সহ্য করতে পারবে না।’

‘কেন, কী ব্যাপার?’ দ্রুত জানতে চাইল অ্যানি, তার ভিতর সাংবাদিকসুলভ আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ‘কী করছে ওরা?’

‘বুড়ির অভিযোগ, যুবক তার ছেলেকে খুন করেছে। গার্ড দু'জন ঘটনার সাক্ষী। আর নূর আয়াঙ বিচার করবে। এখুনি রায় দেবে সে। শাস্তিও দেয়া হবে সাথে সাথে।’

‘এখানে?’ হতচকিত দেখাল অ্যানিকে।

‘হ্যাঁ, মিস উইসপার। আমি অনুরোধ করছি, তুমি চলে যাও। গালাদের প্রধান মুসলমান হলেও, ওরা বেশিরভাগই খ্রীস্টান-বুড়ি আর যুবকও তাই। কাজেই এ ধরনের অপরাধের শাস্তি বাইবেলে যা লেখা আছে তাই হবে-ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে রায় নেবে নূর আয়াঙ। ব্যাপারটা হবে দাঁতের বদলে দাঁত।’

প্রিন্সের পরামর্শ মেনে নিতে ইতস্তত করল অ্যানি। সম্ভাব্য সবরকম অভিজ্ঞতাই একজন সাংবাদিকের থাকা দরকার, তা সে যতই না কেন ভীতিকর বা বীভৎস হোক। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আর সময় পাওয়া গেল না।

হাসতে হাসতে বুড়ির উন্মুক্ত বুকে একটা লাথি মেরে তাকে দূরে সরিয়ে দিল নূর আয়াঙ, অভিযুক্ত যুবককে ধরে থাকা গার্ডদের কী যেন একটা নির্দেশ দিল সে। রায় শুনে অকস্মাৎ বোবা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল বুড়ি। মনের আশা পূরণ হওয়ায় আনন্দে কী করবে ঠাহর করতে পারল না। উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল সে, জরাগ্রস্ত মুখে কুৎসিত হাসি। তারপর রোমহর্ষক একটা চিৎকার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না, অগত্যা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল যুবকের দিকে। গার্ডরা আবার তাকে হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিল, যুবকের গা থেকে সব কাপড় ঘন ঘন হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে তারা। দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়ল যুবক, শুধু হাত দুটো এক করে বাঁধা রয়েছে।

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর এত লোক ঢুকেছে যে তিল ধারণেরও জায়গা নেই। সব ক'টা দরজা আর জানালায় উপচে পড়ছে মানুষের মাথা। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে লোকজন, চিৎকার করে কথা বলছে। এমনকী ভাবলেশহীন দুই যুবতী গালা, নূর আয়াঙের

পাশে যারা বসে আছে, তারাও যেন কীসের প্রতীক্ষায় ছটফট করছে। পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে কথা বলছে তারা, চুপিচুপি হাসছে, সরু চোখে নগ্ন উল্লাস।

অভিযুক্ত যুবক নরম গলায় ফোঁপাচ্ছে। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাল সে, যেন পালানোর পথ খুঁজল। তার নগ্ন শরীরে ফুটে রয়েছে সুগঠিত পেশী, ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে মধু-রঙা ত্বক, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। তার উপর থেকে দৃষ্টি ছিঁড়ে আনবার চেষ্টা করল অ্যানি, কিন্তু পারল না, সম্মোহিতের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

বন্দীর সামনে বারবার লাফ দিল বুড়ি, হুপ হুপ আওয়াজ করল, কখনও বসে কখনও দাঁড়িয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে উপভোগ করল অসহায় শিকারের প্রতিক্রিয়া। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, সে-ও তেমনি সন্তানের হত্যাকারীকে নিয়ে খেলছে। যুবকের মুখে থুথু ছিটাল সে, তার দিকে পিছন ফিরে কাপড় তুলে নিতম্ব নাচাল। যুবকের নাকের পাশে পড়া থুথু গড়াতে গড়াতে নেমে এল উদ্যম বৃকে, ঘন কালো চুলের উপর।

‘প্লিজ, মিস উইসপার! এবার তুমি যাও! প্লিজ!’ আবেদন জানাল প্রিন্স।

দাঁড়াবার চেষ্টা করল অ্যানি, কিন্তু পা নড়ল না। চোখের সামনে যা ঘটছে তা বাস্তব বা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না, আরও অবিশ্বাস্য লাগল তার নিজের উপস্থিতি।

অ্যানির উল্টোদিকে বসা গালা যোদ্ধাদের একজন কোমরের ঝোলা থেকে হাতড়ে একটা ড্যাগার বের করল। খাপ থেকে মুক্ত করবার পর দেখা গেল ফলাটা সরু আর হাতলটা বুনো ঝাঁড়ের শিং থেকে টেঁছে তৈরি করা হয়েছে, বাঁধা হয়েছে তার দিয়ে। ফলার মাথা সামান্য একটু বাঁকা আর অসম্ভব ধারাল, লম্বায় প্রায় এক

হাত। বুড়ির দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্য চিৎকার করল সে, তারপর ড্যাগারটা মেঝের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

বুড়ির পায়ের কাছে স্থির হলো ড্যাগার। আনন্দের আতিশয্যে আবার বোবা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল সে। তারপর গায়ে কাঁটা দেওয়া একটা চিৎকার ছেড়ে তুলে নিল সেটা।

ড্যাগার উঁচিয়ে যুবকের দিকে ছুটে গেল ডাইনি বুড়ি। কোপ মারল, কিন্তু না, শুধু ভয় দেখাল-যুবকের বগলের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল চকচকে ফলা। এভাবে বারবার যুবকের শরীরের বিভিন্ন অংশে লক্ষ্যস্থির করল সে, ছুটে গেল, কোপ মারবার ভঙ্গি করল, কিন্তু লাগাল না। সারাক্ষণ হাসছে সে, ঠোঁটের দুই কোণ থেকে লালা গড়াচ্ছে। প্রতিবার ছুটে যাওয়ার সময় দর্শকরা একযোগে চৈচিয়ে উৎসাহ দিল তাকে।

প্রহরীরা এখনও শক্ত করে ধরে আছে যুবককে। ছাড়া পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় মোচড় খাচ্ছে সে। ওদের তিনজনেরই দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে বুড়ির হাতে ধরা ড্যাগারের উপর।

আবার আগের মতই ড্যাগার উঁচিয়ে ছুটে এল বুড়ি। এবার যুবকের হৃৎপিণ্ড বরাবর লক্ষ্যস্থির করেছে সে। কোপ মারল, সত্যি মারল, কিন্তু বুড়ির গায়ে জোর কম বলে ভিতরে খুব একটা ঢুকল না ফলা, হাড়ে লেগে পিছলে স্থানচ্যুত হলো।

যুবকের পাঁজরের কয়েকটা সাদা হাড় বেরিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে হাড়গুলো লাল তাজা রক্তে ঢাকা পড়ে গেল। উল্লাসে মুখর হয়ে উঠল গালারা। যুবকের উদ্দেশ্যে কুকুর আর বিড়ালের ডাক ছাড়ল তারা। শিস দিল কেউ কেউ। মানুষ নয়, আক্ষরিক অর্থেই ওরা যেন একদল পশু।

বারবার চেষ্টা করল বুড়ি। আর একবারও সে মিথ্যে ভান

করছে না। দুই প্রহরীর মাঝখানে হাত বাঁধা যুবক ধস্তাধস্তি করছে, আর অটুত্বসিতে ফেটে পড়ছে প্রহরীরা। ইতিমধ্যে বুড়ির ড্যাগার ধরা গোটা হাত আর মুখ রক্তে ভিজে গেছে। ড্যাগারের ডগা হৃৎপিণ্ড ভেদ করতে পারছে না দেখে আক্রোশ বাড়ছে বুড়ির, রাগের সঙ্গে আরও জোরে ড্যাগার চালান সে, কিন্তু আগের মত হৃৎপিণ্ডের চার ধারে শুধু গভীর অগভীর দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হলো, বুক ভেদ করতে পারল না।

বুকে ঢোকাতে না পেরে এবার বুড়ি যুবকের মুখের দিকে মন দিল। প্রথম কোপে যুবকের নাক আর উপরের ঠোঁট দু'ফাঁক হয়ে গেল। পরবর্তী কোপ চিরে দিল একটা চোখ, কোটরটা এক নিমেষে হয়ে উঠল গাঢ় রক্ত ভরা গর্ত। প্রহরীরা ছেড়ে দিতেই মেঝেতে পড়ে গেল যুবক।

সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে তার বুকে চেপে বসল বুড়ি, ঠিক যেন একটা কালো ভ্যাম্পায়ার। বুকে বসে যুবকের গলা কাটতে চেষ্টা করল সে। করাতের মত ড্যাগার চালান কণ্ঠনালীর উপর। অবশেষে এক সময় ক্যারটিড ধমনী বিস্ফোরিত হলো, লাফিয়ে বেরিয়ে এল রক্তের মোটা ধারা, ভিজে একাকার হয়ে গেল বুড়ির কালো আলখেল্লা আর চারদিকের মেঝে, সেই পিচ্ছিল মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল শিকার আর শিকারী, দর্শকরা উন্মত্ত উল্লাসে নাচতে শুরু করল।

এতক্ষণে নড়ে উঠল অ্যানি উইসপার। ছেড়ে দেওয়া স্প্রিংয়ের মত সিঁধে হলো সে, মানুষের নিরেট পাঁচিল ফুটো করে দরজার দিকে ছুটল। প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে কীভাবে সে বেরিয়ে এল, বলতে পারবে না। রাতের অন্ধকার, ঠাণ্ডা উঠনে নেমে হাঁপাতে লাগল সে, যেন পাঁচ মাইল দৌড়ে এসেছে। বুঝতে পারছে ঘামে ভিজে গেছে তার ব্লাউজ, বমিটা গলায় উঠে আটকে আছে। একটা গাছের গায়ে

হেলান দিয়ে কেঁদে ফেলল সে। ধীরে ধীরে বসে পড়ল গাছের গোড়ায়। তারপর বমি করল।

বমি করবার পরও কয়েক ঘণ্টা কষ্ট পেল অ্যানি, আতংকটা কোনমতে ছাড়ল না তাকে, চোখে ঘুম আসতে দিল না। তার জন্য বরাদ্দ করা ঘরে একা শুয়ে থাকল সে, ড্রাম পেটানোর আওয়াজ আর গালাদের কর্কশ গলার একঘেয়ে গান শুনল। আর খানিক পরপর শিউরে উঠল।

*

ঘুম এল এক সময়, কিন্তু একটু পরই ছারপোকাকার কামড়ে জেগে উঠল অ্যানি। গা-হাত চুলকাতে গিয়ে দেখল, চামড়া ফুলে গেছে। বাকি রাতটা নিতম্বিনীর ভিতর কুঁকড়ে বসে থেকে কাটিয়ে দিল সে। গাড়ির হ্যাচ আর তলা দিয়ে ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাস ঢুকে কাঁপিয়ে দিল ওকে। গায়ে চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে কখন ভোর হবে তার আশায় বসে থাকল সে।

ভোরের প্রথম আলো ফুটতে ইমার্জেন্সী রেশন ব্যাগ থেকে রান্না করা শুকনো মাংস আর বিয়ার বের করে খেলো অ্যানি। পশ্চিম খাদের ঢাল বেয়ে রওনা হলো গাড়ি, বানুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে। ওখানে পৌঁছে রাতের আতংক সামান্য হলেও ছেড়ে গেল তাকে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, জার্মান ডাক্তারের চিকিৎসায় এরইমধ্যে সুফল ফলতে শুরু করেছে, বানুর ক্ষতটা আগের মত ভীতিকর লাগল না। তবে এখনও দুর্বল সে, যদিও জ্বর ছেড়ে গেছে। রীতিমত উৎফুল্ল দেখাল তাকে, অ্যানিকে বাস্তব জ্ঞান দান করবার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

লম্বা একটা দোচালার ভিতর অনেকগুলো লোহার বেড, নারী-

পুরুষ সব ধরনের রোগী রয়েছে আশপাশে। চারদিকে কাশি আর যন্ত্রণার শব্দ। বেডের কিনারায় বসে বানুর একটা হাত ধরে রয়েছে অ্যানি, কাল রাতের দুঃস্বপ্নটার বর্ণনা দিয়ে হালকা করছে মন।

‘নূর আয়াঙ,’ অ্যানি থামতে ঘণার সঙ্গে উচ্চারণ করল বানু, ‘একটা মড়াথেকো। গাভীগুলো তার সাথে ছিল, তাই না?’

গাভী? বুঝতে পারল না অ্যানি। তারপর তার মনে পড়ল দুই যুবতীর কথা। ‘কেন, ওদের তুমি...?’

বানু বলল, ‘বুক ভরা দুধ আছে এমন যুবতী মায়েদের খুঁজে বের করার জন্যে নূর আয়াঙের লোকেরা পাহাড় চষে বেড়ায়।’ বমি করবার ভাব দেখাল সে, নাটকীয় ভঙ্গিতে শিউরে উঠল। ‘ও একটা পশু, অ্যানি। তার প্রজারাও জানোয়ার। সেই রাজা সলোমনের যুগ থেকে ওরা আমাদের শত্রু। ওদের সাথে হাত মেলাতে হচ্ছে আমাদের, সত্যি এরচেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না।’ এরপর সে তার সুভাবসুলভ নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রসঙ্গ বদল করল। ‘আজও কি তুমি খাদ বেয়ে নামবে ওখানে?’

‘হ্যাঁ।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বানু। ‘ডাক্তার বলেছেন, তোমার সাথে আমি যেতে পারব না। আরও বেশ ক’টা দিন।’

‘তুমি সুস্থ হও, তোমাকে আমিই এসে নিয়ে যাব,’ বলল অ্যানি।

‘আরে না, তার দরকার কী,’ বলল বানু। ‘ঘোড়ার পিঠে আরাম বেশি, শর্টকাট রাস্তাটাও ব্যবহার করা যাবে। চিন্তা কোরো না, খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের মাঝখানে দেখতে পাবে আমাকে। তবে ইতিমধ্যে একটা কাজ করো, ভাই-আমার পক্ষ থেকে গভীর ভালবাসা জানিয়ো আব্বাসকে। তাকে বলবে, তার জন্যে আমার হৃদয় ফোঁপাচ্ছে। বলবে, কল্পনায় আমার কাছে তাকে আসতে

হয়। সে এলে কী ঘটে...তাকে কল্পনা করে নিতে বলো। আরও বলবে, আমার চিন্তায়-চেতনায় তার হাঁটার শব্দ পাই আমি।’

হাসি চেপে গম্ভীর হলো অ্যানি। ‘ঠিক আছে, বলব।’

এই সময় দীর্ঘদেহী এক যুবক ঢুকল দোচালায়। তার বয়স হবে বিশ কি বাইশ, পরনে বাদামি জ্যাকেট। অত্যন্ত সুদর্শন, চলাফেরায় স্মার্ট একটা ভাব। সোজা ওদের দিকে এগিয়ে এল সে।

এক নিমেষে বদলে গেল বানু। ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখ আধবোজা করে গোঙাতে লাগল সে। যুবক এগিয়ে এসে অ্যামহারিক ভাষায় সান্ত্বনা দিল বানুকে, তার জ্বর আর পালস্ রেট দেখল।

যুবক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল বানু। চাপা হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠল তার শরীর। অ্যানির মাথাটা ধরে নীচের দিকে টানল সে, কানে কানে বলল, ‘ঠিক পাহাড়ী ভোরের মত সুন্দর ও, তাই না? ডাক্তারী পড়ছে, কিছু দিনের মধ্যে বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে যাবে। কাল রাত থেকে আমার প্রেমে পড়েছে ও। আমার পায়ের ব্যথা একটু কমলেই ওকে আমি প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করব।’ অ্যানির চেহারায় স্তম্ভিত বিস্ময় দেখে আবার তাড়াতাড়ি বলল, ‘আরে না, স্থায়ীভাবে না। দু’চার দিনের জন্যে। যতদিন না ঘোড়ায় চড়ে আব্বাসের কাছে ফিরতে পারি আর কী।’

দেহরক্ষীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এল প্রিন্স হাসান সালে। ওরা বাইরের রোদে দাঁড়িয়ে থাকল, মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে ভিতরে ঢুকল প্রিন্স। তার গম্ভীর থমথমে মুখ মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য নরম হলো মেয়েকে আলিঙ্গন করবার সময়। প্রিন্স দেখল বানু খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠছে। এরপর সে কথাটা বলল

ওদেরকে।

‘আমার গুপ্তচর খবর এনেছে, শিফটারা যে-কোন মুহূর্তে হামলা করবে।’

‘আর ঠিক এই সময় আমি পড়ে আছি বিছানায়!’

প্রিন্স বলল, ‘মিস উইসপার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাওয়া দরকার তোমার। গিরিখাদের গোড়ায় বাবা অপেক্ষা করছেন, তুমি তাকে খবরটা দিয়ে সাবধান হতে বলবে।’ পকেট থেকে সোনালি পকেট-ওয়াচ বের করে সময় দেখল সে। ‘আর কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা প্লেন ল্যান্ড করবে এখানে, সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবে আমাকে। খুশি হতাম তুমি যদি আমার সঙ্গে ল্যান্ডিং ফিল্ড পর্যন্ত যেতে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো অ্যানি।

‘ওখানে নূর আয়াঙের লোকেরা জড়ো হয়েছে,’ বলে চলল প্রিন্স। ‘বারোশো ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা পাঠাতে রাজি হয়েছে সে। তারা তোমার পিছু নিয়ে যাবে...’, তাকে বাধা দিল বানু।

‘নূর আয়াঙের ওই হায়েনাগুলোর সাথে একা থাকবে অ্যানি? কী বলছ? ওরা তো ওদের আপন মাকেও খেয়ে ফেলবে।’

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল প্রিন্স, মৃদু হাসল। ‘আমার নিজের বডি গার্ড থাকবে মিস উইসপারের সাথে। তারা ওর নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখবে—প্রতিটা মুহূর্ত।’

‘ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না,’ প্রতিবাদ করল বানু, অ্যানির হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে।

‘আমার কিছু হবে না, বানু।’ ঝুঁকে তার গালে চুমো খেলো অ্যানি, পাহাড়ী মেয়েটা মুহূর্তের জন্য আলিঙ্গন করল ওকে।

‘আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি,’ ফিসফিস করে বলল বানু। ‘আমি না যাওয়া পর্যন্ত কিছু করো না। শেষ পর্যন্ত হয়তো

মাইকেলেরই প্রথম সুযোগ পাওয়া উচিত।’

অসহিষ্ণু একটা শব্দ করে অ্যানি বলল, ‘তুমি না আমার মাথাটা খারাপ করে দেবে। একবার এর কথা বলো, একবার ওর কথা বলো...।’

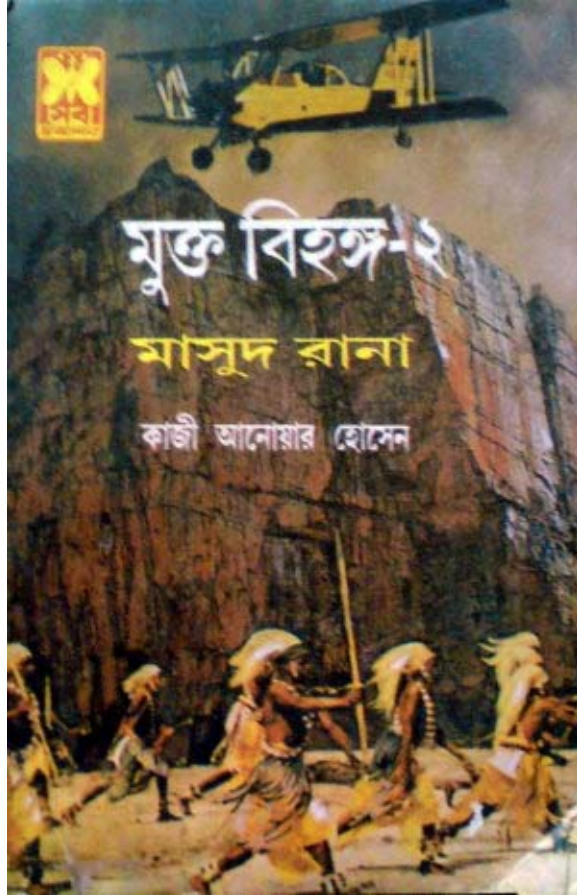
‘হ্যাঁ,’ অভিযোগ স্বীকার করল বানু। ‘দু’জনেই ওরা অত্যন্ত যোগ্য প্রেমিক। সেজন্যেই তো তোমাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে কাছাকাছি আমার থাকা দরকার।’

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

Please go to next page :-

www.BanglaBook.org

Bangla
Book.org



মাসুদ রানা

মুক্ত বিহঙ্গ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

এক

আর্মারড কারের মাথায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্স হাসান সালে আর অ্যানি উইসপার, চোখের উপর হাত দিয়ে রোদ ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে জোড়া পাহাড়চূড়ার মাঝখানে-হঠাৎ করে সেখানে উদয় হলো প্লেনটা।

একজন পাইলট হিসাবে অ্যানি বুঝতে পারে, পাহাড়ের গর্ভ নামে পরিচিত সারডিতে প্লেন নিয়ে আসা ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ। পাহাড়ের কিনারা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তীব্রগতি জলপ্রপাত, চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে আছে ঘন কুয়াশার মত মিহি জলকণা। পাহাড় প্রাচীরে বাধা পেলেও, গিরিখাদ আর প্রতি জোড়া চূড়ার মাঝখানে ফাঁকগুলোয় বাতাস প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎগতিতে, হালকা একটা প্লেন নিয়ে আসা, আর পচা সুতোর মাথায় ঘুড়ি ওড়ানো প্রায় একই কথা।

দেখবার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটা চিনতে পারল অ্যানি। খুব বেশিদিন হয়নি, এই একই মডেলের একটা প্লেন নিয়ে ট্রেনিং পর্ব শেষ করেছে সে, প্লেন চালানোর লাইসেন্স পেয়ে গেছে। ওটা একটা পুস মথ, নীল রঙের ছোট্ট মনোপ্লেন। দ্য হাভিল্যান্ড ফোর-সিলিভার অ্যারো এঞ্জিন। বসবার আয়োজন সীমিত, পাইলট ছাড়া

মুক্ত বিহঙ্গ-২

আর মাত্র দু'জন আরোহীর জায়গা হবে। পাইলট বসবে সামনের ঘেরা কেবিনে।

চূড়ার নীচে, পশ্চিম খাদের ভিতর দিয়ে এল পাইলট; হঠাৎ করে খাড়া নামতে শুরু করে দ্রুত বাঁক নিল, ছুটে এল উপত্যকার একমাত্র খোলা জায়গাটার দিকে—শুধু এদিকটাতেই কোন গর্ত, ঘাস বা পাথর নেই। পশুর হাট, জিমখানা বা পোলো গ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয় জায়গাটা, যখন যেমন দরকার। ফাঁকা মাঠের কিনারায় অবশ্য সবুজ ঘাস রয়েছে, ছাগলও চরছে গোটা পঞ্চাশ, তবে এই মুহূর্তে নূর আয়াঙ গালার ঘোড়সওয়ার সৈনিকরা খেদিয়ে আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে। প্লেন মাটি স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে গালা বাহিনী সেটাকে ধাওয়া করল, তারপর ঘিরে ধরল চারদিক থেকে। পিছনের দু'পায়ে ভর করে খাড়া হলো ঘোড়াগুলো, ওগুলোরপিঠে বসে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে নাচতে শুরু করল গালারা, রাইফেলের মাজল আকাশের দিকে তুলে শুরু করল এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ।

বারোশো সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। যেমন প্রকাণ্ড শরীর তেমনি কুৎসিত কদাকার চেহারা। ইথিওপিয়ার অসভ্য আদিবাসী বলতে গালাদেরই বোঝায়। শৃংখলা, আইন, নীতি, বিবেক, দয়াধর্ম ইত্যাদির কোন চর্চা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। দুর্গম গিরিখাদের ভিতর দিয়ে এদের সঙ্গেই যেতে হবে তাকে, ভাবতে গিয়ে গলাটা শুকিয়ে এল অ্যানির।

আর্মাড কারের পাশেই প্লেন থামাল পাইলট, পাশের জানালা খুলে বের করল মাথাটা। আফ্রিকান তরুণ, গোলগাল চেহারা, খুলি কামড়ে থাকা কঁকড়ানো চুল মাথায়। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলল সে, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর, 'আপনিই কি মি. হাসান সালে?'

www.BanglaBook.org

নিতম্বিনীর মাথা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামবার আগে অ্যানির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল প্রিন্স। বলল, 'এখনও সময় আছে, ভেবে দেখো। যুদ্ধ একটা জোরেশোরেই বাধবে। আমাদেরই যেখানে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তোমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কীভাবে দেই, বলো? আমি চাই, দুনিয়ার লোক জানুক আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে তোমাকে আমি প্রাণের ঝুঁকি নিতে বলতে পারি না। ইচ্ছে করলে আমার সাথে আসতে পারো তুমি।'

'সেই গল্পটা শোনোনি?' মাথা নেড়ে বলল অ্যানি, তার ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'এক সাংবাদিক গোলাগুলির ভয়ে সায়গন থেকে পালিয়ে গেল নিউ ইয়র্কে, পনেরো মিনিট পর মারা গেল কার অ্যাক্সিডেন্টে? কে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চায়?' আবার মাথা নাড়ল সে। 'আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি, প্রিন্স। সেটা শেষ করব।'

ঝুঁকে অ্যানির হাতে চুমো খেলো হাসান সালে। 'আমি কৃতজ্ঞ।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রানাকে গিয়ে কি বলতে হবে মনে আছে তো?' মাথা ঝাঁকাল অ্যানি।

প্লেনের ছোট কেবিনে গিয়ে উঠল প্রিন্স। এতক্ষণ পাশের জানালা দিয়ে অ্যানিকে একদৃষ্টে লক্ষ করছিল পাইলট, অ্যানি তার দিকে তাকাতেই মনভোলানো হাসিতে ভরে উঠল তার মুখ, বৃদ্ধাঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে অনুমোদন আর প্রশংসার আন্তর্জাতিক সংকেত একটা বৃত্ত তৈরি করল সে। তার নিঃশব্দ হাসিতে এত আন্তরিকতা, চেহারা এতটাই সরল আর নিষ্পাপ যে পাল্টা অ্যানিকেও হাসতে হলো। 'আরও একজনের জায়গা হবে!' চোঁচিয়ে বলল পাইলট।

হেসে উঠে অ্যানিও চিৎকার করল, 'পরের বার, যদি সুযোগ

হয়।’

‘ইট উইল বি আ প্লেজার,’ বলে মাথা টেনে নিল পাইলট, বাঁক নিল, খোলা মাঠের দীর্ঘতম সমতল বিস্তৃতির দিকে তাক করল মনোপ্লেনের নাক।

অ্যানি দেখল, অলসভঙ্গিতে পাহাড়চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে পুস মথ, মাত্র দু’জন আরোহীও যেন ওটার জন্য অনেক ভারি বোঝা। এঞ্জিনের আওয়াজ ব্যস্ত মৌমাছির গুঞ্জন, ক্রমশ মিলিয়ে গেল দূরে, সেই সঙ্গে অদৃশ্য কিন্তু নিরোট একটা নিঃসঙ্গ ভাব চারদিক থেকে চেপে ধরল তাকে। কুৎসিতদর্শন প্রকাণ্ডদেহী ঘোড়সওয়ারদের উপর চোখ বুলাল সে, আর্মারড কারটাকে ঘিরে অশ্লীলভঙ্গিতে নাচানাচি আর ছুটোছুটি করছে তারা, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। হঠাৎ উপলব্ধি করল অ্যানি, এত লোক অথচ একজনও তার ভাষা বোঝে না। শুধু নিঃসঙ্গতা নয়, কী এক অজানা আশংকা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল মনে, তলপেটের ভিতর ভয়ের ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি শিরশির করে উঠল।

রানা আর মাইকেল, দু’জনেরই অভাব বোধ করল অ্যানি। বড় কোন ঝুঁকি নিয়ে হলেও সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে যদি যোগাযোগ করা যেত! টেলিগ্রাফ অফিসে একবার যাবে নাকি? কেন যেন জংলী গালাদের কাছে থেকে পালাতে ইচ্ছে করছে তার। ওর পাঠানো রিপোর্টের প্রাপ্তিস্বীকার করে নিউ ইয়র্ক থেকে কোনও মেসেজ এসে থাকতে পারে, গিয়ে দেখে এলে হয়। কিন্তু ধারণাটা বাতিল করে দিল সে। তার সম্পাদক এখনও পায়নি ওটা।

চারদিকে তাকিয়ে প্রিন্স হাসান সালের দেহরক্ষীদের খুঁজল অ্যানি। চিনতে অসুবিধে হলো না, কারণ গালাদের সঙ্গে তাদের চেহারা কিছু অমিল আছে। দেহরক্ষীদের গায়ের রঙ কালো নয়, তামাটে। তারাও দীর্ঘদেহী, হিংস্র ডাকাত বা খুনীর মত দেখতে,

তবে কুৎসিত নয়। গালাদের তুলনায় সংখ্যায় তারা নগণ্য, এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। তারা অ্যানির মনে কোন রকম নিরাপত্তা বা স্বস্তি বোধ ফিরিয়ে আনতে পারল না, ড্রাইভারের হ্যাচ গলে তাড়াতাড়ি নিতম্বিনীর পেটে নেমে এল সে, স্টার্ট দিল এঞ্জিন।

উঁচু-নিচু মাটির উপর দিয়ে হেলে-দুলে এগোল নিতম্বিনী। খানিক পরই ট্র্যাকটা খুঁজে পেল অ্যানি, নদীর কিনারা ঘেঁষে গিরিসংকটের ধূসর পাথুরে প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেছে। সে জানে, ঘোড়সওয়ারদের দীর্ঘ মিছিল পিছু নিয়েছে। কিন্তু এক লাফে তার মন চলে গেছে গিরিখাদের নীচে, ওখানে অপেক্ষা করছে রানা আর মাইকেল। হঠাৎ করে যেন ওরা দু’জন তার গোটা অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়াল। দু’জনকে, কিংবা দু’জনের যে-কোন একজনকে নিজের পাশে পাবার জন্য ছটফট করতে লাগল মনটা, ব্যাকুল ভাবটুকু স্টিয়ারিং-হুইল ধরা আঙুলের মাথায় সাদা হয়ে ফুটে উঠল।

গিরিখাদ বেয়ে উঠবার চেয়ে নামাটা আরও বেশি আতংককর অভিজ্ঞতা। প্রায় খাড়া বিস্তৃতির এক মাথা থেকে আর্মারড কার খসে পড়ল আরেক মাথায়, প্রতিবার শিউরে উঠল তলপেটের ভিতরটা। একের পর এক কঠিন পরীক্ষায় হাঁপিয়ে উঠল অ্যানি, ঠাণ্ডা ঘামে নেয়ে উঠল সে। সামনে আরেকটা ঢাল, মাথায় উঠে একদিকে কাত হয়ে গেল আর্মারড কার, কিনারা খানিকটা দূরে থাকতেই হ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ব্রেক করল অ্যানি, কারণ কিনারার পর কী আছে দেখতে পাচ্ছে না সে। কিন্তু দেরি করে ফেলল, সামনের চাকা দুটো নেমে গেল কিনারা থেকে। উল্টে যাচ্ছে আর্মারড কার, ডিগবাজি খাবে। কিনারা থেকে প্রায় চার ফুট ঝপ্

করে নেমে গেছে পাথুরে পাঁচিল, তারপর আবার শুরু হয়েছে আরেকটা ঢাল। উঠবার সময় কোন সমস্যা হয়নি, কারণ ঢাল আর নিচু পাঁচিলের গোড়ায় প্রিন্সের শ্রমিকরা মাটি ফেলে রেখেছিল। জলপ্রপাতের একটা দিকভ্রান্ত ধারা কখন কে জানে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব।

উল্টে পড়ল না আর্মারড কার, পিছনের চাকাগুলোও প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সঙ্গে পাঁচিল থেকে নীচের ঢালে নামল। আর তারপরই শুরু হলো নিয়ন্ত্রণহীন পতন। পাঁচিলের নীচে ঢাল খুব বেশি খাড়াভাবে নেমে গেছে, পাথরের উপর ভেজা মাটিতে পিছলে গেল চাকা। মরিয়া হয়ে ব্রেক করল অ্যানি, চাকা না ঘুরলেও পিছলে নেমে যাওয়া বন্ধ হলো না। স্টিয়ারিং ঘুরিয়েও লাভ হলো না, খুব একটা সাড়া দিল না সামনের চাকা।

সামনের বাঁকে পৌঁছে গেল নিতম্বিনী, সামনাসামনি সংঘর্ষ হলো পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে। একেবারে শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে দু'হাত তুলে মাথাটাকে চারপাশ থেকে বেড়িয়ে রাখল অ্যানি, ফলে ইম্পাতের সঙ্গে ঠুকে গিয়ে খুলিটা ফাটল না। দাঁড়িয়ে পড়েছে আর্মারড কার, সেটাকে পিছিয়ে এনে বাঁক ঘুরল সে। বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

দুপুরের খানিক পর গিরিসংকটের বেশির ভাগটা পেরিয়ে এল অ্যানি। মনে আছে, বাকি অংশটুকু আরও বিপজ্জনক। এখান থেকে সগর্জনে ধাবিত নদীর অনেক উঁচুতে পাথুরে পাহাড় প্রাচীরের গায়ে ঝুলে আছে পথটা। স্টিয়ারিং হুইল যেন জ্যাস্ত একটা প্রাণী, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, শক্ত করে ধরে রাখতে গিয়ে তার হাত আর পিঠ আড়ষ্ট হয়ে উঠল, যেন লোহার হাত দিয়ে খামচে ধরেছে কেউ। ভিজে চুল আর কপাল থেকে নেমে এসে চোখে পড়ল ঘামের ফোঁটা। হাতের উল্টোপিঠ

দিয়ে চোখ মুছে নতুন আরেকটা ঢালে নামবার জন্য জোরে ব্রেক করল অ্যানি, সেই সঙ্গে ত্রিশ ডিগ্রী ঝাঁকটা ঘুরতে শুরু করল।

পাথর আর আল্গা মাটি ঝাঁক ঝাঁক পাখির মত বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড চাকাগুলোর পিছন থেকে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল আর্মারড কার। খানিকটা পথ নামবার পরই আতংকের সঙ্গে উপলব্ধি করল সে, গাড়ির উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ধীরে ধীরে একপাশে সরে যাচ্ছে নিতম্বিনী। সামনের চাকা কার্নিসের মাঝখানেই রয়েছে এখনও, কিন্তু পিছন দিকটা কার্নিসের কিনারা ছোঁয় ছোঁয়।

বিপদটা টের পেল অ্যানি আরও পরে, যখন পিছনের একটা চাকা কার্নিসের কিনারা থেকে সামান্য নেমে গেল একশো ফুট নীচে খরস্রোতা নদীর দিকে। আতংকে কেঁদে ফেলল সে, কারণ সামনের চাকা গাড়ির পিছনের অংশকে কিনারা থেকে টেনে তুলতে পারছে না। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও অ্যানি বুঝতে পারল কী ঘটছে। খসে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নগণ্য ভারসাম্যের উপর স্থির হয়ে রয়েছে আর্মারড কার, ইতস্তত করছে। পুরোপুরি ভারসাম্য হারাতে আর হয়তো এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ই যথেষ্ট। সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করল অ্যানি। ব্রেক পেডাল থেকে পা সরাল সে, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যে দিকে গড়াতে চাইছে চাকা সেদিকেই গড়াতে দিল, পরমুহূর্তে পা-টা বিদ্যুৎবেগে নামিয়ে আনল থ্রটলের উপর।

একটা চাকা ঝুলে থাকল শূন্যে, ফুল পাওয়ার পেয়ে এঞ্জিন গর্জে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চাকা পাথর কামড়ে ঘুরতে শুরু করল, ইম্পাতের খোলটা সন্ত্রস্ত হরিণের মত লাফ দিল, ঝাঁকি খেয়ে উঠে এল পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা থেকে। সরাসরি

উল্টোদিকের পাঁচিলে ধাক্কা খেল নিতম্বিনী, মাটি আর পাথরে বাড়ি খেয়ে ঘুরে গেল নাক, ভোজবাজির মত পথের উপর সিঁধে হয়ে গেল আবার ওটা।

কার্নিস থেকে উঠে আসবার পর আর তেমন কোন অসুবিধে হলো না। চওড়া একটা ঢালের মাথায় গাড়ি থামাল অ্যানি, হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে দেখে অপ্রতিভ বোধ করল সে। কিছুক্ষণের জন্য নিরিবিলা একটা জায়গা দরকার ওর, রাস্তা থেকে দূরে কোথাও। অসহ্য আতংকের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে, ফলে শারীরিক নিয়ন্ত্রণগুলো দুর্বল আর শিথিল হয়ে পড়েছে—যেমন, বমি চেপে রাখা খুব বেশিক্ষণ সম্ভব হবে না।

গালাদের অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছে অ্যানি। হাত-পা, হাঁটু ও কনুইয়ের সাহায্যে খাদের গা বেয়ে উঠবার সময় তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের গুঞ্জন শুনতে পেল সে। পাথুরে ট্রাকে অস্পষ্ট আওয়াজ তুলে হেঁটে আসছে ঘোড়াগুলো। খানিকটা উঠবার পর বড় আকারের কয়েকটা সেডার গাছ দেখতে পেল সে, নীচে কাঁটারোপও রয়েছে—ওখানে তার একা হওয়ার একটা সুযোগ আছে।

গাছগুলোর ভিতর স্বচ্ছ মিষ্টি পানির একটা ঝর্ণা রয়েছে। বমি ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার পর পাথুরে কিনারায় উবু হয়ে বসল অ্যানি, আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মুখ আর ঘাড় ধুলো। কয়েক মুহূর্ত পানিতে হাত দিল না, স্থির পানির গায়ে নিজের চেহারা দেখল, আঙুল চালিয়ে ঠিকঠাক করে নিল সোনালি চুল, বোতাম লাগাল ব্লাউজের।

চরম ভীতির প্রতিক্রিয়ায় মাথার ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, বাস্তবতা আর বর্তমান থেকে একটু যেন দূরে সরে রয়েছে সে।

সেডার বন থেকে বেরিয়ে এল, নেমে এল ট্রাকের উপর যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্মারড কার। অশ্বারোহী গালারা পৌঁছে গেছে, গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তারা, পিছনের ট্রাকে আধ মাইল পর্যন্ত লম্বা ঘোড়সওয়ারদের বিশৃঙ্খল মিছিল। আর্মারড কারটাকে ঘিরে মানুষ আর ঘোড়ার নিরেট একটা প্রাচীর তৈরি হয়েছে।

গাড়ির সবচেয়ে যারা কাছে, ইতিমধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে তারা। ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগোল অ্যানি, পথ না পেয়ে বার বার দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সে এগোতে চাইছে বুঝতে পেরেও গালা সৈনিকরা সহজে সরল না, শেষ পর্যন্ত যদিও বা সামান্য সরল, সদ্য তৈরি সরু ফাঁক গলে একজন মানুষের পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। দুই কাঁধে ধাক্কা খেতে খেতে কোন রকমে এগোতে চেষ্টা করল অ্যানি।

বুকের ভিতরটা ধুকধুক করছে, প্রিন্সের হারারি দেহরক্ষীরা কাছে-পিঠে কোথাও নেই বুঝতে পেরে হৃৎপিণ্ড জোরে ঢাক পিটাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, পায়ে জোর পাচ্ছে না, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাল।

দীর্ঘ নিস্তর্রতা নেমে এল গিরিখাদের ভিতর। অ্যানির চারপাশে গালারাও কেউ নড়লো না বা শব্দ করল না। অসহায় একটা সুন্দরী মেয়েকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বর্বর একদল জংলী যোদ্ধা। অ্যানি দেখল, তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা গালাদের মধ্যেও কেমন উত্তেজনার ভাব। কুৎসিত কদাকার চেহারায় নগ্ন লালসা, আর সরু ফাটলের মত চোখে শকুনের তীব্র প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে ঝুঁকে আছে তারা। কাল রাতে বুড়িটা যখন পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছিল, তখনও তাদের চোখে ঠিক এই

দৃষ্টিই দেখেছে অ্যানি।

দেহরক্ষীরা কোথায়? তারা আসছে না কেন? দিশেহারা অ্যানি এবার উন্মত্ত অস্থিরতার সঙ্গে চারদিকে তাকাতে শুরু করল পরিচিত একটা মুখের খোঁজে। আর ঠিক তখন গিরিখাদের অনেক নীচে থেকে ভেসে এল একটা শব্দ। অনেকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে বুঝল অ্যানি, তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে দেহরক্ষীরা। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। চিরশত্রু গালারা সংখ্যায় বারোশো, আর দেহরক্ষীরা গোটা পঞ্চাশ। গালারা তাড়া করে ভাগিয়ে দিয়েছে তাদের।

সে একা, বুঝতে পেরে কান্না পেল অ্যানির। মাথা নিচু করে ঘুরে দাঁড়াল সে, ফিরে যাবে। কিন্তু দেখল খাদের গা বেয়ে উঠবার রাস্তাও বন্ধ। পিছনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে ওরা, নিশ্চিহ্ন ভিড় ঘিরে ফেলেছে তাকে। বৃত্তটা এবার ছোট করে আনছে গালারা, দীর্ঘ বিরতি নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে তারা। সবার চেহারায়ে সেই একই নগ্ন লালসা ফুটে আছে।

পিছু হটবার উপায় নেই, সামনেই এগোতে হবে তাকে। ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে এগোতে বাধ্য করল সে নিজেকে। একটা করে পা ফেলে অ্যানি, আলখেল্লা পরা দীর্ঘদেহী একজন গালা তার সামনে চলে এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়। সে ভয় পেয়েছে, এটা বুঝতে দেওয়া চলবে না, জানে অ্যানি। ওর চেহারায়ে ও আচরণে দুর্বলতা প্রকাশ পেলে শেষ মানসিক বাধাটা কাটিয়ে উঠবে লোকগুলো, ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর, টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হয়ে যাবে। মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে একটা দৃশ্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল-তার ফর্সা নগ্ন শরীর পাথুরে মাটিতে লম্বা হয়ে আছে, হাজারটা লোকের খেলার সামগ্রী। ছবিটা মন থেকে মুছে

www.BanglaBook.org

ফেলে ধীরে ধীরে এগোল অ্যানি। প্রতিবার, একেবারে শেষ মুহূর্তে, প্রতিটি দীর্ঘদেহ সবে গেল সামনে থেকে, কিন্তু তার পিছনে সব সময় আরেকজন আছে জায়গাটা দখল করবার জন্য। ভিড়টা চারদিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় ওর ঘাড়ের উপর। বছরে এক-আধবারও বোধহয় গোসল করে না গালারা, পাঁঠা-পাঁঠা গন্ধে বমি পেল অ্যানির। তাদের উগ্র কামনার আঁচ সারা শরীরে উত্তপ্ত ছাঁকার মত অনুভব করল সে। উত্তেজনায় গালারা হাঁপাচ্ছে, ঘামে ভেজা চকচকে মুখগুলোয় নিঃশব্দ হাসি, সরু চোখের নির্লজ্জ দৃষ্টি অ্যানির শরীরে ধারাল নখের মত বিঁধছে।

হঠাৎ করে চোখে অন্ধকার দেখল অ্যানি, সামনে পা ফেলবার জায়গা নেই। এ লোকটা যেন সবার চেয়ে লম্বা, চেহারায়ে মারমুখো ব্যঙ্গ, সাঁচ করে অ্যানির একেবারে মুখের সামনে চলে এল সে, কোমরে হাত দিয়ে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে পথরোধ করে দাঁড়াল। লোকটাকে আগেও দেখেছে অ্যানি, গালাদের একজন সর্দার। গাঢ় নীল আলখেল্লা গলা পেঁচিয়ে নেমে এসেছে পায়ের পাতায়। মাথার চুল আঁকাবাঁকা তার, ফুলে-ফেঁপে কাকের বাসা হয়ে আছে, প্রায় ঢেকে রেখেছে সরু নিষ্ঠুর মুখটাকে, ডান চোখের বাইরের দিকের কোণ থেকে চোয়াল পর্যন্ত নেমে এসেছে শুকনো ক্ষতচিহ্ন।

নোংরা একটা ইঙ্গিত করে নিজের ভাষায় কিছু বলল লোকটা, খসখসে গলা। একটা শব্দও বুঝল না অ্যানি, তবে অর্থটা পরিষ্কার। তার চারদিকের ভিড় নড়ে উঠল, যেন মোচড় খেলো বিশাল একটা অজগরের দেহ। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল অ্যানি, ওকে ঘিরে থাকা বৃত্তটা আরও ছোট হয়ে এল। তার কানের কাছে হেসে উঠল এক লোক, আওয়াজটার মধ্যে কুৎসিত এমন একটা কিছু রয়েছে, প্রচণ্ড ঘুসির মত লাগল অ্যানিকে।

চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো তার। ইচ্ছে হলো ঘুরে দাঁড়ায়, হাত-পা ছুঁড়ে আর নখ দিয়ে খামচে মুক্ত করে নিজেকে। কিন্তু জানে, সেই অপেক্ষাতেই আছে লোকগুলো। সামান্য উসকে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তার উপর চড়াও হবে ওরা। সমস্ত মনোবল আর অবশিষ্ট আত্মবিশ্বাস জড়ো করে গলায় তুলল সে, ‘পথ ছাড়ো!’ স্পষ্ট, দৃঢ় কণ্ঠে বলল। সামনের লোকটা আধবোজা চোখে হেসে উঠল।

হাসতে হাসতেই, তার একটা হাত আলখেল্লার ভিতর গলিয়ে দিল লোকটা, তলপেটের নীচে। একটা ফিতে ধরে টান দিল সে, আলখেল্লা ফাঁক হয়ে যাওয়ায় কোমরের নীচেটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। হাত দিয়ে এমন অশ্লীল একটা ভঙ্গি করল সে, কুঁকড়ে যেন অর্ধেক হয়ে গেল অ্যানি, চামড়া পুড়িয়ে মুখে আর গলায় উঠে এল গরম রক্তস্রোত। তার গলা কেঁপে গেল, আগের সেই দৃঢ়তা নেই, ‘ইউ বাস্টার্ড! ইউ ফিলদি বাস্টার্ড!’ হাত বাড়াল লোকটা, তার আলখেল্লা এখনও খোলা। অ্যানির হাঁটু আর শিরদাঁড়া সামান্য বাঁকা হয়ে গেল, কুঁজো হয়ে পিছিয়ে এল সে, কিন্তু পিছনের ভিড় থেকে কয়েক জোড়া হাত পিঠে ধাক্কা দিয়ে ফেরত পাঠাল আগের জায়গায়।

এই সময় আরেকটা গলা ভেসে এল। কথাগুলো নগণ্য, কিন্তু লোহার উপর করাত চালানোর মত সুর। ‘ঠিক আছে, খতম করো। যথেষ্ট বেয়াদপি হয়েছে!’

অ্যানি অনুভব করল তার চারদিকে ভিড়ের চাপ শিথিল হলো। বাট করে ঘাড় ফেরাল সে, গলা বেয়ে উঠে এল অদম্য একটা কান্না।

খাদের ঢাল বেয়ে হেঁটে আসছে মাইকেল সেভারস, তার সামনে মানুষের নিরেট পাঁচিল ভোজবাজির মত ফাঁক হয়ে গেল।

তার আচরণে কোন রকম মারমুখো ভাব নেই, হেঁটে আসছে প্রায় অলস ভঙ্গিতে, বুকখোলা সাদা শার্টের সঙ্গে গলায় বছরুটা একটা রুমাল জড়িয়েছে সে। কিন্তু তার মুখের ভাব জীবনে কখনও ভুলবে না অ্যানি। মাইকেলের নাকের দুই ফুটো বরফের মত সাদা, নিয়ন্ত্রিত আগুন জ্বলছে দুই চোখে।

ভাব দেখে বোঝা গেল মাইকেলের দিকে ছুটবে অ্যানি, ফুঁপিয়ে উঠবে পরম স্বস্তিতে, এই সময় আবার তার কর্কশ গলা শুনতে পেল সে, ‘ধীরে। বিপদ এখনও কাটেনি।’ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা করল অ্যানি, চিবুক উঁচু করল, সবেগে বেরিয়ে আসবার আগে দমন করল কান্নাটাকে।

‘লক্ষ্মী মেয়ে,’ বলল মাইকেল, নীল আলখেল্লা পরা দীর্ঘদেহী গালা সর্দারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, সরল একটা রেখা ধরে সোজা তার দিকে হেঁটে আসছে। কাছাকাছি এসে অ্যানির বাহু ধরল সে। তার হাতের ছোঁয়া ব্লাউজের নরম কাপড় ভেদ করে সঞ্জীবনী সুধার উষ্ম স্রোত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল অ্যানির সারা শরীরে, শারীরিক নিয়ন্ত্রণ আর মনোবল ফিরে পেতে শুরু করল সে, জোর পেল হাঁটুতে।

ঘাড় ফিরিয়ে গালা সর্দারের দিকে তাকাল মাইকেল, তারপর ধীরে ধীরে তার দিকে ঘুরল। নিজের জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়ল না লোকটা। অ্যানির মনে হলো, যুগ যুগ ধরে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, কারও চোখে পলক পড়ছে না। কিন্তু ওদের মনোবল, ইচ্ছাশক্তি আর ব্যক্তিত্বের পরীক্ষামাত্র পাঁচ সেকেন্ড স্থায়ী হলো। চোখের পাতা কেঁপে উঠল সর্দারের, আড়চোখে পাশে তাকাল সে, দুর্বল গলায় ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল, ঘুরে গিয়ে হেঁড়ে গলায় কী যেন জিজ্ঞেস করল পাশে দাঁড়ানো

লোকটাকে।

কোন রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে সদ্য তৈরি ফাঁকটা গলে আর্মারড কারের সামনে চলে এল মাইকেল। ‘গাড়ি চালাতে পারবে তো?’ শান্ত সুরে প্রশ্ন করল সে, অ্যানির কোমরে হাত রাখল, তুলে দিল তাকে নিতম্বিনীর মাথায়।

‘এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে,’ ফিসফিস করে বলল অ্যানি, ব্যাপারটা এইমাত্র খেয়াল করল সে। স্টার্ট দেওয়ার জন্য ত্র্যাক হ্যান্ডেল ঘোরানোর ঝুঁকি এখন ওরা নিতে পারে না।

‘ঢালের মাথায় রয়েছে গাড়ি,’ বলল মাইকেল, ঘুরে গিয়ে গালাদের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল, ঠেকিয়ে রাখল ভিড়টাকে। ‘গাড়িয়ে দিলেই স্টার্ট নেবে।’

ড্রাইভারের হ্যাচ খুলে নীচে নামছে অ্যানি, দুই চৌঁটের মাঝখানে সাবলীল ভঙ্গিতে একটা চুরট ঢোকাল মাইকেল, বারুদে ঘষে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালল। তার ছোট্ট এই আচরণটুকু অল্প দু’এক সেকেন্ডের জন্য বৈরী গালাদের মনোযোগ কেড়ে নিল, তারা তাকিয়ে থাকল ওর হাতের দিকে। চুরট ধরাল মাইকেল, মুখ থেকে বেরিয়ে এল নীলচে ধোঁয়ার লম্বা একটা টিউব, ভিড়টার কাছে পৌঁছে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। নাক টেনে তামাকের গন্ধ নিল লোকগুলো।

মাইকেলের পিছনে গড়াতে শুরু করল আর্মারড কার, না তাকিয়ে একটা হাত লম্বা করে দিল সে, শরীরটা ঘুরে যাচ্ছে। আর্মারড কারের একটা লোহার আঙটা ঠেকল হাতে, মুঠোর ভিতর নিল সেটা, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গাড়ির মাথায়, চুরট কামড়ে ধরে এখনও তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল নিতম্বিনী, গতি দ্রুত বাড়ছে, তাল সামলে নিয়েই বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে কপালে একটা হাত তুলে গালাদের স্যালুট

করল মাইকেল। বিরতিহীন দু’মাইল নামল আর্মারড কার, দু’জনের মধ্যে কোন কথা হলো না।

অ্যানির পিছনে আর উপরে, টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল; সামনের ট্র্যাকের উপর চোখ রেখে অ্যানি বলল, ‘তুমি এমনকি ভয়ও পাওনি!’

‘নীল হয়ে গিয়েছিলাম, ওল্ড গার্ল। চারদিকে শুধু সর্ষে ফুল দেখছিলাম।’

‘আর আমি কিনা তোমাকে কাপুরুষ বলেছি।’

‘তা-ও সত্যি।’

‘এত তাড়াতাড়ি ওখানে তুমি পৌঁছুলে কীভাবে?’

‘শিফটাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তো, কী? পাহাড়ে উঠেছিলাম ডিফেন্সিভ পজিশন খুঁজতে। দেখলাম তোমার বিশ্বস্ত দেহরক্ষীরা পালিয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম দেখি তো কী ব্যাপার।’

অ্যানির সামনের ট্র্যাক চোখের পানিতে ঝাপসা হয়ে গেল, অকস্মাৎ ব্রেক করে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো সে। কীভাবে কী ঘটল বলতে পারবে না, হঠাৎ দেখল মাইকেলের আলিঙ্গনের ভিতর রয়েছে সে, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মাইকেলের গায়ে চেপে ধরেছে নিজেকে, অনবরত ফোঁপাচ্ছে আর থরথর কাঁপছে। ‘ওহ গড, মাইকেল! জানি না তোমার এই ঋণ কীভাবে শোধ করব আমি!’

‘আমি নিশ্চিত, দু’জন মিলে একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলব,’ বিড়বিড় করে আশ্বাস দিল মাইকেল, অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে উষ্ণ আলিঙ্গনের ভিতর টেনে নিয়েছে অ্যানিকে, পুলকের উৎস আর নিরাপদ আশ্রয় বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছে তাকে। অ্যানি উপলব্ধি করল, মাইকেলের এই দৃঢ় বাহুবন্ধন কখনোই সে এড়িয়ে

যেতে চায়নি। মাইকেলের ঠোঁটের দিকে ঠোট তুলল সে, মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেল পরিচিত বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টির বদলে এমন একটা হেঁকোমল ভাব ফুটে রয়েছে মাইকেলের চোখে, যা কখনও সম্ভব বলে আশা করেনি সে।

মাইকেলের ঠোট আরও একটা চমক-গরম আর কোমল, পুরুষ-পুরুষ স্বাদ, তার সঙ্গে মিশে আছে তামাকের কড়া সৌরভ। আগে কখনও বোঝেনি সে, মাইকেল এতটা লম্বা আর তার শরীর লোহার মত শক্ত বা হাত দুটো এত শক্তিশালী। শেষ একবার ফুঁপিয়ে উঠে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল অ্যানি, টিল দিল পেশীতে, শক্ত বাঁধনের ভিতর কেঁপে উঠল নরম তুলতুলে শরীর, রোমাঞ্চ আর পুলকের উৎসমুখ বিস্ফোরিত হলো-আলিঙ্গনের ভিতর নেতিয়ে পড়ল অ্যানি, ভালোবাসা আর আদর পাবার জন্য কাঙাল শরীরটা অবশ্য হয়ে গেল।

মাত্র এক কি দুই মুহূর্তের জন্য হলেও, শারীরিক চাহিদার কাছে নতি স্বীকার করবার সন্ধিক্ষণে, রিপোর্টার মেয়েটা তার এই আকস্মিক আবেগের কারণ খুঁজে পাবার চেষ্টা করল। তার মনে হলো, নিদ্রাহীন গতরাতের চরম বীভৎসতা, ক্লান্তি ও দিনের আতংকই এই প্রচণ্ড আবেগের উৎস। এরপর আর কারণ অনুসন্ধানে তার আগ্রহ থাকল না, আবেগটাকে স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে পড়তে দিল সারা শরীরে।

দুই

সারডি গিরিসংকটের পাদদেশে, অ্যাকেইশা বনভূমির চার মাইল পরিধি নিয়ে তাঁবু ফেলেছে বৃদ্ধ কামাল হাসানের বাহিনী, পাহাড়চূড়া থেকে দেখে মনে হবে গোটা এলাকা যেন পিঁপড়ে ভর্তি বিশাল একটা পিরিচ, জ্বালানী কাঠের নীলচে ধোঁয়ায় এরইমধ্যে নিজেদের আড়াল করেছে তারা, মানুষ আর পশুর বর্জ্যপদার্থের দুর্গন্ধ ভারি করে তুলেছে পাহাড়ী বাতাস।

রানা আর মাইকেলের ক্যাম্প খানিকটা তফাতে, আলাদাভাবে চেনা যায়। এদিকে বনভূমি আরও গভীর, ফলে ছায়াও ঘন। ক্যাম্পের মাথার উপর পাথুরে জলপ্রপাত, নীচের সমতল প্রান্তরে নামবার আগে এটাই সারডি নদীর সর্বশেষ খাড়া পতন। ক্যাম্পের কাছে ছোট, অস্থির একটা ডোবা তৈরি হয়েছে, এই ডোবায় ডুব দিয়ে শরীরের সমস্ত ধুলো-ময়লা ধুয়ে মনটাকে তাজা করে নিল অ্যানি উইসপার।

ভিজে চুলে তোয়ালে জড়িয়ে, ঢালু পাড় বেয়ে যখন সে ক্যাম্পে ফিরল, চারদিক অন্ধকার করে সন্ধ্যা নেমেছে। ক্যাম্প ফায়ারের গনগনে আগুনের পাশে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে রয়েছে মাইকেল। সদ্য চামড়া ছাড়ানো একটা বাচ্চা ষাঁড় কয়লার আগুনে ভাজা হচ্ছে। সরে বসে অ্যানিকে জায়গা করে দিল সে, হাতে ধরিয়ে দিল পানি মেশানো হুইস্কির মগ। কৃতজ্ঞচিত্তে সেটা গ্রহণ করল অ্যানি, চুমুক দেওয়ার পর মনে হলো হুইস্কির স্বাদ আর কখনও এত ভাল লাগেনি তার।

নিম্নরূপতার মধ্যে একসঙ্গে বসে থাকল ওরা, পরস্পরকে প্রায় ছুঁয়ে অথচ ঠিক ছুঁয়ে নয়, নরম শান্ত চোখের দৃষ্টি মেলে উপভোগ করল পরস্পরের সান্নিধ্য আর আফ্রিকান রাত্রির দ্রুতগতি আগমন। ওরা একা, ওদের নীচে আদিবাসীদের তাঁবুগুলো থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট কল-গুঞ্জন ওদের একাকীত্বকে আরও যেন অর্থময় আর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলল।

রানা, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান কামাল হাসান আর আব্বাস খায়ের দুটো আর্মারড কার নিয়ে শত্রুপক্ষের গতিবিধি জানবার জন্য ওয়েলস অভ চান্ডিতে ফিরে গেছে। উট আর ঘোড়ায় চড়ে কিছু আদিবাসীও গেছে ওদের সঙ্গে। সময় কম, একসঙ্গে দুটো কাজ সারবে রানা-আদিবাসী যুবকদের ভিকার্স মেশিনগান চালানো শেখাবে। মাইকেল, সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে, গিরিখাদ সার্ভে করবার দায়িত্ব নিয়ে রয়ে গেছে। আদিবাসীরা যদি পিছু হটতে বাধ্য হয়, গিরিসংকটে ওঠা ছাড়া তাদের কোন পথ নেই, সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য দীর্ঘ একটা সময় শিফটাদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্য সমতল প্রান্তরে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার, তা না হলে পালাতে গিয়ে শয়ে শয়ে মারা পড়বে আদিবাসীরা। পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে রণকৌশল স্থির করছিল মাইকেল, এই সময় প্রিন্স সালের দেহরক্ষীদের পালাতে দেখে সে।

ওদের দিকে ঝুঁকে রয়েছে পাহাড়গুলো, মাথার উপর হঠাৎ অত্যন্ত কালো হয়ে ওঠা আকাশটাকে প্রায় অর্ধেক ঢেকে রেখেছে। সামনে আগুন, পাশে শক্তিশালী পুরুষ, অ্যানির মনে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেওয়ার ও নিজেকে নিঃশর্তে সঁপে দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য একটা অনুভূতি জাগল, যেন ভাগ্য স্বয়ং এই বিশেষ মুহূর্তটির আয়োজন করেছে, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ।

নির্জন নিরিবিলিতে একা হতে চেয়েছে বলেই ওরা একা, দু'জনের একান্ত ইচ্ছার ফসল। গালাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর মাইকেলের স্পর্শে যে শারীরিক উত্তেজনা আর আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা জেগেছিল তা এখনও অ্যানির দেহ-মনে বাসা বেঁধে আছে।

ভাজা মাংস অল্পই খেলো অ্যানি, প্রায় কোন স্বাদই পেল না, একবারও তাকাল না পাশে বসা পুরুষটির দিকে, স্বপ্নভরা চোখের দৃষ্টি ঘুরে বেড়াল গাঢ় চূড়াগুলোর মাথায় মুক্তোর মত সাদা দ্যুতি নিয়ে জ্বলতে থাকা নক্ষত্রগুলোর উপর, যদিও পাশে তার উপস্থিতি আর নৈকট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন-এত কাছে যে পরস্পরকে এখনও তারা স্পর্শ না করলেও মাইকেলের গায়ের আঁচ অ্যানির বাহুতে যেন মরুভাষাসের কোমল আদর বুলিয়ে দিল। মাইকেলও চুপচাপ, তাকিয়ে আছে অ্যানির দিকে, আর অ্যানি তার দৃষ্টি নিজের শরীরে অনুভব করতে পারছে। মাইকেলের দৃষ্টি এতোই প্রখর আর এমনই গভীরভাবে ছুঁয়ে গেল, সে সচেতন নয় এই ভান করা আর সম্ভব হলো না। মুখ ফেরাল অ্যানি, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল মাইকেলের চোখে।

গনগনে আগুনের গাঢ় আভাষ বয়সের ছাপগুলো মাইকেলের চেহারায়ে ফোটেনি, লালচে-সোনালি চুলে চকচকে ভাব এনে দিয়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল অ্যানির, তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো এত সুন্দর পুরুষমানুষ জীবনে কখনও দেখেনি সে। মনের জোর খাটিয়ে চোখ সরাতে হলো।

উঠে দাঁড়াল অ্যানি, ধীর পায়ে হেঁটে এল, অনুভব করল বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড, যেন খাঁচা ভেঙে পালাতে চাইছে উন্মত্ত একটা পশু, দুই কানে রক্তের গর্জন শুনতে পাচ্ছে

সে।

তার তাঁবুর ভিতর ক্যানভাস ভেদ করে ঢুকে পড়েছে ক্যাম্প ফায়ারের কোমল আভা। ল্যাম্প জ্বালল না, আধো অন্ধকারে কাপড় ছাড়ল, অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে দিল সেগুলো প্রবেশ পথের পাশে ফোল্ডিং চেয়ারটার দিকে। সরু খাটিয়ার উপর লম্বা হয়ে গুলো সে, নগ্ন পিঠ আর নিতম্বে কর্কশ লাগল উলেন চাদরটা। প্রতিটি নিঃশ্বাস এখন কষ্টকর অভিজ্ঞতা, শরীরের দু'পাশে মুঠো করা শক্ত হাত নিয়ে আড়ষ্টভঙ্গিতে পড়ে থাকল সে-ভয় ভয় করছে, আবার উল্লসিতও বটে-নিঃসঙ্গ বালিশ থেকে মাথা তুলে নিজের শরীরটা দেখল, যেন এর আগে কখনও এটার উপর এতো সচেতন মনোযোগ ছিল না তার।

আসতে দেরি করল মাইকেল, আবার এতো দেরি করল না যাতে অধৈর্য হয়ে ওঠে অ্যানি। তার পায়ের শব্দ পেল অ্যানি, কাঁকরের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। দম বন্ধ হয়ে এল, আকস্মিক আতংকের সঙ্গে ভাবল নিঃশ্বাস আটকে মারা যেতে পারে সে। এই সময় তাঁবুর পর্দা এক ঝটকায় ফাঁক হয়ে গেল, ঝুঁকে ভিতরে ঢুকল মাইকেল, পিছনে আবার ঝুলে পড়ল পর্দাটা।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে ঢাকল অ্যানি, একটা হাত উঠে এল বুকের উপর, অপর হাতটা নেমে গেল তলপেটের নীচে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল মাইকেল, আগুনের আভায় আলোকিত ক্যানভাসের গায়ে মানুষের একটা কাঠামো। আবার নিয়মিত হলো অ্যানির শ্বাস, তবে দ্রুতগতি আর সংক্ষিপ্ত। তার মনে হলো অনন্তকাল ধরে ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল, বোবা ও সতর্ক প্রহরী। তার বাহু আর উরুতে ধীরগতি দৃষ্টি অনুভব করল সে, কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে। তারপর বোতাম খুলে শার্টটা

মেঝেতে ফেলে দিল মাইকেল, আগুনের স্নান আভায় ভিজে মার্বেল পাথরের মত লাগল নগ্ন পেশীগুলো।

অবশেষে অ্যানির বিছানার কাছে সরে এল মাইকেল, তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকল। দুই হাত তুলে মাইকেলকে ধরল অ্যানি, টেনে আনল নিজের উপর।

গভীর রাতে একবার মাত্র ঘুম ভাঙল অ্যানির, দেখল তাঁবুর বাইরে নিভে গেছে আগুন, তবে পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে উঠে এসেছে উজ্জ্বল সাদা বড় একটা চাঁদ, ওদের মাথার উপর ক্যানভাস ভেদ করে নেমে এসেছে স্নান রূপালি শীতল আলো।

অদ্ভুত আলোটা মাইকেলের চেহারা থেকে সব রঙ নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। মুখটা এখন স্নান, অনেকটা যেন মর্মরমূর্তি বা মড়ার মত। অ্যানির অনুভূতি আর উপলব্ধির জগতে আকস্মিক একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। মনের গভীর তলদেশে ছোট্ট ভোঁতা একটা ভার অনুভব করল সে। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখবার পর চিনতে পারল-অপরাধবোধ। আর ওই অপরাধবোধের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সমাজকে অভিসম্পাত দিল সে। চাবুকের তীব্র কষাঘাত ব্যতীত একজন পুরুষকে ভোগ করতে পারবে না সে, প্রকৃতি যেভাবে চায় সেভাবে সে তার শরীরটাকে ব্যবহার করতে পারবে না, এ কোন্ সত্যতায় বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে?

একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে-পাশের ঘুমন্ত লোকটাকে যাতে বিরক্ত করা না হয় সে-ব্যাপারে সচেতন, ঝাড়া প্রায় দশ মিনিট ধরে খুঁটিয়ে দেখল মুখটা-অপরাধবোধের নতুন অনুভূতিটার গুরুত্ব আর গভীরতা বুঝবার চেষ্টা করল, মাপজোক করল মাইকেলের প্রতি তার ভালোবাসার পরিধি। ধীরে ধীরে সে

উপলব্ধি করল, দু'জন ওরা পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে।

আশপাশে এমন কেউ নেই যে অ্যানির চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, মাইকেলের প্রতি তার আবেগ আর অনুভূতিগুলোয় সত্যিকার কোন গভীরতা নেই। ভয় আর আতংকের জোয়ারে দিশেহারা বোধ করায় উদ্ধারকর্তা হিসাবে সামনে যাকে পেয়েছে তাকে সব দিয়ে ফেলবার বিশ্বাসঘাতক একটা প্রবণতাই এর জন্য দায়ী।

এই আবেগ আর অনুভূতির উৎস ভালবাসা নয় বলেই অপরাধবোধ জেগেছে তার মনে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হলো না, নিজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল অ্যানি। দিশেহারা আর বিষণ্ণ বোধ করল সে।

মাইকেলের দীর্ঘ শরীরের পাশে শুয়ে পড়ল আবার অ্যানি, তবে এবার সামান্য সরে গেছে সে, যাতে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়। তার জানা আছে, প্রেম করবার পর জগতের সব প্রাণীই বিষণ্ণ বোধ করে—কিন্তু তার বিষণ্ণ বোধ করবার পিছনে আরও কী যেন একটা কারণ আছে, যে-জন্য বেদনার একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করে বিঁধছে বুকে।

হঠাৎ, সঠিকভাবে জানে না কেন, মাসুদ রানার কথা ভাবল সে। আর সেই সঙ্গে দুঃখ-বেদনার শীতলতা ও গভীরতা অনেক গুণ বেড়ে গেল। আবার ঘুম আসতে অনেক দেরি হলো, জেগে উঠে দেখল ক্যানভাসে কড়া রোদ, বাইরে আর্মারড কার আর বহু লোকজনের আওয়াজ।

তাড়াহুড়ো করে উঠে বসল অ্যানি, চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে, ছোঁ দিয়ে চাদর তুলে বুক ঢাকল। চোখ-মুখ ফুলে আছে তার, শরীরে অদ্ভুত এক অলস ভাব। খাটিয়ায় একা সে, মাইকেল

কখন যেন চলে গেছে। পাশের উলেন চাদরটায় হাত রাখল অ্যানি, মাইকেলের গায়ের ছোঁয়ায় এখনও গরম হয়ে রয়েছে ফাঁকা জায়গাটা। আর রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক একটা ব্যথা, অ্যানির হৃদয়ের গভীরে।

ব্যস্ত হাতে কাপড় পরে তাঁবু থেকে রোদে বেরিয়ে এল অ্যানি, হাত দিয়ে তখনও মাথার চুল ঠিকঠাক করছে, শোক মিছিলটাকে পৌছুতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনের গাড়িটা রানার, চঞ্চলা। চকচকে সাদার উপর গাঢ় লাল ক্রসচিহ্ন উধাও হয়েছে গা থেকে, তার বদলে অনুজ্জ্বল ধূসর রঙের উপর কালচে-সবুজ ক্যামোফ্লেজ দাগ টানা হয়েছে। মাউন্টিং থেকে তির্যকভাবে খাড়া হয়ে আছে ভিকার্স মেশিনগানের মোটা ব্যারেল। টারিটের উপর পতপত করে উড়ছে ইথিওপিয়ার জাতীয় পতাকা, পাশে তিন রঙা আরেক পতাকা কামাল হাসান বাহিনীর প্রতীকচিহ্ন বহন করছে—গাঢ় নীল মাঠের উপর সিংহের বলমলে সোনালি মাথা।

চঞ্চলার ঠিক পিছু পিছু আসছে টোলাইনে বাঁধা, ভাগ্যদেবী-আব্বাস খায়েরের আর্মারড কার-রঙ বদলানোর পর চঞ্চলার মতই চেহারা পেয়েছে ওটা, জোড়া পতাকা বাতাসে উড়ছে, প্রতিটি গান পোর্ট ভরে আছে আলোয়ান্ধ্রে। সব মিলিয়ে ওটাকে যুদ্ধান্ত্র সজ্জিত সামরিক যান বলে মনে হলেও, পরিত্যক্ত আর বাতিল ভাবটুকু গোপন করা যায়নি। চঞ্চলা ওটাকে টেনে নিয়ে আসছে ক্যাম্পে, ওটার পিছন থেকে কর্কশ ধাতব যে আওয়াজটা বেরিয়ে আসছে তা কানের পর্দা ফাটানোর জন্য যথেষ্ট, টিকতে না পেরে নিজের তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মাইকেল

সেভারস, কাপড় পরা তখনও শেষ করেনি, ড্রাইভারের হ্যাচে রানার মাথাটা উঁচু হতেই রাগতস্বরে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সে।

‘ঘটনাটা কী?’

রাগে লাল আর বিকৃত হয়ে আছে রানার মুখ। ‘বুড়ো...!’ উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজে না পেয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারল না ও, আঙুল তাক করে গোত্রপ্রধান কামাল হাসানকে দেখিয়ে দিল।

তোবড়ানো, ভাঙাচোরা গাড়ির টারিটে সগর্বে বসে আছেন কামাল হাসান, চোহরায় কোন ক্ষোভ বা খেদের লেশমাত্র নেই, দাঁতহীন মাড়ি বের করে বেসুরো গলায় হাসছেন, তাকিয়ে আছেন মাইকেলের দিকে।

‘ভিকার্স গানের এক হাজার গুলি ছুঁড়েও সম্ভব হতে পারেননি,’ বলল রানা। ‘ড্রাইভারের সিট থেকে আব্বাসকে লাথি মেরে সরিয়ে দেন, তারপর আমাদেরকে দেখান কীভাবে গাড়ি চালাতে হয়।’

‘ওহ্ মাই গড!’ গুণ্ডিয়ে উঠল মাইকেল।

‘হাউ ডু ইউ ডু?’ বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান উল্লাসে চৈচিয়ে উঠলেন, মাইকেলের আত্ননাদটাকে প্রশংসাসূচক বলে ধরে নিয়েছেন।

‘তুমি ওকে থামাওনি কেন?’ ব্যাখ্যা দাবি করল মাইকেল।

‘খামাব? খোদা! তেড়ে আসা গণ্ডারকে তুমি কখনও থামাতে পেরেছ? উপকূলের দিকে অর্ধেক পথ ধাওয়া করে তারপর নাগাল পাই ওঁর...।’

‘ক্ষতি?’

‘গিয়ারবক্স গেছে, ক্ল্যাচ পুড়েছে—এখনও ভাল করে দেখার সাহস হয়নি আমার।’ হ্যাচ থেকে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নামল রানা, চোখ থেকে খুলল ডাস্ট গগলস। ক’দিনের না কামানো দাড়ি আর মাথার চুল লাল হয়ে আছে ধুলোয়, চোখের চারপাশের চামড়া শুকনো সাদাটে ঘায়ের মত স্লান আর নগ্ন দেখাল, চেহারা

বিস্ময়াভিভূত ও নিরীহ একটা ভাব এনে দিয়েছে। হাত দিয়ে শার্ট আর ট্রাউজারের ধুলো ঝাড়ছে ও, এখনও খেপে আছে বুড়ো কামাল হাসানের উপর। ‘শুয়োরের ছানাকে কাদায় গড়াগড়ি খেতে দেখেছ? উনি ঠিক তাই করেছেন! শত্রুদের অবস্থান দেখার জন্যে এভাবে কেউ দলবল নিয়ে যায় কখনও? হাসিটা চিনতে পারছ? বন্ধ একটা উল্লাদ! বলতে পারো একটা সার্কাস পার্টির সাথে গিয়েছিলাম।’

এতক্ষণে অ্যানির উপর চোখ পড়ল রানার, আর সেই সঙ্গে সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেল ওর, আনন্দে বিক করে উঠল চোখ দুটো। ধীরে ধীরে কালো মেঘ কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল চেহারা। সবই লক্ষ করল অ্যানি, কী ঘটছে বুঝতে পারবার আগেই মন জুড়ে ফিরে এল অপরাধবোধটা, তলপেটের ভিতর ঠাণ্ডা অসুস্থ একটা অনুভূতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

‘অ্যানি!’ ডাকল রানা। ‘গড, তোমার জন্যে চিন্তায় ছিলাম আমি!’

আগুনের পাশে কফি বানাতে বসল অ্যানি, কাজে ব্যস্ততার কারণে অপরাধবোধ থেকে খানিকটা মুক্তি পেল। বাসি ভাজা মাংস গরম করে পরিবেশন করল সে, তারপর কেক বানাতে বসল। সকালের রোদ এখনও তেতে ওঠেনি, টেবিলটা ফেলা হলো গাছের ছায়ায়। চুলোর ধারে নিজের কাজে ব্যস্ত অ্যানি, টেবিলে বসে রিকনিসন্স-এর ফলাফল ব্যাখ্যা করছে রানা।

যাবার পথে ভিকার্স মেশিনগান দিয়ে গাছ, পাথর, নদী, পাখি ইত্যাদি সামনে যা পড়েছে সবগুলোর উপর গুলি ছুঁড়েছেন কামাল হাসান। সঙ্গে গুলি ছিল প্রচুর, প্রায় শেষ করে ফেলেছেন তিনি। ঘুরপথ দিয়ে উত্তর দিকে পৌঁছায় ওরা, ধুলো এড়াবার জন্য

কলামের গতি কমিয়ে রাখে। উপত্যকার উপর চমৎকার একটা জায়গা দেখতে পায় ওরা, ওখান থেকে মাসাওয়া আর ওয়েলস অভ চান্ডির মাঝখানের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। রাস্তায় কিছু যানবাহন ছিল, বেশিরভাগ মালামাল পরিবহনে ব্যস্ত, কিন্তু ওখানে বেশিক্ষণ ওরা থাকতে পারেনি—কারণ, কামাল হাসান জেদ ধরেন গাড়িগুলোর উপর টার্গেট প্র্যাকটিস করবেন তিনি। তাঁকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হলেও, ব্যাপারটা যুদ্ধজয়ের মত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। রানার নেতৃত্বে পিছিয়ে আসে ওরা, পশ্চিম দিক থেকে কুয়ার দিকে এগোয়।

কফির মগে চুমুক দেওয়ার জন্য থামল রানা, আর মাইকেল ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল। আগুনের ধারে মাথা নিচু করে বসে আছে মেয়েটা, গোলাপি মুখে কী ভাব বুঝবার উপায় নেই।

‘আজকের ব্রেকফাস্ট কেমন আসছে, বলো তো, মাইডিয়ার ওল্ড চ্যাপ?’ হঠাৎ সহাস্যে জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

শব্দগুলো নয়, নয় সম্বোধনও, মাইকেলের বলবার ভঙ্গি আর গলার সুরে এমন কিছু রয়েছে, ঝট করে অ্যানির দিকে তাকাল রানা। এই সুর একজন পুরুষ শুধু তার স্ত্রী বা তার মেয়েমানুষ প্রসঙ্গে ব্যবহার করে। এক সেকেন্ডের জন্য রানার চোখে স্থির হয়ে থাকল অ্যানির দৃষ্টি, তারপরই মাথা নামিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে, আর রানা চিন্তিতভাবে ধূমায়িত মগের ভিতর তাকাল, চৌঁটের কোণে সামান্য হাসির আভাস।

‘কতটা কাছে যেতে পেরেছ তোমরা?’ সহজ সুরে জিজ্ঞেস করল মাইকেল। রানা আর অ্যানির দৃষ্টি বিনিময় লক্ষ করেছে সে। তার হাবভাবে কোন উদ্বেগ নেই, পেশী শিথিল, মনে তৃপ্তি—চেয়ারে হেলান দিয়ে দোল খেতে খেতে দু’আঙুলের মাঝখানে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে একটা চুরট।

ধীরে ধীরে, প্রায় ফিসফিস করে বলে গেল রানা। অসমতল প্রান্তরে গাড়িগুলোকে রেখে পায়ে হেঁটে এগোয় ওরা। কামাল হাসান যাতে শিফটাদের খুব কাছাকাছি যেতে না পারেন সে-ব্যাপারে সতর্ক ছিল ও। একটানা প্রায় দু’ঘণ্টা শিফটা বাহিনীর উপর নজর রাখা হয়। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে তারা। পাহাড়শ্রেণী বরাবর তাদের মেশিনগান আর মর্টারের পজিশনও সুরক্ষিত। তাদের প্রস্তুতি আপাতত প্রতিরক্ষামূলক, কাজেই ওখানে তাদের উপর হামলা করা ওদের জন্য নেহাতই বোকামি হবে। যতক্ষণ তারা না এগোয় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

সদ্য তৈরি কেক নিয়ে টেবিলের পাশে উঠে এল অ্যানি, সে ঝুঁকে পড়তেই তার নিরাবরণ বাহুতে স্বাভাবিক আদরের একটা হাত রাখল মাইকেল। তাড়াতাড়ি সিঁধে হলো অ্যানি, দ্রুত পিছিয়ে গেল সেন্স ডিম আনবার জন্য। ব্যাপারটা লক্ষ করল রানা, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে কোন রকম উত্থান-পতন ঘটল না।

ও চেয়েছিল গোটা এলাকাটা চারদিক থেকে একবার ঘুরে আসবে, তা হলে শিফটাদের পজিশনের উপর পিছন থেকে আক্রমণ করা সম্ভব কিনা জানা যেত। কিন্তু হঠাৎ করে বৃদ্ধ কামাল হাসান একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়েন, জেদ ধরেন কীভাবে গাড়ি চালাতে হয় তা তিনি ওদেরকে দেখিয়ে ছাড়বেন। ‘মাই গড, খিদেতে মরে যাচ্ছি!’ কেকে কামড় বসাল ও। ‘তোমার এদিকের খবর কী, মাইকেল?’

‘গিরিখাদের বাইরে নয়, ভেতরে চমৎকার একটা ডিফেন্সিভ পজিশন দেখতে পেয়েছি আমি,’ বলল মাইকেল। ‘ঢালের ওপর মাটি খোঁড়ার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি একটা দলকে। ভিতর দিয়ে

যাবার চেষ্টা করলে শিফটাদের কচুকাটা করব আমরা।’

‘শিফটাদের উপর নজর রাখার জন্য কিছু লোককে স্কাউট হিসেবে রেখে এসেছি আমরা,’ বলল রানা। ‘প্রায় একশোর মত, আব্বাসের বাছাই করা। কুয়ার ওপর থেকে শিফটারা নড়লেই খবর পেয়ে যাব। কিন্তু আমি জানতে চাই, ওরা এগোবার আগে কতটা সময় পাচ্ছি আমরা। প্রস্তুতি নিতে আরও সময় দরকার আমাদের, তা হলে ট্যাকটিক্স সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারব, হারারি আর রাসটাদের ট্রেনিংও শেষ হয়ে আসবে...।’

চুলোর কাছ থেকে উঠে এসে ওদের সঙ্গে টেবিলে বসল অ্যানি। ‘সময় তুমি পাবে না,’ বলল সে। ‘প্রস্তুতি তোমার যা নেয়ার এখনি নিতে হবে।’

‘তারমানে? এ-কথা বলছ কেন?’

‘প্লেনে চড়ার আগে প্রিন্সকে আমি খুব চিন্তিত দেখেছি,’ বলল অ্যানি। ‘তার কারণ সে একটা গোপন মেসেজ পেয়েছে। মেসেজটা হলো, নিজের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে শিফটা বাহিনীকে তাগাদা দিয়ে একটা বার্তা পাঠিয়েছেন সন্মিট হাইলে সেলাসি। তারমানে যে-কোন মুহূর্তে ট্রেনিং থেকে বেরিয়ে এদিকে অ্যাডভান্স করবে শিফটারা। ধরে নাও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।’

ঠোট গোল পাকিয়ে শিস দিল রানা, গলা ফাটিয়ে বলল, ‘হিয়ার উই গো!’ মাইকেলের দিকে ফিরল ও। ‘খবরটা তুমিই বরং কামাল হাসানকে দাও। একমাত্র তুমিই ওকে সামলাতে পারো।’

‘আমার ওপর তোমার আস্থা দেখে একটা ধাক্কা খেলাম,’ মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করল মাইকেল।

‘কামাল হাসানের কী প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারি। ছুটে গিয়ে সরাসরি আঘাত করতে চাইবেন তিনি। জানা কথা, সুযোগ দেয়া হলে নিজের বাহিনীকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলবেন। ওঁকে

তোমার শান্ত রাখতে হবে।’

‘কীভাবে তা সম্ভব বুদ্ধি দাও-মরফিন ইঞ্জেক্ট করব, নাকি লোহার রড দিয়ে বাড়ি মারব মাথায়?’

‘রামি খেলতে বসাও,’ পরামর্শ দিল রানা। ‘সেদ্ধ একটা ডিম মুখে পুরে চেয়ার ছাড়ল ও। ‘নাস্তার জন্যে ধন্যবাদ, অ্যানি। যাই, দেখি, ভাগ্যদেবীর কী অবস্থা করেছেন কামাল হাসান।’

অ্যানি সাড়া দিল না, এমনকী মুখ তুলে ওর দিকে একবার তাকালও না। তবে চোখের পাতা ঘন ঘন কেঁপে উঠল তার, সামান্য আড়ষ্ট হয়ে গেল কাঁধ দুটো।

একটানা দু’ঘণ্টা কাজ করল রানা। ভাগ্যদেবীর গোটা গিয়ারবক্স খুলে আনতে হবে। বিশ গজ দূরে নিজের তাঁবুর বাইরে টেবিলে বসে রয়েছে অ্যানি, আপনমনে দ্বিতীয় রিপোর্টটা টাইপ করছে। কাজে ব্যস্ত থাকলেও, একজন আরেকজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তবে প্রকাশ্যে নয়। ভুলেও কেউ একবার কারও দিকে তাকাল না।

অবশেষে কঠিন কাজটা শেষ করল রানা, সেটিং থেকে বের করে আনল গিয়ারবক্স। পিছিয়ে এসে ন্যাকড়া দিয়ে হাতের গ্রিজ মুছল, বলল, ‘কফি ব্রেক।’ হেঁটে আঙনের পাশে চলে এল ও, দুটো মগে কালো কফি ঢেলে টেবিলের সামনে থামল। ‘কেমন হচ্ছে তোমার রিপোর্ট?’ জিজ্ঞেস করল অ্যানিকে, টাইপরাইটারের সচল কাগজটার উপর চোখ বুলাল একবার। ‘পুলিটজার আশা করা যায়?’

হেসে উঠল অ্যানি, হাত বাড়িয়ে কফির মগটা ধরল। ‘পুরস্কার কখনও সেরা লোকটি পায় না।’

‘কিংবা সত্যি যার দরকার,’ সায় দেওয়ার সুরে বলল রানা,

অ্যানির উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসল।

রানা এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ায় রাগের চেয়ে বরং বিরজাই বোধ করল অ্যানি। ‘দেখো, রানা। তোমাকে বা আর কাউকে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই,’ মৃদু, নরম সুরে বলল সে।

‘ঠিক,’ বলল রানা, ‘ঠিক কথা। তুমি এখন আর ছোট্ট খুকিটি নও।’ আমিও মাইকেল সেভারসের প্রতিদ্বন্দ্বী নই, ভাবল রানা, কোনদিন ছিলামও না। মাইকেল যেদিন ওকে বলেছে, অ্যানিকে পেলে সে ভাল হয়ে যাবে, সেদিন থেকেই প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে রানা। তবে মাইকেল এ-কথাও বলেছিল, কারও দান করা জিনিস সে নেবে না, নিতে হলে জিতে নেবে-তার মর্যাদা রক্ষার জন্যই এতদিন প্রতিযোগিতার বিশ্বাসযোগ্য ভান করে এসেছে রানা। এখন যখন প্রায় পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে অ্যানি আর মাইকেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে, লোক দেখানো প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে পারে রানা। অবশ্য হঠাৎ করে এমন কিছু করা বা বলা উচিত হবে না ওর, যাতে মাইকেল বুঝতে পারে এতদিন ভান করে এসেছে ও। অ্যানির মনেও কোন আঘাত দেওয়া চলবে না।

‘আমার বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ আছে, ধর্মাবতার?’ দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান নিয়ে মুখ তুলে তাকাল অ্যানি, কিন্তু রানার চোখের ভাব দেখে তার ভিতর ফণা তোলা রাগ মাথা নোয়াল।

‘তোমার সাথে কোন রকম ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে যেতে চাই না, অ্যানি,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘একটা কথা তো ঠিক, তোমার যা ভাল মনে হবে তাই তুমি করবে।’ শেষ চুমুক দিয়ে মগটা নামিয়ে রাখল ও। ‘উঠি, কাজ পড়ে আছে।’

‘একটুতেই হাল ছেড়ে দাও, তাই না?’ অ্যানির মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাটা, শব্দগুলো বেরবার আগে বোঝানি কী বলে ফেলেছে। ইচ্ছে হলো ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু টিল ছুঁড়বার পর আর কী সেটা ফেরে!

একটা চোখ কুঁচকে অ্যানিকে দেখল রানা, কিশোরসুলভ নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। ‘হাল ছেড়ে দিয়েছি?’ হা-হা করে হেসে উঠল এবার। ‘ওহ্ লেডি! তা যদি বিশ্বাস করো, আমার প্রতি অন্যায় করা হবে-ভয়ানক অবিচার করা হবে।’ টেবিল ঘুরে অ্যানির দিকে এগিয়ে এল ও, ঝুঁকল তার দিকে। চোখ থেকে হাসিটা নিভে গেল, ফিসফিস করে বলল, ‘তুমি সত্যিই খুব সুন্দর।’ একটু বুঝতে চায় রানা। মেয়েটা কি মাইকেলের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে?

‘রানা!’ অ্যানির চোখে পলক পড়ল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার মুখে। ‘ইচ্ছে হয় সব তোমাকে ব্যাখ্যা করি-কিন্তু নিজেকে আমি বুঝতে পারি না।’ আরও একটু ঝুঁকে অ্যানির চিবুক স্পর্শ করল রানা। ‘না, রানা, প্লিজ-না...,’ বলল অ্যানি, যদিও ঠোট সরাবার কোন চেষ্টা করল না, বরং রানার দিকে তুলে ধরল একটু। কিন্তু আর এক মিলিমিটারও এগোল না রানা। হঠাৎ শোনা গেল ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ, বনভূমির ভিতর দিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেল ওরা, এখনও দু’জনের দৃষ্টি এক হয়ে আছে। ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাম্পের সামনে চলে এল আব্বাস খায়ের, লাগাম টেনে পনি থেকে লাফ দিয়ে নামল, রুদ্ধশ্বাসে বলল, ‘মাসুদ ভাই, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে! মাগরেব নদী পেরিয়ে শিফটাদের আরেকটা বাহিনী রওনা হয়ে

গেছে সেলাসি বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্যে! চান্ডির শিফটারা যে-কোন মুহূর্তে হামলা চালাবে এখন!’

‘ঠিক সময়টিতে ভগ্নদূতের আগমন ঘটল,’ বিড়বিড় করে বলল অ্যানি, ব্যঙ্গ আর কৌতুকের সুরে বলতে চেষ্টা করলেও, তার গলা সামান্য কেঁপে গেল, হাসিটা আড়ষ্ট।

‘আমি এসেছি আপনাকে সাহায্য করতে, মাসুদ ভাই। গাড়িটা মেরামত করা দরকার। ওটা ছাড়া আমি লড়ব কীভাবে?’ তার পিছু নিয়ে আসা একজন আদিবাসীর হাতে লাগামটা ধরিয়ে দিল আব্বাস। দাদু তাঁর সব ক’জন সর্দারকে নিয়ে পরামর্শসভা ডেকেছেন দুপুরে, বলে পাঠিয়েছেন আপনাকেও থাকতে হবে।’ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাগ্যদেবীর দিকে হন-হন করে এগোল সে।

এক মুহূর্ত অ্যানির সামনে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ বাঁকাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আব্বাসের পিছু নিল ও।

এক ঘণ্টা পর, গিয়ারবক্স খুলে পার্টসগুলো পরিষ্কার একটা ক্যানভাসে রাখল ওরা। পিছিয়ে এল রানা, বলল, ‘না, সম্ভব নয়। তোমার দাদু তাঁর হাঁস জবাই করে ফেলেছেন, এ আর ডিম পাড়বে না।’

‘হ্যাঁ,’ বলল আব্বাস, কালো হয়ে গেছে তার চেহারা, ‘কী বলব, দাদু একটা...!’ সময়মত নিজেকে সামলে নিল সে। ‘দাদুর উৎসাহ আর প্রাণশক্তি আরেকটু কম হলে খুশি হতাম।’

‘দুপুর তো হয়ে এল,’ আড়মোড়া ভেঙে বলল রানা। ‘চলো, শুনে আসি তিনি কী বলেন।’

হারারি আর রাসটা বাহিনীর ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে আস্তানা গেড়েছেন কামাল হাসান। তাঁর সঙ্গে শুধু সর্দার, প্রভাবশালী মাতবর, আর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা ঠাঁই পেয়েছে।

বেড়া, প্যারাফিন টিন, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে তাড়াহুড়োর সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে বেশ কিছু কুঁড়েঘর, সব মিলিয়ে দুই একর জায়গার উপর ছোটখাট একটা গ্রামই বলা যায়। গলিগুলোয় ন্যাংটো হেলে-মেয়েরা ঘুর ঘুর করছে, দোরগোড়ায় পা ছড়িয়ে বসে গোত্রপ্রধানের যুবতী পত্নীরা উকুন বাছছে পরস্পরের। গোটা এলাকায় অবোধে চলছে ছাগল, নেড়ি কুত্তা, গাধা আর উট।

গ্রামের মাঝখানে কামাল হাসানের তাঁবু। তাতে এত বেশি তালি পড়েছে, প্রথম যে ক্যানভাস দিয়ে ওটা বানানো হয়েছিল সেটার প্রায় কোন অস্তিত্বই নেই। প্রবেশ পথে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেহরক্ষীরা, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

গোত্রপ্রধানের তাঁবুর আরও সামনে বড় একটা খোলা মাঠ, অপেক্ষারত আদিবাসী যোদ্ধারা সেটা প্রায় ভরে ফেলেছে।

‘মাই গড,’ বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। ‘পরামর্শসভায় দেখছি সবাই উপস্থিত।’

‘সেটাই নিয়ম,’ ব্যাখ্যা করল আব্বাস। ‘সবাইকে হাজির থাকতে হবে, তবে কথা বলতে পারবে শুধু মাতবর আর সর্দাররা।’

মাঠের একদিকে হারারি আর রাসটা বাহিনী একসঙ্গে বসেছে, আরেক দিকে আলাদাভাবে বসেছে গালা বাহিনী। একটা হাত তুলে রানাকে দেখাল অ্যানি, বলল, ‘ওরা গালা গোত্রের লোক, হারারি আর রাসটাদের সাথে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।’

‘একদল জন্মাদ,’ বিড়বিড় করল রানা। ‘এ-ধরনের বন্ধু থাকলে, শত্রুর দরকার কী?’

পথ দেখিয়ে ওদেরকে সরাসরি কামাল হাসানের তাঁবুতে নিয়ে এল আব্বাস, সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল দেহরক্ষীরা। ভিতরটা তন্দুরের মত গরম, প্রায় অন্ধকার। বাঁঝাল মশলা আর তামাকের

গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল ওদের। তাঁবুর শেষ প্রান্তে একদল লোক বৃত্ত রচনা করে বসে আছে, মাঝখানে একজোড়া মূর্তি, মূর্তি দুটোর দিকে আগ্রহের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব ঝুঁকে আছে তারা। মূর্তি দুটোকে চিনতে পারল রানা—একজন গাঢ় রঙের আলখেল্লায় মোড়া কামাল হাসান, অপরজন হালকা নীল সিল্ক শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরা মাইকেল সেভারস।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত রানা ভাবল, ওরা দু'জন সারডি গিরিসংকটের প্রতিরক্ষা বিষয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন। তারপর ওর চোখে পড়ল টাকা আর খুচরো পয়সার স্তূপ। সোনালি একটা কম্বলের উপর বসে আছে ওরা, দু'জনের সামনে তাস।

‘মাই গড,’ বলল রানা। ‘কথার কথা বলেছিলাম, মাইকেল দেখছি গুরুত্বের সাথে নিয়েছে!’

দু’হাতে ধরা তাসের আড়াল থেকে মুখ বের করল মাইকেল। ‘থ্যাঙ্ক গড!’ রানাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। ‘আরও আগে আসতে পারলে না?’

‘সমস্যাটা কী?’

‘বুড়ো বেজিয়াটা আমাকে একা পেয়ে চুরি করেছে,’ বলল মাইকেল। ‘মার্কিন ডলারের হিসেবে শালা আমার কাছ থেকে তিনশো ডলার ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি হতভম্ব, রানা। আমি স্তম্ভিত! এরা দেখছি মানুষের জাতই নয়! চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে ছুরি ঢালায়, মানে চুরি করে...’ আড়চোখে তাকিয়ে আব্বাসকে দেখতে পেল সে, তারপর সরাসরি তাকাল। ‘নো অফেন্স মেনট, অফকোর্স। তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তোমার দাদু আমাকে খুন করেছে।’

মাইকেলের প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের সঙ্গে একবার করে সবেগে মাথা ঝাঁকালেন কামাল হাসান, বিপুল উৎসাহে হাসছেন

তিনি, চোখ থেকে ঠিকরে বেরচ্ছে বিজয়ের উল্লাস। রানা আর অ্যানির উদ্দেশে হাত নাড়লেন, ইঙ্গিতে নিজের পাশের খালি গদিটা দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন।

‘উনি যদি চুরি করেন, ওঁর সাথে না খেললেই পারো তুমি,’ বলল অ্যানি।

আহত হলো মাইকেল। ‘তুমি বুঝতে পারছ না, ওল্ড গার্ল। এখনও আমি ঠিক ধরতে পারিনি কীভাবে অপকর্মটি করেছে সে। আমার দৃঢ় সন্দেহ, বিজ্ঞান আর জুয়ার জগতে সম্পূর্ণ নতুন একটা পদ্ধতি ব্যবহার করেছে সে। আদিকালের বুড়োটা যে ভণ্ড সাধু তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তবে এ-কথাও ঠিক যে অদ্ভুত এক ধরনের প্রতিভা তাকে সাহায্য করেছে। তার পদ্ধতিটা কী তা না জানা পর্যন্ত খেলে যেতে হবে আমাকে, এর কোন বিকল্প নেই।’ হঠাৎ তার চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ‘এবার বাছাধনকে আর দান মারতে হচ্ছে না...’ একটা কার্ড ফেলল সে, হরতনের ছয়।

কার্ডটা হেঁ দিয়ে তুলে নিলেন কামাল হাসান, কোমর আর নিতম্ব গদি থেকে তুলে অবিশ্বাস্য এক দেহ-ভঙ্গিমায় নাচতে শুরু করলেন তিনি, হাতের সব কার্ড মেলে দিলেন দামী উলেন কম্বলের উপর।

‘যীশুর মা, যীশু আর যীশুর বাপ!’ আঁতকে উঠল মাইকেল। ‘জোচ্চোরটা আবার জিতেছে!’

ছমড়ি খেয়ে থাকা বয়স্ক সর্দার আর মাতবররা উল্লাসে বিস্ফোরিত হলো, উলু-ধ্বনির মত লু-লু আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা চিরে। তাদের অভিনন্দনের জবাবে আহ্লাদে আটখানা কামাল হাসানের নর্তন-কুর্দনের গতিবেগ বেড়ে গেল। কম্বলের উপর ঝুঁকে

পড়লেন তিনি, বোমা ফাটানোর আওয়াজ তুলে গর্জে উঠলেন, ‘হাউ ডু ইউ ডু?’ সেই সঙ্গে খেলাচ্ছলে ঘুসি মারলেন মাইকেলের বাহুতে।

ব্যথায় মুখ বাঁকিয়ে আহত বাহুটা ডলতে শুরু করল মাইকেল। ‘যতবার জিতবে এই ঘুসি খেতে হবে আমাকে। হাতে মাংস নেই, শুধু হাড়, কাঁটা লাগানো হাড়-রানা, আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি!’

‘হাউ ডু ইউ ডু?’ আবার হাঁক ছাড়লেন কামাল হাসান, আগের চেয়ে জোর গলায়, মুঠো পাকিয়ে তাক করলেন মাইকেলের বাহু লক্ষ্য করে।

তাড়াতাড়ি মানিব্যাগ বের করল মাইকেল। ইতিমধ্যে তাঞ্জানিয়ান মুদ্রা যা ছিল সব সে হেরে গেছে। মানিব্যাগ দেখে কামাল হাসান হাত নামিয়ে নিলেন।

‘যতক্ষণ না টাকা দেই, একের পর এক মারতেই থাকে।’ টাকা গুণে কম্বলের উপর রাখল মাইকেল। কামাল হাসান সেগুলো তুলে নিয়ে নিজের থলেতে ভরলেন। ‘খেলাটায় আমি কোন মজা পাচ্ছি না,’ মুখ হাঁড়ি করে বলল মাইকেল। ‘নিজে হারব, তার ওপর আবার মারও খাব...হাতটা যদি ভেঙে যায়? শালার বুড়ো আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছে...’ আড়চোখে আব্বাসের দিকে তাকাল সে। ‘নো অফেন্স, অফকোর্স। বেজন্মা বুড়ো আমাকে একবিন্দু বিশ্বাস করে না- সম্ভবত নিজের মাকেও করে না, সঙ্গত কারণেই। সত্যি আমি বজ্রাহত!’ হঠাৎ থামল সে, কারণ তাস গুছিয়ে নিয়ে আবার বাঁটবার জন্য তৈরি হচ্ছেন কামাল হাসান।

‘হাউ ডু ইউ ডু?’ তারমানে আরও খেলবার জন্য মাইকেলকে উৎসাহ দিচ্ছেন বৃদ্ধ।

আব্বাসের দিকে তাকাল মাইকেল, ‘তোমার দাদুকে বলো, বিনা চ্যালেঞ্জে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না, পরে এক সময় শোধ

www.BanglaBook.org

নেব আমি। তবে এখন তার খানিকটা মেধা উভয়ের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সময় হয়েছে। শিফটা বাহিনী অপেক্ষা করছে দোরগোড়ায়।’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতের তাস একপাশে সরিয়ে রাখলেন কামাল হাসান, তীক্ষ্ণ গলায় অ্যামহারিক ভাষায় কিছু বললেন-পরামর্শভা শুরু হয়ে গেল। রানার দিকে ফিরলেন তিনি।

‘আমার দাদু তাঁর আর্মারড স্কোয়াড্রনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইছেন, মাসুদ ভাই,’ বলল আব্বাস। ‘গাড়িগুলো তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর ধারণা: ওগুলো ঠিক মত ব্যবহার করতে পারলে শিফটা বাহিনীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া যাবে।’

‘তাকে বলো, উনি তাঁর আর্মারড স্কোয়াড্রনের সিকি ভাগ যুদ্ধ না করেই ধ্বংস করে ফেলেছেন। আমাদের হাতে এখন মাত্র তিনটে গাড়ি আছে।’

রানার কথায় রাগা তো দূরের কথা, উত্তেজনায় সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন কামাল হাসান, সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন ভাগ্যদেবীর ড্রাইভার হিসাবে কী রকম বীরত্ব আর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। সর্দাররা মুহূর্মুহ উল্লাসে ফেটে পড়ল। বেশ কয়েক মিনিট পর আবার তিনি রানার দিকে ফিরলেন।

‘দাদু বলছেন, শিফটা বাহিনীকে মাটির সাথে গুইয়ে দেয়ার জন্যে তিনটে গাড়িই যথেষ্ট।’

‘তাঁর আত্মবিশ্বাসের বহর দেখে আমি মুগ্ধ,’ ব্যঙ্গ করল মাইকেল।

রানা বলল, ‘আরও সমস্যা আছে-ড্রাইভার আর গানারের অভাব রয়েছে আমাদের। তোমাদের লোককে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে

নিতে দু'এক হণ্টা সময় লাগবে।'

কামাল হাসান প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন, যেন রানার বক্তব্য অনুবাদ ছাড়াই বুঝতে পারছেন। তাঁকে সমর্থন করে সর্দার আর মাতবররাও চোঁচামেচি শুরু করল।

'দাদু চাইছেন, ওয়েলস অভ চান্ডিতে শিফটাদের পজিশনে হামলা চালাবেন। তাঁর ইচ্ছে, এই মুহূর্তে হামলা চালাতে হবে।'

মাইকেলের দিকে তাকাল রানা, মাইকেল তাঁবুর মাথার দিকে মুখ তুলে চোখ ঘোরাল।

'নির্মম সত্যটা ফাঁস কর, ওল্ড চ্যাপ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার কথা উনি শুনবেন বলে মনে হয়। বুঝিয়ে দেখো।'

বড় করে শ্বাস টানল মাইকেল, তারপর শুরু করল। আর্মারড সাপোর্ট সত্ত্বেও সামনে থেকে আক্রমণ করা আত্মহত্যার সামিল হবে, কারণ শত্রুদের কমান্ডিং পজিশনে ট্রেঞ্চের ভিতর রয়েছে মেশিনগান আর মর্টার। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবার পর সে বলল, 'নিজেদের গরজেই সামনে বাড়তে হবে শিফটাদের। তখন আমরা সুযোগ পাব।'

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় আর প্রাণশক্তির অর্ধেকটা ব্যয় করবার পর কামাল হাসানকে রাজি করাতে সমর্থ হলো মাইকেল। শিফটা বাহিনী ওয়েলস অভ চান্ডির মাথা থেকে নিজেদের পজিশন না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা। শিফটারা খোলা প্রান্তরে নেমে এলেই আক্রমণ করা হবে। এরপর আবার দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। তিনটে গাড়ির জন্য যথেষ্ট ড্রাইভার ও গানার নেই।

'আমি ড্রাইভ করতে পারি,' মাঝখান থেকে বলল অ্যানি, হঠাৎ সে বুঝতে পেরেছে তার কথা কেউ বিবেচনাতেই আনছে না।

রানা আর মাইকেল দৃষ্টি বিনিময় করল, সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই সম্পূর্ণ একমত হলো, তবে প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলল মাইকেল, 'শখের ড্রাইভার হিসেবে আর্মারড কার চালানো এক কথা, আর ওটা নিয়ে যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ অন্য কথা, মাই ডিয়ার। এখানে তুমি আছ যুদ্ধের রিপোর্ট লেখার কাজ নিয়ে, যুদ্ধ করার জন্যে নয়।'

কটমট করে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যানি, তারপর সমর্থনের আশায় ঝট করে রানার দিকে ফিরল। 'রানা!' শুরু করল সে।

'মাইকেল ঠিকই বলেছে,' অ্যানিকে থামিয়ে দিল রানা। 'ওর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।'

চুপসে গেল অ্যানি, রাগটা দমন করবার চেষ্টা করল, জানে এই মুহূর্তে তর্ক করে কোন লাভ হবে না। সে যে ওদের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয় সেটা সময় মত দেখিয়ে দেওয়া যাবে, ভাবল সে।

আবার আলোচনা শুরু হলো। রণকৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রানা বলল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভিকার্স গানসহ আর্মারড কারগুলো শিফটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, শিফটা বাহিনী যাতে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খায়। যে-কোন মূল্যে শিফটাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটা ফাঁক তৈরি করতে হবে, সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকবে কামাল হাসানের অশ্বারোহী সৈনিকরা, বিশৃংখল রাসটা বা হারারি পদাতিক বাহিনীর দুর্বলতা পুষিয়ে নেওয়ার এটাই একমাত্র বিকল্প।

আব্রাস বলল, 'দাদু এখন বলছেন, চান্ডির গুহা পেরিয়ে এলেই শিফটাদের উপর হামলা করতে হবে। হারারি আর গালা, দুই গোত্রের অশ্বারোহী যোদ্ধারা এই আক্রমণের দায়িত্ব নেবে, নেতৃত্ব থাকবে দুটো আর্মারড কার। পদাতিক, ভিকার্স গান আর

অবশিষ্ট আর্মারড কার এখনে, এই সারডি গিরিসংকটে রিজার্ভ হিসেবে থাকবে।’

‘গাড়িরগুলোর ড্রাইভার থাকবে কারা?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আপনি আর আমি একটা গাড়িতে, দ্বিতীয় গাড়িতে ড্রাইভার থাকবেন মেজর মাইকেল সেভারস, গানার থাকবেন দাদু।’

‘আমার কপালে এত বড় অভিশাপ নেমে আসছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,’ গুঁড়িয়ে উঠল মাইকেল। ‘আদিকালের বুড়োটা স্রেফ একটা উন্মাদ। নিজের জন্যে, এবং তার চারপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাকি সবার জন্যে সে একটা ভীতিকর অভিজ্ঞতা।’

‘শিফটাদের জন্যেও,’ সায় দিল রানা। হাসছে।

‘তুমি তো হাসবেই,’ অভিযোগ করল মাইকেল। ‘তোমাকে তো আর একটা টিনের কৌটার ভেতর ম্যানিয়াকটার সাথে থাকতে হচ্ছে না। আব্বাস, শোনাও ওকে...।’

‘না, মেজর সেভারস।’ মাথা নাড়ল আব্বাস, তার চেহারা নির্লিপ্ত। ‘আমার দাদু অর্ডার যা দেয়ার দিয়ে ফেলেছেন, তাঁর কথার উপর আর কোন কথা চলবে না। আপনার প্রতিবাদ আমি তাঁকে অনুবাদ করে শোনাব না—তবে আপনি যদি জেদ ধরেন, এইমাত্র তাঁর সম্পর্কে যে বিশেষগুলো উচ্চারণ করলেন সেগুলো অনুবাদ করে...।’

‘মাই ডিয়ার চ্যাপ,’ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে আব্বাসকে থামিয়ে দিল মাইকেল। ‘তোমার দাদু আমাকে নির্বাচিত করায় ব্যাপারটাকে আমি দুর্লভ সম্মান হিসেবে নিচ্ছি। মন্তব্য যেগুলো করেছি, স্রেফ কৌতুক ছিল, বিলিভ ইট। নো অফেন্স, ওল্ড চ্যাপ, নো অফেন্স অ্যাট অল।’ সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল, তাস তুলে নিয়ে পরবর্তী দান বাঁটতে গুরু করেছেন কামাল

www.BanglaBook.org

হাসান। ‘এখন আমার একটাই প্রার্থনা—তাড়াতাড়ি মুভ করুক শিফটার। তাসের পরাজয় আর আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারব না।’

তাঁর মুখ থেকে স্যালুট করল মেজর লুইগি রাকা। ‘আপনি আমাকে ডেকেছেন, মাই কর্নেল?’

বিশাল আয়নায় চোখ রেখে ছোট করে মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক, পরমুহূর্তে আবার নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে মনোযোগ দিল। ‘সাতা!’ ধমক মারল সে। ‘আমার বাঁ বুটের ডগায় ওটা কি ময়লার দাগ?’

সার্জেন্ট/ক্যামেরাম্যান বানানটো সাতা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসল কাউন্টের পায়ের কাছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল বুটের উপর, বুটের গায়ে তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ায় চকচকে ভাবটা স্পান হয়ে গেল— তাড়াতাড়ি নিজের শার্টের হাতা দিয়ে বুটটা পালিশ করল সে। তার খুব ইচ্ছে হলো কাউন্টকে খুশি করবার জন্য বুটের ডগায় একটা চুমো খায়, কিন্তু ঠোঁট লেগে ভিজে গেলে লাথি খেতে হবে ভেবে ইচ্ছেটাকে অতিকষ্টে দমন করল।

চোখ তুলে তাকিয়ে কাউন্ট দেখল এখনও প্রবেশপথের কাছে ইতস্তত করছে মেজর রাকা। তার চেহারা এমনই সীসার মত ভারি আর নীরস, কাউন্ট অনুভব করল তার রাগ ফিরে এসেছে। ‘গু-মুত খেয়েছ নাকি, রাকা, তোমার চেহারা অমন তেতো হয়ে আছে কেন?’

‘আমার আশংকার কথা আমি তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি, মাই কর্নেল।’

‘বটে!’ হুঙ্কার ছাড়ল কাউন্ট। ‘সেজন্যেই কি তোমাকে আমি

যুদ্ধযাত্রার আদেশ দেয়া সত্ত্বেও এখনও তুমি রওনা হওনি?’

‘মাই কর্নেল, আমি কি আরেকবার ব্যাখ্যা করতে পারি কেন আমাদের পজিশন ছেড়ে নড়া উচিত হবে না?’

‘না, পারো না! আরে খচ্চর, জেনারেল ফাদ স্বয়ং আমার ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন! তিনি মেসেজ পাঠিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, বলেছেন সারডি গিরিসংকট পেরিয়ে শিফটাদের নিয়ে সেলাসি বাহিনীর সাথে যোগ দিতে হবে আমাকে। হাজার হাজার হারারি আর রাসটাদের কে প্রতিহত করল? আমি না? খোলা প্রান্তরে রক্তশ্রোত বইয়ে দিয়ে কয়েক হাজার শত্রুর লাশ কে ফেলল? আমি না? কাজেই তিনি যে আমার ওপর আস্থা স্থাপন করবেন তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে! শুধু তোমার মত বেআক্কেল...।’

‘মাই কর্নেল, শত্রুরা...।’

‘বাহ্!’ ঘৃণায় কুঁচকে উঠল কাউন্টের চেহারা। ‘বাহ্ ছাড়া আর কী বলার আছে আমার? তুমি বলছ শত্রু, আমি বলি বর্বর! আমি বলি জংলী, তুমি বল সৈনিক। বাহ্!’

‘আমার কর্নেল যা বলেন, কিন্তু আর্মারড কার...।’

‘না! রাকা, না! ওটা কোন আর্মারড ভেহিকেল ছিল না-ছিল একটা অ্যান্ডুলেস।’ কাউন্ট নিজেকে সত্যিই তাই বুঝিয়েছে। ‘বিজয় নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, সেটা আমি তোমার কথায় হাত ছাড়া করতে পারি না। ভীতু মেয়েমানুষের মত গর্তের ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকতে অস্বীকার করছি আমি। ভয় পাওয়া আমার স্বভাব নয়, তুমি ভাল করেই জানো। আমি অ্যাকশন, ডিরেক্ট অ্যাকশন পছন্দ করি...।’

হাল ছেড়ে দিয়ে মেজর বলল, ‘কর্নেল যা বলেন।’

‘আমি কী বলি সেটা বড় কথা নয়, রাকা। বড় কথা হলো,

ঈশ্বর এই গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়েছেন। একজন বীরযোদ্ধা হিসেবে সে দায়িত্ব অবশ্যই আমি পালন করব।’

এর কোন জবাব হয় না। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে তাঁবু থেকে কাউন্টকে বের করার পথ করে দিল মেজর রাকা। কাউন্টের চিবুক উঁচু হয়ে আছে, দৃঢ় পায়ে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

সেই ভোর অন্ধকার থাকতে মেজর রাকার স্ট্রাইক ফোর্স তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশটা ট্রুপ ট্রান্সপোর্টার। সামনে বাড়বার আদেশ দিতে ইচ্ছে করেই দেরি করেছে মেজর রাকা।

ইতিমধ্যে রণকৌশল স্থির করে ফেলেছে সে। ওয়েলস অভ চান্ডির মাথার উপর, ট্রেঞ্চের ভিতর পুরো একটা কোম্পানী রেখে যাওয়া হবে, একজন ক্যাপটেনের অধীনে। বাকি সব ট্রুপস নিয়ে গিরিখাদের দিকে এগোবে তারা, প্রবেশপথ দখল করবে, লড়তে লড়তে উঠে যাবে হাইল্যান্ডের দিকে।

লাইনের প্রথমে পাঁচ ট্রাক ভর্তি রাইফেলম্যান রয়েছে, তার ঠিক পিছনে মেশিনগান সেকশন-কয়েক মিনিটের নোটিসে অ্যাকশনে যেতে পারবে ওগুলো। মেশিনগানের পিছনে বিশটা ট্রাকে রয়েছে পদাতিক বাহিনী, আর লাইনের একেবারে শেষ মাথায় রয়েছে আরও দশটা ট্রাক। ফিল্ড আর্টিলারিকে নিজের চোখ আর হাতের নীচে রেখেছে মেজর রাকা।

কলাম যদি ঘোরতর কোন বিপদে পড়ে, কামান খুলে সারিবদ্ধভাবে সাজাতে যে মূল্যবান সময় দরকার হবে তার জন্য পদাতিক বাহিনীর উপর নির্ভর করছে সে। কাউন্ট যে তাদেরকে

বিপদের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই, তবে কামানের সুরক্ষিত মাজলের ছত্রছায়ায় থেকে বিপদ মোকাবিলা করা কঠিন হবে না। মেজরের আত্মবিশ্বাস কম হলেও, একেবারে নেই তা নয়।

প্রতিটি স্থির ট্রাকের পাশে বালি মেশানো মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে-বসে রয়েছে ত্রু আর ড্রাইভাররা-খালি মাথা, শার্টের বোতাম খোলা, হাতে সিগারেট।

মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে বড় করে শ্বাস টানল মেজর লুইগি রাকা, তার নির্দেশ বজ্রনির্ঘোষের মত ছড়িয়ে পড়ল মরু প্রান্তরে। ‘ফল ইন!’

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠল লোকজন, ব্যস্ত হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে ইউনিফর্ম ঠিকঠাক করল, প্রতিটি ট্রাকের পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়াল তারা।

‘আমার আদরের সন্তানরা! আমার বুকের মাণিকরা!’ উত্তেজিত ভাবে লাইনের সামনে পায়চারি শুরু করল কাউন্ট ডিকানডিয়া। ‘তোমরা আমার রক্ত, হে আমার বীর সন্তানরা!’ খুঁটিয়ে প্রত্যেককে দেখছে সে, কিন্তু আবেগের বশে দৃষ্টি বাপসা হয়ে থাকায় দেখতে পাচ্ছে না শার্টের বোতাম খোলা, সিগারেট ধরা হাত পিছনে লুকানো, মুখে না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ‘জানি, আমি জানি রক্তপিপাসায় অস্থির হয়ে আছ তোমরা!’ পিছনের বাতাসে হেলান দিয়ে মুক্তকণ্ঠে হাসল সে। ‘বাহারা, তোমাদের আমি বালতি বালতি রক্ত দেব! আজ তোমরা মনের আশ মিটিয়ে তা পান করতে পারবে!’

যারা শুনতে পাবার মত কাছাকাছি রয়েছে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল, অস্বস্তির সঙ্গে মাথা চুলকাল কেউ কেউ। মদ খেয়েছে সবাই, কিন্তু তাই বলে স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি

হারায়নি তারা। ভাবছে, কাউন্ট কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল?

অল্পবয়সী এক ভাড়াটে সৈনিকের সামনে দাঁড়াল কাউন্ট, হেলমেটের বাইরে তার লম্বা চুল ঝুলে রয়েছে। ‘গামবিনো,’ বলল কাউন্ট। ছোকরা মাথা নত করে অপ্রতিভ ভাবটুকু লুকানোর চেষ্টা করল। ‘তোমাকে আজ আমরা একজন বীরযোদ্ধা বানাব।’ রাইফেলম্যান সৈনিকটিকে আলিঙ্গন করল সে। ‘তোমাকে শত্রুর হাতে নিহত হয়ে প্রমাণ করতে হবে...কী প্রমাণ করতে হবে? প্রমাণ করতে হবে, কাউন্ট ডিকানডিয়ার নির্দেশ পেলে হাসতে হাসতে মরতে পারো তুমি।’ সৈনিকের লাজুক হাসি দপ করে নিভে গেল, মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে মুখ তুলল সে।

‘গাও, গামবিনো, গাও!’ চেষ্টা করে উঠল কাউন্ট, নিজেই হেঁড়ে গলায় গাইতে শুরু করল, ‘কাউন্ট ডিকানডিয়ার অপর নাম, দুর্জয় সাহস/সামনে যাকে পাও কেটে করো সাফ, মানুষ কিংবা মোষ...।’ লাইনের সামনে মার্চ করতে করতে গেয়ে চলল সে, তার পায়ের নীচে মাটি খরখর করে কাঁপতে লাগল, লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছুবার পর তার গান থামল। মেজর রাকার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, মেজর আবার একটা হুংকার ছাড়ল।

‘মাউন্ট আপ!’

কালো শার্ট পরা ট্রুপারদের ঝাঁকটা ভেঙে গেল, যে-যার ট্রাকের দিকে ছুটল সবাই।

কলামের মাথায় সম্মানসূচক জায়গাটি দখল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্টের রোলস-রয়েস, ড্রাইভারের সিটে আগেই উঠে বসেছে ডিনো, তার পাশে বানানটো সাতা, হাতে ক্যামেরা।

রোলস-রয়েসের এঞ্জিন স্টার্ট দেওয়া রয়েছে, কাউন্টের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র পিছনের সিট ভর্তি। স্পোর্টস রাইফেল,

শটগান, ট্রাভেলিং ব্যাগ, পিকনিক বক্স, বেতের তৈরি ওয়াইন ক্যারিয়ার. বিনকিউলার, টেবিল ঘড়িসহ আরও কত কী। গাড়িতে চড়ে প্যাড লাগানো নরম সিটে হেলান দিল কাউন্ট, তাকাল মেজরের দিকে। ‘মনে রেখো, রাকা, আমার রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য হলো গতি আর চমক। শত্রুর হৃৎপিণ্ডে বজ্রাঘাত হানো-কাউন্ট ডিকানডিয়ার নামে।’

কলামের সর্বশেষ ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে বসে রয়েছে মেজর লুইগি রাকা, সামনের উনপঞ্চাশটা ট্রাকের ধুলো খাচ্ছে আর দরদর করে ঘামছে। হাতঘড়ি দেখল সে। ‘সর্বনাশ, এরইমধ্যে এগারোটা পেরিয়ে গেছে!’

এই সময় কাকে যেন অভিশাপ দিয়ে কষে ব্রেক করল ড্রাইভার, ট্রাক পুরোপুরি থামবার আগেই লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডে বেরিয়ে এল মেজর, সেখান থেকে আরেক লাফে উঠে পড়ল ক্যাবের ছাদে। ‘কী ব্যাপার?’ সামনের ট্রাকের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল সে।

‘কী জানি, মেজর, কিছু বুঝতে পারছি না,’ পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল লোকটা।

তাদের সামনে গোটা কলাম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ হতে মাথা নিচু করে নিল মেজর, তার ধারণা হলো, সরাসরি একটা অ্যামবুশের ভিতর এসে পড়েছে তারা। চারদিক থেকে প্রশ্ন আর মন্তব্য শোনা গেল। প্রায় সব ট্রাক থেকেই নেমে এল ড্রাইভার আর হেলপাররা। সামনে কোথাও থেকে গুলির আওয়াজ হয়েছে।

চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাল মেজর রাকা। মরু বিস্মৃতি পেরিয়ে আবার ভেসে এল গুলির শব্দ। এতক্ষণে রোলস-

রয়েসটাকে বিনকিউলারের লেন্সে ধরতে পারল সে।

কলাম থেকে বেরিয়ে বাম দিকের খোলা প্রান্তুর ধরে ছুটছে রোলস-রয়েস। ব্যাক সিটের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট, তার হাতে শটগান। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। মেজর রাকাও তাকাল। পাখির পালক উড়ছে বাতাসে, নিহত পাখিটা ডিগবাজি খেতে খেতে রোলস-রয়েসের খানিকটা সামনে পড়ল। পাখির ঝাঁকটা এখনও রয়েছে নাগালের মধ্যে। কাউন্টের শটগান আবার গর্জে উঠল। নীল আগুনের ফুলকি বেরল মাজল থেকে। আকাশে বিস্ফোরিত হলো আরও দুটো পাখি, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল পালকগুলো। ব্রেক করল ড্রাইভার।

বানানটো সাতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেজর, গাড়ি থেকে নেমে নিহত পাখি নিয়ে দৌড়ে কাউন্টের কাছে ফিরে এল সে। সাতার হাত থেকে পাখি নিয়ে পোজ দিল কাউন্ট, হাঁটু গেড়ে বসে চোখে ক্যামেরা তুলল বানানটো সাতা। তার ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল। এত দূর থেকে শুনতে না পেলেও কী বলছে সে বুঝতে পারল লুইগি রাকা-‘আরেকটু হাসুন, মাই কাউন্ট।’ সত্যিই তাই, পর মুহূর্তে দু’কান পর্যন্ত বিস্মৃত হলো কাউন্টের ঠোঁট।

‘শালা বানচোত ডোবাবে!’ দাঁতে দাঁত চেপে ঝাল ঝাড়ল মেজর রাকা।

তিন

আদিবাসী যোদ্ধাদের মধ্যে বিপজ্জনক একটা অস্ত্রিরতা মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। সেই সকাল থেকে খুলি ফাটানো রোদের মধ্যে

বসে অপেক্ষা করছে তারা অথচ যুদ্ধ শুরুর কোন আলামত এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

সকাল দশটার দিকে স্কাউটরা এসে রিপোর্ট করে গেছে, শিফটারা পজিশন ছেড়ে রওনা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কামাল হাসানের আদিবাসী বাহিনী সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত পজিশনে চলে এসেছে, কিন্তু তারপর আর কোন খবর নেই।

শিফটাদের প্রথম আক্রমণটা কোথায় ঠেকানো হবে মাইকেল আগেই তা ঠিক করে রেখেছিল, সম্ভাব্য ভাল পজিশন খুঁজে বের করবার জন্য তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। আদিবাসীদের অশ্বারোহী বাহিনী অত্যন্ত বিশৃংখল, অল্প সময়ের ভিতর যতটা সম্ভব ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তাদের, সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে, চোখ-কান খোলা না রাখলে অ্যামবুশের ফাঁদে পড়তে হবে।

নির্বাচিত জায়গাটা দুই গিরিশৃঙ্গের মাঝখানে-সরু সারডি গিরিসংকট যেখানে চওড়া হতে শুরু করে একটা ফানেল-এর সৃষ্টি করেছে, তার মুখের কাছে। জানা কথা, শিফটাদের সামনে এটাই একমাত্র খোলা পথ, দৈর্ঘ্যে সেটা প্রায় বারো মাইলের মত।

আক্রমণকারীদের কোনভাবে দক্ষিণ শৃঙ্গের কাছাকাছি টেনে আনতে হবে, ওদিকে পাথুরে ঢালের উপর ভিকার্স মেশিনগানগুলো বসানো হয়েছে, ওখান থেকে পাথুরে ঢাল বেয়ে ছোট্ট একটা পানিপথও নেমে গেছে খোলা প্রান্তরে। নালাটা এখন শুকনো, ঐকৈবেঁকে পাঁচ মাইল এগিয়ে মরুভূমির সঙ্গে মিশে গেছে, তবে গালা, হারারি আর রাসটা অশ্বারোহী সৈনিকদের লুকিয়ে থাকবার জন্য যথেষ্ট গভীর আর চওড়া ওটা।

নালায় মেঝোতে বালি যেন সাদা চিনি, পাশে ঘোড়া নিয়ে সারাদিন সেখানে অপেক্ষা করল বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী। বুদ্ধি

করে দুটো দলকে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে-রাসটা আর হারারিরা পজিশন নিয়ে আছে ফাঁদের মাথায়, পাহাড়ের পাথুরে ঢালের সবচেয়ে কাছাকাছি, ওখানে বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে ভিকার্স গানাররা। আর গালারা পজিশন নিয়েছে নালায় আরও সামনে, নালাটা যেখানে খোলা প্রান্তরে বেরুবার পর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে শুকনো ঘাসজমির দিকে। ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে গালাদের একজন সর্দার, দাগী কাপুলা। কাপুলা গালায় মুখে, চোখের কোণ থেকে চিবুক পর্যন্ত লম্বা, একটা কাটা দাগ আছে, সেজন্যই তার নামের আগে ওই শব্দটা বসেছে। গালা অশ্বারোহীদের পরনে নীল আলখেল্লা।

নালায় বাঁকটার কাছে। পাড় এত উঁচু যে বারোশো অশ্বারোহীকে লুকিয়ে রাখতে কোন অসুবিধে হলো না। হারারি আর রাসটা অশ্বারোহীদের সংখ্যাও কম নয়, প্রায় তিন হাজার। বিজয় বা পরাজয় নির্ভর করছে দুটো প্রশ্নের উপর, শৃংখলা আর ধৈর্যের সঙ্গে কতক্ষণ নালায় ভিতর নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারবে ওরা, বিদেশী কমান্ডারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে কিনা। সন্দেহ নেই, খোলা মরু ধরে এগিয়ে আসার সময় শিফটারা বিশৃংখল আর এলামেলো অবস্থায় থাকবে, অতিরিক্তে বাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা। সারাদিন সূর্যের অত্যাচার সহ্য করে সবাই ক্লান্ত আর মেজাজী হয়ে উঠেছে, দানা-পানির অভাবে হটফট করছে ঘোড়াগুলো।

অদৃশ্য একটা জাল ফেলে রেখেছে মাইকেল সেভারস, সেই জালে শিফটা বাহিনীকে আটকাতে চায় সে। জালের মুখ হিসাবে বেছে নিয়েছে নালায় চওড়া একটা বাঁক, তার আশা টোপ গিলিয়ে

এখানে তাদেরকে আনতে পারবে সে। খোলা প্রান্তরের আরও দু'মাইল সামনে, মাটির একটা চওড়া আর উঁচু ভাঁজের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অশ্বারোহীদের ছোট্ট একটা দল, মাইকেলের টোপ। এই মুহূর্তে ভাঁজটার কাছ থেকে খানিকটা পিছনে, গরবিনীর টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল। আজ সকালে প্রথম যখন খবর এল শিফটারা মুভ করছে, সেই থেকে ওখানে পজিশন নিয়েছে ছোট্ট দলটা। আর সবার মত তারাও অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, একঘেয়েমির শিকার। ওরা স্বাধীনচেতা, উচ্ছৃঙ্খল, বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী, এখনও যে ওরা জোট ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েনি সেটাই আশ্চর্য লাগল মাইকেলের। যে-কোন মুহূর্তে ধুবোর বলে বাড়ির পথ ধরলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

নিজের কাজে ব্যস্ত এবং খুশি, এমন লোক মাত্র একজনকেই দেখতে পেল মাইকেল। চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে অকারণ অস্বস্তির সঙ্গে ভদ্রলোকের দৃশ্যমান অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। চঞ্চলার এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের ভিতর কোমর থেকে উপরের অংশ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে রানার, বাইরে বেরিয়ে আছে শুধু পা আর উরুর পিছনটা। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে বিরতিহীন শিস।

‘ওখানে তোমার সাফল্যের পরিমাণ কি উল্লেখ করার মত?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল, শ্রেফ শিসটা থামানোর জন্য, কারণ সুরটা একেবারেই অর্থহীন লাগছে তার।

এলোমেলো চুলসহ মাথাটা বের করল রানা, একদিকের গালে কালো তেলের দাগ। ‘সমস্যাটা বোধহয় ধরতে পেরেছি,’ বলল ও। ‘কার্বন রডে খানিকটা ময়লা ঢুকে পড়েছে।’ আব্বাসের হাত থেকে ন্যাকড়া নিয়ে হাত মুছল। ‘শিফটাদের মতলবটা কী বুঝতে পারছ কিছু?’

‘একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, ওল্ড চ্যাপ।’ চোখে বিনকিউলার তুলে চারদিকটা আবার একবার দেখে নিল মাইকেল, চোহারায় গাঙ্গীর্ষ আর উদ্বেগ। ‘স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি ভেবেছিলাম মরার জন্যে পঙ্গপালের মত ছুটে আসবে শালারা, সামনে পিছনে ভুলেও তাকাবে না।’

ধীর পায়ে হেঁটে এল রানা, গরবিনীর টারিটে মাইকেলের পাশে উঠে পড়ল। নালা যেখানে বাঁক নিয়েছে তার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কার দুটো, খানিক সামনেই সীমাহীন ঘাস আর ঢেউ তোলা বালির পাহাড়ের ভিতর অস্তিত্ব হারিয়েছে নালাটা। এখানে নালার পাড় খুব কম উঁচু, কার দুটোর খোল আড়াল করা গেলেও, টারিটের উপরের অংশ পাড়ের কিনারা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে। গাছপালার শুকনো ডাল দিয়ে ঢাকা হয়েছে ওগুলো, ক্রুদের অবজারভেশন পোস্ট হিসাবে কাজ করছে।

রানার হাতে বিনকিউলারটা ধরিয়ে দিল মাইকেল। ‘আমার ধারণা, শত্রুদের কমান্ডার লোকটা কুঁড়ের বাদশা অথবা ভীতুর ডিম। দু’পা এগোয় তো এক পা পিছোয়।’ উদ্বেগের সঙ্গে মাথা নাড়ল সে। ‘ব্যাপারটা আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না।’

‘আবার থেমেছে দেখছি,’ বলল রানা, দূরের ধূলিমেঘ দেখে কলামের মাথার পজিশন ঠাहर করল ও। ধুলোর পাহাড় সামনে এগোচ্ছে না, ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে আকারে।

‘ওহ মাই গড!’ গুঙিয়ে উঠল মাইকেল, ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল বিনকিউলার। ‘শালার ব্যাটা শালা নির্ধাত কোন ফন্দি এঁটেছে! এবার নিয়ে সাতবার থামল অথচ সহজবোধ্য কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুর্লভ কোন সামরিক প্রতিভার খপ্পরে পড়েছি আমরা—নেপোলিয়ানের আধুনিক

সংস্করণ। আক্রমণ না করেই শালা আমার নার্ভের দফারফা করে দিয়েছে!’

স্মিত হেসে রানা পরামর্শ দিল, ‘তোমার আসলে যা দরকার তা হলো খানিকটা অবসর সময়, রামি খেলার জন্যে। কামাল হাসান অপেক্ষা করছেন, সে খবর রাখো?’ যেন অনুবাদ ছাড়াই রানার কথা বুঝতে পারলেন, চোখে নগ্ন প্রত্যাশা নিয়ে গরবিনীর পাশ থেকে ওদের দিকে মুখ তুললেন গোত্রপ্রধান কামাল হাসান। আর্মারড কারের পাশে সামান্য ছায়া পড়েছে, সেখানে একটা অ্যামুনিশন বক্স রাখা হয়েছে, ঢাকনির উপর তাস সাজিয়ে বসে আছেন তিনি। তাঁর পিছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা, তারাও আগ্রহের সঙ্গে মুখ তুলল।

‘ওরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে,’ হাঁসফাঁস করে উঠল মাইকেল। ‘জানি না কোন্ দল বেশি বিপজ্জনক—বেজন্না বুড়োটা, নাকি কুঁড়ের বাদশা শিফটাদের কমান্ডার!’ আবার চোখে বিনকিউলার তুলল সে, পাহাড়শ্রেণীর লম্বা পাদদেশের উপর দৃষ্টি বুলাল। ধুলোর কোন চিহ্নমাত্র দেখল না সে। ‘শালারা করছেটা কী?’

সপ্তম যাত্রাবিরতির নির্দেশটা কাউন্ট ডিকানডিয়ার তরফ থেকেই এল। সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার আদৌ কোন উপায় ছিল না।

যে-কোন বিচারে যাত্রাবিরতির কারণটাকে জরুরী বলে অভিহিত করা যায়। কাউন্টের পোর্টেবল কমোড অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে একটা ট্রাক থেকে নামানো হলো, ওটাতেই তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বহন করা হচ্ছে। ওদিকে রোলস-রয়েসের পিছনের সিটে মোচড় খাচ্ছে কাউন্টের শরীর, গোঙাচ্ছে সে, প্রকৃতির ডাকে এখুনি সাড়া দিতে না পারলে তার শারীরিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়বে,

লেজেগোবরে হয়ে যাবে অভিজাত্য আর প্রাইভেসী। ‘আরেকটু ধৈর্য ধরুন, মাই কাউন্ট,’ পাশ থেকে তাকে সাবুনা দিল বানানটো সাতা, কাউন্টের দুর্দশা দেখে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী। ‘জানি, এর কারণ কি আমি জানি,’ ধরা গলায় বলল সে। ‘কুয়ার পানি, মাই কাউন্ট! কুয়ার দূষিত পানি!’

কমোডটা এমনভাবে বসানো হলো, ব্যক্তিগত কাজটি সারবার মুহূর্তে কাউন্ট যাতে একই সঙ্গে পাহাড়শ্রেণীর সৌন্দর্য অবলোকনের সুযোগ পায়। কমোডের তিন দিকে ক্যানভাসের পর্দা টাঙানো হলো, পাঁচশো পদাতিক সৈনিকের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে আসনটি আড়াল করবার জন্য।

আয়োজন শেষ হলো একেবারে চরম মুহূর্তে। তিনজন লোকের ঘাড়ে চেপে রোলস-রয়েস থেকে নামল কাউন্ট, অবিরাম কাতরাচ্ছে সে। গোটা কলাম স্থির হয়ে গেল, শ্রদ্ধা ও আগ্রহসূচক নিম্মুদ্রতা নেমে এল সৈনিকদের মধ্যে। তিনজন লোক কাউন্টকে কমোডের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল সে, এমনভাবে ছুটল যেন অলিম্পিক দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে চায়। চোখের পলকে ক্যানভাস পর্দার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মাত্র দু’এক সেকেন্ড পরই ভিতর থেকে হুংকার ভেসে এল।

‘ডাক্তার ডাকো!’

রহস্যে ভরপুর ছায়াছবির শেষ দৃশ্যে দর্শকরা যেমন উত্তেজনাবোধ করে, সম্মোহিত হয়ে পড়ে, পাঁচশো যোদ্ধারও সেই একই অবস্থা হলো। কাউন্ট চিৎকার করে উঠতেই তাদের মধ্যে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ল, এক কান থেকে আরেক কান হয়ে শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছল মেজর লুইগির কানে। বিশ্বাস আর

অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব অস্থির হয়ে ছুটে এল সে, ব্যাপারটার তদন্ত হওয়া দরকার।

পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে সে দেখল, কাউন্ট আর তার মেডিকেল অ্যাডভাইজাররা কমোডটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কমোডের মাঝখানে পড়ে থাকা পদার্থ সম্পর্কে জোর আলোচনা চলছে। কাউন্টকে ম্লান দেখাল, কিন্তু তবু সে সদ্য মাতৃত্ব অর্জনকারিণীর মত গর্বিত, যার সন্তান সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে।

দোরগোড়ায় নড়াচড়া লক্ষ করে সেদিকে তাকাল কাউন্ট, মেজর রাকাকে দেখতে পেয়ে গম্ভীর হলো। তাকেও কমোডে পড়ে থাকা পদার্থ পরীক্ষার জন্য ডাকা হতে পারে, এই ভয়ে কঁকড়ে ছোট হয়ে গেল মেজর। তাড়াহুড়োর সঙ্গে স্যাঁলুট করল সে, পিছিয়ে গেল এক পা। ‘ইওর এক্সপ্লেন্সী আমাকে কি তলব করেছেন?’

‘আমি একজন অসুস্থ মানুষ, রাকা,’ বলেই একটা ভঙ্গি নিয়ে ফেলল কাউন্ট-শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেল, আলগাভাবে দুলাতে লাগল মাথা। তারপর ধীরে ধীরে কাঁধ শক্ত করল সে, উঁচু করল চিবুক। টান পড়ল ঠোঁটে, দুর্বল হাসি ফুটল সামান্য। ‘কিন্তু সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমরা অগ্রসর হব, রাকা। শত্রুর দুর্জয় দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব! আমার বাহিনীকে বলো, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। সত্যি কথাটা তাদের কাছে গোপন করে যাও। আমি অসুস্থ জানলে ওদের মনোবল ভেঙে যাবে, ওরা আতংকিত হয়ে পড়বে।’

আবার স্যাঁলুট করল মেজর। ‘আপনি যা বলেন, মাই কর্নেল।’

‘আমাকে সাহায্য করো, রাকা,’ নির্দেশ দিল কাউন্ট। ‘আমি গাড়িতে ফিরব।’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাউন্টের একটা হাত ধরল লুইগি রাকা, তার কাঁধের উপর মাথার ভার চাপিয়ে দিল কাউন্ট।

ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, মেজরের কাঁধ থেকে মাথা তুলে অপেক্ষারত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে সহাস্যে হাত নাড়ল কাউন্ট। ‘বাহারা!’ বিড়বিড় করে বলল সে। ‘আমার অসুস্থতার কথা জানতে পারলে কেঁদে বুক ভাসাবে ওরা। না, ওদেরকে জানানো চলবে না। ওদেরকে আমি বিজয়ের পথে অবশ্যই এগিয়ে নিয়ে যাব।’

‘ওখানে ছাই ঘটছেটা কী, বলবে আমাকে?’ টারিটে দাঁড়ানো রানার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল মাইকেল, ভারি উদ্ভিগ্ন।

‘কিছু না,’ আশ্বস্ত করল রানা। ‘কোন নড়াচড়া নেই।’

‘লক্ষণটা ভাল মনে করছি না।’ গম্ভীর হলো মাইকেল, আর ঠিক তখনই বিজয়ীর উল্লাস বেরিয়ে এল কামাল হাসানের গলা থেকে, কোমর আর নিতম্ব তুলে নৃত্য শুরু করলেন, মাইকেলের সামনে মেলে দিলেন হাতের সব ক’টা তাস। ‘এটা আরও খারাপ লক্ষণ,’ বলে ঘুসি খাওয়ার আগেই পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগ বের করল, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ আবার তাস ফাঁটতে শুরু করেছেন। ‘অ্যানির ব্যাপারটা, তার কী খবর?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘ছায়া পর্যন্ত দেখছি না,’ আবার আশ্বস্ত করল রানা। ‘দেখব বলে আশাও করি না।’

‘তার আচরণ আমার ভাল লাগেনি। নিষেধটা অমন শান্তভাবে নিল কেন? আমার হিসেবে বলে, অনেক আগেই তার উদয় হওয়ার কথা ছিল।’

‘ধরে নাও হিসেবে ভুল করেছ,’ বলল রানা, চোখে বিনকিউলার তুলে ফাঁকা দিগন্তে দৃষ্টি বুলাল।

‘আমার হিসেবে সাধারণত ভুল হয় না বলেই তো চিন্তা হচ্ছে,’

বলে তাসগুলো তুলে নিল মাইকেল। ‘যে-কোন মুহূর্তে তার গাড়িটা আমরা দেখতে পাব। ক্যাম্পে অলস সময় কাটাবে, তেমন মেয়েই সে নয়, বিশেষ করে এখানে যখন পুরোদস্তুর একটা যুদ্ধ লাগতে যাচ্ছে। কোথাও কিছু ঘটলে, সামনের সারিতে থাকা তার স্বভাব।’

‘তা ঠিক,’ একমত হলো রানা। ‘গিরিখাদে থাকতে রাজি হলো বটে, কিন্তু তার ভাবসাব আমারও ভাল ঠেকেনি। তাই এমন ব্যবস্থা করে এসেছি, নিতম্বিনী নড়বে না একচুল।’

‘মানে?’

‘তেমন কিছু না,’ বলল রানা। ‘ডিসট্রিবিউটর থেকে কার্বন রড খুলে নিয়ে এসেছি।’

টোট টিপে হাসতে শুরু করল মাইকেল। ‘সারাদিনে এই একটাই সুখবর পেলাম। বাঁচা গেল, দু’পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে অ্যানিকে দেখা যাবে না।’

‘ভাড়াটে ইটালিয়ানদের কপাল মন্দ,’ মন্তব্য করল রানা। ‘দু’জনেই হেসে উঠল।

‘মারো মধ্যে তুমি আমাকে সত্যিই অবাক করে দাও, তা জানো কি, ওল্ড চ্যাপ?’ পকেট থেকে চুরুট বের করে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল মাইকেল। ‘আমার সম্পত্তির নিরাপত্তার দিকটায় তুমিও লক্ষ রাখছ, সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ,’ বলল সে। ‘সত্যি, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল।’

চুরুটের গোড়া কামড়ে ছিঁড়ল রানা, দিয়াশলাইয়ের কাঠি জেলে সেটা ধরাবার সময় চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল মাইকেলের দিকে। ‘র‍্যাপের নিয়ম দেখছি কিছুই তুমি জানো না হে,’ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল ও। ‘মালিকানার ছাপ না মারা পর্যন্ত সব গরুই বেওয়ারিস।’ ওর অভিনয় দারুণ বিশ্বাসযোগ্য হলো।

তাগড়া যোয়ান দেখে আদিবাসী পাঁচজন যুবককে বেছে নিল অ্যানি উইসপার, এরা সবাই কামাল হাসানের ক্যাম্প পাহারা দেওয়ার জন্য রয়ে গেছে। প্রত্যেককে এক ডলার করে মজুরি দিল, খাটিয়ে নিল গাধার খাটনি। প্রতিবার একজন করে নিতম্বিনীর ক্র‍্যাকহ্যান্ডেল ঘোরাল তারা, পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে উৎসাহ দিল অ্যানি, রাগ আর হতাশায় টকটকে লাল হয়ে আছে তার চেহারা।

এভাবে এক ঘণ্টা কাটবার পর সে বুঝল, তাকে নিরাপদ দূরত্বে আটকে রাখবার জন্য স্যাবোটাজ করা হয়েছে, অর্থাৎ নিতম্বিনীর এঞ্জিনে কোথাও কলকাঠি নাড়া হয়েছে। অ্যানি উইসপার হলো সেই দুর্লভ প্রজাতির মেয়ে যে কিনা কোথায় কী ঘটছে জানবার জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে বা যে-কোন ঝুঁকি নিতে সদা প্রস্তুত। সে তার অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক মেটানোর জন্য সারাটা জীবন অসংখ্য বন্ধু, মেকানিক, আর ইন্ট্রাকটরদের অজস্র প্রশ্ন করে শুধু যে বিরক্ত করেছে তাই নয়, শিখেছেও প্রচুর। বোতাম টিপে একটা মেশিন বা এঞ্জিন চালু করতে পারাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। ড্রাইভার আর পাইলট হয়েই সম্ভব হতে পারেনি সে, গাড়ি আর প্লেনের এঞ্জিন কীভাবে কাজ করে তা-ও সে শিখেছে। ‘ঠিক আছে, জনাব মাসুদ রানা, দেখা যাক তোমার কুকীর্তি ধরতে পারি কিনা,’ গান্ধীর্যের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলল সে। ‘প্রথমে পরীক্ষা করা যাক ফুয়েল সিস্টেম।’

চুলগুলো এক করে মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধল সে, শার্টের আঙ্গিন গুটিয়ে কাজে নেমে পড়ল। প্রকাণ্ডদেহী পাঁচজন হেলপার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল। এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে কাউলিংটা তুলে ফেলল অ্যানি। পাঁচজনই তারা এবার

ভিড় করে এগিয়ে এল পরামর্শ আর সাহায্য নিয়ে। কাজ শুরু করবার আগে তাড়া করে তাদের খেদাতে হলো অ্যানির। একবার কাজ শুরু করবার পর চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তার আর কোন খেয়ালই থাকল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফুয়েল সিস্টেম টেস্ট করা হয়ে গেল, নিশ্চিতভাবে বুঝল ট্যাংক থেকে কোন বাধা ছাড়াই কারবুরেটর আর সিলিভারে পৌঁছুচ্ছে ফুয়েল, পাম্পটাও কাজ করছে সুষ্ঠুভাবে।

এরপর ইলেকট্রিক সিস্টেম পরীক্ষা করা দরকার। শুরু করতে যাবে, তার শার্টের প্রান্ত ধরে টান দিল কেউ। বিরক্ত হলো অ্যানি, কিন্তু তাকাল না, বলল, ‘হ্যাঁ, শুনছি, বলো কী বলতে চাও।’

কোন জবাব না পেয়ে রাগের সঙ্গে ঘাড় ফেরাল সে, অবাধ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। ‘বানু!’ দৃষ্ট বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে আনল অ্যানি। ‘ফর গডস সেক, এখানে তুমি এলে কীভাবে!’

‘পালিয়েছি, মিস অ্যানি। হাসপাতাল তো একটা কয়েদখানা, আমার মত ছাগলছানা ওখানে কী করে থাকে, বলো?’

‘মাই গড! কিন্তু এলে কীভাবে?’

‘বাবার এক লোককে বললাম, একটা ঘোড়া চাই আমার। জানালা দিয়ে বেরিয়ে ওটার পিঠে চড়লাম। তারপর গিরিখাদ বেয়ে নামা, সে তো আমার জন্যে পানি।’

‘তোমার সেই বন্ধুর কী হলো? যুবক ডাক্তার?’ আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল অ্যানি, এখনও বানুর হাত ধরে আছে, মেয়েটির প্রতি তার দরদ আর ভালবাসা উপলব্ধি করে মনে মনে নিজেই খানিকটা বিস্মিত।

‘ও, সে!’ বানুর স্বরে তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা। ‘গোটা হাসপাতালে সেই ছিল সবচেয়ে নীরস আর একঘেয়ে। ডাক্তার! হুঁহু! একটা

মেয়ে কি চায় তাই সে জানে না! আমি শেখাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এমন কী শেখার আগ্রহও তার নেই।’

হাসি চেপে অ্যানি জিজ্ঞেস করল, ‘আর তোমার পা? পা কেমন আছে?’

‘ও কিছু না, ঠিক হয়ে গেছে।’ জখমটাকে কোন গুরুত্বই দিল না বানু, যদিও অ্যানি লক্ষ করল আগের চেয়ে বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। দীর্ঘ, দুর্গম গিরিখাদ বেয়ে নামতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে এল অ্যানি, একটা গাছের নীচে ছায়ায় বসাল।

‘শুনলাম যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে,’ বলল বানু। ‘সেজন্যেই চলে এলাম।’ চেহারাই বলে দেয় তার পায়ে এখনও ব্যথা আছে, কিন্তু সেটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করছে সে। ‘শিফটারা নাকি মুভ করেছে?’ চারদিকে চোখ বুলাল একবার। ‘রানা, মাইকেল, ওদের দেখছি না যে? আব্বাসই বা কোথায়?’

‘ওরা যুদ্ধে গেছে,’ মৃদুকণ্ঠে বলল অ্যানি।

‘যুদ্ধে গেছে? আর আমরা? আমরা এখানে কী করছি, মিস অ্যানি?’ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল বানুর।

‘আমরা যাতে যেতে না পারি তার ব্যবস্থাও করে গেছে...।’

‘কী!’

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল অ্যানি। সব শুনবার পর মাথায় হাত দিল বানু।

‘পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করেছ কি মরেছ!’ অবশেষে মন্তব্য করল সে। ‘তবে আমাদেরও ওরা চেনে না-দাঁড়াও, ভেলকি দেখিয়ে ছাড়ব।’ খানিকক্ষণ চিন্তা করল সে, ধীরে ধীরে হতাশার

ছায়া নামল চেহায়ায়। ‘কিন্তু আমার মাথায় যে কোন বুদ্ধি আসছে না! তবে কি ওরা শুধু একাই মজা লুটবে? আমরা যুদ্ধে যাব না?’

‘যাব, অবশ্যই যাব!’

বানুকে পাশে নিয়ে আর্মারড কারের এঞ্জিন পরীক্ষা করা অসম্ভব ব্যাপার, না চাইতেই সাহায্য করতে গিয়ে সে শুধু কাজে বিঘ্নই সৃষ্টি করল। ছয়বারের বার কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়ার পর অ্যানি জিঙ্কস করল, ‘কীভাবে ভিকার্স মেশিনগান চালাতে হয় জানো তুমি?’

‘আমি পাহাড়ী মেয়ে, মিস অ্যানি,’ সগর্বে বলল বানু। ‘আমার জন্মই হয়েছে হাতে বন্দুক আর দু’পায়ের মাঝখানে ঘোড়া নিয়ে।’

‘দ্বিতীয়টা অবশ্য ঘন ঘন বদলাও,’ ফিসফিস করে বলল অ্যানি, শুনতে পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল বানু। ‘না, আমি জিঙ্কস করছি, ভিকার্স মেশিনগান কখনও চালিয়েছ কিনা।’

‘না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল বানু, পরমুহূর্তে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ‘কিন্তু কীভাবে চালাতে হয় শিখতে এক মিনিটও লাগবে না আমার! অন্তত কীভাবে কাজ করে সেটা বলে দিতে পারব...।’

‘ওই যে!’ টারিটে খাড়া হয়ে থাকা ব্যারেলটা ইঙ্গিতে দেখাল অ্যানি। ‘চেষ্টা করে দেখো!’

আঁচড়াআঁচড়ি করে নিতম্বিনীর টারিটে উঠে পড়ল বানু, এতক্ষণে মন দিয়ে কাজ করবার সুযোগ পেল অ্যানি। আধঘন্টা পর সবিস্ময়ে বলল সে, ‘বানু, পেয়ে গেছি! ডিসট্রিবিউটর থেকে কার্বন রডটা খুলে নিয়ে গেছে ও। তুমি শালা ভেবেছিলে...।’

টারিট থেকে মাথা তুলে তাকাল বানু। ‘কে? মাইকেল?’ জানতে চাইল সে।

‘না,’ জবাব দিল অ্যানি। ‘রানা।’

‘রানা?’ ভুরু কঁচকে উঠল বানুর। ‘তার কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি।’ নিতম্বিনীর টারিট থেকে নেমে এসে অ্যানির পাশে দাঁড়াল সে, কতটুকু কী ক্ষতি হয়েছে বুঝতে চায়।

‘ওরা সবাই সমান,’ বলেই অ্যানি উপলব্ধি করল, রানার প্রতি অবিচার করা হলো।

‘খুলে নিয়েছে, বলছ? তারমানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। কোথায় রাখতে পারে বলে তোমার ধারণা?’

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যানি। ‘ওর কাজে কোন খুঁত থাকে বলে তো মনে হয় না। সম্ভবত নিজের পকেটে।’

‘আমরা তা হলে কী করব এখন?’ হতাশায় হাত ছুঁড়ল বানু। ‘যুদ্ধটা তো আর বাদ দিতে পারি না!’

‘তা পারি না,’ অ্যানি অন্যমনস্ক। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করবার পর আবার মুখ তুলল সে। ‘তাঁবুর ভেতর, আমার ব্যাগে, একটা এভার-রেডি ফ্ল্যাশলাইট আছে। আর আছে একটা কসমেটিক কেস। দুটোই নিয়ে এসো, প্লিজ।’

বানুর কোমর থেকে ড্যাগারটা টেনে নিল অ্যানি, বাঁকা ফলা দিয়ে একটা ড্রাই-সেল ব্যাটারি খুলে ভিতর থেকে বের করল কার্বন রড। কসমেটিক কেস থেকে বেরাল নেইল-ফাইল, সেটা দিয়ে সাবধানে ঘষে রডটাকে সরু করল, তারপর ঢুকিয়ে দিল ডিসট্রিবিউটরের শ্যাফটে-প্রথমবার ত্র্যাক্স-হ্যান্ডেল ঘোরাতেই স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

‘তুমি দেখছি ভারি চালাক, মিস অ্যানি!’ বানুর বলবার সুরে এমন আন্তরিক প্রশংসা ফুটল, সারা শরীরে কোমল আদরের মধুর স্পর্শ অনুভব করল অ্যানি, চোখের তারায় আনন্দের ঝিলিক নিয়ে মুখ তুলল সে। ড্রাইভারের সিটের উপর দাঁড়িয়ে আছে বানু, মাথা

আর কাঁধ টারিটে, হাঁটু জোড়া ঠেকে আছে সিটের পিঠে।

‘মেশিনগান কীভাবে কাজ করে শেখা হলো?’ জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

অনিশ্চিতভঙ্গিতে মাথা বাঁকাল বানু, সরু একটা হাত রাখল মেহগনি পিস্তল গ্রিপে, পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে চোখ রাখল সাইটে। ‘তুমি শুধু ওদের কাছে আমাকে পৌঁছে দাও, মিস অ্যানি।’

ক্লাচ ছেড়ে দিল অ্যানি, গাছের ছায়া থেকে বাঁক নিয়ে পাথুরে ঢালের দিকে ছুট দিল নিতম্বিনী। ঢালটা নেমে গেছে ফানেল-এর ঘাস ঢাকা খোলা প্রান্তরে।

‘রানার ওপর আমি খুব রেগে আছি,’ ঘোষণা করল বানু, এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথের উপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে অনবরত বাঁকি খাচ্ছে নিতম্বিনী, একবার এটা একবার ওটা ধরে স্থির থাকবার চেষ্টা করছে সে। ‘দেখা হোক, মজাটা টের পাওয়াব! আমি তার কাছ থেকে এ-ধরনের ব্যবহার আশা করি না। কী? না, কার্বন রড খুলে নিয়েছে। ছি-ছি! হ্যাঁ, মাইকেলের পক্ষে কাজটা শোভা পায়। কিন্তু রানা... নাহ, সে আমাকে হতাশ করেছে!’

‘তাই?’

‘হ্যাঁ, আমার ধারণা তাকে আমাদের শায়েস্তা করা উচিত।’

‘কীভাবে?’

‘খুব সহজেই বিচার করা যায় ওর। তুমি মাইকেলকে প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করো,’ গম্ভীর সুরে পরামর্শ দিল বানু। ‘আমার ধারণা, এভাবেই আমরা রানাকে শাস্তি দিতে পারি।’

ভারি স্টিয়ারিঙটাকে বুকের সঙ্গে প্রায় সঁটে রেখেছে অ্যানি, গ্যাসপেডাল আর ক্লাচের উপর নাচছে তার পা, এত ব্যস্ততার মধ্যেও রানা সম্পর্কে বানুর কথাটা নিয়ে চিন্তা করল সে। ভাবতে গিয়ে বারবার বাধা পেল, কারণ চোখের সামনে বারবার ভেসে

উঠতে লাগল কিশোরসুলভ আন্তরিক হাসি নিয়ে রানার মুখ আর মায়াভরা চোখ, তার পুরুশালি কাঁধ আর পেশীবহুল শরীর, মাথা ভর্তি কালো চুল আর টিকালো নাক। তারপর ওর ব্যবহার, আচরণ, রুচি আর পরিমিতিবোধের কথা মনে পড়ল অ্যানির। এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে উপলব্ধি করল, এই মুহূর্তে একটা জিনিসই তার চাওয়ার আছে, আর তা হলো রানার সঙ্গ। উপলব্ধি করল, গিয়ে যদি দেখে রানা নেই, চলে গেছে, হতাশায় দম আটকে মারা যেতে পারে সে। ‘প্রেমিক বাছাইয়ের কাজটা আমার হয়ে তুমি করে দেয়ায়, বানু, সত্যি আমি কৃতজ্ঞ,’ বলল সে। ‘মানলাম, এব্যাপারে তুমি একটা প্রতিভা।’

‘ধ্যেৎ, আমার লজ্জা লাগছে, মিস অ্যানি,’ পাল্টা চিৎকার করল বানু। ‘এ-সব ব্যাপার আমি ভাল বুঝি, এই আর কী।’

চার

বিকেলের দিকে বিদ্যুতের চমক আর গর্জন নিয়ে পশ্চিম দিকে উদয় হলো ঘন কালো মেঘ, অথচ খোলা প্রান্তরের মাথার উপর বাকঝাকে ইম্পাতকঠিন নীল আকাশে সূর্য গনগনে আগুন জ্বলে রেখেছে, তাকিয়ে থাকা যায় না। প্রখর রোদে পুড়ছে মাটি, চারদিক থেকে ভাপ উঠছে, তাপ-তরঙ্গের ভিতর প্রতিটি বস্তু নাচছে, দূরে দৃষ্টি চলে না। এক পর্যায়ে পাহাড়গুলোকে এত কাছে মনে হলো, ওগুলো যেন আকাশ ছুঁয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে নির্ঘাত কাত হয়ে পড়ে যাবে লুকিয়ে রাখা জোড়া আর্মারড কারের উপর,

পরমুহূর্তে দূরে সরে গেল, সেই সঙ্গে ছোট হয়ে গেল আকারে।

রোদ লেগে গরম হয়ে আছে আর্মারড কারের খোল, ছুঁলে ফোঁকা পড়বে চামড়ায়। যারা অপেক্ষা করছে, রানা আর মাইকেল বাদে, বড় কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া আহতদের মত হামাগুড়ি দিয়ে ছায়ার সন্ধানে ব্যস্ত, রোদ হয়ে উঠেছে অত্যাচারী শত্রু।

প্রচণ্ড গরমের কারণে অনেক আগেই রামি খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। ক্লান্ত একজোড়া কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে রানা আর মাইকেল, লোমকূপ থেকে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে শুকিয়ে যাচ্ছে ঘাম, সাদা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ আর মিহি লবণের প্রলেপ জমছে চামড়ায়।

পশ্চিম পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে মেঘের উপর চোখ বুলাল আব্বাস, বিড়বিড় করে বলল, ‘একটু পরই বৃষ্টি হবে।’ ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, চঞ্চলার টারিটে নিশ্প্রাণ মর্মরমূর্তির মত বসে আছে ও।

সাদা একটা লম্বা কাপড় দিয়ে মাথা, বুক আর কাঁধ জড়িয়ে নিয়েছে রানা, বিনকিউলারটা রেখেছে কোলের উপর। কয়েক মিনিট পর পর চোখে তুলছে সেটা, নজর বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে সামনের প্রান্তর, তারপর আবার জড় পদার্থের মত স্থির হয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে আর্মারড কারগুলোর নীচ থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল ছায়া, পশ্চিম দিকে চলে পড়ল সূর্য, হারাতে শুরু করল চোখ-ধাঁধানো সাদা উজ্জ্বলতা, রোদে যোগ হলো লালচে আর হলদেটে ভাব। বিনকিউলারের লেন্সে দূরবর্তী আকাশের গায়ে সঁটে থাকা কালো মেঘ মোচড় খেলো। আরও নীচে স্লান আকাশ, তার নীচে ধূসর দিগন্তরেখা-সবই অস্পষ্ট, আন্দাজ করে নিতে হয়। মনে

হলো ধুলোর একটা মেঘ ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে।

ঝাড়া পাঁচ মিনিট ধরে দেখল রানা, তাপ-তরঙ্গের থামগুলো বাধা হয়ে আছে, আরও দূরে কী আছে দেখবার কোন উপায় নেই।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল রানা, কপালের চুল থেকে ঘামের স্রোত নেমে এসে চোখে পড়ল, লবণ লেগে জ্বালা করে উঠল চোখ। লিনেনের কাপড়টা দিয়ে চোখ ডলল ও, ঘন ঘন চোখ পিটপিট করল, তারপর আবার গ্লাস তুলল চোখে। ছাঁৎ করে উঠল বুক, ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেল চুল।

উত্তপ্ত বাতাসের খেয়ালি ঘূর্ণি হঠাৎ করে অদৃশ্য হলো। মাত্র ক’মিনিট আগে ধুলোর যে মেঘটাকে বহু দূরে ছোট দেখাচ্ছিল, এখন সেটা এত কাছে আর স্পষ্ট আকৃতি নিয়েছে যে লেন্সটা প্রায় ভরে উঠল। দ্বিতীয়বার ছাঁৎ করে উঠল বুক-সচল চেউয়ের মত ধুলোর নীচে সচল যানবাহনগুলো যেন কালো পোকা। এক নিমেষে আবার দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল তাপ-তরঙ্গ, সেই সঙ্গে অগ্রসরমান কলামের আকৃতি বদলে গেল, হয়ে উঠল দানবীয়, ঝুলে আছে ধুলোর কুয়াশার ভিতর-কাছে, প্রতি মুহূর্তে আরও কাছে চলে আসছে।

রানার চিৎকার শুনে মুহূর্তের মধ্যে পাশে চলে এল মাইকেল।

‘পাগল হয়েছ! এক মিনিটের মধ্যে ওরা আমাদের ধরে ফেলবে!’ হাঁপিয়ে উঠল মাইকেল, প্রতিবাদ জানাল সে।

‘স্টার্ট দাও!’ আবার কড়া ধমক দিল রানা। ‘যা বলছি করো!’ হড়কে ড্রাইভারের হ্যাচ গলে নীচে নামল ও।

গাড়ি দুটোর চারপাশে ছুটোছুটি পড়ে গেল। ক্র্যাঙ্ক ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখা গেল প্রতিবাদমুখর এঞ্জিন ব্যাকফায়ার করছে, কারণ বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ায় ফুয়েল সাপ্লাই যথেষ্ট নয়।

অক্লান্তভাবে বারবার চেষ্টা করবার পর অবশেষে স্টার্ট দেওয়া গেল।

সশস্ত্র ছ'জন দেহরক্ষীর কাঁধে চড়ে মাইকেলের আর্মারড কারে উঠলেন কামাল হাসান, তাঁকে নামানো হলো ভিকার্স গানের পিছনে। কাজ শেষ করে নিজেদের পনিগুলোর কাছে ফিরে গেল তারা, লাফ দিয়ে পিঠে চড়ল, এই সময় কামাল হাসান আর্তনাদ করে উঠলেন।

সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কামাল হাসান হাঁ করে আছেন, তর্জনী দিয়ে নিজের মুখের ভিতরটা দেখাচ্ছেন ওদেরকে। হাঁ-টা দাঁতহীন, এত বড় যে ছোটখাট একটা সিংহের বাচ্চা অনায়াসে ঢুকে যাবে বলে মনে হলো।

দেহরক্ষীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর প্রবীণদের মধ্য থেকে একজন তার স্যাডল ব্যাগ থেকে চামড়া মোড়া একটা বাক্স বের করল, সেটা নিয়ে ছুটে এল আর্মারড কারের দিকে। বাক্সটা খুলে উঁচু করে মাথার উপর তুলল সে, আল্লাদে আটখানা চেহারা নিয়ে কামাল হাসান বাক্সের ভিতর হাত গলিয়ে বের করে নিলেন এক প্রস্থ কৃত্রিম দাঁত-প্রতিটি দাঁত মুক্তোর মত সাদা আর কোদাল আকৃতির, লাল মাড়ি সহ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দাঁতগুলো মুখে ফিট করতে সামান্যই ঝামেলা হলো, এবার তাঁর হাসিটা দেখতে হলো ঠিক ভূতের মত-কালো তোবড়ানো ফুটবল আকৃতির মুখের মাঝখানে ঝকঝকে সাদা দাঁত।

গোত্রপ্রধানের ভক্তরা উল্লাসে ফেটে পড়ল, আর আব্বাস খায়ের রানাকে জানাল, 'দাদু শুধু যুদ্ধ আর নতুন বিয়ে করার সময় দাঁত ব্যবহার করেন।' ছুটে আসা শিফটা কলামের দিক থেকে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে চোখ ধাঁধানো দন্ত প্রদর্শনীর উপর

রানাও একবার চোখ বুলাল।

'দাঁত থাকায় ওঁর বয়স অনেক কম দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল ও। 'নব্বুইয়ের চেয়ে একদিনও বেশি মনে হচ্ছে না।' আর্মারড কার পিছিয়ে এনে গর্তের আরও নীচে নেমে এল, এখন শুধু উঁকি দিলে খোলা প্রান্তরে দেখতে পাবে শিফটাদের। অপর গাড়িটাকে পাশে আনল মাইকেল, খোলা হ্যাচ থেকে রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল সে। দুষ্টলোকের সকৌতুক হাসি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সমাগতপ্রায় সংঘর্ষ চুটিয়ে উপভোগ করবার জন্য আত্মহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে সে।

এখন আর বিনকিউলার ব্যবহার করবার দরকার নেই। শিফটা কলাম মাত্র দু'মাইল দূরে, ছুটে চলেছে শুকনো নালার সঙ্গে সমান্তরাল একটা পথের দিকে, যে পথটা অ্যামবুশের বাঁকা শৃঙ্গ ছাড়িয়ে, পাহাড়গুলোর মাঝখানে খোলা অরক্ষিত সমতল প্রান্তরে নিয়ে যাবে তাদেরকে। এই গতিতে এগোতে থাকলে আর পনেরো মিনিটের মধ্যে কামাল হাসান বাহিনীর নাগালের বাইরে দিয়ে পাশ কাটাতে তারা, কোন বাধার সামনে না পড়েই পৌঁছে যাবে গিরিসংকটের মুখে।

নিজেদের অশ্বারোহী বাহিনীকে নিয়ে উদ্বেগের সীমা নেই রানার। উচ্ছৃংখল অশ্বারোহীরা একবার যদি ঝাঁক ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরকে আবার এক জায়গায় জড়ো করা অসম্ভব একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাদের উপর আস্থা আছে রানার, বিশাল জনারণ্যের শ্রোত তাদেরকে সামনের দিকে ঠেলে দিলে এক একজন অসুরের মত লড়বে, কিন্তু একবার যদি শ্রোতের গতি রুদ্ধ হয় বা পিছু হটে, গোটা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, যে-যার প্রাণ নিয়ে ছুটেবে পাহাড়ের দিকে আশ্রয় পাবার আশায়, কারও বাপের

সাধ্য নেই তাদের ফিরিয়ে আনতে পারে।

উরুর উপর একটা ঘুসি মারল রানা, অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে টোপটা পরিবেশন করা না হলে ওদের রণকৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে, আদিবাসীরা মারা পড়বে পাইকারী হারে।

আদিবাসীদের পাইকারী হারে মরতে দেখেছে রানা, কিন্তু ওদেরকে যুদ্ধ করতে দেখেনি। ওরা একা, কারও সাহায্য পাবার আশায় না থেকে, যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত; যুদ্ধের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন এড়িয়ে চলে। কিন্তু যে-কোন সুযোগ সৃষ্টি হওয়ামাত্র তা ছিনিয়ে নিতে ওস্তাদ, ক্রোধান্বিত সাপের মত ক্ষিপ্ত।

একা যুদ্ধ করে বলেই প্রতিটি লোক তার নিজের কমান্ডার, সাধারণত নিজেকে নির্ভুল নির্দেশ দিতে তারা কখনও ব্যর্থ হয় না। রানার উদ্বেগের কোন কারণ এইজন্যও নেই যে আদিবাসী যোদ্ধারা অ্যামবুশ পাতার বা ফাঁদে ফেলবার কৌশল ছোটবেলা থেকেই শেখে, প্রথম যখন তাদের হাতে রাইফেল আসে।

দূর থেকে দেখে মনে হলো সামনের সারির শিফটা যানবাহনের চাকা থেকে মাথাচাড়া দিচ্ছে ছুটন্ত একদল রাসটা ঘোড়সওয়ার, মাটির উপর এক ঝাঁক পাখির মত ভাসছে, কাঁপা কাঁপা আর ভোঁতা আকৃতি, ধুলোর স্তান আবরণে মোড়া। তারপর দেখা গেল, শিফটা লাইনের সামনে রয়েছে ঘোড়সওয়াররা, তির্যক একটা পথ ধরে ঝড়ের বেগে ছুটছে লুকিয়ে থাকা আদিবাসী বাহিনীর মধ্যভাগ লক্ষ্য করে।

প্রায় সেই মুহূর্তে কলামের মাথা থেকে একটা গাড়ি আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল, উড়ন্ত ঘোড়সওয়ারদের সামনের পথ লক্ষ্য করে ছুটল। গাড়িটার গতি ভীতিকর, এত দ্রুত কাছে চলে এল যে অশ্বারোহীরা দিক বদলাতে বাধ্য হলো, বাধ্য হলো লুকিয়ে রাখা

আর্মারড কার দুটোর দিকে সরে আসতে।

তীব্রগতি নিঃসঙ্গ গাড়িটার পিছনে শিফটা কলাম তার নিরেট আকৃতি হারাল। সামনের অর্ধেক বিচ্ছিন্ন হলো, দীর্ঘ আগোছাল একটা রেখার আকৃতি নিয়ে ধাওয়া করল ঘোড়সওয়ারদের। ওগুলো সব ক'টা ভারি যান, ক্যানভাসে মোড়া মাথা আর ছাদ, গতি মন্তর-এতই মন্তর যে ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর নাগাল পাবার সাধ্য নেই।

তবে ছোট গাড়িটা মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্রুত কমিয়ে আনল। ভাল করে দেখবার জন্য একটু উঁচু হলো রানা, বিনকিউলার তুলল চোখে। প্রথমবার ওয়েলস অভ চান্ডিতে দেখেছিল ও, রোলস-রয়েসটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না। পালিশ করা গা চকচক করেছে রোদে, পিছনের চাকায় ধুলোর ঘূর্ণি যেন টগবগ করে ফুটছে।

হঠাৎ ব্রেক করল ড্রাইভার, চাকা পিছলে যাওয়ায় রানার দিকে আড়াআড়ি হয়ে গেল রোলস-রয়েস, ধুলোর পাহাড় তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছনের সিট থেকে নীচে ঢলে পড়ল একটা শরীর।

লোকটাকে রাইফেল তুলতে দেখল রানা, ক্ষিপ্ততার সঙ্গে পরপর সাতটা গুলি করল সে।

অশ্বারোহীরা দ্রুত রোলস-রয়েস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ধুলোর পর্দা বা দূরত্ব মার্কসম্যানকে বিভ্রান্ত করেছে পারল না। প্রতিটি গুলির শব্দের সঙ্গে একটা করে ঘোড়া ধরাশায়ী হলো, আকাশের দিকে পা তুলে মৃত্যুযজ্ঞণায় ছটফট করতে লাগল, গড়াগড়ি খেলো মাটিতে, অবশেষে স্থির হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে রোলস-রয়েসে উঠে পড়ল লোকটা, আবার শুরু হলো ধাওয়া, বেঁচে যাওয়া অশ্বারোহীরা নাগালের মধ্যে চলে আসছে,

গাড়ির পিছনে ঝুলে আছে অতিকায় ট্রাক আর ট্রুপ ট্র্যাস্পোর্টার বহর-মানুষ, ঘোড়া, গাড়ি সমস্ত কিছু নিয়ে অব্যাহত গতিতে গড়াতে গড়াতে রানা ও মাইকেল সেভারসের রচিত নিধন ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে।

‘বাস্টার্ড!’ রাগে কঁপে উঠল রানা, রোলস-রয়েসটাকে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে দেখল। ইটালিয়ান লোকটা অশ্বারোহীদের খুব বেশি কাছে যাবার ঝুঁকি নেয় না। আদিবাসীদের মাফাতা আমলের রাইফেল-রেঞ্জের বাইরে থাকছে সে, প্রতিবার একজন করে লোককে ফেলছে, পাখি শিকারের মত অলস ভঙ্গিতে, প্রায় কৌতুকের সঙ্গে। রানার কাছ থেকে কম করেও হাজার গজ দূরে, তবু ইটালিয়ান মার্কসম্যানের নড়াচড়ার মধ্যে রক্ত পান করবার একটা ব্যাকুলতা পরিস্কার অনুভব করতে পারল ও। স্নেহ আনন্দ পাবার জন্য খুন করছে সে, খুন করবার রোমাঞ্চ আর উত্তেজনাটুকু সারা শরীরে উপভোগ করবার নেশায়।

এখন যদি বাধা দেয় ওরা, এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা বিশৃঙ্খল কলামের পাশ থেকে, পলায়নপর অশ্বারোহীদের বেশ ক’জনকে বাঁচানো সম্ভব হবে। কিন্তু শিফটা কলাম এখনও পুরোপুরি ফাঁদের ভিতর ঢোকেনি। বিনকিউলার ঘুরিয়ে তাপ-তরঙ্গ আর ধুলোর ভিতর অস্পষ্ট প্রান্তরের দিকে চোখ বুলাল রানা, এই প্রথম লক্ষ করল একেবারে পিছন দিকে শিফটাদের দশটা ট্রাক রয়েছে, অশ্বারোহীদের পিছু ধাওয়ায় অংশগ্রহণ করেনি।

ছোট্ট একটা গ্রুপ, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কে যেন ওগুলোকে খুব কড়া নিয়ন্ত্রণের ভিতর আটকে রেখেছে, ধুলোর পাহাড়ের ভিতর অস্পষ্ট ভারি যানবাহনগুলো থেকে দু’মাইল পিছনে।

গ্রুপটার দিকে বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারল না রানা,

কারণ এদিকে আবার পাখি শিকার শুরু হয়েছে-ইটালিয়ান মার্কসম্যান একটা করে গুলি ছোঁড়ে, অশ্বারোহীদের একজন বাহন নিয়ে ধরাশায়ী হয়, সেই পুরনো দৃশ্য।

বাধা দেওয়ার প্রবল একটা ইচ্ছা এবার অস্থির করে তুলল রানাকে। নিজের সঙ্গে তর্ক করছে ও। জানে, এখনও সময় হয়নি। কিন্তু নিজেকে বোঝাল, সময় হয়নি বলে লোকগুলোকে অসহায় ভাবে মরতে দেওয়া যায় না। ডান পা সজোরে চেপে ধরল থ্রটলে, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল এঞ্জিন, কিন্তু মাইকেল ওকে দেরি করিয়ে দিল। রানাকে আগে থেকেই লক্ষ্য করছিল সে, ওর চেহারা য় ভাবাবেগ ফুটে উঠতে দেখে তৈরি ছিল মনে মনে। চঞ্চলা রওনা হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গরবিনীও স্টার্ট নিল, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রানার সামনে চলে এসেছে মাইকেল, এগোবার রাস্তা বন্ধ।

‘মরার খুব শখ, কী?’ চিৎকার করে বলল সে। ‘তোমার ভেতর হিংস্র পশুটাকে দমন করো, ওল্ড চ্যাপ। পুরো অনুষ্ঠানটা তুমি তুল করতে চাইছ।’

‘ঘোড়ার পিঠে ওরা...তুমি দেখতে পাচ্ছ না?’ রাগের সঙ্গে পাল্টা চিৎকার করল রানা।

‘যার যা ঝুঁকি তাকে তা নিতেই হবে,’ রানাকে থামিয়ে দিল মাইকেল। ‘তোমাকে আমি আগেও বলেছি, তোমার সেকলে সেন্টিমেন্ট আমাদের দু’জনকেই বিপদে ফেলবে।’

এই পর্যায়ে তর্কযুদ্ধে আরও একজন নাম লেখাল। মাইকেলের উপর টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কামাল হাসান। হাতের অস্ত্র হিসাবে তিনি একটা তরোয়াল বেছে নিয়েছেন-ফলাটা লম্বা আর অসম্ভব চওড়া, কোপ মারবার সময় দু’হাতে ধরতে হয়। উত্তেজনার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এরপর আর তাঁর পক্ষে চুপ করে থাকা

সম্ভব হলো না। বুকের রক্ত ছলকানো বিকট রণোল্লাস বেরিয়ে এল তাঁর গলা চিরে, মাথার পিছনে তরোয়ালটা বনবন করে ঘোরালেন-তরোয়ালের ফলা আর কৃত্রিম দাঁত, দুটোই ঝিক করে উঠল রোদ লেগে।

তিনি তাঁর উন্মত্ত রণলুংকারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়লেন, প্রতিটি লাথি তাঁর ড্রাইভারকে লাগল। তাকে তিনি কাপুরুষ ইত্যাদি বলে গালিগালাচ করছেন আর সাহস দিয়ে বলছেন, ভয় নেই, আমি একাই শত্রু নিধন করব, তুমি শুধু ওখানে পৌঁছে দাও আমাকে। তার উড়ন্ত পা থেকে বাঁচবার জন্য মাথা সরিয়ে নিল মাইকেল।

‘উন্মাদ!’ ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল সে। ‘আমি একদল উন্মাদের খপ্পরে পড়েছি!’

‘মেজর সেভারস,’ হাঁক ছাড়ল আব্বাস খায়ের, তারও তর সইছে না। ‘আমার দাদু আপনাকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।’

‘তোমার দাদুকে বলো জাহান্নামে...’ কিন্তু পাঁজরে আরেকটা লাথি খেয়ে জবাবটা শেষ করতে পারল না মাইকেল।

‘অ্যাডভান্স!’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল আব্বাস।

‘খোদার দোহাই, পথ ছাড়ো!’ দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

‘ইয়া-আ-আ-হু!’ গর্জে উঠলেন কামাল হাসান, টারিটে আধপাক ঘুরে তাঁর দেহরক্ষীদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে আদেশ দিলেন শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। আর কিছু জানবার বা বুঝবার ইচ্ছে হলো না, গোত্রপ্রধানের নির্দেশ পেয়ে তারাও বিকট রণলুংকার ছাড়ল, গুঁতো মারল পনির পাঁজরে, পাথুরে নালার মেঝেতে খটাখট খটাখট পায়ের আওয়াজ তুলে ঝড়ের বেগে আর্মারড কার দুটোর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘোড়াগুলো।

www.BanglaBook.org

আরোহীরা মাথার উপর হাতে ধরা রাইফেলগুলো নাচাচ্ছে, বাতাসে পত পত করে উড়ছে আলখেল্লার প্রান্ত, নালার প্রায় খাড়া পাড় টপকে উঠে পড়ল খোলা প্রান্তরে, তীরবেগে ছুটল শিফটা কলামের এলোমেলো একটা পাশ লক্ষ্য করে।

‘ওহ্, মাই গড!’ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল মাইকেল। ‘সব শালা এক একজন জেনারেল...!’

‘দেখো! ওদিকে দেখো!’ হাত তুলে নালার পিছন দিকটা দেখাল রানা, পরমুহূর্তে সবাই ওরা স্তব্ধ হয়ে গেল।

দেখে মনে হলো মাটি যেন দু’ফাঁক হয়ে গেছে, উগরে দিচ্ছে সারির পর সারি ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার। পাহাড়ের নীচেটা একটু আগে যেখানে খাঁ খাঁ করছিল, এখন সেখানে মানুষ আর ঘোড়া গিজ গিজ করছে, শয়ে শয়ে, সামনে মাথা দিয়ে নাক বরাবর সোজা ছুটে যাচ্ছে শিফটা কলামের দিকে।

গোটা দৃশ্যের উপর ঝুলে আছে ধুলোর পাহাড়, মোচড় খাচ্ছে, ঢেকে দিচ্ছে সূর্যটাকে, ফলে ঘোড়া আর বাহনগুলো থমথমে মেঘের নীচে কালো কাঠামো মাত্র, স্লান রোদ লেগে রাইফেল আর তরোয়াল ঝলসে উঠছে প্রতি মুহূর্তে।

‘তোমরাই জিতলে,’ তিক্ত কণ্ঠে রাজি হলো মাইকেল, চঞ্চলার সামনে থেকে গরবিনীকে পিছিয়ে আনল সে, তারপর নালার খাড়া পাড়ের দিকে নাক ঘোরাল।

পাড় বেয়ে একসঙ্গে উঠে এল দুটো গাড়ি, সামনের দু’জোড়া চাকা পাশাপাশি থাকল।

ওদের সামনে কোন বাধা নেই, দূরে রয়েছে আড়াআড়িভাবে শিফটা কলাম-এক লাইনে বহু যানবাহন, প্রতিটির গা নরম ধাতুর তৈরি-অত্যন্ত লোভনীয় টার্গেট। দুই লৌহমানবী সগর্জনে সামনে

ছুটল, এঞ্জিনের শব্দে নতুন একটা সুর শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হলো রানার-ওগুলোও যেন অনেকদিন পর আবার নিজেদের অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। চট করে একবার গরবিনীর উপর চোখ বুলিয়ে নিল ও। গরবিনীর চেহারা গাঢ় রঙ মেখে আগের চেয়ে কুৎসিত হয়েছে, তবে তার চাকাগুলোয় যোগ হয়েছে নতুন প্রাণশক্তি।

‘আগে বাড়ো, আয়রন লেডিস!’ জোর গলায় চৈঁচিয়ে বলল রানা, গরবিনীর হ্যাচ থেকে মাথা তুলে ওর দিকে ঘাড় ফেরাল মাইকেল। তার ঠোঁটের কোণে সদ্য ধরানো একটা চরুট বুলছে, ওটা যেন আপন গুণেই লটকে আছে ওখানে, চারধারে ফুটে আছে নিঃশব্দ হাসি।

‘কচুকাটা করো শালাদের,’ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা, মাইকেলের শেষ কথাটা এঞ্জিন আর বাতাসের গর্জনে চাপা পড়ে গেল। ওর সামনে অকস্মাৎ আলোড়ন আর গতিবিধির প্যাটার্নটা বদলে গেল। নিঃশব্দচিহ্নে ধাওয়ারত শিফটা যোদ্ধারা হঠাৎ করে টের পেয়েছে, সুনিপুণ কৌশলে পাল্টে দেওয়া হয়েছে ভূমিকা।

পাঁচ

রাইফেল তুলল কাউন্ট ডিকানডিয়া, অশ্বারোহীদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে নিশানা স্থির করল, দম আটকে রেখেছে, টেনে দিল ট্রিগার। ম্যানলিকার হাই-ভেলোসিটি রাইফেল, দূরত্ব একশো মিটারের বেশি নয়।

লেগেছে, পরিষ্কার দেখতে পেল সে। লোকটা ঝাঁকি খেলো, হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘোড়ার ঘাড়ে, কিন্তু পিঠ থেকে খসে মাটিতে

পড়ল না। হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল, মাটিতে ডিগবাজি খেলো সেটা, অথচ লোকটা ঠিকই কেশর আঁকড়ে ধরে শুয়ে থাকল ঘোড়ার পিঠে, তার নোংরা সাদা আলখেল্লা শ্রুতি রাঙা হয়ে উঠল।

‘কী! এত বড় স্পর্ধা! আমাকে অপমান করে!’ হাঁসফাঁস করতে করতে আবার রাইফেল তুলল কাউন্ট, লক্ষ্যস্থির করল ঘোড়ার কাঁধ আর ঘাড় যেখানে মিলিত হয়েছে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ঘোড়া, ভাঁজ করা হাঁটু নিয়ে পড়ল আরোহীর গায়ের উপর, এত দূর থেকেও আরোহীর ফুসফুস ফেটে যাওয়ার আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল সে।

হেসে উঠল কাউন্ট, উত্তেজনায় উন্মাদ। ‘ক’টা, সাতা? এটা নিয়ে ক’টা হলো?’

‘আটটা, মাই কর্নেল!’

‘মুখে মুখে হিসাব রাখছ? অ্যাই বেজন্মা, লিখে রাখতে কী হয়েছে? লেখো...বাইশটা!’

‘জ্বে-আজ্বে,’ বুক পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে লিখবার সময় সংখ্যাটা পড়ল সার্জেন্ট বানানটো সাতা,... ‘বত্রিশটা!’

‘তোমার ভাতা দ্বিগুণ করে দেয়া হবে...,’ আশ্বাস দিল কাউন্ট।

‘হবে? হয়নি? মাই কর্নেল...!’

‘লিখতে থাকো, লিখতে থাকো,’ বাধা দিয়ে আবার রাইফেল তুলল কাউন্ট, সাইটে চোখ রেখে পরবর্তী টার্গেট খুঁজছে। হঠাৎ স্থির পাথর হয়ে গেল সে, রাইফেলের ব্যারেল নড়ে গেল, নেমে এল মাটির দিকে, মাজলুটা তার জুতোর চকচকে ডগার দিকে হাঁ করে থাকল। যেন কজা খুলে পড়ায় তার নীচের চোয়াল ঝুলে

পড়ল, রাইফেল ব্যারেলের সঙ্গে সহানুভূতিসূচক প্রতিক্রিয়ায়। ধাওয়া করবার উত্তেজনায় সে ভুলেই গিয়েছিল ভয় কাকে বলে, অকস্মাৎ প্রবল বন্যার তোড়ের মত ফিরে এল সেটা দেহ-মনে। অনুভব করল, পেটে পানি ছাড়া কিছু নেই, পা দুটো রাবারের। ‘ঈশ্বরের মা!’ বিড়বিড় করে উঠল সে।

গোটা দিগন্তরেখা জ্যাস্ত আর সচল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টিসীমার এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন একটা রেখা সবেগে ছুটে আসছে তার দিকে। কী দেখছে, বুঝতে অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে গেল তার। আগে ছিল বারোজন ঘোড়সওয়ার, তাদের ধাওয়া করছিল সে, এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার অশ্বরোহী আদিবাসী, আর ধাওয়া করে এমন দুর্বীর গতিতে তার দিকে ছুটে আসছে যে চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। চোখ ফেরানোর সাধ্য নেই, সে দেখতে পেল সারির পর সারি শত্রুরা যেন তার সামনের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে, ধুলোর পাতলা একটা আবরণ ভেদ করে। সূর্যের লাল রোদে তরোয়ালের নগ্ন ফলাগুলো রক্তমাখা লাগল, আর ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর পায়ের আওয়াজ বজ্রপাতের মত শোনাগেল। অস্পষ্টভাবে কানে এল অসংখ্য মানুষের রণহংকার।

‘ডিনো! ডিনো!’ আত্ননাদ করে উঠল কাউন্ট। ‘তোমার হাতে আমার প্রাণ, আমার হাতে তোমার প্রাণ! এখন থেকে নিয়ে চলো আমাকে-জলদি!’ এ-ধরনের আবেদন সরাসরি ড্রাইভারের হৃদয় স্পর্শ করে, কোন দিকে না তাকিয়ে গাড়ি ঘোরাল সে, বাঁকি খেয়ে কাউন্টের দুর্বল পা ভাঁজ হয়ে গেল, ধপাস করে ব্যাক সিটের নরম গদিতে পড়ে গেল সে। ‘সময়মত নিরাপদ জায়গায় ফিরতে না পারলে তোমাকে আমি গুলি করব!’

রোলস-রয়েসের পিছনে আর দু’পাশে সিকি মাইল ব্যাপ্তি নিয়ে

ত্রিশটা ধূসর রঙের ফিয়াট ট্রুপ-কারিয়ার ছুটে আসছিল। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবার পরও ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল ড্রাইভাররা, রোলস-রয়েসকে ধরতে পারেনি, শেষ পর্যায়ে দূরত্ব থেকে যায় এক হাজার গজের মত। তবে ধাওয়া করে শিকার বধের উত্তেজনা শিফটা সৈনিকদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়, কাউন্ট ডিকানডিয়ার প্রতিটি সাফল্য তাদেরকে উজ্জীবিত করে তোলে, ট্রাকের উপর ধেই ধেই করে উদ্বাহ নৃত্য শুরু করে দেয় তারা।

ট্রাক বহরের এই নিরেট মিছিল, যেন চাকার সঙ্গে লেগে আছে চাকা, এমন পবলবেগে ছুটছে যে ফিয়াট কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী দেখতে পেলে নির্ঘাত মূর্ছা যাবে। ঠিক এই সময়, গতি না কমিয়ে উল্টোদিকে ছুটবার জরুরী একটা তাগাদা অনুভব করল ড্রাইভাররা।

সামনের সারির দু’জন ট্রাক ড্রাইভার বাকি সবার চেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাকুল মনের ডাকে সাড়া দিল, বন বন করে ঘুরিয়ে লক করে দিল হুইল, একজন বাঁ দিকে এবং অপরজন ডান দিকে, ফলে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ধাবমান দুটো ট্রাক পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পতিত হলো। সগর্জনে মাথাচাড়া দিল বাস্প, আর কাঁচের গুঁড়ো। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ধাক্কায় কর্কশ যে আওয়াজ উঠল তাতে ভয় পেয়ে পাহাড়ের গর্তে মুখ লাকাল হুঁদুর আর শিয়ালের দল। দুই ট্রাকের আরোহীরা, যারা প্রথম ধাক্কায় চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়নি, গমের দানার মত ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে, যারা পড়ল না তারা বাহনের গায়ে খাড়া হয়ে থাকা ইস্পাতের খুঁটি বা অন্য কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারাল বা মারা পড়ল। ট্রাক দুটোকে এখন আর আলাদাভাবে চিনবার উপায় নেই, জোড়া লেগে গেছে, সবটুকু ধুলো সেরে যাবার আগেই হুপ করে বিকট

একটা আওয়াজের সঙ্গে পায়ের তলায় কেঁপে উঠল মাটি, বিস্ফোরিত হলো তোবড়ানো ফুয়েল ট্যাংক, টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উঠল আগুন আর কালো ধোঁয়া।

বাকি ট্রাকগুলো বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনায় পড়ল না, দিক বদলে নিজেদের তৈরি ধুলোর পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটল, রণলংকার তুলে পিছু ধাওয়া করে আসছে আদিবাসী অশ্বারোহী বাহিনী।

শত চেষ্টা করেও ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকানোর সাহস হলো না কাউন্টের, নিশ্চিতভাবে জানে তাকালেই সে দেখতে পাবে তার কঁকড়ে থাকা নিতম্বের দিকে তাক করা রয়েছে ধারাল আর লম্বা একটা তরোয়াল। তার ঘুসি হাতুড়ির বাড়ির মত, অনবরত পড়ছে ড্রাইভারের ঘাড়, কাঁধ আর মাথায়।

‘জোরে! আরও জোরে! তোর সাথে মেয়ের বিয়ে দেব, আমাকে বাঁচা, ভাই!’ প্রলাপ বকছে কাউন্ট। ‘জোরে! আরও জোরে! তা না হলে তোকে আগুনে পোড়াব!’ ড্রাইভারের একটা কানের পিছনে আবার ঘুসি মারল সে, এলোমেলো বহরের একটা ট্রাককে রোলস-রয়েস ওভারটেক করছে দেখে খানিকটা স্বস্তির পরশ অনুভব করল।

এতক্ষণে তার মনে হলো, এবার পিছনে তাকানো নিরাপদ, কারণ হঠাৎ করে তার মনে পড়ে গেছে দৌড় প্রতিযোগিতায় যে-কোন অশ্বারোহীকে হারিয়ে দেবে রোলস-রয়েস। চোখে-মুখে রক্ত আর মনে সাহস ফিরে আসায় গরম একটা অনুভূতি হলো তার।

‘আমার রাইফেল, সাতা!’ হাঁক ছাড়ল কাউন্ট। ‘রাইফেলটা দাও আমাকে!’

কিন্তু পিছু ধাওয়ারত অশ্বারোহীদের ছবি তুলবার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত বানানটো সাতা।

কাউন্ট তার হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল সার্জেন্টের কোমরে। ‘খচ্চরের বাচ্চা, এটা যুদ্ধ!’ গর্জে উঠল সে। ‘আর আমি একজন বীরযোদ্ধা। দে, রাইফেল দে!’

কথাটা শুনে ড্রাইভার ডিনোর ধারণা হলো, কাউন্ট বোধহয় আশা করছে গাড়ির গতি কমানো হবে, তা না হলে সে যোদ্ধাসুলভ বীরত্ব কীভাবে প্রদর্শন করবে। কিন্তু গাড়ির গতি একটু কমতেই, আবার তাকে কাউন্টের ঘুসি খেতে হলো।

‘খচ্চরের বাচ্চা! মরার ইচ্ছে হলে তুই নিজে মর, আমাকে নিয়ে কেন!’

অটেল স্বস্তি অনুভব করল ড্রাইভার, থ্রটলে পা চেপে ধরল সে, লাফ দিয়ে আবার সামনে ছুটল রোলস-রয়েস।

কাউন্টের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে বানানটো সাতা, রাইফেলটা খুঁজে পেয়ে সিধে হলো সে। তার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল কাউন্ট।

‘লোড করা, মাই কাউন্ট।’

‘সাহসী বালক, ধন্যবাদ।’ নাভির নীচে বাঁট ঠেকিয়ে রাইফেলটা খাড়া করে রাখল কাউন্ট, গুলি করবার জন্য লক্ষ্যবস্তু খুঁজছে।

ইতিমধ্যে আদিবাসী অশ্বারোহীরা অনেক পিছিয়ে পড়েছে, রোলস-রয়েসও প্রায় সব ক’টা ট্রুপ-ক্যারিয়ারকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এসেছে—ক্যারিয়ারগুলো এখন অশ্বারোহী আর রোলস-রয়েসের মাঝখানে। ড্রাইভারকে একপাশে সরে যাবার নির্দেশ দেবে কিনা ভাবল কাউন্ট, তা হলে শত্রুদের দিকে গুলি করবার জন্য সুযোগ পাবে সে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে অশ্বারোহীদের গুলি করে ফেলে দিতে কী যে মজা, মনে পড়ে গেল

তার। ব্যাকসিটের পিঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে, তাকাল সেদিকে।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল কাউন্ট। অদ্ভুত একজোড়া আকৃতি, পিঠে কুঁজ, খোলা ঘাসজমির উপর দিয়ে ধেয়ে আসছে। বিকলাঙ্গ দুটো উটের মত লাগল ওগুলোকে, এমন ভারসাম্যহীন আলগা একটা বিদঘুটে ভাব নিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে যে একাধারে কৌতুককর এবং ভীতিকর মনে হলো।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে একটা ঝাঁকি খেলো কাউন্ট, মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল, ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে সে উপলব্ধি করল, কিন্তু তকিমাকার মেশিন দুটো তির্যক পথ ধরে তার পালানোর পথ বন্ধ করতে আসছে।

‘ডিনো!’ করণসুরে কেঁদে উঠল কাউন্ট ডিকানডিয়া, ম্যানলিকারের বাঁট দিয়ে ড্রাইভারকে মারল। জোরাল কোন আঘাত নয়, শ্রেফ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য, তবে ইতিমধ্যে আরও অনেক মার খেয়ে বেচারার রক্তাক্ত হয়ে আছে। শক্ত করে হুইল ধরে থাকল সে, আঙুলের গাঁট আর ডগা সাদা হয়ে আছে, সরাসরি নবাগত শত্রুদের দিকে সগর্জনে ছুটে চলল রোলস-রয়েস।

‘ডিনো!’ কান্না ভুলে গেল কাউন্ট, আতর্জন করে উঠল সে, সামনের আর্মারড কারের মাথায় লম্বাটে আর মোটা কী যেন একটা জিনিস দেখতে পেয়েছে সে, সিলিন্ডারের মত, পাইপ আকৃতির মাজল ভারি ওয়াটার-জ্যাকেট থেকে বেরিয়ে আছে।

‘ও আমার ঈশ্বরের দয়াবতী মা!’ আর্মারড কার সামান্য ঘুরে গেল, সেই সঙ্গে ভিকার্স মেশিনগানের মাজল সরাসরি কাউন্টের দিকে হাঁ করল। ‘ইউ ফুল!’ ড্রাইভার ডিনোকে আবার রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারল সে। ‘ঘোরো!’ ঈশ্বর সাক্ষী, আমার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী! বাঁক নাও! ঘোরো!’

ডিনো আসলে মার খেয়ে কাঁদছে, তার চোখে পানি, দৃষ্টি

ঝাপসা। তার দুঃখ, মার খেয়ে কাঁদছে, অথচ তারপরও কাউন্ট তাকে মারছে। মনের দুঃখে গাড়ি চালাচ্ছে সে, সামনে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখছে না। অশ্রুমুক্ত হবার জন্য চোখ পিট পিট করল সে, সামনেটা পরিষ্কার হয়ে গেল, ভীষণ আতংকের সঙ্গে দেখতে পেল উট সদৃশ একটা বিশাল বাহন ঝুলে রয়েছে তার সামনে। বন বন করে হুইল ঘোরাল ডিনো, ঠিক যখন বিস্ফোরিত হলো ভিকার্স মেশিনগানের মাজল। পরমুহূর্তে রোলস-রয়েসের চারদিকের বাতাস হিস হিস শব্দে ছিঁড়তে শুরু করল, মনে হলো শত শত চাবুকের বাড়ি মেরে ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে প্রকৃতিকে।

একটা ট্রাকের ক্যাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজর লুইগি রাকা, চোখে বিনকিউলার, চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে বহুদূর প্রান্তরে আলোড়িত ধুলোর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে—ধুলোর ভিতর অস্পষ্ট আর ছায়া ছায়া কিছু আকৃতি আপাতদৃষ্টিতে দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

দশটা ট্রাককে আটকে রাখবার জন্য শারীরিক উপস্থিতি আর কর্তৃত্বের সবটুকু কাজে লাগাতে হয়েছে মেজর রাকাকে। ওগুলোয় আর্টিলারির লোকজন রয়েছে, প্রতিটির পিছনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে চাকা লাগানো ফিল্ড পীস। আর সবার মত শত্রুপক্ষের ছোট অশ্বারোহী দলটার দিকে ছুটে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল আর্টিলারির লোকজন, অনেক কষ্টে তাদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে সে।

ধুলোর ভিতর কী ঘটছে পরিষ্কার নয়, মেজর ভাবল মাউন্ট আপ-এর অর্ডার দেবে কিনা। এই সময় আবার চোখে বিনকিউলার তুলল সে। মনে হলো, ধুলোর ভিতর ছুটোছুটির

নকশাটা বদলে গেছে। ধুলোর কিনারায় বেরিয়ে আসা একটা আকৃতি হঠাৎ চিনতে পারল সে, ফিয়াট ট্র্যাপপোর্ট, সবেগে তার দিকে ফিরে আসছে সেটা, ক্যানভাস ছাদে উপচে পড়ছে লোকজন, সবাই তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

বিনকিউলার আরেক দিকে ঘোরাল মেজর। ধুলোর রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে এল আরেকটা ট্রাক, সরাসরি তার দিকেই ছুটে আসছে। ওটার ছাদ থেকে এক সৈনিক তার পিছনের ধুলো লক্ষ্য করে গুলি করছে, আশপাশে ছাদের কিনারা ধরে ঝুলে রয়েছে তার সঙ্গী-সাথীরা, ঝুলে থাকবার ভঙ্গি আড়ষ্ট, তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

একটা আওয়াজ শুনল মেজর, চিনতে পেরে তার চামড়ার নীচে ভয়ের অনুভূতি কিলবিল করে উঠল। ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না, ব্রিটেনে তৈরি ভিকার্স মেশিনগানের আওয়াজ চেনে সে। শব্দের উৎসের দিকে ছুটল তার দৃষ্টি। ডান দিকে প্রসারিত শিফটা কলামও এখন লেজ তুলে পালিয়ে আসছে, সম্পূর্ণ দিশেহারা আর বিশৃংখল। কুঁজ বিশিষ্ট আকৃতিটা দেখতে পেল সে, হেলেদুলে অথচ তীব্রবেগে সরাসরি শিফটা ট্র্যাপপোর্টার বহরের মাঝখানটা লক্ষ্য করে ছুটছে। ওটা একটা আর্মারড কার, জানে সে। জানে ফিয়াট ট্রাকগুলোর গা ওটার তুলনায় নরম তুলতুলে।

‘কামানের ঢাকনি খোলো!’ অকস্মাৎ নির্দেশ দিল মেজর রাকা। ‘শত্রুর আর্মার মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হও!’

আর্মারড কারের টারিটে ভিকার্স মেশিনগানের রয়েছে বল-টাইপ মাউন্টিং। ব্যারেল তোলা বা নামানো যায়, কিন্তু ডান বা বাম দিকে দশ ডিগ্রির বেশি ঘোরানো যায় না-বল-টাইপ মাউন্টিঙের এটা একটা দুর্বলতা। তাই ড্রাইভারকে গানল্যেয়ার-এর ভূমিকাও পালন করতে হয়, অস্ত্র তাক করবার জন্য তাকে প্রয়োজনমত

গাড়ি ঘোরাতে হবে।

ব্যাপারটা কামাল হাসানের জন্য সহ্যসীমার বাইরে উৎকট একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিবার একটা করে টার্গেট নির্বাচন করে সে, বিশুদ্ধ অ্যামহারিক ভাষায় ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে হুংকার ছাড়ে, ওদিকে ড্রাইভার মাইকেল সেভারস অ্যামহারিক ভাষার কিছুই বোঝে না, ইতিমধ্যে নিজেই অন্য একটা টার্গেট বাছাই করেছে। টার্গেটের দিকে নিশানা স্থির করেছে সে, কিডনিতে দমাদম লাথি খেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার দশা হলো তার, কামাল হাসান বোঝাতে চাইছেন তাঁর টার্গেটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ফলশ্রুতিতে গরবিনী তার সমস্ত গুণাগুণ বিসর্জন দিয়ে হয়ে উঠল উন্মাদিনী, শিফটা কলামের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা অপ্রত্যাশিত পথ ধরে ছুটল, মাঝে মধ্যে পাক খেলো, তিক্ত ভাষায় তুরা পরস্পরের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তুমুল গুলিবর্ষণ একরকম প্রায় গ্রাহ্যই করল না।

ওদিকে চঞ্চলা রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছে। রোলস-রয়েসকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলির প্রথম ঝাঁকটা কাজে লাগেনি, ধুলো আর অস্থির ট্রাক বহরের আড়ালে হারিয়ে গেছে গাড়িটা। কিন্তু তার পর থেকে রানা আর আব্বাস পারস্পরিক সমঝোতা ও নৈপুণ্যের সাহায্যে একের পর এক ছিনিয়ে নিচ্ছে সাফল্য।

‘বাঁ দিকে, মাসুদ ভাই! বাঁ দিকে!’ চেষ্টা করে বলল আব্বাস, ভিকার্সের সাইটে চোখ, সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে শিফটারদের একটা ট্রাক, মাত্র একশো গজ দূরে।

‘হয়েছে, ব্যাটাচ্ছেলে আমার নাক বরাবর সামনে!’ ভাইজরে ট্রাকটা উদয় হতেই পাল্টা চিৎকার করল রানা। ভাইজরটা সরল, গায়ে কয়েকটা ফুটো নিয়ে ইস্পাতের একটা পাত, শুধু সামনের

খানিকটা দেখা যায়, তবে টার্গেটকে একবার দেখতে পেলে পিছু ছাড়বার নাম করে না রানা, ধাওয়া করে বিশ গজের মধ্যে চলে আসে—এবারও তাই হলো।

ট্রাকের গা থেকে কালো শার্ট পরা পদাতিক সৈনিক উপচে পড়ছে, তাদের কেউ কেউ চঞ্চলাকে লক্ষ্য করে গুলি করল। ইম্পাতের খোলে লেগে পিছলে আরেক দিকে বেরিয়ে গেল বুলেটগুলো। ট্রাকের ভিতর যত না সৈনিক, তারচেয়ে বেশি বুলে আছে গায়ে। ট্রাকের কিনারায় দু’হাত, আড়ষ্ট ভঙ্গি, রক্তহীন সাদা মুখে তাকিয়ে আছে পিছনে, চিড়ে-চ্যাপ্টা অথবা ঝাঁঝরা হবার অপেক্ষায় আছে।

‘শূট, আব্বাস!’ অনুমতি দিল রানা। আব্বাসের প্রতি খুশি ও, নির্দেশ না পাওয়ায় এখন পর্যন্ত একটাও গুলি করেনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে নির্দেশ পাওয়ায় আব্বাসের একটা গুলিও অপব্যয় হলো না, টার্গেট এত কাছে যে সব ক’টা ট্রাকে লাগল—ক্যানভাস, মাংস, হাড় আর ইম্পাত ভেদ করে ভিতরে ঢুকল মিনিটে সাতশো রাউন্ড।

অকস্মাৎ ঘুরে গেল ট্রাকটা, ধসে পড়ল সামনের অংশ, কাত হয়ে উল্টে গেল, ডিগবাজি খেলো বারবার, প্রতিবার গা থেকে ছিটকে চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মানুষ, যেন একটা কুকুর পুকুর থেকে পাড়ে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে পানি ঝরাল।

‘মাসুদ ভাই, ডান দিকে!’ সঙ্গে সঙ্গে বলল আব্বাস। ‘আরেকটা ট্রাক, ডান দিকে, আরও একটু ডানে—হয়েছে!’ আতংকিত সৈনিকে ভর্তি আরেকটা ট্রাকের পিছু ধাওয়া করল ওরা।

ওদের পাশে একশো গজ দূরে গরবিনী তার প্রথম সাফল্যের মুখ দেখল। কামাল হাসানের অসম্মানজনক লাথি খেতে আর রাজি

নয় মাইকেল সেভারস, রাজি নয় দুবোর্ধ্যভাষার নির্দেশ মানতে, ছুটন্ত আর্মারড কারের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে গোত্রপ্রধানকে লক্ষ্য করে একটা ঘুসি মারল সে।

‘তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, ওল্ড চ্যাপ,’ খঁকিয়ে উঠল সে। ‘ভুলে গেছ আমরা একই দলে, কী?’

নিয়ন্ত্রণহীন আর্মারড কার আপন খুশিতে ছুটল, প্রায় পাশাপাশি একই সঙ্গে ছুটছে একটা ফিয়াট ট্রাক, শিফটা পদাতিকে ভর্তি, কিন্তু ড্রাইভার টের পায়নি পিছু ধাওয়ারত অশ্বারোহী বাহিনী ছাড়াও অন্য আরেক শত্রুর অস্তিত্ব আছে। তার ঘাড় অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে মোচড় খেয়ে আছে, মাথাটা যেন ঘাড়ের উপর উল্টো করে বসানো, তাকিয়ে আছে পিছিয়ে পড়া অশ্বারোহীদের দিকে, ট্রাক কোন দিকে যাচ্ছে জানে না বা আরেক পাশে কী রয়েছে দেখেনি।

নিয়ন্ত্রণহীন দুটো গাড়ি তির্যকভাবে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেলো, ইম্পাতের সঙ্গে ইম্পাতের সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ছুটল চারদিকে, ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসে দুটো গাড়িই কাত হতে শুরু করল, উল্টে পড়ছে। মুহূর্তের জন্য মনে হলো গরবিনীও উল্টে পড়বে, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে কাত হওয়ার গতি রুদ্ধ হলো, একপাশের দুটো চাকা ফিরে এল মাটিতে, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে স্থির হলো আর্মারড কার, ভিতরের ত্রুটি ইম্পাতের দেয়ালে ঘন ঘন বাড়ি খেয়ে রক্তাক্ত হলো। এঞ্জিন বন্ধ হয়নি, আবার ছুটল গরবিনী, নাকে রক্ত নিয়ে কন্ট্রোল সামলানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠল মাইকেল।

ফিয়াট ট্রাকটা তুলনায় হালকা ও উঁচু, আর্মারড কার ওটার ক্যাবের নীচে ধাক্কা মেরেছে, এক ধাক্কাতেই চিৎ, মাটিতে পিঠ

দিয়ে পড়ল, চারটে ঢাকা তারপরও বন বন করে ঘুরছে। ক্যাব আর ক্যানভাস ঢাকা ছুড ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল, ওগুলোর নীচে যারা ছিল সব ক'টা ইস্পাত আর শক্ত মাটির মাঝখানে পড়ে ছাতু হয়ে গেছে।

কামাল হাসানের জন্য পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে উঠল। গরম ধাতব বাক্সের ভিতর বন্দী থাকবে সে, বাইরে কী ঘটছে তার প্রায় কিছুই দেখতে পাবে না, নাকের ডগা দিয়ে শয়ে শয়ে জন্মশত্রু কোন বাধা না পেয়ে পালিয়ে যাবে, তা কী করে হয়! টারিটের হ্যাচ দড়াম করে খুলল সে, সবেগে মাথা আর কাঁধ বের করে খাড়া হলো। রক্তপিপাসায়, রাগে, দুঃখে, হতাশায় আর উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল সে।

এই সময় খোলা একটা নীল আর কালো রোলস-রয়েস গরবিনীর সামনে দিয়ে উজ্জ্বল আলোর ঝলকানির মত ছুটে গেল। পিছনের সিটে রয়েছে শিফটাদের একজন শ্বেতাঙ্গ সামরিক অফিসার, ইউনিফর্মে পদক আর মেডেলের ছড়াছড়ি, সঙ্গে সঙ্গে গোত্রপ্রধান আর মাইকেলের মধ্যে মতের মিল ঘটে গেল আবার। দু'জনের জন্যই ভয়ানকভাবে গ্রহণযোগ্য একটা টার্গেট পেয়েছে ওরা।

‘সেই চিৎকারটা ছাড়ছ না কেন, ওল্ড চ্যাপ?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল, অপেক্ষায় না থেকে নিজেই অনুকরণ করল, ‘ইয়া-আ-আ-হু!’

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা উত্তর দিলেন কামাল হাসান, ‘হাউ ডু ইউ ডু?’ মাইকেলের মাথার উপর দাঁড়িয়ে ঠিক যেন একটা মোরগ ডেকে উঠল।

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত হাত-পা ছুঁড়তে আর গালিগালাজ করছে কাউন্ট ডিকানডিয়া, কারণ পুরোপুরি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে

ড্রাইভার। আরও মার খেয়ে ক্ষতের সংখ্যা বেড়ে গেছে শরীরে, ডান দিকে বাঁক ঘুরে সরাসরি পলায়নপর শিফট কলামের দিকে গাড়ি চালাচ্ছে সে। বোকামিটা অসংখ্য আইসবার্গের ভিতর দিয়ে ফুলস্পীডে জাহাজ চালানোর মত। আলোড়িত ধুলোর পাহাড় দৃষ্টিসীমা কমিয়ে দিয়েছে পঞ্চাশ ফুটে, আর এই খয়েরী রঙের কুয়াশা ভেদ করে বিনা নোটিসে হেলেদুলে বেরিয়ে আসছে বিশালকায় ট্রুপ-ক্যারিয়ার, একজন ড্রাইভারেরও সময়মত দিক বদলানোর বা ব্রেক করবার মানসিক অবস্থা নেই, তা ছাড়া সবাই তারা বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

রোলস-রয়েসের সামনে দানবীয় আরও দুটো আকৃতি ধুলোর পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এল-একটা নিজেদের ট্রাক, অপরটা উটের মত কুঁজ নিয়ে কিছুতকিমাকার একটা বাহন, টারিটে উড়ছে দুটো পতাকা, তার মধ্যে একটা ইথিওপিয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। টারিট থেকে আরও একটা জিনিস বেরিয়ে আছে, সেটা হলো ভিকার্স মেশিনগানের ব্যারেল।

হঠাৎ করে আর্মারড কার ঘুরে গেল, প্রচণ্ড ধাক্কা মারল ট্রাকের গায়ে, উল্টে পড়ল ট্রাক। আবার ঘুরে গিয়ে সরাসরি রোলস-রয়েসের দিকে ছুটে এল আর্মারড কার। চোখের পলকে এত কাছে চলে এল সেটা, ওদের উপর এখন হুমকির ভাব নিয়ে ঝুলে রয়েছে, এমনকী সীমিত দৃষ্টিসীমার ভিতর ডিনোও সেটাকে দেখতে পেল।

ভোজবাজির মত প্রতিক্রিয়া হলো। সিটের উপর ছেড়ে দেওয়া স্প্রিংয়ের মত টান টান হলো ডিনো। অবিরাম হুইল ঘোরাল। মাত্র দু'চাকার সাহায্যে দিক বদলাল রোলস-রয়েস, আর্মারড কারের সামনে দিয়ে, প্রায় নাক ছুঁয়ে, নিপুণভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই

মুহূর্তে টারিটের হ্যাচ দড়াম করে খুলে গিয়ে বেরিয়ে এল বাদামি একটা প্রাচীন চেহারা, মুখ ভরে আছে বিশাল হাসিতে—এমন শুভ্র আর চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল হাসি জীবনে কখনও দেখিনি কাউন্ট। আর্মারড কারের সামনে থেকে রোলস-রয়েস সরে আসবার আগেই প্রাচীন চেহারা থেকে বিদায় নিল হাসিটা, তার পরিবর্তে গলা চিরে বেরিয়ে এল এমন রক্ত পানি করা রণহংকার, যে কাউন্টের পেটের ভিতর থলিগুলো ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল।

সবেগে রোলসের দিকে ঘুরল ভিকার্সের ব্যারেল, গানার কামাল হাসান টারিটের নীচে নামিয়ে নিয়েছেন মাথাটা, ব্যারেল খানিকটা উঁচু হলো, সাইটে চোখ রেখে লক্ষ্যস্থির করছেন তিনি। আয়নায় চোখ রেখে সবই দেখল ডিনো, আবার স্যাঁৎ করে দিক বদলাল সে, ভিকার্সের গুলি রোলস-রয়েসের বাঁ দিকে লাগল, ধুলো আর পাথরের ঘূর্ণি ঝর্ণার মত লাফিয়ে উঠল শূন্যে।

ঘুরে গেল আর্মারড কারও, তারই সঙ্গে ঘুরল ধাবমান ধুলোর মেঘ, দুই গাড়ির মাঝখানের ফাঁক চোখের পলকে ছোট হয়ে আসছে। আবার গুলি হবে, দেখতে পেল ডিনো, অনিবার্য মৃত্যু এড়াবার জন্য ভীষণ এক ঝুঁকি নিয়ে ফেলল সে—সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রেক করল। ব্যাকসিটে উল্টে গেল কাউন্ট ডিকানডিয়া, প্রতিবাদমুখর, কালো কাপড়ে ঢাকা তার নিতম্ব আকাশের দিকে উঁচু হয়ে থাকল, চকচকে বুট সহ পা দুটো অনবরত ছুঁড়ছে।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেট রোলস-রয়েসের মাথার কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে উড়ে গেল, আবার উল্টোদিকে অবিরাম ঘুরিয়ে হুইল লক করে দিল ডিনো, ব্রেক রিলিজ করল, পায়ের চাপে মেঝের সঙ্গে সঁটে ধরল থ্রটল। খানিকটা জায়গা লাফ দিয়ে পোরিয়ে গেল রোলস-রয়েস, বন বন করে ঘুরছে ঢাকা, মাটির স্পর্শ পেয়ে এমন এক প্রচণ্ড ঝাঁকির সঙ্গে দ্রুতগতি লাভ করল যে আবার পিছন

দিকে নিষ্ক্ষিপ্ত হলো কাউন্ট, পিছনের লেদার সিটে কেউ যেন ঠুকে বসিয়ে দিল তাকে, খটাখট বাড়ি খেলো হাড়গুলো পরস্পরের সঙ্গে, মাথার হেলমেট নেমে এল চোখের উপর।

‘তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলাম,’ হাঁপিয়ে উঠে বলল কাউন্ট, হেলমেট ঠিক করতে হিমশিম খাচ্ছে।

এত ব্যস্ত, তার কথা শুনবার সময় নেই ডিনোর। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে মাথা নামিয়ে নিল সে, জানে হয় কাউন্টের ঘুসি খেতে হবে, নয়তো ভিকার্স মেশিনগানের বুলেট। তবু কর্তব্যের কথা ভোলেনি লোকটা, আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে রোলস-রয়েসকে, সাফল্যের সঙ্গে পালাচ্ছে। রোলসের গতি আর্মারড কারের চেয়ে বেশি, মাঝখানের ফাঁকটা ক্রমশ বাড়ল। গুলি হলেও রোলস-রয়েসের গায়ে একটাও লাগল না।

দুটো গাড়ির খানিক সামনে আরেকটা উঁচু ট্রিপ-ট্র্যাংগপোর্টারের কাঠামো ধুলোর ভিতর বুলেট রয়েছে, ওদের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায়, তবে গায়ে গতরে সৈনিকদের বোঝা থাকায় গতি মন্থর।

ঘন ঘন হুইল ঘুরিয়ে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট এড়াবার চেষ্টা করল ডিনো, তারপর আবার একটা ভয়াবহ ঝুঁকি নিল। ট্রিপ-ক্যারিয়ারের নাকের সামনে ঝাঁক নিয়ে সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিল, একটুর জন্য সংঘর্ষ বাধল না, আর্মারড কারের ঘাতক মেশিনগান ওটাকে এখন আর ছুঁতে পারবে না। তবে এক শিকার হারিয়ে বৃদ্ধ কামাল হাসান আরও মরিয়া হয়ে উঠলেন, আরেক শিকার দেখতে পেয়ে বিকট রণহংকার ছাড়লেন তিনি, টেনে ধরে থাকলেন ভিকার্সের ট্রিগার।

ট্রাকের ক্যানভাস শতচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেল বাতাসে, ক্যানভাসের নীচে মানুষের নিরেট ভিড় ফুটোয় ফুটোয় ঝাঁঝরা হয়ে

গেল, ট্রাকের আড়ালে দ্রুত দূরে সরে গেল রোলস-রয়েস। হঠাৎ করে ধুলোর রাজ্য ভেদ করে স্ফটিক-স্বচ্ছ মরু বাতাসে বেরিয়ে গেল সেটা, সামনে দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত খোলা প্রান্তর। বোঝার ভারে ধুকতে থাকা ট্রুপ-ক্যারিয়ারগুলো পিছনে পড়ে থাকল। এই মুহূর্তে কাউন্ট ডিকানডিয়ার যা মনোভাব, ওয়েলস অভ চাল্ডির উপর ডিফেন্সিভ পজিশনে না পৌঁছে থামবে না রোলস-রয়েস। তারপর হঠাৎ করেই, তার সামনে খোলা প্রান্তরে সাজানো কামানগুলোর দিকে চোখ পড়ল। তিনটে কামান, প্রতিটির পিছনে গানাররা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরম আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কাউন্ট, সদ্য দেখা দুঃস্বপ্ন ভুলে গেল, বুকের সাহস ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুনিধনের তীব্র লালসা জেগে উঠল তার অন্তরে।

‘ডিনো, জামাই বাবাজী, তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ,’ আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠল সে, ‘শুধু মেয়ে নয়, তোমাকে আমি একটা মেডেলও দেব।’ মৃত্যুদণ্ড সম্ভবত বাতিল করা হয়েছে। ‘কামানের কাছে নিয়ে চলো, আমার বীর সন্তান। যে কৃতিত্ব দেখিয়েছ, অদূর ভবিষ্যতে আমাকে তুমি কৃতজ্ঞ কর্নেল হিসেবে পাশে দেখতে পাবে।’

ডিনো সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিল, এত কথাই জবাবে চুপ করেই থাকবে সে, কিন্তু মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাটা, কাউন্টকে জিজ্ঞেস করল, ‘স্যার, মাই কর্নেল, আপনার মেয়ের সাথে আমার বিয়েটা কী...?’

‘দেব যখন বলেছি, অবশ্যই হবে,’ আশ্বস্ত করল কাউন্ট। ‘আগে কর্নেল পদটা দখল করো, কারণ আমার মেয়ে আবার কর্নেল ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করবে না...।’

এতক্ষণে, কথাবার্তা শুনে যখন বুঝল বিপদ কেটে গেছে,

কাউন্টের পায়ের নীচ থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলল সার্জেন্ট বানানটো সাতা, ভয়ে ভয়ে রোলস-রয়েসের কিনারা থেকে পিছন দিকে উঁকি দিল। সে যা দেখল, নিজেকে সামলানোর সময় পেল না, তার গলা চিরে বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল, চোখের পলকে আবার আগের জায়াগায় ফিরে গেল সে।

ওদের পিছনে ধুলোর পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে আদিবাসীদের আর্মারড কার, সবগে ছুটে আসছে রোলস-রয়েসের দিকে।

কাউন্টও একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, ডিনোর ঘাড়-গর্দানে ঘুসি মারল দমাদম। ‘জোরে, ডিনো, জোরে!’ হুংকার ছাড়ল সে। ‘এখন যদি মারা পড়ি, জেনারেল হয়েও আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। তোমাকে আমি নিজের হাতে গুলি করব...।’

তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে কামানগুলোর দিকে ছুটল রোলস-রয়েস।

‘শান্ত থাকো, বাছারা,’ একঘেয়ে সুরে একই কথা বারবার আওড়ে যাচ্ছে মেজর লুইগি রাকা। ‘হোল্ড ইওর ফায়ার! হোল্ড ইওর ফায়ার!’

গোলন্দাজবাহিনীর অস্থিরতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে, কামান দাগবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে প্রত্যেকটি লোক।

‘ট্রেনিঙের কথা মনে করো,’ বলে চলেছে সে। দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে থামল একজন গান-লেয়ারের পাশে, চোখে বিনকিউলার তুলে সামনের প্রান্তরে চোখ বুলাল। ‘শান্ত থাকো! হোল্ড ইওর ফায়ার!’

ধুলোর মেঘ গড়াতে গড়াতে দ্রুত এদিকে সরে আসছে, কিন্তু ভিতরে কী ঘটছে পরিস্কার নয়।

‘তোমার কামানে হাই-এক্সপ্লোসিভ লোড করা?’ গান-লেয়ারকে জিজ্ঞেস করল মেজর। মস্ত একটা ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকাল ছোকরা।

‘মনে রেখো, প্রথম শটটাই শুধু মনোযোগ দিয়ে তাক করার সময় পাবে তুমি।’

‘স্যার!’ ছোকরার গলা কেঁপে গেল, লক্ষ করে রাগ আর ঘৃণায় গা জ্বালা করে উঠল মেজরের। ভাড়াটে সৈনিকদেরই যদি এই অবস্থা হয়, আনাড়ি শিফটাদের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। নার্ভাস, নার্ভাস, সবাই বড়বেশি নার্ভাস! কম পয়সা খরচ করলে যা হয়, প্রায় অনভিজ্ঞ ছোকরাদের ধরে আনা হয়েছে কামান দাগবার জন্য। কামানের পিছনে দাঁড়াতে গিয়ে বুক কাঁপে ওদের। ঝট করে ঘুরে পরবর্তী ব্যাটারির দিকে এগোল সে।

‘স্টেডি, স্টেডি! সময় না হওয়া পর্যন্ত শান্ত থাকো!’

একজন গানারকে দেখে মনে হলো ছোকরা কেঁদে ফেলবে।

‘তোমরা শুধু একজনকে ভয় পাবে-আমাকে,’ হেঁড়ে গলায় সতর্ক করল মেজর। ‘আমার অনুমতি ছাড়া কেউ যদি ফায়ার ওপেন করো, আমি তার...।’

চিৎকার হলো, বাধা পেয়ে থেমে গেল মেজর রাকা। একজন লোডার হাত তুলে প্রান্তরের দিকটা দেখাল।

‘লোকটার নাম জেনে রাখো!’ কঠিন সুরে বলল মেজর, আচরণে ব্যস্ততার বদলে মর্যাদা আর কর্তৃত্ব ফোটাবার জন্য মাথা নিচু করে বিনকিউলারের লেন্স থেকে ধুলো পরিস্কার করল, তারপর সেটা চোখে তুলল।

নিজের বাহিনীকে পিছনে ফেলে পালিয়ে আসায় এতই

উৎসাহী কাউন্ট ডিকানডিয়া, পিছন ফিরে তাকাবার কথা তার মনে থাকল না। ইতিমধ্যে শিফটা কলাম আর রোলস-রয়েসের মাঝখানে আধ মাইলের একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে সেটা। সরাসরি আর্টিলারি ব্যাটারির দিকে গাড়ি চালাচ্ছে ডিনো, ঘুসি খেয়ে কানের নীচে মাংস ফুলে গেছে তার, রক্ত গড়াচ্ছে আঁচড়ের দাগগুলো থেকে। এই মুহূর্তে পিছনের সিটে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট, হাত দুটো এত ঘন ঘন নাড়ছে যে মনে হতে পারে এক ঝাঁক মৌমাছি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর।

গাড়ি রঙের ধুলোর পাহাড় ভেদ করে আরও একটা কিছুতকিমাকার বাহন ছিটকে বেরিয়ে এল, দেখবার সঙ্গে সঙ্গে কাঠামোটা চিনতে পারল মেজর রাকা, নতুন রঙ বা টারিটে বসানো নতুন অস্ত্র তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। টারিটে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বুড়োটা যে শত্রুপক্ষের একজন, তাও তাকে বলে দিতে হলো না।

‘ভেরি ওয়েল, ল্যাডস,’ শান্ত সুরে বলল মেজর। ‘হিয়ার দে কাম। হাই এক্সপ্লোসিভ, অ্যান্ড ওয়েট ফর দা অর্ডার। নট আ মোমেন্ট বিফোর।’

ছুটন্ত আর্মারড কার থেকে গুলি হলো, বিরতি ছাড়া দীর্ঘ বিস্ফোরণের শব্দ। বড় বেশি দীর্ঘ, ভাল-মেজর, হাসল নিঃশব্দে। সন্দেহ নেই মেশিনগানটা গরম হয়ে উঠছে, যে-কোন মুহূর্তে জ্যাম হয়ে যেতে পারে। অভিজ্ঞ একজন গানার থেমে থেমে গুলিবর্ষণ করবে-তারমানে শত্রুপক্ষও অনভিজ্ঞ উপলব্ধি করল সে।

‘শান্ত থাকো, ধৈর্য ধরো,’ ধমকে উঠল মেজর, নিজের লোকদের অস্থিরতা অনুভব করতে পারছে সে। পরস্পরের দিকে

নার্ভাস ভঙ্গিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে তারা।

আর্মারড কার আবার গুলি করল, রোলস-রয়েসের চারদিকে লাফিয়ে উঠল পাথুরে মাটি-এবারও দীর্ঘ বিস্ফোরণের একটানা শব্দ শোনা গেল। শব্দটা হঠাৎ করে থেমে গেল, তারপর আর শোনা গেল না।

‘হাহ্!’ মেজরের গলা থেকে উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এল। ‘ওদের মেশিনগান জ্যাম হয়ে গেছে!’ তার নার্ভাস গানাররা শত্রুপক্ষের কোন গুলি খাবে না। স্বভাবতই সাহস বেড়ে যাবে তাদের।

‘স্টেডি, মাই বয়েজ। অল স্টেডি। নট লংটু ওয়েট। নাইস অ্যান্ড স্টেডি! ইজি!’

কী ঘটেছে বুঝতে পারলেন না কামাল হাসান। পিস্তল গ্রিপ আর ট্রিগার ধরে টানাটানি কম করলেন না, কিন্তু হঠাৎ থেমে যাওয়া মেশিনগান থেকে আর কোন শব্দ বেরুল না। খেপে গিয়ে গালিগালাজ শুরু করলেন তিনি, এমনই অশ্রাব্য যে কোন মানুষকে করা হলে সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন না করে উপায় থাকত না, আর দু’জনের একজনকে অবশ্যই মরতে হত।

তাতেও যখন কাজ হলো না, তরোয়াল হাতে টারিটের উপর উঠে দাঁড়ালেন গোত্রপ্রধান বৃদ্ধ, সামনে পিছনে না তাকিয়ে মাথার উপর বন বন করে ঘোরালেন সেটা, সেই সঙ্গে রণলুংকার তো আছেই।

একশো মিলিমিটার ফিল্ড গান কী জিনিস সে-সম্পর্কে কামাল হাসানের কোন ধারণা নেই, ধারণা যদি থাকতও, এই মুহূর্তে তিনি ওগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর দৃষ্টি আটকে আছে রোলস-রয়েসের দিকে, বিদেশী আরোহীদের নিয়ে তাঁর সামনে দিয়ে পালাচ্ছে সেটা।

তাঁর নীচে ভাইজরের দিকে ঝুঁকে সামনেটা দেখবার চেষ্টা করল মাইকেল সেভারস। সর্ব ভাইজর, খুব বেশি কিছু দেখবার উপায় নেই, তা ছাড়া করডাইটের ধোঁয়ায় চোখ ভরে উঠেছে পানিতে, ফলে দৃষ্টিও ঝাপসা। চোখ পিট পিট করে রোলস-রয়েসটাকে দেখতে পেল সে, সেটাকেই অনুসরণ করল। ‘গুলি করো, বুড়ো খচ্চর!’ হাঁক ছেড়ে বলল সে। ‘ওপরে করছটা কী তুমি, অ্যাই ব্যাটা, বেল্লিক!’ কিন্তু না, আগের মতই স্তব্ধ হয়ে থাকল মেশিনগান।

ইম্পাতের খোলের ভিতর মাইকেলের সিটটা নীচের দিকে, আর মেজর রাকা বুদ্ধি করে মাটির একটা ভাঁজে কামানগুলো বসানোয় আর্মারড কার থেকে ওগুলোকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। সগর্বে কামানের দিকে ছুটে চলল গরবিনী, মাইকেলের চোখের সামনে টোপ হিসাবে রয়েছে রোলস-রয়েস। অবধারিত মৃত্যুর কত কাছে চলে এসেছে, তার জানা নেই।

ছয়

‘চমৎকার!’ তুমুল গতিতে আর্মারড কারটাকে এগিয়ে আসতে দেখে তৃপ্তির সঙ্গে বলল মেজর রাকা। এরইমধ্যে সেটা অভিজ্ঞ একজন গানারের জন্য লোভনীয় নাগালের ভিতর চলে এসেছে। তবে এখন যে দূরত্ব, তার আরও অর্ধেকটা ওটাকে পেরিয়ে আসতে দেবে সে, তা হলে তার অনভিজ্ঞ ড্রুনা টার্গেট প্র্যাকটিসে অবশ্যই সাফল্যের পরিচয় দেবে বলে আশা করা যায়।

কামানের দুশো মিটার সামনে রয়েছে রোলস-রয়েস, ছুটে

আসছে কম করেও ঘন্টায় ষাট-সত্তর মাইল বেগে। তিনটে আতংক নীল মুখ তার দিকে আবেদনভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, প্রাণ বাঁচানোর আকুল আত্নাদের প্রতিযোগিতায় তিনটে কণ্ঠস্বরই প্রথম হতে চায়। তাদেরকে অগ্রাহ্য করে বাট করে শত্রুপক্ষের দিকে তাকাল মেজর রাকা। আর্মারড কার এখনও দু'হাজার মিটার দূরে, তবে দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। অস্ত্রির গানারদের শান্ত থাকবার জন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এই সময় ফাঁক ফাঁক করে বসানো কামানগুলোর মাঝখান দিয়ে সবেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল রোলস-রয়েস।

রোলসের পিছনের সিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট, এক হাত দিয়ে মাথায় ধরে আছে হেলমেট, অপর হাত দিয়ে শাসাচ্ছে গানারদের। 'ওপেন ফায়ার, ইউ বাস্টার্ডস! এই মুহূর্তে ফায়ার ওপেন কর, তা না হলে তোদের সব কটাকে আমি গুলি করে মারব!' দুই কামানের মধ্যবর্তী সরু পথে চলে এল রোলস-রয়েস, হঠাৎ কাউন্টের খেয়াল হলো গানারদের উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে তারা যার যার পোস্ট ছেড়ে না পালায়, পালালে আর্মারড কারটাকে তার পিছনে ঠেকাবে কে! 'পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়!' গর্জে উঠল সে। 'প্রাণ দাও, কিন্তু মান দিয়ো না-খবরদার!' কামান আর গানারদের পিছনে ফেলে এখনও ঘন্টায় ষাট-সত্তর মাইল গতিতে ছুটছে রোলস-রয়েস, সামনে দিগন্ত পর্যন্ত খাঁ-খাঁ করছে প্রান্তর।

কাউন্টের নির্দেশটাকে বাতিল ঘোষণা করবার জন্য গলার সমস্ত জোর একত্রিত করল মেজর রাকা, কিন্তু তিনটে ফিল্ড গানের সম্মিলিত গর্জনের তুলনায় তার কণ্ঠস্বর পিঁপড়ের কান্নার মত, কেউ শুনতে পেল না। তিনটে কামান একসঙ্গে গর্জে ইঠল, শত চেষ্টাতেও গানারদের এই সাফল্য ট্রেনিংয়ের সময় অর্জিত হয়নি।

কর্নেলের 'এই মুহূর্ত'টাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছে তারা, দ্রুত গোলাবর্ষণের স্বার্থে লক্ষ্যস্থির বা ভুল সংশোধনের কথা ভুলে গেছে।

এই যখন পরিস্থিতি, দিকব্রান্ত গোলাগুলোর একটা যদি টার্গেট খুঁজে পায় তা হলে সেটাকে ভাগ্যগুণই বলতে হবে। একটা ফিয়াট ট্রিপ-কারিয়ার, আর্মারড কারের সিকি মাইল পিছনে এই মাত্র ধুলোর পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ওটার রেডিয়েটর চুরমার করে দিয়ে ভিতরে ঢুকল গোলা, গুঁড়িয়ে দিল এঞ্জিন ব্লক, ছিন্নভিন্ন করল ড্রাইভারকে, তারপর বিস্ফোরিত হলো ক্যানভাস ছডের নীচে পদাতিক সৈনিকদের নিরেট ভিড়ের ঠিক মাঝখানে। এঞ্জিন আর সামনের চাকা কয়েক সেকেন্ড সচল থাকল, সামনের এবড়োখেবড়ো মাটিতে এসে উল্টে গেল, গুরু করল ডিগবাজি খেতে-মাটিতে নাক দিয়ে সটান খাড়া হলো ট্রাক, যন্ত্রদানব যেন শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করছে প্রথম পুরস্কারটি পাবার আশায়।

শত্রুপক্ষের কাছাকাছি পৌঁছুল মাত্র একটা শেল। গরবিনীর দশ ফুট সামনে বিস্ফোরিত হলো সেটা, হলুদ মাটি আর আগুনের শিখা নিয়ে মাথাচাড়া দিল একটা টাওয়ার, মাটিতে তৈরি হলো গোলাকার একটা গভীর গর্ত, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ফুট চারেকের কম নয়, ওই গর্তে পড়ে অচল হয়ে গেল আর্মারড কার।

টারিট থেকে বেরিয়ে আছে কামাল হাসানের মাথা, মুখ আর বিস্ফোরিত চোখ, শরীরের এই তিনটে জায়গাই শেল বিস্ফোরণজনিত ধুলো আর কাঁকরে ভরে উঠল, গলা চিরে বেরিয়ে আসা রণহংকার থেমে গেল মাঝপথে। বাতাসের অভাবে হাঁপাতে লাগলেন তিনি, দু'হাতে রগড়াচ্ছেন ভেজা চোখ।

আগুন আর মাটির টাওয়ার মাইকেলের দৃষ্টিপথেও বাধা হয়ে

দাঁড়াল, অন্ধের মত গর্তের ভিতর গাড়ি নিয়ে পড়ল সে। প্রচণ্ড ধাক্কায় সিট থেকে ছিটকে পড়ল, স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে ঠুকে গেল বুক, নীচের মেঝেতে ঢলে পড়বার আগে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে এল সমস্ত বাতাস।

আরেকটা প্রচণ্ড বাঁকি খেয়ে গর্তটা থেকে উঠে এল গরবিনী, ওটার চারদিকে আগুন আর গুঁড়ো মাটি বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল। আর্মারড কারের স্প্রিং ছিঁড়ে গেছে, একদিকে কাত হয়ে আছে গাড়ি, সামনের চাকা দুটো এমন ভঙ্গিতে বাঁকা আর কাত হয়ে পড়েছে যে আর কোন দিন সিধে হবে বলে মনে হয় না, যদিও এঞ্জিন সগর্জনে চালু রয়েছে, ফলে ট্রেনিং পাওয়া সার্কাসের পশুর মত ডান দিকে ঘুরছে গরবিনী, বিরতিহীন পাক খাচ্ছে।

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে ড্রাইভারের সিটে সিধে হয়ে বসল মাইকেল, দেখল স্টিয়ারিং কলামের কোন অস্তিত্বই নেই, আর থ্রটল এমনভাবে আটকে গেছে যে দু'হাতে ধরে বাঁকালেও এক চুল নড়ে না। মাথাটা পরিষ্কার হবার অপেক্ষায় দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল চুপচাপ, এখনও হাঁপাচ্ছে, কারণ খেলার ভিতরটা ভরে আছে ধোঁয়া আর ধুলোয়। ছি-ছি, ভাবল সে, কী কুক্ষণেই না বিপদতারিণীর নাম বদলে গরবিনী রেখেছিল! বিপদতারিণী নামটা রানার দেওয়া ছিল, ওটার কারবুরেটর সংগ্রহ করবার সময় মাইকেলের গাধার খাটনির কথা স্মরণ রেখে। রানাকে হাফ ডজন চুরট ঘুষ দিয়ে নামটা বদলাবার অনুমতি আদায় করে সে, বিপদতারিণী নামটা শুনলেই সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাবে এই ভয়ে। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, রানার দেওয়া নামটাই বোধহয় ঠিক ছিল!

আরেকটা শেল বিস্ফোরিত হলো খেলার কাছাকাছি কোথাও। উঠতে যাচ্ছিল, সিটের উপর ঠুকে বসিয়ে দেওয়া হলো তাকে।

www.BanglaBook.org

নিতম্বে ব্যথা নিয়ে মাথার উপর হাত তুলল সে, হ্যাচের ঢাকনি খুলে মাথা তুলল ফাঁকটায়, তাজা বাতাস বুক ভরে নিল। তারপর চোখ মেলল মাইকেল, দেখল তিনটে কামান সরাসরি তাকে লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ করছে।

‘ওহ্, মাই গড!’ আঁতকে উঠল মাইকেল, দ্রুত বৃত্ত রচনায় ব্যস্ত আর্মারড কারের চারপাশে একের পর এক বিস্ফোরিত হলো শেলগুলো, প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে বাঁকি খেলো মাথা, দু’সারি দাঁতের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো।

‘চলো বাড়ি ফিরি!’ সর হ্যাচ থেকে বেরিয়ে আসছে মাইকেল। পা দুটো কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে ইস্পাতের মেঝে ত্যাগ করল, তা না হলে দুটো পায়েরই হাঁটু থেকে নীচের সব ক’টা হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে যেত।

দু’হাজার গজ দূরে অন্য আরেক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে মেজর লুইগি রাকা, কাউন্ট ডিকানডিয়া গানারদের মধ্যে যে আতংক ছড়িয়ে গেছে সেটা নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় নামিয়ে আনবার জন্য গলদঘর্ম হচ্ছে সে। গানাররা যন্ত্রচালিতের মত লোডিং আর ফায়ারিং এতই ব্যস্ত যে কামান দাগবার বাকি সব সূক্ষ্ম ও পরিশোধিত নিয়ম বেমালাম ভুলে যাওয়া হয়েছে। লেয়াররা এমনকী টার্গেটের নিশানা স্থির করবার ভানও করছে না, ব্রিচ ব্লক সশব্দে বন্ধ হওয়া মাত্র হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে ল্যানিয়ার্ডে।

রাকার হুংকার গর্জন তাদের বন্ধ কানে ঢুকলোই না, ইতিমধ্যে তারা কী এক নেশায় যেন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কাউন্টের মুখ থেকে মৃত্যুদণ্ডের হুমকি শুনবার পর তাদের মায়ু একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, সহজবোধ্য যুক্তি বা বিচার-বিবেচনা বোধ

হারিয়ে বসেছে সবাই।

একজন লেয়ারকে তার সিট থেকে হিঁচড়ে টেনে আনল মেজর, হাতের প্রচণ্ড চাপ দিয়ে মুঠো থেকে ছাড়াল ল্যানিয়ার্ডটা। অযোগ্য লোকদের অভিশাপ দিল সে, সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে কামানের হ্যাভেলগুলো দ্রুত ঘোরাল। মোটা ব্যারেল নীচে নামাল, সঁাৎ করে সরে এল একপাশে, বড়সড় ম্যাগনিফাইং গানসাইটে ছোট্ট পোকাকার মত আর্মারড কার হঠাৎ বিশাল হয়ে দেখা দিল। উন্মত্ত একটা গতিবেগের সঙ্গে পাক খাচ্ছে ওটা, বোঝাই যায় কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। পাক খাওয়ার ছন্দটা লক্ষ করল মেজর, কজির কঠিন আর সংক্ষিপ্ত একটা ঝাঁকিতে ল্যানিয়ার্ড টানল।

সবেগে পিছিয়ে এল ব্যারেল, শক অ্যাবজরবার-এর হাইড্রলিক পিস্টনে বাধা পেয়ে অবশেষে রুদ্ধ হলো ওটার গতি, পনেরো পাউন্ড ওজনের ইস্পাত শেল প্রান্তরের উপর দিয়ে প্রায় সরল একটা পথ ধরে ছুটল বিদ্যুৎবেগে।

সামান্য একটু নীচে লক্ষ্যস্থির করা হয়েছিল। সামনের দুই চাকার মাঝখান দিয়ে ভিতরে ঢুকল শেল, আঘাত করল সরাসরি ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের নীচের মাটিতে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় খেলের নরম তলপেট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সেটিং থেকে হিঁড়ে বেরিয়ে এল এঞ্জিন ব্লক, প্রকাণ্ড সামনের চাকা জোড়া গাড়ির গা থেকে রোস্ট করা মুরগির ডানার মত ছাড়িয়ে নেওয়া হলো যেন, খেলের মোটা ইস্পাতের মেঝে ফুলে গম্বুজ আকৃতি পেল।

ড্রাইভারের হ্যাচে ঝুলছে মাইকেল। অর্ধেক উপরে, অর্ধেক নীচে। বিস্ফোরণের ধাক্কাটা উঠে এল সদ্য খোলা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মত-মাইকেল যেন একটা ছিপি, হ্যাচ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো তাকে, পা দুটো তখনও ছন্দহীন নাচানাচি করছে।

একই অবস্থা হলো কামাল হাসানের। টারিট থেকে ছিটকে নিষ্ক্ষিপ্ত হলেন তিনি, শূন্যে উত্থানের শেষ সীমায় পৌঁছে মাইকেলের সঙ্গে মিলিত হলেন। দুটি দেহ এক সঙ্গে নেমে এল মাটিতে, প্রায় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়, ডিগবাজি খেতে খেতে। মাটিতে পড়বার পর দেখা গেল মাইকেলের পিঠে, শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে আয়েশ করে বসে রয়েছেন বৃদ্ধ-সবচেয়ে বিস্ময়কর দিকটি হলো, দু'জনের কাউকেই তরোয়ালের সামান্য একটু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি, অথচ ওদের সঙ্গেই ছিল সেটা, নেমে এসে মাইকেলের কানের লতি থেকে এক ইঞ্চি দূরে গভীরভাবে গঁথে গেছে মাটিতে।

দুর্বল মাইকেল আশ্তে ধীরে পিঠ থেকে নামাতে চেষ্টা করল কামাল হাসানকে। ‘আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওল্ড চ্যাপ,’ বলল সে, গলায় জোর কম। ‘এভাবে যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকো, বসার সময় যদি হুঁশ না থাকে, তোমার কপালে খারাবি আছে।’

কিন্তু বসবার পর মাংসের নরম গদিতে আরাম পেয়ে গেছেন গোত্রপ্রধান, উঠবার কোন ইচ্ছে নেই তাঁর।

‘তরোয়ালটা ঘোরাবে না? শুনতে পাচ্ছ না, ওরা আসছে?’

ভোজবাজির মত কাজ হলো, এক লাফে মাইকেলের পিঠ থেকে সরে গেলেন কামাল হাসান, হ্যাঁচকা টানে তরোয়াল তুলে মাথার উপর বিপুলবেগে ঘোরাতে শুরু করলেন।

তবে মিথ্যে বলেনি মাইকেল, সত্যি ওরা আসছে। একটা নয়, কয়েক ডজন এঞ্জিনের আওয়াজ পেল। পিঠ ভারমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল সে, খেঁতলানো ঠোঁট থেকে চারদিকে ধুলো আর রক্ত ছড়াল, মুখ তুলে দেখল রণেভঙ্গ দিয়ে শিফটাদের ট্রাকগুলো

সগর্জনে পালিয়ে আসছে।

‘ওহ্, মাই গড!’ হাঁপিয়ে উঠল মাইকেল, হামাগুড়ি দিয়ে বিধ্বস্ত গরবিনীর আড়ালে আশ্রয় নিল, এখনও আর্মারড কারের গা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কুঁকড়ে শরীরটাকে ছোট করে আনছে মাইকেল, এই সময় খেয়াল হলো আশপাশে কোথাও কামাল হাসানকে দেখা যাচ্ছে না।

‘কামাইল্ল্যা, ও-ই ধাড়ি বজ্জাত-ফিরে এসো বলছি!’ মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে উঠল মাইকেল।

বকের মত সরু, কাঁপা কাঁপা পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন কামাল হাসান। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া থেকে এখনও তিনি মুক্ত হতে পারেননি, মাথার ভিতরটা ভোঁ-ভোঁ করছে, কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু রক্তে পুরোপুরি অটুট রয়েছে যুদ্ধোন্মাদনা। তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারল মাইকেল। তিনি একাই গোটা শিফটা কলামকে এক হাত দেখিয়ে দিতে চান, সেদিকেই হিংস্র ভঙ্গিতে এগোচ্ছেন তিনি, চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চিৎকার করছেন, দু’হাতে ধরে মাথার উপর বন বন করে ঘোরাচ্ছেন তরোয়ালটা।

ছুটে এল মাইকেল, তরোয়ালের নীচে মাথা নামিয়ে জাপটে ধরল কামাল হাসানকে, টেনে-হিঁচড়ে বৃদ্ধ যোদ্ধাকে ফিরিয়ে আনল গরবিনীর আড়ালে, আগোছাল একটা স্তূপের মত ফেলে রাখল মাটিতে। মাইকেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন তিনি, ভাঙা স্টীল খেলের ভিতর একটা হিংস্র বাঘের সঙ্গে লড়াই হলো মাইকেলকে। ওদের পাশ ঘেঁষে শিফটা কলামের প্রথম ট্রাকটা বেরিয়ে গেল।

আতংকিত শিফটা সৈনিকরা ওদের দিকে ভাল করে একবার তাকালও না, নিজেদের কর্নেলকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন

ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই।

‘চুপ! চুপ বলছি! শান্ত হও!’ গর্জে উঠল মাইকেল, যদিও তাতে কোন কাজ হলো না, অ্যামহারিক ভাষায় মাইকেলকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে চলেছেন কামাল হাসান। ভাগ্যিস একটারও কোন অর্থ করতে পারছে না মাইকেল, তা যদি পারত, প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই মুহূর্তে এখানে একটি খুনোখুনি হয়ে যেত। শুধু গালিগালাজ নয়, সেই সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়ছেন বৃদ্ধ, অগত্যা বাধ্য হয়ে মাইকেল তাঁর মাথার চারদিকে ঢোলা আলখেল্লার খানিকটা জড়িয়ে দিল, তারপর বসল ওটার উপর। ওদিকে মিছিলের মত শিফটা ট্রাকগুলো পাশ কাটাচ্ছে গরবিনীকে। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

ধুলোর আলোড়ন একটু কমবার পর, মাইকেলের মনে হলো, দূরে কিছুতকিমাকার আকৃতিটা সম্ভবত চঞ্চলা। কামাল হাসানের মাথা থেকে লাফ দিয়ে নেমে চিৎকারের সঙ্গে হাত নাড়ল সে, কিন্তু গাড়িটা চোখের পলকে আবার হারিয়ে গেল ধুলোর ভিতর, একটা ফিয়াট ট্রাকের পিছু নিয়ে। ভিকার্স মেশিনগানের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল মাইকেল, চারদিকে অসংখ্য এঞ্জিনের শব্দ সত্ত্বেও।

তারপর হঠাৎ করে ট্রাক মিছিল শেষ হলো, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ, হালকা হয়ে এল ধুলো। খানিক পরই আরেকটা শব্দ ভেসে এল-অস্পষ্ট কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে।

তিন গোত্রের বেশিরভাগ অশ্বারোহী যোদ্ধাই অনেকক্ষণ হলো আর পলায়নরত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করছে না, তারচেয়ে অনেক উপভোগ্য ও লাভজনক একটা কাজে এই মুহূর্তে ব্যস্ত তারা। উল্টে পড়া অথবা অচল শিফটা ট্রাকগুলো লুণ্ঠ হয়ে যাচ্ছে, তবে কিছু অশ্বারোহী সৈনিক লুণ্ঠপাটে অংশগ্রহণ না করে এখনও ধাওয়া করে

আসছে শিফটাদের।

বিধবস্ত ট্রাক থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া অনেক শিফটাই ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে, অশ্বারোহীরা তাদেরকে কচু-কাটা করতে করতে ছুটে আসছে।

‘কী বলছি শোনো, কামাইল্ল্যা,’ গৌত্রপ্রধানের মাথা থেকে আলখেল্লার পঁচা ছাড়া মাইকেল। ‘দয়া করে এবার বেরিয়ে এসো। তোমার লোকদের ডাকো, এখান থেকে আমাদেরকে নিয়ে যেতে বলো।’

তিনটে কামানের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলো দিয়ে শিফটা কলাম ঢুকে পড়ল, এই সুযোগে এক কামান থেকে আরেক কামানে ছুটে গিয়ে ক্রুদের মন থেকে আতংক দূর করবার শেষ চেষ্টা চালান মেজর লুইগি রাকা। অনেক কষ্টে গানারদের নিজের নিয়ন্ত্রণে আনল সে, আর ঠিক তখনই ধুলোর মেঘ ভেদ করে বেরিয়ে এল আদিবাসীদের দ্বিতীয় আর্মারড কার।

ওটার আকস্মিক আগমন গান ক্রুদের মধ্যে পুনঃস্থাপিত বোধবুদ্ধি আর সুস্থতা ধ্বংস করবার জন্য যথেষ্ট। নাক ঘুরিয়ে আর্মারড কার সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এল, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তুমুল গুলিবর্ষণ শুরু করল। লোডাররা হাতের শেল ফেলে দিয়ে ঝেঁড়ে দৌড় দিল, সিট থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল লেয়ারদের, ডাইভ দিয়ে পড়ল কামানের আর্মার শিল্ডের পিছনে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সবাই তারা গাদাগাদি করে পড়ে থাকল সেখানে। এরপর আর্মারড কারের গানার আর মাত্র এক পশলা গুলি করল, গাড়ির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত বেগে ফিরে এল ধুলোর আড়ালে। গানাররা যেমন হতচকিত হয়ে পড়েছিল, তেমনি আর্মারড কারের ভিতর রানাও—একটা ফিয়াট ট্রাককে ধাওয়া

করছিল ও, হঠাৎ তার বদলে সামনে তিন তিনটে কামান দেখতে পেলে আঁতকে ওঠাই স্বাভাবিক।

‘মাই গড, আববাস, কামানের একেবারে মুখে গিয়ে পড়েছিলাম!’

‘ভোলীড অ্যান্ড থানডার্ড—কবিতাটা মনে আছে আপনার, মাসুদ ভাই?’ পাল্টা চিৎকার করল আববাস।

‘কবিতা, এই সময়?’ রানার গলা থেকে কাতর একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল, পা চেপে ধরল চঞ্চলার অ্যাকসিলারেটরে।

‘কোথায় যাচ্ছি আমরা?’ জিজ্ঞেস করল আববাস।

‘ঘরের ছেলে ঘরে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়—ওগুলো আমাদের দিকে আগ্নেয়গিরি তাক করে রয়েছে, আববাস।’

‘মাসুদ ভাই...!’ প্রতিবাদে মুখর হতে চাইল আববাস, কিন্তু হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হলো, এমনকী ধুলোর ঘন মেঘের ভিতরও মুহূর্তের জন্য এক ঝলক আগুন দেখতে পেল ওরা, একশো মিলিমিটার শেলটা উঁচু টারিটের মাথার পাশ দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল। বাতাসের চড় খেলো ওরা, কানের ভিতর ঝড় উঠল, শেলের তীক্ষ্ণ শব্দে কঁকড়ে গেল শরীর! আধমাইল দূরে বিস্ফোরিত হলো সেটা, আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল মাটি আর আগুন।

‘কী বলছি বুঝতে পারছ, বৎস?’ প্রশ্ন করল রানা।

‘জ্বী-জ্বী, হ্যাঁ!’

ধুলোর মেঘ নিরাপত্তার একটা বেষ্টনী হিসাবে কাজ করছিল, হঠাৎ সেটা আকারে ছোট হয়ে একপাশে সরে যাওয়ায় কামানগুলোর লোভনীয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো চঞ্চলা। শুধু চঞ্চলা নয়, উপাদেয় আরও একটা টার্গেট দেখতে পেল শিফটাদের ভাড়াটে মেজর। আদিবাসী অশ্বারোহীরা তখনও ছুটে

আসছে।

আর্মারড কারকে লক্ষ্য করে কয়েকটা গোলা ছুঁড়ে যখন কাজ হলো না, মেজর লুইগি রাকা তখন টার্গেট বদল করল। ‘শ্র্যাপনেল,’ হুংকার ছাড়ল সে। ‘লোড উইথ শ্র্যাপনেল, ফিউজ ফর এয়ার বার্স্ট!’

ইথিওপিয়ার পনি আকারে ছোটখাট, গায়ে প্রচুর পশম, পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠা-নামায় ভারি দক্ষ, তবে খোলা প্রান্তরে তীরবেগে শত্রুর পিছু ধাওয়া করা তার জন্য অস্বস্তিকর। তা ছাড়া কয়েকহুণ্টা ধরে সমতল মরুর শুকনো ঘাসজমিতে আটকে রাখা হয়েছে ওগুলোকে, ফলে ইতিমধ্যে তাদের শক্তি-সমার্থ্য সব খরচ হয়ে গেছে।

প্রথম সারির অশ্বরোহীদের মাথা থেকে পঞ্চগশ ফুট উপরে বিস্ফোরিত হলো শ্র্যাপনেল। ঘন নীল আকাশের গায়ে ভীতিকর একটা উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ল, আওয়াজটা শুনে মনে হলো গোটা আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার উপর, সেই সঙ্গে উড়ন্ত ছুরির মত অসংখ্য শ্র্যাপনেলের বিদ্যুৎগতি ছুটোছুটিতে হিসহিস আওয়াজ উঠল বাতাসে।

প্রথম বিস্ফোরণে বারোটা ঘোড়া ধরাশায়ী হলো, মাটিতে মাথা দিয়ে সামনের দিকে আছাড় খেলো ওগুলো, পিঠ থেকে ছুঁড়ে দিল আরোহীদের। পরমুহূর্তে আকাশ ভরে উঠল ভয়াবহ আগুনে গোলায়। অবিরাম বিস্ফোরণের আওয়াজে চিঁহিহি ডাক ছেড়ে দিকভ্রান্ত ঘোড়াগুলো গা ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে আরোহীদের ফেলে দিতে চেষ্টা করল, আরোহীরা প্রাণপণে কেশর ধরে ঝুলে থাকল। আহত ঘোড়াগুলোর নীচে চাপা পড়ল আরোহীরা। দু’একজন অতি সাহসী ঘোড়সওয়ার লাগাম টেনে নীচের দিকে ঝুকল, আহত সৈনিককে তুলে নিল ঘোড়ার পিঠে। মাত্র কয়েক

সেকেন্ডের মধ্যে, গোটা আদিবাসী বাহিনী, সচল আর্মারড কারসহ রক্ষা পাওয়া অশ্বরোহীদের নিয়ে, পিছু হটল। যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেল মেজর লুইগি রাকার গোলন্দাজ বাহিনীর দখলে, আর মাঝখানে অচল পড়ে থাকল ত্রুদের নিয়ে গরবিনী।

বিধ্বস্ত খোলের আশ্রয় থেকে, চোখে বিষাদ নিয়ে, আদিবাসী বাহিনীর পলায়ন চাক্ষুস করল মাইকেল সেভারস। দ্রুত উদ্ধার পাবার শেষ আশাটা কেরোসিন ফুরিয়ে আসা কুপির মত ধীরে ধীরে নিভে গেল। ‘ওদের কোন দোস দেই না, সত্যিই দেই না,’ কামাল হাসানকে বলল সে, আর তারপরই তার চোখ পড়ল দ্রুতগতি আর্মারড কারের ওপর। অশ্বরোহী বাহিনীকে ছাড়িয়ে আগে চলে যাচ্ছে রানার চঞ্চলা।

‘ওর কথা আলাদা,’ বিড়বিড় করে আবার বলল মাইকেল। ‘ও আমাদের দেখেছে—আমি জানি দেখেছে।’ এক পর্যায়ে চঞ্চলা ওদের সিকি মাইলের মধ্যে চলে এসেছিল। শুধু তাই নয়, নাক ঘুরিয়ে ওদের দিকে রওনাও হয়েছিল। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তারপর আবার বাঁক নিয়ে দূরে সরে যায় সেটা। ‘কী জানো, ভাই কামাল হাসান, এ-কথা বিশ্বাস করার ভূরি ভূরি কারণ দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে একজোড়া ছাগল হিসেবে উৎসর্গ করে যাওয়া হয়েছে।’ আড়চোখে কামাল হাসানের দিকে তাকাল সে।

মাইকেলের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন কামাল হাসান, শিকারী কুকুরের মত হাঁপাচ্ছেন তিনি, ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে বুকটা, নাকের ফুটো দিয়ে শিসের শব্দ হয়ে বেরিয়ে আসছে নিঃশ্বাসগুলো।

‘মুখের ভেতর থেকে ওই সাদা কোদালগুলো বের করে নিলে ভাল করবে, ওল্ড চ্যাপ—তা না হলে কখন গিলে ফেলবে জানতেও

পারবে না। আজকের মত যুদ্ধ শেষ হয়েছে। চেষ্টা করে দেখো শান্ত হতে পারো কিনা। বাড়ি ফিরতে হলে রাতের অন্ধকারে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।’

ঘাড় ফিরিয়ে আবার প্রান্তরের দূর প্রান্তে তাকাল মাইকেল। এখনও দেখা যাচ্ছে চঞ্চলাকে, অস্পষ্ট। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ওটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক কাঁপিয়ে। ‘মহৎপ্রাণ মাসুদ রানা এখানে ফেলে যাচ্ছে আমাদেরক। ফিরে গিয়ে বীরত্বের কাহিনী শোনাবে, তারিয়ে তারিয়ে খাবে...কী খাবে? মধু, মধু! আহ, মধু!’ অ্যানি উইসপারের আপেল-রাঙা চেহারাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মাইকেল, সবচেয়ে খারাপটা কী ঘটতে পারে আন্দাজ করে নিয়েছে, চরম পরিণতির জন্য মানসিকভাবে তৈরি। ‘ভাই কামাল, ওল্ড চ্যাপ, এক অর্থে রানাকে আমি শুধু শুধু দোষ দিচ্ছি, তাই না? মনে রেখো ওর জায়গায় আমি হলেও সম্ভবত এই-ই করতাম। কিন্তু পার্থক্যটা তোমাকে বুঝতে হবে, ভাই কামাল হাসান। আমি মাইকেল আর তুমি মাসুদ রানা এক কথা হলো, কী? ভদ্রলোক এবং মহৎ হৃদয় মাসুদ রানার কাছ থেকে এই আচরণ সত্যি আমি আশা করিনি-যাও, মনের কথাটা ফাঁস করে দিলাম!’

মাইকেলের একটা কথাও শুনছেন না কামাল হাসান। দুই সেনা বাহিনীর মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার দৃষ্টিতে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। তিনি শুধু সামান্য একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন-হঠাৎ আচমকা মস্ত একটা লাফ দিয়ে উঠে তরোয়াল হাতে সিধে হলেন, রণভংকার ছেড়ে ছুটলেন মেজর রাকার কামানগুলোর দিকে। হতভম্ব হয়ে পড়ল মাইকেল, কী ঘটছে বুঝতে খানিকটা সময় লাগল তার। শত্রুর পজিশনে পৌঁছুবার জন্য

প্রয়োজনীয় দু’হাজার গজের মধ্যে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেছেন কামাল হাসান, এই সময় তাঁকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরবার সুযোগ হলো মাইকেলের।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে ঠিক সেই মুহূর্তে একজন গানার দু’হাতে বিনকিউলার তুলে অচল আর্মারড কারের উপর চোখ বুলাল।

প্রথম শেলটা গরবিনীর কাছাকাছি পড়ল, আরও সামনে মাইকেল পিছন থেকে জড়িয়ে ধরায় কামাল হাসান তখন ধস্তাধস্তি শুরু করছেন। কৃত্রিম দাঁত, ওগুলোর সাহায্যে কামড়ানো যায় না, তাই আঙুলের নখ দিয়ে মাইকেলের উপর হামলা চালালেন বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান। হার মানল মাইকেল, ছেড়ে দিল তাকে, ঝুঁকে একটা পাথর তুলে নিল হাতে। আকারে সেটা ক্রিকেট বলের মত। তরোয়াল বাগিয়ে ধরে আবার ছুটলেন কামাল হাসান, তার পিছু নিল মাইকেল। বুড়ো মানুষ, খুলিটা কী পরিমাণ ভঙ্গুর আন্দাজ পাবার চেষ্টা করল সে। কানের পিছনে, খানিকটা উপরে, একটা জায়গা পছন্দ হলো তার, ওখানটায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। মারল প্রায় আদর করবার ভঙ্গিতে, আবার এত আস্তে নয় যে ব্যথা পাবেন অথচ জ্ঞান হারাবেন না। তা যদি ঘটে, মাইকেলের কপালে খারাবি আছে। কুলিটা সামান্য ডেবে গেল ভিতর দিকে, বিনাবাক্যব্যয়ে চলে পড়লেন কামাল হাসান, মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগেই তাকে দু’হাতের মধ্যে ধরে ফেলল মাইকেল।

গোত্রপ্রধানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসছে সে, তার বুকের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে যেন ঘুমন্ত একটা শিশু। মাইকেল ছুটছে, ওদের চারপাশে একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে শেলগুলো। বিধ্বস্ত আর্মারড কারের পাশে পৌঁছুতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে।

খালি মাঠে কামানের গোলা পড়ে কেন? ভুরা জোড়া কুঁচকে উঠল রানার! ‘ওহে, আব্বাস, ব্যাপার কি দেখো তো?’

রানার চিংকার শুনে টারিটের আরও উপরে উঠে পড়ল আব্বাস, পিছন দিকে তাকিয়ে কী ঘটছে বুঝবার চেষ্টা করল। এতদূর থেকে বিধ্বস্ত গরবিনীর খোলটা দেখতে পাবার কথা নয়, মাথাচাড়া দিয়ে থাকা পাথর বা ঘাসের একটা চাপড়া বলে মনে হবে। গত কয়েক মিনিটে ওরা দু’জন অন্তত পঞ্চাশ বার ওদিকে তাকিয়েছে, ওটাকে আর্মারড কার বলে চিনতে পারেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওটার চারদিকে অসংখ্য শেল বিস্ফোরিত হতে দেখে যা বুঝবার বুঝে নিল আব্বাস। ‘আমার দাদু!’ প্রায় কেঁদে ফেলল সে। ‘ওখানে আমার দাদু রয়েছেন, মাসুদ ভাই! হায় খোদা, ওরা গোলা খেয়েছে!’

চঞ্চলাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ব্রেক করল রানা, উঠে এল হ্যাচ থেকে, শার্টের প্রান্ত দিয়ে বিনকিউলারের লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করল। সেটা চোখে তুলতেই লাফ দিয়ে কাছে চলে এল গরবিনী, সঙ্গে সঙ্গে ছুটন্ত মূর্তিটাকে চিনতে পারল সে। টুইডের সুট পরনে, নিশ্চয় মাইকেল। বুকের সঙ্গে কাকে যেন ধরে রয়েছে, বাতাসে উড়ছে সাদা আলখেল্লা। তারমানে কামাল হাসান আহত হয়েছেন! নিহত হলে...না মারা গেলে লাশটা বয়ে আনত না মাইকেল। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা, বিধ্বস্ত গরবিনীর খোলার আড়ালে পৌঁছে গেছে মাইকেল।

‘ওদেরকে উদ্ধার করতে হবে, মাসুদ ভাই!’ ব্যাকুলকণ্ঠে আবেদন জানাল আব্বাস। ‘কেউ সাহায্য না করলে মারা পড়বে ওরা!’

‘চলো যাই,’ বলল রানা, হ্যাচ গলে ঝুপ করে নেমে পড়ল

ড্রাইভারের সিটে, থ্রটলে চাপ পড়তেই লাফ দিয়ে ছুটল চঞ্চলা।

একটা গোলাও ওদের দিকে এল না, শিফটারা স্থির টার্গেটকে নিয়ে ব্যস্ত। বারবার কামান দাগবার ফলে দূরত্বের নিখুঁত হিসাবটা পেয়ে যাচ্ছে তারা, প্রতিটি গোলা আগেরটার চেয়ে গরবিনীর আরও কাছে বিস্ফোরিত হচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে সরাসরি আঘাত খাবে অচল আর্মারড কার। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পায়ের চাপে থ্রটলটাকে মেঝের সঙ্গে সমান করে দিল রানা, কিন্তু ঠিক বিপদের সময়টাতে চঞ্চলা তার আসল স্বভাব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। আর্মারড কারের ইতস্তত ভাবটুকু অনুভব করল রানা, মুহূর্তের জন্য বদলে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ, খক খক করল, ভাবটা পায়তারা কষবার, গৌঁ ধরে বোঝাতে চাইছে পাওয়ার সাপ্লাই যথেষ্ট নয়। তারপর আবার সমস্ত অভিযোগ ভুলে গিয়ে আগের মতই তুমুল বেগে ছুটতে শুরু করল।

‘গুড লিটল ডার্লিং,’ ভাইজরে চোখ রেখে সামনে তাকাল রানা, সঁাৎ করে সামান্য একটু বাঁ দিকে সরিয়ে নিল চঞ্চলাকে—বিধ্বস্ত গরবিনী আর শেলগুলোর বিস্ফোরণকে আড়াল হিসাবে পেতে চাইছে।

নাক বরাবর সামনে বিস্ফোরিত হলো একটা শেল, সদ্য তৈরি ধূমায়িত গর্তগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে এড়িয়ে গেল রানা। প্রয়োজনের চেয়ে খানিকটা বেশি এগিয়ে পিছনের চাকাগুলোর উপর পাক খাওয়াল চঞ্চলাকে, যে দিক থেকে এসেছে সেদিকে ঘুরে গেল আর্মারড কারের নাক, সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, দ্রুত পালাবার জন্য তৈরি।

পুরোপুরি না হলেও, গরবিনীর খানিকটা আড়াল পেয়েছে চঞ্চলা, শিফটারা ওটার অংশবিশেষ দেখতে পাচ্ছে, কামাল

হাসানকে কোলে নিয়ে বসে থাকা মাইকেলের কাছ থেকে মাত্র সাত-আট গজ দূরে।

‘মাইক!’ হাঁক ছাড়ল রানা, হ্যাচ থেকে এইমাত্র মাথা তুলেছে।

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল মাইকেল, চেহারায় হতচকিত ভাব আর অবিশ্বাস। শেল বিস্ফোরণের অবিরাম শব্দে কালা হয়ে ছিল সে, টেরও পায়নি রানা ওকে উদ্ধার করবার জন্য আবার ফিরে এসেছে।

আবার হাঁক ছাড়তে হলো রানাকে। ‘তুমি শালা নরকে পচে মরো-বলি, আসবে নাকি ওখানে বসে থাকবে?’

এতক্ষণে সংবিত্ত ফিরল মাইকেলের, কামাল হাসানকে কোল থেকে বুক নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, মাথা নিচু করে ছুটল চঞ্চলা দিকে। একটা গোলা এত কাছে বিস্ফোরিত হলো যে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল মাইকেল, অচল আর্মারড কারের গায়ে-মাথায় পাথর আর আগুন বৃষ্টি হলো।

একবার মনে হলো কামাল হাসানকে বুক থেকে ফেলে দেবে মাইকেল। পরমুহূর্তে ব্যাকুল দু’জোড়া হাতে তুলে দিল অজ্ঞান দেহটাকে। কামাল হাসানকে ভাল করে ধরল আব্বাস।

‘দাদু, আমার দাদু।’ আব্বাস ফোঁপাচ্ছে। ‘উনি কী...?’

‘চিন্তার কিছু নেই, ছোট্ট একটা পাথর লেগেছে মাথায়,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মাইকেল, মুহূর্তের জন্য হেলান দিল গাড়ির গায়ে, নোংরা গাল বেয়ে নেমে আসছে ঘামের মোটা ধারা। রানার দিকে তাকাল মুখ তুলে। ‘আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আর আসছ না,’ কর্কশ সুরে বলল সে।

‘চিন্তাটা খেলেছিল মাথায়,’ হেসে বলল রানা, ঝুঁকে মাইকেলের হাতটা ধরল, টেনে গাড়ির মাথায় তুলে আনল তাকে।

প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তবু রানার হাতটা ছাড়ল না মাইকেল,

আরও এক সেকেন্ড ধরে থাকল, চাপ দিল মৃদু। ‘আমার কাছে তোমার পাওনা থাকল, ওল্ড চ্যাপ।’

‘ভেবো না ইতস্তত করব চাইতে।’ নিঃশব্দে হাসল রানা।

‘এনি টাইম। এনি টাইম অ্যাট অল।’

ঠিক এই সময় চ্যালেন্জের সুরে গর্জে উঠল চঞ্চলা, শিফটা কামানের উপর্যুপরি বিস্ফোরণের জবাবে ব্যাকফায়ার করল। থক-থক করে উঠল এঞ্জিন, গোঙাল, তারপর নিশ্চুপ হয়ে গেল।

‘ওহ্, ইউ ডটার অভ আ বীচ!’ রাগে নিজের চুল খামচে ধরল রানা। ‘আর সময় পেলি না!’

‘একটা মেয়ের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় পরিচয় হয়েছিল...।’

‘পরে,’ বলল রানা। ‘যাও, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলটা ঘোরাও।’

‘মাই প্লেজার, ওল্ড চ্যাপ,’ বলল মাইকেল, একটুর জন্য লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ একটা গোলার বিস্ফোরণ আর্মারড কারের মাথা থেকে নীচে ফেলে দিল তাকে। টলতে টলতে দাঁড়াল সে, সুট থেকে ধুলো-বালি ঝাড়ল, ঝোঁড়াতে ঝোঁড়াতে গাড়ির সামনে চলে এল।

ঝাড়া এক মিনিট হ্যান্ডেল ধরে সংগ্রাম করল মাইকেল, নিঃশেষে ব্যয় করল ক্লান্ত শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু, ফলাফল শূন্য। মাটিতে ঠিক বসল না, পড়ে গেল, বেদম হাঁপাচ্ছে। ‘আমি শেষ, ওল্ড চ্যাপ।’

হ্যান্ডেলের সামনে থেকে সরে গেল মাইকেল, তার জায়গায় রানা দাঁড়াল। চারদিকের বিস্ফোরণ ভুলে থাকবার চেষ্টা করল ও, ধেয়ে আসা ধুলো আর ঝোঁয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখল মুখ, চোখ বন্ধ, প্রাণপণে ঘোরাল হ্যান্ডেলটা।

আরও এক মিনিট পর টেঁচিয়ে বলল মাইকেল, ‘ডাইনীটা মারা গেছে।’

প্রচণ্ড রাগে কথা বলবার শক্তিও হারিয়ে ফেলল রানা, মুখের চেহারা লাল হয়ে উঠল, গলায় ফুটে উঠল সব ক’টা নীল রগ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকেও হাল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসতে হলো, দম ফুরিয়ে গেছে।

এক সেকেন্ড পর বলল, ‘টুলকিটটা সিটের নীচে, মাইকেল।’

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মাইকেল। ‘কী বলছ, ওল্ড চ্যাপ? এখানে? এখন? ভাবছ পার্টস খুলে মেরামত করার সময় তোমাকে দেয়া হবে, কী?’ অস্থির একটা হাত তুলে চারদিক দেখাল সে-রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র, শিফটা কামান, শেল বিস্ফোরণ। ‘কী দেখছ চারপাশে?’

‘আর কোন বিকল্প জানা আছে?’ ঝাঁঝের সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

চারদিকে চোখ বুলাল মাইকেল, ঢালু কাঁধ দুটো হঠাৎ উঁচু করল, ঝুলে পড়া মুখ ফিরে পেল সুষ্ঠু আকৃতি, ব্যঙ্গাত্মক নিঃশব্দ হাসিতে প্রসারিত হলো ঠোঁটের একটা কোণ। ‘তুমি জিজ্ঞেস করলে সেটাই ভারি আশ্চর্য, ওল্ড চ্যাপ। ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা হলো এই যে-,’ হাত তুলে রানাকে দেখাল সে, রানা সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেল, আলোড়িত ধোঁয়া আর ধুলোর কিনারা থেকে কিস্তৃতকিমাকার একটা জন্তু হোঁচট খেতে খেতে ওদের দিকে ছুটে আসছে।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল নিতম্বিনী, দড়াম করে একযোগে খুলে গেল দুটো হ্যাচ। একটায় বেরল রাহেলা বানুর কালো, অপরটায় অ্যানি উইসপারের সোনালি মাথা।

রানার দিকে ঝুঁকল অ্যানি, হাত দিয়ে মুখের চারপাশে চোঙ তৈরি করল, শেল বিস্ফোরণের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার চিৎকার, ‘চঞ্চলার হয়েছেটা কী?’

মুখ খুলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল রানা, চেহারা এখনও টকটকে লাল, দর দর করে ঘামছে। ‘যা স্বভাব, হঠাৎ বেঁকে বসেছে।’

‘টো রোপটা কষে বাঁধো,’ বলল অ্যানি। ‘তোমাদের টেনে নিয়ে যাব।’

সাত

বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছে বীরযোদ্ধারা; তাদের সদম্ভ পদচারণা, মন-খোলা হাসি আর উল্লাসধ্বনিতে মুখর হয়ে আছে আদিবাসীদের ক্যাম্প। কিশোরী মেয়েরা প্রচণ্ড ভিড়ের ভিতর ছুটোছুটি করে ভাই-বেরাদারদের খুঁজে বের করল, গলায় পরিয়ে দিল বিজয়মাল্য। আরও যারা বড়, কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নাচ আর গানের আসর বসাল। যুবতী স্ত্রীরা, গনগনে আগুনের ধারে বসে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, ঘন ঘন মুখ তুলে স্বামীদের দেখে নিল, কথা হলো চোখে চোখে, পুরুষদের গর্বে তারাও গর্বিত। রাতে যে ভোজটা হবে তার আয়োজন ব্যাপক, গোটা ক্যাম্প জুড়ে একশোরও বেশি শুধু গরু জবাই করা হয়েছে। তার সঙ্গে আছে খাসী, ভেড়া আর উট। বাতাস ভারি হয়ে আছে মাংস আর মশলার গন্ধে।

টাইপরাইটারের উপর ঝুঁকে নিজের কাজে ব্যস্ত অ্যানি উইসপার বসে আছে নিজের তাঁবুর ফ্ল্যাপের নীচে, কী-বোর্ডের

উপর ব্যস্ত মৌমাছির মত উড়ে বেড়াচ্ছে তার আঙুলগুলো-হারারি ও রাসটা গোত্রদ্বয়ের সাহস আর নৈপুণ্যের বর্ণনা দিচ্ছে সে, প্রায় নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও শুধু আত্মরক্ষার স্বার্থে, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত শিফটা বাহিনীর বিরুদ্ধে, স্রেফ তরোয়াল আর ঘোড়া সম্বল করে কী বীরত্বের সঙ্গেই না লড়েছে তারা। যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা দেওয়ার পর, অ্যানি লিখল-শিফটাদের শুধু দুষ্কৃতকারী ভাবলে মারাত্মক ভুল করা হবে, কারণ তাদের এবারকার আক্রমণের উদ্দেশ্য শুধু লুণ্ঠপাট করা নয়। শিফটারা গণহত্যা চালাচ্ছে, আর তাদেরকে সাহায্য করছে বিদেশী শক্তি। এখন আর এটা কোন গোপন ব্যাপার নয় যে ইথিওপিয়ায় ফণা তুলেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নামক বিষাক্ত সাপ। জন-বিরোধী অত্যাচারী সম্রাট হাইলে সেলাসীকে জোর করে ক্ষমতায় বসিয়ে রাখবার জন্য কমিউনিস্ট গেরিলাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। দু'পক্ষের যুদ্ধে আদিবাসী আর হারারি অন্যান্য গোত্রগুলো হয়ে পড়েছে অসহায় শিকার। শিফটারা সারডি গিরিসংকট পেরিয়ে সেলাসী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে...

‘চমৎকার, মিস অ্যানি, ভারি চমৎকার!’ অ্যানির কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে শেষ লাইনগুলো পড়ে ফেলেছে রাহেলা বানু। ‘তোমার লেখা পড়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, ভাই! তোমার প্রতি আমি, আমাদের গোত্র চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। এত সুন্দর রিপোর্ট...।’

‘তোমার ভাল লেগেছে শুনে খুশি হলাম, তবে তুমি আমার সম্পাদক হলে আরও খুশি হতাম।’ লেখা শেষ করে কাগজটা টাইপরাইটার থেকে বের করল অ্যানি, পড়বার সময় কলম দিয়ে সংশোধন করল দু'একটা লাইন, সবশেষে ভাঁজ করা কাগজটা মোটা একটা খয়েরী এনভেলাপে ভরল, জিভের ডগা দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিল আঠা, তারপর বন্ধ করল এনভেলাপের মুখ। জিজ্ঞাস

করল, ‘ঠিক জানো তো, বানু, লোকটা বিশ্বস্ত?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই, শতকরা একশো ভাগ-আবাসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত যারা, তাদের একজন।’ অ্যানির কাছ থেকে এনভেলাপটা নিয়ে অদূরে অপেক্ষারত ঘোড়সওয়ারের হাতে ধরিয়ে দিল বানু, তাঁরুর বাইরে ঘণ্টা দেড়েক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে, অনলবর্ষী ভাষায় লোকটাকে জ্ঞানদান করল বানু; রিপোর্টে কী আছে, যথাস্থানে পৌঁছুলে গোত্রগুলোর অনুকূলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, ইত্যাদি বোঝাবার পর যুবক ঘোড়সওয়ারের দুই কাঁধে হাত রেখে কাছে টানল সে, চুমো খেলো তার কপালে, তারপর কোমরে একটা মৃদু চাপড় মেরে পিছিয়ে এল। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ল যুবক, লাগাম তুলে নিল, টগবগ শব্দ করে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল ঘোড়া, কালো হয়ে আসা গিরিসংকটের মুখ লক্ষ্য করে ছুটল-ওদিকে কর্কশ পাহাড়ের পাঁচিল আর এবড়োখেবড়ো শৃঙ্গগুলোকে ঢেকে দিতে শুরু করেছে সন্ধ্যার ধোঁয়াটে নীল ছায়া।

‘মাঝরাতের আগেই সারডি শহরে পৌঁছে যাবে ও। বলে দিয়েছি, পথে কোথাও যেন না থামে। তোমার মেসেজ টেলিগ্রাফে চড়বে, এই ধরো, কাল ভোরে।’

‘ধন্যবাদ, বানু ডিয়ার।’ ক্যাম্প চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যানি। টাইপরাইটারটা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ছে, ওকে ঝুঁটিয়ে লক্ষ করল বানু। গোসল করেছে অ্যানি, সঙ্গে করে আনা সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরেছে-স্নান নীল হালকা লিনেন-এর স্কার্ট, কোমরের কাছে আঁটসাঁট হয়ে আছে। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হলেও, হাঁটুর পিছনে সুগঠিত মাংসপেশী উন্মুক্ত হয়ে আছে, যে-কোন পুরুষের মনে লোভ জাগাবে, পায়ের সিন্ধু মোজা ফর্সা মাখন রঙা ত্বকের

সঙ্গে মিশে আছে।

‘তোমার পোশাকটা ভারি সুন্দর,’ মৃদু কণ্ঠে বলল বানু।
‘তোমার চুল অত্যন্ত নরম আর হলুদ।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ‘আহা, মিস অ্যানি, আমি যদি তোমার মত সুন্দর হতাম! আমি কালো মেয়ে, আমার গায়ের চামড়া কোনদিনই তোমার মত হবে না।’

‘ঠাট্টা করছ, তাই না?’ বিব্রত ভাবটুকু গোপন করে কটাক্ষ হানল অ্যানি। ‘তোমার চামড়ায় যে লাবণ্য, দেখি আর হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরি-সে খবর রাখো?’ একযোগে হেসে উঠল দু’জনে।

‘আমাকে বলবে, আজ তুমি কার কথা ভেবে এমন সুন্দর করে সেজেছ, মিস অ্যানি? দাঁড়াও, আমাকে আন্দাজ করতে দাও। মা-সু-দ রা-না। ঠিক? উফ্, আজ তোমাকে দেখে মাথাটা ঘুরে উঠবে ওর। আমি জানি, তোমাকে এই মুহূর্তে খুঁজছে ও। চলো না, ওকে আমরা খুঁজে বের করি?’

‘ভুলে গেছ, তোমার একটা জরুরী কাজ রয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল অ্যানি, হাসিটা গোপন রাখল। ‘আব্বাসকে খুঁজে বের করতে হবে না? আমি জানি, সে তোমাকে খুঁজছে।’

পরামর্শটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করল বানু। একদিকে কর্তব্য, আরেক দিকে ফুর্তি, উভয়সংকটে পড়ে গেছে। তারপর মুখ তুলে ব্যাকুলকণ্ঠে জানতে চাইল, ‘তুমি ঠিক জানো, একা সামলাতে পারবে? যদি কোন সমস্যা হয়...।’

‘বাহ্, ইতিমধ্যে তোমার কাছ থেকে খানিকটা হলেও তো ট্রেনিং পেয়েছি, তাই না? চেষ্টা করলে কেন সামলাতে পারব না! আর যদি কোন সমস্যা হয়ই, তোমাকে তখন ডাকব।’

‘সাথে সাথে চলে আসব আমি,’ আশ্বাস দিয়ে বলল বানু।

রানাকে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে, পরিষ্কার ধারণা আছে

অ্যানি উইসপারের। পা টিপে টিপে উঁচু ইম্পাতের খোলের পাশে এসে দাঁড়াল সে, কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে রানাকে কাজ করতে দেখল। নিজের কাজে সম্পূর্ণ নিমগ্ন, অ্যানির উপস্থিতি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওর। নিজেকে তিরস্কার করল অ্যানি মনে মনে, এতদিনেও কেন সে রানাকে ভাল করে দেখতে পায়নি বা বুঝতে পারেনি বলে; কেন সে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে ছিল। বালকসুলভ তরতাজা ভাবটুকুও মিথ্যে নয়, কিন্তু সেটা শুধু উপরের আবরণ, ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে শক্তিশালী একজন পরিণত পুরুষ, যে পুরুষ নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে, হতে পারে সদয় প্রেমিক। ওর চেহারায় চিরতরুণ ভাবটুকু, অ্যানি উপলব্ধি করল, বুড়ো বয়েসেও অম্লান থাকবে। ওর চোখে দৃষ্টির যে গভীরতা, আজ যেন হঠাৎ করে সেটা দেখতে পেল অ্যানি। নতুন করে লক্ষ করল, চোয়ালের চারধারে ইম্পাতকঠিন দৃঢ় একটা ভাব ফুটে আছে। এই জাতের পুরুষরাই তো যা করব বলে ভাবে তা করে দেখায়, কোন হতাশা বা পিছুটান তাদেরকে কর্তব্য থেকে সরিয়ে আনতে পারে না। দায়িত্বসচেতন আর কর্তব্যপরায়ণ, পুরুষজাতির মধ্যে এদেরকেই শ্রদ্ধা করে অ্যানি। হঠাৎ করে অ্যানির প্রচণ্ড একটা ইচ্ছা হলো, রানাকে ওর কাজে সাহায্য করবে সে, সারাজীবন ধরে ওর পাশে, ওর সঙ্গে হাঁটবে-ওকে, শুধু ওকেই ভালবাসা দেবে সে, ওর সন্তান ধারণ করবে পেটে, ওর সন্তানকে লালন করবে, ভাগীদার হবে ওর দুঃখ আর শোকের, দু’জনে একসঙ্গে স্বপ্ন দেখবে।

প্রেমে পড়লে বোধহয় তৃতীয় একটা নয়ন খুলে যায়, ভাবল অ্যানি। চুপিচুপি রানাকে দেখল সে, অকারণ পুলকে শিহরিত হলো সারা শরীর। নাকি, প্রেমে পড়লে আসলে নিজেকে বোকা বানানো

সহজ হয়? চিন্তাটা খানিক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল তাকে। সে একজন রিপোর্টার, প্রতিটি বিষয় বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত, নিজের মধ্যে ভাবাবেগে ভেসে যাবার প্রবণতা লক্ষ করে অবাকই হয়েছে। সমস্ত চিন্তা বাতিল করে দিয়ে নতুন করে শুরু করল হিসাব-যোগ অংক। সংখ্যাগুলো এক এক করে সাজাল সে। রানা সুন্দর, কর্মঠ, বুদ্ধিমান...। আংশিক যোগফল দাঁড়াল পঞ্চাশ। আঁতকে উঠল অ্যানি, এভাবে যোগ করতে থাকলে যোগফল পাঁচ হাজারে দাঁড়াবে, নাকি পঞ্চাশ হাজারে, বলা অসম্ভব! রানা সম্পর্কে যা ভাবছে বা মনে পড়ছে সবই যোগের খাতায় টুকতে হয়, বিয়োগের খাতা শূন্য থাকে! হয় ঈশ্বর, তারমানে ভালভাবেই ডুবেছি দেখছি! যাকে বলে হাবুডুবু খাচ্ছি!

তারপর মনে হলো, সে বোধহয় নিজেকে কনভিন্স করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অতি সাম্প্রতিক একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল তার, একজন পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে সে। দ্বিধা, অনিশ্চিত ভাবটুকু আবার ফিরে এল মনে। স্মৃতিটা মন থেকে মুছে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। আবিষ্কার করল, দু'জন পুরুষকে সে দাঁড়িপাল্লায় তুলে ওজন করবার চেষ্টা করছে। তুলনা করছে কে তার জন্য ভাল, কার কী গুণ বা অগুণ। মাইকেল সেভারস মানেই যেন অবাধ ফুর্তি, দুষ্ট আনন্দের অফুরান উৎস। আর মাসুদ রানা মানেই মার্জিত প্রেম যোগ নিরাপদ আশ্রয়, যোগ আদর্শগত উত্তরণ, যোগ...।

তারপর আবার লোকটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সে। তার বিশ্বাস, ওকে সে ভালবাসে। তার জানা নেই রানাও তাকে ভালবাসে কি না। ইদানীং রানা একটু যেন দূরে থাকতে পছন্দ করে, একটু এড়িয়ে যাওয়া ভাব। সেদিনের কথা ভোলেনি অ্যানি, ওকে চুমো খাওয়ার সুযোগ পেয়েও সেটা নেয়নি রানা। কেন? কে

এই লোক? কী তার সত্যিকার পরিচয়? কেন সে আফ্রিকায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে? জীবনের কাছ থেকে কী আশা করে সে, তার স্বপ্ন কী? এরকম হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর অ্যানির জানা নেই। ভালবাসা কি স্রেফ একটা ভাবাবেগ, সেখানে স্বার্থচিন্তা বা কৌতূহল কি থাকতে নেই? যাকে সে প্রায় চেনেই না, যার সম্পর্কে প্রায় কিছুই তার জানা নেই, এমন একজন লোককে কি সত্যিকার অর্থে ভালবাসা যায়?

না-সিদ্ধান্তটা মনে আসতেই, নিজের অজান্তে প্রায় আঁতকে উঠল অ্যানি উইসপার। শব্দটা শুনে ঝট করে তার দিকে ঘাড় ফেরাল রানা।

রানার চোখে বিস্ময়, বিস্ময়ের জায়গাটুকু দ্রুত দখল করে নিল আনন্দ। অ্যানির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল ও, সেই সঙ্গে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল ভুবনভোলানো হাসি। 'এই মেয়ে, আগে যেন কোথায় দেখেছি তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল ও।

কোমরে দু'হাত রেখে পাক খেলো অ্যানি, ফুলে উঠল পোশাকটা। 'পছন্দ হয়?' জিজ্ঞেস করল সে।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা, জানতে চাইল, 'বিশেষ কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'কামাল হাসান ভোজ দিচ্ছে, ভুলে গেছ?'

'তঁার আরেকটা ভোজ আমার সহ্য হবে?' কৃত্রিম ভয়ে শিউরে উঠল রানা। 'শিফটাদের হামলা, নাকি কামাল হাসানের দাওয়াত-ঠিক জানি না, কোন্টা বেশি বিপজ্জনক।'

'কিন্তু ওখানে তোমাকে থাকতেই হবে-মহান বিজয়ের অন্যতম নায়কদের মধ্যে তুমিও তো একজন।'

'হুম।' ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের কাজে মন দিল রানা, চঞ্চলাকে নিয়ে

ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

‘গোলমালটা কোথায় ধরতে পেরেছ?’ সরে রানার পাশে চলে এল অ্যানি।

‘না।’ হাত নেড়ে হতাশ একটা ভঙ্গি করল রানা। ‘সমস্ত পার্টস খুলেছি, তারপর আবার নতুন করে জোড়া লাগিয়েছি, কোথাও কোন ত্রুটি নেই।’ দাঁড়াল রানা, পিছিয়ে এল এক পা, ন্যাকড়াই হাত মুছল। ‘কোথায় যে কী হয়েছে, আল্লা মালুম।’

‘আবার স্টার্ট দিয়ে দেখেছ?’ কাপড়ে ময়লা লাগবার ভয়ে অ্যানিও এক পা পিছাল।

‘কোন লাভ নেই—অন্তত যতক্ষণ না ত্রুটিটা ধরা পড়ে। এখন থাক, পরে আবার চেষ্টা করা যাবে।’

‘এখুনি একবার স্টার্ট দিয়ে দেখো না।’ ঠোঁট টিপে হাসল অ্যানি।

‘দূর, বললাম না, কোথায় গোলমাল ধরতে পারিনি।’

‘তবু, আমি যখন বলছি, একবার চেষ্টা করে দেখবে না?’ আবদার জানাল অ্যানি।

‘স্রেফ তোমার মন রক্ষার জন্যে,’ বলে ত্র্যাক্স হ্যান্ডেল ধরে ঝুঁকল রানা, সেটা শুধু একবার ঘোরাতেই স্টার্ট নিল চঞ্চলা, সাবলীল যান্ত্রিক ছন্দে চালু থাকল এঞ্জিন। ‘মাই গড!’ এক পা পিছিয়ে এসে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ও। ‘ফাজলামি ছাড়া আর কী বলতে পারি!’

‘তোমার লৌহমানবীদের মধ্যে ও-ই একমাত্র ভদ্রমহিলা,’ ব্যাখ্যাদান করল অ্যানি। ‘আর একজন ভদ্রমহিলার আচরণ যুক্তিসঙ্গত হতেই হবে এমন কোন কথা নেই।’

অ্যানির দিকে সরাসরি তাকানোর জন্য ঘুরল রানা, নিঃশব্দে হাসল, চেহারায়ে সবজাত্তার যে ভাবটা ফুটে রয়েছে তা দেখে

রীতিমত রাঙা হয়ে উঠল অ্যানি। ‘সেটা আমি উপলব্ধি করতে শুরু করেছি,’ বলল রানা।

দিগন্ত থেকে দিনের আলো নিঃশেষে মুছে যাবার ক’মিনিট আগে গিরিসংকট থেকে নেমে এল এক ঘোড়সওয়ার, ঢাল বেয়ে ঘোড়াটা ছুটে এল লাফাতে লাফাতে, তারপর সমতল ভূমিতে নেমে বিদ্যুৎগতি তীরের মত এগিয়ে এল ওটা, ঘোড়সওয়ার লাগাম টানল কামাল হাসানের ক্যাম্পের সামনে। কালো আর সাদা রঙের ঘোড়াটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ওটার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক যুবক, ঘামে চকচক করছে তার মুখ।

তার হাত থেকে মেসেজটা হোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে ছুটল রাহেলা বানু, সার সার তাঁবুর মাঝখান দিয়ে দৌড় দিল সে, দমকা বাতাসের মত ঢুকে পড়ল অ্যানির তাঁবুতে, হাতের কাগজটা ঘন ঘন নাড়ল, ভিতরে ঢুকবার আগে যে সাড়া দিতে হয় সেটা বেমানুম ভুলে গেছে।

পাথরের একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে রানা তাঁবুর ভিতর। ওর সামনে অ্যানি উইসপার। রানার গায়ে সাবানের গন্ধ, সদ্য ব্যাক ব্রাশ করা চুল এখনও ভিজ। গোসল করবার পর রানা নিজের তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল, কথা আছে বলে হাত ধরে নিজের তাঁবুতে ওকে টেনে এনেছে অ্যানি।

‘তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন, রানা?’

অবাক হওয়ার ভান করল রানা। ‘কী বলছ! কই, না তো!’

‘একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই—বলো।’

‘তুমি আমাকে পছন্দ করো না?’

‘কেন পছন্দ করব না—জীবনে যত সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, তুমি তাদের মধ্যে সেরা।’

‘তা হলে?’ রানার একেবারে বুকের কাছে এগিয়ে এল অ্যানি, আলিঙ্গন করবার জন্য হাত তুলল। ‘তা হলে?’ রানা এখনও পাথর।

‘ওহ্!’ বিস্ময় প্রকাশ করল বানু, প্রকৃতিদত্ত আশ্রয় আর মোহ নিয়ে জন্মসূত্রে একজন ষড়যন্ত্রকারিণী হঠাৎ যেন একটা গোপন প্রণয়ের কথা জেনে ফেলেছে। ‘তোমরা ব্যস্ত!’

‘হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছ, আমি ব্যস্ত,’ ধমকে উঠল অ্যানি, দুই গালে আগুনের আঁচ অনুভব করল, চেহারায়ে দিশেহারা ভাব নিয়ে পিছিয়ে এল।

‘আমি দুঃখিত, মিস অ্যানি। ভাবলাম মেসেজটা হয়তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ...।’

এতক্ষণে বানুর হাতে কেবলখামটা দেখতে পেল অ্যানি, নিমেষে সমস্ত অস্বস্তি কাটিয়ে উঠল সে।

‘ভাবলাম তুমি বোধহয় দেখতে চাইবে এটা...।’

বানুর হাত থেকে কেড়ে নিল অ্যানি কাগজটা, সীল ভেঙে রুদ্ধস্থানে পড়ল। মেসেজটা পড়তে পড়তে তার সব রাগ পানি হয়ে গেল, পড়া শেষ করে চকচকে চোখে বানুর দিকে তাকাল সে। ‘ধন্যবাদ, বানু ডিয়ার—তুমি ঠিকই ভেবেছ!’ চরকির মত আধপাক ঘুরল সে, নাচের ভঙ্গিতে এগোল, দু’হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রানার ঘাড়, খিল খিল করে হাসছে।

‘অ্যাঁ, কী হলো, অ্যাঁ!’ অ্যানির সঙ্গে রানাও হাসছে, আড়ষ্টভঙ্গিতে অ্যানির কোমরে হাত রেখে তাল সামলাল, বানুর উপস্থিতিতে অপ্রতিভ বোধ করছে ও। ‘খুলে বলো কী হয়েছে।’

‘আমার সম্পাদক মেসেজ পাঠিয়েছেন,’ বলল অ্যানি। ‘ওয়েলস অভ চান্সিতে শিফটাদের হামলার উপর আমার রিপোর্টটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছে। সারা দুনিয়ার প্রায় সব জাতীয় দৈনিকে হেডলাইন হয়েছে খবরটা। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘের মহাপরিচালক ব্যক্তিগতভাবে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, এ ব্যাপারে তথ্যভিত্তিক আরও খবর পেতে তিনি আগ্রহী।’

অ্যানি খামতেই কাগজটা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। রানাকে পরাজিত করে সেটা ছিনিয়ে নিল বানু, এমন গম্ভীর চেহারা নিয়ে পড়তে শুরু করল যেন গোটা ব্যাপারটা তাকে নিয়ে। পড়া শেষ করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল কাগজটা, অ্যানিকে বলল, ‘তুমি যে এ-ধরনের একটা কিছু আমাদের জন্যে করতে পারবে, সে বিশ্বাস প্রথম থেকেই ছিল বাবার।’ নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল মেয়েটা, হরিণের মত টানা টানা চোখ থেকে পানি গড়াল। ‘দুনিয়া এখন জানে ইথিওপিয়ার কয়েক লাখ আদিবাসী কী রকম নির্যাতন সহ্য করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছে। সম্রাট হাইলে সেলাসী আমাদেরকে কী সুখেই না রেখেছে! এবার সভ্য দুনিয়া থেকে আমাদের জন্যে সাহায্য আসবে।’ মেয়েটা শিশুর সারল্য নিয়ে বিশ্বাস করছে, মঙ্গলের কাছে অমঙ্গলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রানার বাহু থেকে অ্যানিকে ছাড়িয়ে আনল সে, রানার পরিবর্তে সে-ই আলিঙ্গন করল অ্যানিকে। ‘মিস অ্যানি, তোমার এই ঋণ কোনদিন আমরা শোধ করতে পারব না।’ তার চোখের পানি অ্যানির নাক-মুখ ভিজিয়ে দিল, ঘন ঘন নাক টানল সে, নিজের হাত দিয়ে মুছিয়ে দিল অ্যানির মুখ। ‘তোমার কথা চিরকাল আমরা মনে রাখব,’ বলল সে, কান্নার মাঝখানে হাসল। ‘চলো যাই, দাদুকে খবরটা দেই।’

খবরটা কেন সুখবর, আদিবাসীদের তাতে কী উপকার বা লাভ, শত চেষ্টা করেও বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান কামাল হাসানকে তা বোঝাতে পারা গেল না। যখন তাঁকে বলা হলো যে অদূর ভবিষ্যতে শিফটাদের আক্রমণ বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়, ভয়ানক রেগে উঠলেন তিনি। কী, যুদ্ধ থেমে যাবে? তারমানে বীরত্ব দেখাবার সুযোগই আর পাওয়া যাবে না? প্রবলবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে কাগজটা তিনি ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। উচ্চৈঃস্বরে অ্যামহারিক ভাষায় ভাষণ দিলেন তিনি, অনুবাদ করে তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে হিমশিম খেয়ে গেল আব্বাস। তিনি বললেন, সম্রাট হাইলে সেলাসী জাহান্নামে যাক! বললেন, আমরা কমিউনিস্ট হয়ে গেছি! শিষ্য, অনুচর, মিত্র আর ভায়েরা, সবাই তোমরা মাথায় লাল পট্টি বাঁধো!

তাঁর এই আচরণের জন্য আব্বাস এককভাবে দায়ী করল মাইকেলকে, কারণ সে-ই নাকি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কামাল হাসানকে বোকা বানিয়ে মগের পর মগ তেজ খাইয়েছে।

তারপর, ভাষণের মাঝপথে, অকস্মাৎ হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করলেন কামাল হাসান। মাইকেলকে আলিঙ্গন করলেন তিনি, ঘোষণা করলেন, তারা দু'জন আজন্ম বন্ধু, কমিউনিস্টদের জন্মশত্রু, এবং নিজে উপস্থিত থেকে কমপক্ষে সতেরোটা বিয়ে করাবেন মাইকেলের-কারণ তার নিজেরও সতেরোটা বেগম রয়েছে।

এরপর, ভাষণের মাঝপথেই, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেলেন কামাল হাসান, নাটকীয়ভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন, ঢলে পড়লেন মাংস ভরা বিশাল এক পাত্রে মুখ দিয়ে। সারাদিনের যুদ্ধ, মেসেজ শুনবার পর উত্তেজনা, আর মাত্রাতিরিক্ত তেজ, সব

মিলিয়ে বুড়ো মানুষটার শক্তি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট না থাকবারই কথা। পাত্র থেকে চারজন দেহরক্ষী তুলল তাঁকে, বয়ে নিয়ে গেল তাঁবুতে, এরইমধ্যে তিনি সশব্দে নাক ডাকতে শুরু করেছেন।

‘চিন্তার কিছু নেই,’ বানু তার অতিথিদের আশ্বস্ত করল। ‘দাদু খুব বেশিক্ষণ অনুপস্থিত থাকবেন না-খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিরে আসবেন।’

‘তাকে বরং তোমার পরামর্শ দেয়া উচিত, চব্বিশ ঘণ্টার আগে যেন ঘুম থেকে না জাগে,’ হেঁড়ে গলায় বলল মাইকেল। ‘মাই গড, এমন প্রাণশক্তি নিয়ে গোটা বিশেক লোক থাকলে দুনিয়ার বাকি সব মানুষ বেকার হয়ে যেত!’

বিশাল এলাকা জুড়ে কয়েকশো অগ্নিকুণ্ডের আলো লালচে করে তুলেছে আকাশটাকে, পাহাড়চূড়ার মাথায় ভাসছে স্নান চাঁদ, ক্লান্ত আদিবাসী যোদ্ধাদের মাথা কোলে নিয়ে সুরেলা কণ্ঠে গান ধরেছে যুবতী স্ত্রীরা, গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ফিসফাস করছে যুবকদের সঙ্গে কুমারী মেয়েরা।

চাঁদের স্নান আলো আর অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভা লেগে চকচক করছে দখল করা আগ্নেয়াস্ত্রের স্তূপগুলো। কামাল হাসান আপাতত অনুপস্থিত থাকলেও, তাঁর ভোজসভা পুরোদমে চলছে, সম্মানিত সদস্য আর মেহমানদের সামনে তিনটে স্তূপে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো-রাইফেল, পিস্তল আর অ্যামুনিশন। অ্যামুনিশনের সঙ্গে অল্প দু'চারটে হ্যান্ডগ্রেনেডও রয়েছে, যদিও ওগুলো সম্পর্কে একা শুধু মাইকেলই খানিকটা আগ্রহ দেখিয়েছে। গ্রেনেডের সংখ্যা কম দেখে তার ধারণা হয়েছে, শিফটাদের

হাতেও জিনিসটা খুব বেশি নেই।

রাত যত বাড়তে লাগল, তেজের গুণে ভোজনরত বীরযোদ্ধাদের কৌতুক আর হাসির মাত্রাও সেই পরিমাণ তুঙ্গে উঠল।

উপত্যকার আরেক দিকে, গালাদের গোত্রপ্রধান নূর আয়াঙ গালাও বিজয় উৎসব পালন করছে। ওদিক থেকে মাঝে মধ্যেই মাতালদের চিৎকার বা দখল করা শিফটা রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ ভেসে আসছে।

মাইকেল আর রানার মাঝখানে বসেছে অ্যানি। বসবার আয়োজনটা তার নয়, সুযোগ পেলে রানার সঙ্গে একা বসত সে—কিন্তু মাইকেল সেভারসকে যত সহজে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব বলে ধারণা করেছিল সে, বাস্তবে দেখা গেল ব্যাপারটা তত সহজ নয়। নাছোড়বান্দা মাইকেল যেন হাল না ছাড়বার পণ করেছে।

আব্বাসের পাশ থেকে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এল বানু। মেহমানদের ঘাড় আর হাঁটু টপকে, কয়েকজনকে নিতম্বের ধাক্কা দিয়ে গদিমোড়া আসনে অ্যানির পাশে বসল সে, তার আরেক পাশে মাইকেলকে খানিকটা জায়গা ছাড়তে হলো। অ্যানির কানের কাছে ঠোট, কথা বলল ফিসফিস করে।

‘আমাকে তোমার আগেই জানানো উচিত ছিল,’ গলায় দুঃখ নিয়ে অভিযোগ করল বানু। ‘আমি টেরও পাইনি ভেতরে ভেতরে তুমি দু’জনের মধ্যে থেকে রানাকেই প্রথম সুযোগ দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাকে যদি খুলে বলতে, আমি হয়তো তোমাকে সং কিছু পরামর্শ দিতে পারতাম...।’

‘সত্যি ভুল হয়ে গেছে,’ হাসি চেপে বলল অ্যানি। ‘দুঃখ কোনো না, আবার যখন বাছাই করার প্রশ্ন উঠবে, তোমাকে আমি অবশ্যই জানাব।’

‘তোমার জন্যে আমার কষ্ট হয়,’ চাপা কণ্ঠে ঘোষণা করল বানু।

‘কী! কেন?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল অ্যানি।

‘দেখছ না, তোমার কপাল কেমন ফাটা?’ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রাহেলা বানু। ‘তোমার সাথে প্রেম করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা মাত্র দু’জন। রানা আর মাইকেল, ব্যস। বিশ-বাইশটা প্রেম করার সুযোগই তুমি পাচ্ছ না। অনেক প্রেমিকের মধ্যে থেকে বাছাই করার যে মজা সেটা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে তোমাকে।’

হাসি চেপে রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল অ্যানি, পেটের পেশী কঁকড়ে উঠল। ‘সত্যিই তো!’

‘আমি বলি কী,’ গোপন ষড়যন্ত্রের সুরে অ্যানির কানে ঠোট ঠেকিয়ে বলল বানু, ‘একবার একে, একবার ওকে, দু’জনকে নিয়েই খেলতে থাকো—কাউকেই পাকা কথা দিয়ো না। খেলতে খেলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, ইতিমধ্যে দু’জনের সম্পর্কেই সমস্ত কিছু জানা হয়ে গেছে তোমার, তখন যাকে ভালো মনে হবে তাকে বেছে নিয়ো স্বামী হিসেবে...।’

এই সময় গালাদের ক্যাম্প থেকে একটা শব্দ ভেসে এল ওদের কানে। দূর থেকে এল, তা ছাড়া আদিবাসীরা অনর্গল কথা বলছে আশপাশে, অস্পষ্ট আর ভোঁতা শোনা শব্দটা। তবু আওয়াজটার মধ্যে বুক হুঁৎ করা এমন একটা কিছু রয়েছে যে খপ করে বানুর কজি চেপে ধরল অ্যানি।

ওদের পাশে রানা আর মাইকেলও আড়ষ্ট হয়ে গেল, শিরদাঁড়া খাড়া করে তাকাল পরস্পরের দিকে, পরমুহূর্তে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঘাড় ফেরাল, কান খাড়া। দু’জনই শব্দের ধরনটা বুঝতে

পেরেছে-দীর্ঘ, প্রলম্বিত সুরে কেউ যেন ফুঁপিয়ে উঠল।

‘ইতিমধ্যেই তোমার একটু ভুল হয়েছে, মিস অ্যানি,’ নিজের প্রসঙ্গ ছাড়তে রাজি নয় বানু, ভাব দেখাল শব্দটা যেন গুনতে পায়নি সে। ‘পুরুষদের ঠিকমত চিনতে না পারলে চুটিয়ে প্রেম করা খুব কঠিন। যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলবো, প্রথমবার সুযোগ দেয়ার জন্যে রানাকে বেছে নিয়ে খুব একটা বুদ্ধিমতীর কাজ করেনি তুমি...।’

তার একটা কথাও অ্যানির কানে যায়নি। ‘বানু, কী ওটা?’ কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল সে। ‘কীসের শব্দ হলো?’ বানুর কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিল সে।

‘দূর, ও কিছু না!’ অগ্রাহ্য করবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বানু। ‘এ-সবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি!’

‘কিছু না মানে? কীসে অভ্যস্ত হয়ে গেছ?’

ধৈর্য ধরে এক সেকেন্ড অ্যানির দিকে তাকিয়ে থাকল বানু, বুঝল একটা ব্যাখ্যা না পেলে তাকে শান্ত করা যাবে না। ‘শোনো তা হলে,’ বলল সে, চেহায়ায় ফুটে উঠল ঘৃণা আর আক্রোশ। ‘ওখানে কী ঘটছে আন্দাজ করা কঠিন কিছু না। হৌদল কুতকুত নূর আয়াঙ গালা তার গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছে, বুঝলে? আমরা জিতেছি শুনে গর্ত থেকে মুখ বের করেছে ইঁদুরটা, মালের বখরা পাবার আশায়। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে গাভীগুলোকে নিয়ে এদিক দিয়ে গেল সে, এখন বোধহয় ভোজ আর উৎসব শুরু হয়েছে।’ এক মুহূর্ত থেমে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ‘বাদ দাও!’

শব্দটা আবার হলো। তীক্ষ্ণ, অমানুষিক একটা চিৎকার, ধারাল নখের মত আঁচড় কাটল অ্যানির মায়ুতে। প্রতি মুহূর্তে তীব্রতর হলো, এক পর্যায়ে সহ্য করতে না পেরে তার ইচ্ছে হলো দু’হাতে

কান চেপে ধরে। যখন মনে হলো এবার তার মায়ু ছিঁড়ে যাবে, এই সময় অকস্মাৎ থেমে গেল আওয়াজটা।

অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে শুনবার আত্রেহে টান টান একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল, চিৎকারটা থামবার পরও কয়েক সেকেন্ড দীর্ঘায়িত হলো সেটা, তারপর এদিক ওদিক থেকে নিচু গলার মন্তব্য শোনা গেল, নড়েচড়ে বসল লোকজন, চাপা গুঞ্জনের ভিতর থেকে হেসে উঠল কেউ কেউ, যেন নিষ্ঠুর হতে পারবার মধ্যে যথেষ্ট পৌরুষ আছে।

‘কী ওটা? তোমরা কেউ কথা বলছ না কেন? কী করছে ওখানে ওরা?’ বানুর কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকি দিল অ্যানি।

‘এত অস্থির হলো না তো!’ মৃদু তিরস্কার করল বানু। ‘নূর আয়াঙ গালা বন্দী ইটালিয়ানদের সাথে খেলছে।’ নিরুদ্ভিগ্ন ও শান্ত সে।

অ্যানি উপলব্ধি করল, আজ যাদের বন্দী করা হয়েছে তাদের কথা ওর মনেই ছিল না। ‘খেলছে, বানু? কী বলতে চাও তুমি?’

ঘৃণায় কুঁচকে উঠল বানুর চেহারা, এক দলা থুথু ফেলল পায়ের কাছে। ‘ওরা জানোয়ার, মিস অ্যানি। গালারা সব ক’জন এক একটা হিংস্র পশু। আর নূর আয়াঙ হলো খোদ শয়তান। আজ সারাটা রাত ওদের ক্যাম্পে এই কাণ্ড চলবে। সকালে, যখন সূর্য উঠবে, জানোয়ারগুলো বন্দীদের সেই জিনিসটা কেটে নেবে-মানে পুরুষদের ওটা আর কী...’, আবার থুথু ফেলল সে। ‘বিয়ের আগে যে-কোন একজন বন্দীর ওটা কেটে নিতে হয় ওদের-কী বলো তোমরা? চামড়ার থলের ভেতর ডিমের মতো দুটো...?’

‘ট্রেসটিকল,’ কর্কশ সুরে বলল অ্যানি, শব্দটা গলায় আটকে যাওয়ায় আরেটকু হলে বিষম খাচ্ছিল।

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল বানু। ‘গালাদের রীতি হলো, একজন যুদ্ধবন্দীকে খুন করার পর তার টেসটিকুল্ কেটে নিয়ে কনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে হবে। তার আগে, নিয়ম হলো, বিদেশী বন্দীদের নিয়ে খেলবে ওরা।’

‘কিন্তু ধরা তো শিফটারাও পড়েছে...।’

‘ভেবেছ তাদেরকে ওরা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে? শিফটা বন্দীরা মারা গেছে অনেক আগেই, গালা যোদ্ধারা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে না! শিফটারদের ওপর সবার সমান অধিকার ছিল, ফলে সবার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বিদেশী বন্দীরা শুধু সর্দার আর মাতবরদের বিবাহযোগ্য যুবকদের ভাগে পড়েছে।’

‘ওদের থামানো যায় না?’ জিজ্ঞেস করল অ্যানি, তার গলা কেঁপে গেল।

‘থামাবে?’ বানু স্তম্ভিত। ‘ওরা কারা? শত্রু নয়? তা ছাড়া, গালারা তাদের বন্দীদের নিয়ে কী করবে তা নিয়ে আমরা কেন মাথা ঘামাতে যাব?’

রক্ত ছলকানো শব্দটা আবার শুরু হতেই আদিবাসীদের ক্যাম্প জুড়ে নেমে এল অটুট নিস্তব্ধতা, যেন প্রবল আত্মহের সঙ্গে শব্দটা কখন আবার শোনা যাবে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল সবাই। মরুর শুকনো, মৌন বাতাস বিশ্বস্ততার সঙ্গে বয়ে নিয়ে এল যন্ত্রণাকাতর মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ। একবার বাড়ে আওয়াজটা, একবার কমে, প্রতিবার বাড়বার সময় আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ লাগল কানে, এক সময় বিশ্বাস হতে চাইল না কোন মানুষের ফুসফুস থেকে এধরনের বিকট আর্তচিৎকার বেরুচ্ছে। সর্বান্তে দাউ দাউ আগুন ধরে গেছে এমন একজন অভাগাও বোধহয় এভাবে একটানা চিৎকার করতে পারবে না।

‘ওহ্ গড! ওহ্ গড!’ বিড়বিড় করল অ্যানি, বানুর উপর থেকে চোখ তুলে মাইকেলের দিকে তাকাল।

স্থির ও নিশ্চুপ মাইকেল, অ্যানির দিকে তার মুখ খানিকটা ফেরানো, ফলে ঈশ্বরতুল্য ঠাণ্ডা ও ধ্যানমগ্ন অবয়বের পাশটা শুধু দেখতে পেল অ্যানি। রক্ত হিম করা চিৎকারটা থেমে যাবার পর সামনের দিকে ঝুঁকল সে, গনগনে আগুনে একটা কাঠি গুঁজলো, সেটা তুলে আগুন ধরাল দু’সারি সাদা দাঁতের মাঝখানে ধরা কালো চুরটে।

বড় করে টান দিল মাইকেল, ধোঁয়াটুকু বুকে ধরে রাখল, তারপর ধীরে ধীরে বেরুতে দিল নাক দিয়ে। অবশেষে অ্যানির দিকে ফিরল সে।

‘বানু কী বললো তুমি শুনেছ। গালাদের একটা সামাজিক রীতি।’ বলবার সময় অ্যানির দিকে তাকিয়ে থাকল মাইকেল, কিন্তু কথাগুলো আসলে রানাকে বলছে, শেষ করবার আগেই বার কয়েক বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে রানার চোখে তাকাল সে, ঠোঁটে ঝুলে আছে আধো হাসি।

তারপর দু’জনেই ওরা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, কারও চোখে পলক নেই, চেহারা ভাবলেশহীন।

শব্দটা আবার হলো, কিন্তু এবার আগের চেয়ে দুর্বল, তীক্ষ্ণ আর্তনাদের বদলে ভোঁতা গোঙানি প্রতিধ্বনি তুলল নিস্তব্ধ রাতের বাতাসে।

ভাঁজ করা হাঁটু সিঁধে করে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটায় কোন জড়তা বা বিরতি নেই, একই ছন্দ আর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে হেঁটে এল রানা শিফটা আগ্নেয়াস্ত্রের স্তূপগুলোর সামনে। ঝুঁকল ও, তুলে নিল একটা অটোমেটিক পিস্তল, সেভেন এম এম বেরেটা।

চকচকে লেদার হোলস্টারে রয়েছে ওটা, ফ্ল্যাপ খুলে অস্ত্রটা বের করল, হোলস্টার আর ওয়েস্ট বেল্ট ফেলে দিল। পিস্তলের লোড করা ম্যাগাজিন চেক করল ও, তালুর এক ধাক্কায়ে আগের জায়গায় পাঠিয়ে দিল সেটা, স্লাইড টেনে ব্রিচে একটা রাউন্ড ভরল, সেফটি ক্যাচ ঠেলে দিয়ে জ্যাকেটের পকেটে ভরল পিস্তলটা।

কারও দিকে একটিবারও না তাকিয়ে শান্ত, দৃঢ় পায়ে ঘুরল রানা, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল গালা ক্যাম্পের দিকে। চোখে অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই। এখন আর ওকে দেখা যাচ্ছে না, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ।

নিশ্চিন্ততা ভাঙল মাইকেল। ‘অনেকদিন আগেই ওকে আমি বলেছি যে ভাবাবেগ জিনিসটা গতযুগের বিলাসিতা—এই যুগে অত্যন্ত খরচ আর ঝুঁকিবহুল, বিশেষ করে এই জায়গায়। ভাবাবেগ আর বোকামি, দুটো একই জিনিস, যে-কোন একটা যদি তোমার ওপর ভর করে, ধরে নিতে পারো তুমি খুন হয়ে গেছ,’ নিচু গলায় ফিসফিস করে কথাগুলো বলল মাইকেল, ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে ছাইটুকু পরীক্ষা করল।

‘ওখানে একা গেলে গালারা ওকে মেরে ফেলবে,’ বাহুল্যবর্জিত ভাষা আর সুরে শ্রেফ বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা দিল বানু। ‘রক্তপিপাসায় অস্থির হয়ে আছে ওরা, লুফে নেবে রানাকে।’

‘আরে ধ্যাত্, তুমি শুধু শুধু রঙ চড়াচ্ছ,’ দ্বিমত পোষণ করল মাইকেল। যতোটা সিরিয়াস ভাবছ আসলে ততোটা নয়।’

‘তুমি গালাদের চেনো না, তাই এ-কথা বলছ। সিরিয়াস নয়? অন্য কোন পরিস্থিতি হলে তোমার অজ্ঞতা দেখে হাসতাম আমি।’ ঝট করে অ্যানির দিকে ফিরল বানু। ‘রানাকে তা হলে তুমি ওদের ক্যাম্পে যেতে দিচ্ছ? কোথায় যাচ্ছে ও, কাদের বাঁচাতে চায়,

ভেবে দেখেছ? ইটালিয়ান বন্দীরা আমাদের শত্রু।’

দুই যুবতী এক মুহূর্তে পরস্পরের চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। প্রথমে নড়ে উঠল অ্যানি, এক লাফে খাড়া হলো সে, ছুটল রানার পথ ধরে, তার নীল লিনেন পায়ের চারধারে ফুলে উঠল বাতাসে, অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভা আলোড়িত সোনালি চুলে তরল তামার একটা ভাব এনে দিল।

গালাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে রানার নাগাল পেল অ্যানি, লম্বা লম্বা পা ফেলে ওর পাশে চলে এল। রানা এক পা ফেলে, সমান তাল বজায় রেখে ওর পাশে থাকবার জন্য অ্যানিকে ফেলতে হলো দুই পা।

‘ফিরে যাও,’ মৃদুসুরে বলল রানা।

জবাব না দিয়ে ওর পাশেই থাকল অ্যানি, হন হন করে হেঁটে আসায় হাঁপাচ্ছে।

‘যা বলছি শোনো।’

‘না, আমি তোমার সাথে যাব।’

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, সবেগে অ্যানির দিকে ফিরল। অ্যানিও চেহারায়ে জেদ নিয়ে দৃঢ়ভঙ্গিতে চিবুক উঁচু করল, কাঁধ দুটো উঁচু করে কাত করল পিছন দিকে, এমন টান টান করল পিঠ যে লম্বায় খানিকটা বেড়ে গিয়ে রানার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছল তার মাথা।

‘আমার কথা শোনো...’, রানার চেহারায়ে কাঠিন্য।

‘তোমাকে আমি একা ওখানে যেতে দেব না, ব্যস!’ উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল অ্যানি, তার চেহারা আর চোখ দেখে রানার মনে হলো, যে-কোন পরিণতির জন্য তৈরি সে।

রাগে কেঁপে উঠল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল ও। অ্যানির এই গৌয়ার্তুমি একদম সহ্য

করতে পারছে না। ‘এই শেষবার বলছি, ফিরে যাও...।’

‘না গেলে কী করবে? মারবে আমাকে? মারো!’ বেসুরো গলায় আহ্বান জানাল অ্যানি। ‘যাই করো, তোমার সাথে যাব আমি।’

‘মাথাটা ঠাণ্ডা করো,’ হঠাৎ নরম হলো রানা। ‘বোঝার চেষ্টা করো...।’ আর ঠিক তখনই রাতের নিশ্চলতা চিরে আবার সেই চিৎকার ভেসে এল ওদের কানে।

ফোঁপানোর আওয়াজ, ভোঁতা আর তরল, তারই সঙ্গে চারদিক মুখর হয়ে উঠল শতকণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে। নির্দয় একদল শিকারী মানুষ রক্ততৃষ্ণায় গর্জে উঠল।

‘ওরা তোমাকে পেলে কী করবে আন্দাজ করতে পারো?’ শব্দের উৎসের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে রানা; চোখ জোড়া ক্লান্ত, ঠাণ্ডা।

‘তুমি গেলে আমিও যাচ্ছি,’ অ্যানি অটল। যুক্তি বা ভীতি, কোনটাই তার উপর প্রভাব ফেলছে না।

আর কিছু না বলে নিজের পথে হাঁটা ধরল রানা। গালা ক্যাম্পের মাথার উপর গাছপালার শাখা-প্রশাখা অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভায় আলোকিত হয়ে আছে, উঁচু গির্জার ছাদের মত লাগছে দেখতে।

সেদ্বিদের কোথাও দেখা গেল না, সার সার বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোর সামনে দিয়ে হন হন করে এগোল ওরা কারও চোখে ধরা না পড়েই। ব্যস্ত হাতে খাড়া করা হয়েছে অসংখ্য কুঁড়েঘর আর তাঁবু, সারিগুলোর মাঝখানে সরু গলি, তারই একটা ধরে রানার পিছু পিছু এগোল অ্যানি। ভয় করছে তার, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তবু বিপদের ঝুঁকি নেওয়ায় একবিন্দু অনুতাপ নয়।

গলির মাথা থেকে হঠাৎ ক্যাম্পের একেবারে মাঝখানে বেরিয়ে এল ওরা। বিশাল জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলছে, যতদূর দৃষ্টি যায়

উপচে পড়ছে গালাদের বৃত্তাকার ভিড়-আগুনের আভায় কুৎসিত কদাকার চেহারাগুলো নগ্ন উত্তেজনা আর লোভে চকচক করছে। হাভানায় চাক্ষুষ করা একটা মোরগ লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে গেল রানার, রক্তদর্শনের নেশায় দর্শকরা এমন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল যে নিজেদের হাত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেও ক্ষান্ত হয়নি, শত্রু-মিত্র বাছ-বিচার না করে পরস্পরকে ছুরি মারতে শুরু করে দেয়।

হিংস্র জন্তুর মত গর্জে উঠছে গালারা একযোগে।

‘ওই, ওই লোকটা নূর আয়াঙ,’ ফিসফিস করল অ্যানি, রানার আশ্চিন ধরে মৃদু টান দিল।

ফাঁকা, গোলাকার জায়গাটার দিকে চোখ ফেরাল রানা। একধারে কার্পেটের উপর কয়েকটা গদি ফেলা হয়েছে, সেগুলোর উপর বসে রয়েছে নূর আয়াঙ গালা। দশ কি আরও বেশি উজ্জ্বল রঙের ডোরা কাটা একটা শাল তার কাঁধ আর মাথায় জড়ানো, মসৃণ নরম মুখ ঢাকা পড়ে আছে তারই ছায়ায়, আগুনের প্রতিফলন নিয়ে জ্বলতে থাকা চোখ দুটোয় স্থির ও ঠাণ্ডা স্থাপদের দৃষ্টি।

তার চর্বিবহুল মোটা হাতের রঙ হাতির দাঁতের মত, শক্ত মুঠোর আকৃতি নিয়ে একটা হাত পড়ে আছে কোলের উপর, অপর হাতের আঙুলগুলো পাশে বসা মেয়েলোকটার কোমর আর পেটে কিলবিল করছে। প্রতিটি আঙুলের যেন নিজস্ব প্রাণ আছে, পেট বেয়ে পোকের মত চরছে; স্নান আর অশ্লীল, বেচপ আকৃতি নিয়ে ফুলে ঢোল হয়ে থাকা স্তনের গায়ে চাপ দিল।

আগুনের সামনে, বৃত্তের দূরপ্রান্তে, খোলা মাঠের কিনারায়, তিনজন ইটালিয়ান বন্দী ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘামে

আর আতংকে চকচকে সাদা তাদের মুখ, প্রত্যেকের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ঢোলা, সুতী কাপড়ের পাঁজামা পরে আছে তারা, শরীরের উর্ধ্বাংশ খালি, উদোম গায়ে অসংখ্য কাটাকুটির তাজা দাগ। তিন জোড়া নগ্ন পা ফুলে উঠেছে, লাল রক্তের মোটা ধারা গড়িয়ে নামছে পায়ের পাতায়। পাতাগুলোর কিনারা ক্ষতবিক্ষত। বুঝতে অসুবিধে হয় না, উঁচু-নিচু দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে আনা হয়েছে তাদেরকে, কিংবা হয়তো ঘোড়ার পিছনে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে আনা হয়েছে, ঘোড়ার সঙ্গে সমান তালে হাঁটতে না পেরে ঘন ঘন আছাড় খেয়েছে লোকগুলো। তাদের চোখগুলো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে খোলা মঞ্চের মাঝখানে-ওখানে নারকীয় একটা দৃশ্যে অভিনয় করছে এক মেয়েলোক।

যুবতী মেয়েলোকটাকে চিনতে পারল অ্যানি, সারডি শহরের রেস্ট হাউসে নূর আয়্যাঙের পাশে তাকে বসে থাকতে দেখেছে সে, গালা গোত্রপ্রধানের একজন ভালোবাসার পাত্রী-বানুর ভাষায়, গাভী। এই মুহূর্তে মাটিতে ভাঁজ করা হাঁটু ঠেকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে সে, বিশাল দুই স্তন ঝুলে রয়েছে নীচের দিকে, নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত।

তার সূর্যমুখী ধাঁচের মুখে ধর্মীয় আবেগ আর মোহ প্রায় পবিত্র একটা আলো ফুটিয়ে তুলেছে। পটলচেরা কালো চোখে নিষ্ঠা, ত্যাগ, একাত্মতা আর আত্মনিবেদনের গভীর, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি। ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে, মৃদু হাঁপাচ্ছে সে। সাংসারিক কাজে ব্যস্ত মেয়েদের অথবা কসাইদের মত, তার আলখেল্লার আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটানো, কজি পর্যন্ত রক্তে ভিজে আছে হাত। একজন দক্ষ সার্জেন-এর মতই বাঁকা ডগাসহ ছোরাটা বাগিয়ে ধরে আছে সে, ছোরার রূপালি ফলা আগুনের আভায়ে লালচে আর স্নান লাগল দেখতে।

যে জিনিসটাকে নিয়ে ব্যস্ত সে, এখন আর সেটাকে প্রাণী বলা চলে না, যদিও এখনও মোচড় খাচ্ছে সেটা, বাঁধন ছিঁড়বার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করছে, নিঃশ্বাসও ফেলছে, কিন্তু বাধা দিতে বা উঠে দাঁড়াতে পারছে না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এখনও ফোঁপাচ্ছে সে, যদিও আওয়াজটা এখন আর মানুষের বলে চিনবার কোন উপায় নেই।

ছোরার কোপ আর গভীরভাবে টানা আঁচড়ে মানুষের পরিচিত আকৃতি হারিয়ে ফেলেছে সে। বৃত্তের কিনারায় উপচে পড়া ভিড় থেকে জোরাল দাবি উঠল, যেন একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েক হাজার হয়েনা। ব্যস্ততার ভান করে নিজের কাজে আরও মনোযোগ দিল মেয়েলোকটা, জিনিসটার বিস্ফারিত তলপেটের গোড়া থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘন ঘন ছোরা চালিয়ে কী যেন একটা কেটে বের করে আনবার চেষ্টা করছে সে। রক্তে ভেজা আঙুল পিচ্ছিল হয়ে আছে, মুঠো থেকে ছোরার বাঁট বারবার পিছলে বেরিয়ে যেতে চায়। খানিকটা করে কাটছে সে, টানা-হাঁচড়া করছে-মৃত্যুপথযাত্রী ফুঁপিয়ে উঠল আবার, তবে আওয়াজটা অস্পষ্ট। হঠাৎ লাফ দিয়ে সিঁধে হলো মেয়েলোকটা, ছোরার ফলা দিয়ে সদ্য কেটে আনা জিনিসটা মাথার উপর তুলে ধরল সে দর্শকদের দেখানোর জন্য।

বৃত্তের কিনারা ধরে একটা চক্রর দিল সে, একটা হাত মাথার উপর, আঙুলের ভিতর সদ্য কেটে আনা জিনিসটা। চক্রর দেওয়ার সময় খিলখিল করে হাসল সে, নাচতে নাচতে এগোল, রক্তের কয়েকটা ধারা হাত বেয়ে নেমে এসে ভিজিয়ে দিল কাঁধ আর স্তন, পাজরের উপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে গেল কোমরের নীচে।

‘গায়ের সাথে সঁটে থাকো,’ নরম গলায় বললো রানা।

আশ্চর্য! ওর এই গলার স্বর আগে কখনও শোনেনি অ্যানি। মেয়েলোকটার উপর থেকে সে তার আতংকিত দৃষ্টি ছিঁড়ে আনল, তাকাল রানার দিকে।

রানার মুখ যেন নিস্প্রাণ পাথুরে একটা অবয়ব। চোয়াল দুটো কঠিন, চোখ জ্বলছে।

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করল রানা, হাতটা নামিয়ে উরুর পাশে সমান করে রাখল। ওর হাঁটবার মধ্যে ব্যস্ততার কোন ভাব ফুটল না, তবে দৃঢ়তা ফুটে উঠল প্রতিটি পদক্ষেপে, কাঁধের ধাক্কা সরিয়ে দিল সামনের বাধা প্রতিটি লোককে। জোরাল ধাক্কা খেয়ে ভিড়টা ফাঁক হয়ে গেল, আবার জোড়া লাগবার আগে সেই ফাঁক গলে প্রতি মুহূর্তে ওর পিছনে থাকবার সুযোগ হলো অ্যানির।

কী ঘটতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে অ্যানির কোন ধারণা নেই। কয়েক হাজার হিংস্র আর উত্তেজিত গালার বিরুদ্ধে একা রানা কী করতে পারবে, তাও তার অজানা। তবে এ-সব সমস্যা বা বিপদের কথা তার মাথায় ঢুকলেও তেমন একটা বিচলিত বোধ করল না। অ্যানি উইসপার এই মুহূর্তে শুধু মাসুদ রানার কথা ভাবছে। শ্রদ্ধেয় নমস্য পুরুষ জীবনে কম দেখেনি সে, তাঁদের সঙ্গে রানার তুলনা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, কারও সঙ্গে কোন দিক থেকেই রানাকে মেলানো যাচ্ছে না। ওর এই দুর্দমনীয় সাহস, এর কী কোন তুলনা হয়? এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেওয়া, ঠাণ্ডা মাথায় ইতিকর্তব্য স্থির করা, কারও সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে কর্তব্যের ডাকে একাই এগিয়ে যাওয়া, এ-সব ক'জন মানুষের চরিত্রে দেখেছে সে?

প্রতিটি গালার অচ্ছেদ্য মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে নৃত্যরত মেয়েলোকটা, এই মুহূর্তে ভূমিকম্প বা বজ্রপাত হলেও বোধহয় তাদের হুঁশ ফিরবে না, ওর উপস্থিতি কেউ টের পাবার আগেই নূর

আয়াঙ গালার কাছে পৌঁছে গেল রানা।

মোটা, নরম বাঁ হাতের উপরের দিকটা ধরল ও, তুলতুলে চর্বি আর মাংসের ভিতর ডেবে গেল আঙুলগুলো, প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করাল তাকে, ভারসাম্য কেড়ে নিয়ে প্রায় ঝুলিয়ে রাখল হাতের উপর, ঘুরিয়ে নিজের দিকে মুখ ফেরাল, অপর হাতে ধরা বেরেটার মাজল ঠেকাল উপরের ঠোঁটে, ঠিক চওড়া নাকের কদর্য ফুটোর নীচে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, রানার আগুন ঝরা দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল নূর আয়াঙ, পরমুহূর্তে মাংসের ভিতর নখ ঢুকে পড়ায় ব্যথায় গুঁড়িয়ে উঠল, ইম্পাতের ঠাণ্ডা মাজল ঠোঁটের উপর ঘষা খাওয়ায় ভয়ে কাঁপ ধরে গেল শরীরে।

অল্প দু'চারটে অ্যামহারিক শব্দ শিখেছে রানা আব্বাসের কাছে, মনে মনে সেগুলো গুছিয়ে নিল। 'বন্দীরা,' হিস হিস করে বললো ও, 'আমার ভাগে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল নূর আয়াঙ, যেন ওর কথা শুনতে পায়নি, তারপর একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সে। গালাদের সবচেয়ে কাছের ভিড়টা দুলে উঠল, যেন বাধা দিতে আসছে।

নূর আয়াঙের ঠোঁটে পিস্তলের মাজল চেপে ধরে ঘোরাল রানা, দাঁত আর ইম্পাতের মাঝখানে খেঁতলে গেল ঠোঁট, চামড়া ছিঁড়ে মাজলটা ভিতরে ঢুকল খানিক, রক্ত বেরিয়ে পড়ল।

'মৃত্যু।' একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল রানা। ভোঁতা গলায় শিষ্য যোদ্ধাদের বারণ করল নূর আয়াঙ। চেহারায়ে আক্রোশ নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে গেল তারা, আঙুলের ডগা দিয়ে ছোরার ধার পরীক্ষা করছে, হিংস্র দৃষ্টি রানার উপর স্থির হয়ে আছে, ওর যে-কোন দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি।

রক্ত ভেজা হাত নিয়ে মেয়েলোকটা আবার তার শিকারের সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসল, বিশাল জনসমুদ্রে নেমে এল প্রত্যাশায় ভরাট অটুট নিস্তর্রতা। চারদিকে ভিড় নিরেট নিস্ত্রাণ পাঁচিল, এক চুল নড়লো না কেউ, সবাই রানা আর নূর আয়াঙের দিকে তাকিয়ে আছে। জমাট নিস্তর্রতার মাঝখানে, আগুনের পাশ থেকে ভাঙাচোরা রক্তাক্ত জিনিসটা আবার ককিয়ে উঠল-ফাঁস ফাঁস নিঃশ্বাস ফেলা ধরনের একটা দীর্ঘ আওয়াজ, রানার মায়ুতে যেন গরম লোহার ছাঁকা দিল, চেহারা হয়ে উঠল ক্ষ্যাপার মত।

‘তোমার লোকদের বলো,’ নির্দেশ দিল রানা, নিজের কানেই কর্কশ শোনা।

কেঁপে গেল নূর আয়াঙের গলা, যেন একটা মেয়ে চিৎকার করল। অর্ধনগ্ন বন্দীদের চারপাশে সশস্ত্র প্রহরীরা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

নূর আয়াঙের ঠোঁট থেকে মাজল তুলে নিল রানা, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক খোঁচা দিল নাকের ফুটোয়, দুই ফুটোর মাঝখানের নরম দেয়াল ছিঁড়ে গিয়ে দরদর করে রক্ত বেরল। নির্দেশটা পুনরাবৃত্তি করল রানা। অনিচ্ছার ভাব নিয়ে প্রহরীরা বন্দী তিনজনকে ঠেলে দিল সামনের দিকে। তিনজনই ঠক ঠক করে কাঁপছে।

‘ওর ড্যাগারটা নাও,’ শাস্ত গলায় অ্যানিকে বলল রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নূর আয়াঙের চোখে স্থির হয়ে আছে।

ভয়ে ভয়ে, একটু একটু করে সরে এল অ্যানি, নূর আয়াঙের পাশে থামল। চেহারা দেখে মনে হলো নূর আয়াঙ নড়ে বা ধমকে উঠলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে সে।

একটা হাত তুলে রানার কাঁধে রাখল অ্যানি, খামচে ধরল, শুধু এই স্পর্শটুকুই সমস্ত আতংক দূর করে দিল তার মন থেকে। অপর হাত দিয়ে ড্যাগারের কারুকাজ করা হাতলটা ধরল সে,

বিশাল ভুঁড়ির গা থেকে আস্তে করে টেনে নিল সেটা। কাঠের হাতল, হাতলের মাথাটা সোনা দিয়ে মোড়া, সোনার উপর অনেকগুলো দামী পাথর। জিনিসটা সৌখিন হলেও, ফলাটা চকচকে আর ধারাল।

‘ওদের মুক্ত করো,’ বলল রানা। ‘রশি কেটে দাও।’

রানার পাশ থেকে সরে যেতে হলো অ্যানিকে। বিপজ্জনক মুহূর্ত, পিস্তল ব্যারেলের উপর চাপ বাড়িয়ে খেঁতলানো ঠোঁট থেকে আরও খানিকটা রক্ত ঝরাল রানা। নূর আয়াঙ দাঁড়িয়ে আছে, মাথাটা একপাশে ও পিছন দিকে অসম্ভব ভঙ্গিতে কাত করে, আর বুঝি এক চুল কাত হলেই ঘাড়টা মট করে ভেঙে যাবে। দাঁত বের করে মুখ ভেঙেছে থাকবার ভঙ্গিটাও যেন স্থায়ী ও স্থির, কোটরের ভিতর চোখের মণি অনবরত ঘুরছে, মাঝেমধ্যেই সেটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় চোখ জোড়া নিরুলক্ষ সাদা হয়ে উঠল, গাল বেয়ে নেমে এল পানির মোটা ধারা, আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে গোলাপের হলুদ পাপড়িতে জমে থাকা শিশিরের মত।

বন্দীদের কজি আর কনুই থেকে রশির শক্ত বাঁধন কেটে দিল অ্যানি, হাত ডলে রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল তারা, তিনজন পরস্পরের গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে আছে। প্রত্যেকের স্তান মুখে ক্ষতচিহ্ন, ঘাম আর শুকনো রক্ত-চেহারায়া দিশেহারা ভাব, চোখে নগ্ন আতংক।

ব্রস্ত পায়ে রানার পাশে ফিরে এল অ্যানি। মিথ্যে সান্ত্বনা কিনা জানা নেই, তবে রানার গা ঘেঁষে থাকতে পারলে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে ভাবতে পারছে সে।

নূর আয়াঙকে হাঁটতে বাধ্য করল রানা, প্রতিটি মুহূর্ত সচেতন প্রয়াসের সঙ্গে রানার পাশে আঠার মত লেগে থাকল অ্যানি। নূর

আয়াঙকে খোলা মঞ্চে মাঝখানে নিয়ে যাচ্ছে রানা-অত্যন্ত ধীরগতিতে, প্রতিবার এক পা করে, প্রতি পদক্ষেপের পর কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিল। উপচে পড়া ভিড়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে রানার।

ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে আক্ষরিক অর্থেই প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে জিনিসটাকে, নরম ও নোংরা পদার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না, বেদনা প্রকাশের ভাষা আর শ্রবণশক্তি কেড়ে নিয়ে মূক ও বধির বানানো হয়েছে তাকে। বেঁচে থাকবার আকুতি বা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবার অক্ষমতা, কারণটা যাই হোক, নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবার পরও বেঁচে আছে সে-অল্লস্বল্প নড়ছে এখনও, আক্ষেপের সুর নিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে।

নূর আয়াঙের উল্টো দিকে সামান্য ঝুঁকল রানা, তবে ধরে থাকল তাকে। অ্যানি দেখল, রানার ঠাণ্ডা পাশাণ চেহারায় করুণা আর সমবেদনার ছায়া ফুটল মুহূর্তের জন্য। নূর আয়াঙের মুখ থেকে পিস্তল নামাল রানা, তার আগে পর্যন্ত অ্যানি বোঝেনি কী করতে চাইছে ও। পিস্তল ধরা হাতটা যতটুকু পারা যায় লম্বা করল রানা।

তীক্ষ্ণ শব্দে বিস্ফোরিত হলো পিস্তল। মাংসপিণ্ডের ডগায় শুধু মাথা আর কপালটা চেনা যায়, কপালের মাঝখানে ঢুকল বুলেটটা। ভুরুর উপর চকচকে হাড়ের গায়ে নীলচে একটা গর্ত তৈরি হলো। মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হাঁসের ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে কেঁপে উঠল চোখের পাতা, ধনুকের মত বেঁকে থাকা মাংসপিণ্ড চুপসে গেল, শিথিল হলো। হেঁড়া-ফাড়া গলার ভিতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরল, অনেকটা ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকবার মত। তারপর সমস্ত যন্ত্রণার উর্ধ্বে উঠে গেল সে।

আট

লোকটাকে মুক্তি দিল রানা, যদিও তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না, হাতের পিস্তলটা আবার নূর আয়াঙের চোঁটে ঠেকাল, আঙুলের চাপ বাড়িয়ে তার বাহুর মাংসে সঁধিয়ে দিল নখগুলো, ঘুরতে বাধ্য করল তাকে, হাতটা আরও মুচড়ে দিয়ে ধীরগতিতে হাঁটিয়ে নিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের নিরেট ভিড়টা দুলে উঠল, পিছু নেওয়ার জন্য তৈরি।

বন্দীদের উদ্দেশ্যে ছোট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, সংকেত দিয়ে এগোতে বলল। সামনে থাকল তারা, ধীর পায়ে এগোল, আগের মতই পরস্পরের গায়ের সঙ্গে সঁটে আছে। ওদের পিছনে থাকল অ্যানি, নিরাপত্তার অনুভূতিটাকে ধরে রাখবার জন্য একটা হাত পিছন দিকে লম্বা করা, রানার কাঁধের উপর। নূর আয়াঙের হাত এমনভাবে মুচড়ে ধরেছে রানা যে তার গোটা শরীর কুঁকড়ে ছোট হয়ে আছে, ইচ্ছে করলেই ভারসাম্য ফিরে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়-আঙুলের চাপ আর হাতের ধাক্কা প্রয়োজনে কমিয়ে বা বাড়িয়ে তার হাঁটবার গতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ও, এক পা এক পা করে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে।

রানা জানে, তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না, উচিত হবে না দুর্বলতা প্রকাশ করা। ওদের কৌশল বা শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই বলেই এখনও ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না গালারা। হিংস্র হয়েনাগুলোকে দমিয়ে রেখেছে গোত্রপ্রধানের নির্দেশ, এরপর কী ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে অজ্ঞতা, কিন্তু

একবার মরিয়া হয়ে উঠলে কেউ তাদের ঠেকাতে পারবে না। পরিণতি সম্পর্কেও জানে রানা, জেনে শুনেই ঝুঁকিটা নিয়েছে ও। ওদের মৃত্যু হবে মহা বিশৃংখলার ভিতর— চারদিক থেকে ধেয়ে আসবে ভিড়গুলো, লোমশ কয়েকশো হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলবে ওদের হাত-পা, চুলসহ খুলে নেবে খুলির চামড়া, আঙুল ঢুকিয়ে বের করবে চোখ, বুকে পা দিয়ে মট মট করে ভাঙবে পঁজর, টেনে ছিঁড়ে নেবে জিভ...।

পিছনের ভিড়টা সচল, তবে মধ্যবর্তী দূরত্ব কমল না। এক পা এক পা করে এগোল রানা, তাল বজায় রেখে ওর সঙ্গে এগোল নূর আয়াঙ। একই ছন্দে ওর সামনে অ্যানি, অ্যানির সামনে বন্দীরাও হাঁটছে। খানিক পরপরই দীর্ঘদেহী গালারা ওদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে, আঙুলের ডগা দিয়ে ছোরার ধার পরীক্ষা করছে। প্রতিবার নূর আয়াঙের নরম চামড়ায় পিস্তলের মাজলটা সজোরে ঘষল রানা। গুঙিয়ে উঠল লোকটা, অনিচ্ছার ভাব নিয়ে ফাঁক হয়ে গেল সামনের ভিড়, কদাকার যোদ্ধারা ঠিক ততটুকু সরে গেল যতটুকু ওদের এগোবার জন্য দরকার, তারপর পিছন থেকে অনুসরণ করল। যারা পিছু নিল তাদের সামনের সারিতে রয়েছে সর্দার আর মাতবররা। এত কাছাকাছি থাকল লোকগুলো যে হাত বাড়ালেই তারা তাদের গোত্রপ্রধানকে ছুঁতে পারবে।

কতক্ষণ সময় লাগল বলতে পারবে না রানা, হঠাৎ এক সময় দেখতে পেল সামনেটা ফাঁকা, ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা। অন্ধকারের ভিতর সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে, রানার ইচ্ছে হলো অ্যানি আর বন্দীদের ছুঁতে বলবে, নূর আয়াঙকে নিয়ে সে-ও পিছু নেবে ওদের। ইচ্ছেটাকে দমন করল ও, কারণ জানে ওদের সঙ্গে তা হলে গালারাও দৌড় দেবে—জনসমুদ্রে চাপা

পড়ে যাবে ওরা। সামনে ঢাল। অন্ধকার যেখানে গাঢ়, ধরে নিতে হচ্ছে সেখানে কাঁটাঝোপ। কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে সরু পথ।

‘ওদের নিয়ে কী করব আমরা?’ রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল অ্যানি। ‘পিস্তলের মুখে এই লোকটাকে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না।’

রানা জবাব দিল না। পিছনে গা ঘেঁষে থাকা গালাদের ওর অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর শুনতে দিতে চায় না। আবার এ-ও চায় না যে অ্যানির আচরণে আতংক প্রকাশ পাক।

তবে কথাটা অ্যানি মিথ্যে বলেনি, অনুসরণরত গালাদের আচরণে বেরোয়া একটা ভাব রানাও অনুভব করতে পারছে, একঘেয়ে অনুসরণে তারা আর সম্ভ্রষ্ট থাকতে পারছে না, প্রতিশোধপরায়ণ জনসমুদ্রে মাথাচাড়া দিচ্ছে আত্মহননের অদম্য স্পৃহা। আহ্বানের সুর সম্বলিত কয়েকটা গর্জন শোনা গেল, পিছন থেকে সামনের সারির যোদ্ধাদের প্ররোচিত করা হলো—ছিঁড়ে ফেলো, মেরে ফেলো, পিষে ফেলো! ঝাঁপিয়ে পড়ো, উদ্ধার করো গোত্রপ্রধানকে!

‘গাড়ি!’ চিন্তাটা মাথায় ঢুকতেই অনুপ্রাণিত বোধ করল রানা। ‘ওদেরকে গাড়িতে তুলবে তুমি।’

‘তারপর?’

‘এক এক করে,’ মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। ‘আগে ওদেরকে গাড়িতে তোলা।’

কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে এখনও উঠছে ওরা, আগের চেয়ে আরও কাছে সরে এসেছে গালারা। আলখেল্লা পরা দীর্ঘদেহী একজন ধাক্কা দিল ওকে, বাজিয়ে দেখল, সঁটে থাকল গায়ের সঙ্গে, চাপ বাড়াল। রানার গতি সাবলীল ও বিরতিহীন, ঢিল করে

দিল পেশী, সিকি পাক ঘুরল। এমনই ক্ষিপ্র আর বিদ্যুৎ গতি যে ঘুসিটা গালা সর্দার এড়াতে পারল না। যদি দেখতেও পেত, চারপাশে সঙ্গী-সাথীদের নিরেট ভিড়ের চাপ থাকায় সরে যাবার উপায় ছিল না তার।

কনুই থেকে কজি পর্যন্ত হাতটাকে দা-এর মত ব্যবহার করল রানা, কোপ মারবার ভঙ্গিতে, মুঠোয় ধরা পিস্তলটা লাগল লোকটার মুখে, উপরের মাড়ি থেকে নিখুঁতভাবে দাবিয়ে দিল সামনের চারটে দাঁত, ধাক্কাটা সরাসরি সামনের সাইন্যাসগুলোর মধ্য দিয়ে ব্রেনে গিয়ে আঘাত করল। কোন শব্দ না করে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল লোকটা, পরমুহূর্তে অসংখ্য পায়ের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল, অনুসরণরত গালারা হোঁচট খেলো, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। তবে আগের মত আর ওদের গা ঘেঁষে থাকল না তারা। পিস্তলটা এবার নূর আয়াঙের মাথার পাশে ফিরিয়ে এনেছে রানা। নূর আয়াঙের মোচড়ানো হাতে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল সে, গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরবার আগেই গুরু থেকে শেষপর্যন্ত ঘটে গেছে ঘটনাটা।

তার হাতটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনল রানা, সামান্য চাপ বাড়িয়ে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করল, নিতম্বে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে আরও দ্রুত হাঁটবার নিঃশব্দ তাগাদা দিল।

ওদের সামনে, গাড়িগুলোর কুঁজ আকৃতির মাথা দেখতে পেল রানা, তাঁদের আলোয় ভাসছে, ছাই চাপা আঙুনের গায়ে ফুটে আছে ইস্পাতের ভোঁতা কিনারাসহ কাঠামোগুলো।

‘অ্যানি, নিতম্বিনীকে ব্যবহার করব আমরা। চঞ্চলা বাদ, কারণ প্রথমবারই স্টার্ট না নিলে বিপদ হবে,’ রানার দাঁতের ফাঁক গলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল শব্দগুলো। ‘ড্রাইভরের হ্যাচ গলে নামতে হবে তোমাকে। আর সব কিছু ভুলে যাও, তোমার একমাত্র

কাজ ছইলের পিছনে বসা।’

‘কিন্তু বন্দীদের কী হবে?’

‘যা বলা হয়েছে তাই করো, প্রশ্ন কোরো না।’ ওদের কাছ থেকে গাড়িগুলো আর মাত্র বিশ ফুট দূরে। ‘তাড়াতাড়ি, অ্যানি, যত তাড়াতাড়ি পারো।’

ছুটতে চাইলেও, পারল না অ্যানি, হন হন করে এগোল। গালারা কেউ বাধা দেওয়ার আগেই নিতম্বিনীর সবচেয়ে উঁচু পাশটায় পৌঁছে গেল সে, আঙটা ধরে এক লাফে উঠে পড়ল গাড়ির মাথায়।

‘বন্ধ করো!’ চিৎকার করল রানা, কর্কশ ধাতব আওয়াজের সঙ্গে হ্যাচটা বন্ধ হতেই স্বস্তির পরশ অনুভব করল ও। শিকার হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ একপাল নেকড়ের মত গর্জে উঠল গালারা, পিলপিল করে সামনে বাড়ল তারা, পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে আগে বাড়তে চেষ্টা করল, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল গাড়িটাকে।

আকাশের দিকে একটা গুলি করল রানা, সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে একটা নির্দেশ দিল নূর আয়াঙ। সামান্য পিছিয়ে গেল গালারা, থেমে গেল তাদের চাপা গর্জন, চারদিকে নেমে এল উত্তেজনায় টান টান নিস্তব্ধতা।

‘অ্যানি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?’ ডাকল রানা, বন্দীদের নিজের নাগালের মধ্যে আগলে রেখেছে ও, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নিতম্বিনীর দিকে।

সাড়া দিল অ্যানি, স্টীল প্লেটের পিছন থেকে তার কণ্ঠস্বর ভোঁতা শোনাল, ভেসে এল যেন অনেক দূর থেকে।

‘পিছনের দরজা,’ জরুরী সুরে বলল রানা, ‘খুলবে, কিন্তু আমি

বলার পর।' ধাক্কা দিয়ে বন্দীদের ঘুরিয়ে পিছনের দরজার সামনে নিয়ে আসছে ও। বন্দীরা আড়ষ্ট হয়ে আছে, নাগালের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় দেখতে পেয়ে অস্থিরতা বেড়ে যাওয়ায় হোঁচট খেতে লাগল, দিশেহারা বোধটুকু কাটিয়ে উঠতে পারল না, বোকার মত পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাল। ওদের পিঠে ঘন ঘন ধাক্কা দিতে হলো রানাকে।

'খোলো এবার!' গলার রগ ফুলে উঠল রানার, মুঠো করা হাত হাতুড়ির মত আঘাত করল দরজার গায়ে। ভুলটা বুঝতে পেরে মুঠোর বদলে পিস্তল ঠুকল ইস্পাতের গায়ে।

ঝনাৎ শব্দে খুলে গেল দরজা, সাঁাৎ করে ছুটে এসে বাইরে দাঁড়ানো ছোট ভিড়টার গায়ে ধাক্কা খেলো কবাট।

'ধুস শালা!' একটা কবাটের গায়ে কাঁধ ঠেকাল রানা, ধাক্কা দিয়ে পুরোপুরি খুলল সেটা, কবাটের আকস্মিক আঘাতে ছিটকে পড়ল একেবারে কাছে এসে পড়া দু'জন গালা। দেহভঙ্গিমার দ্রুতগতি পরিবর্তনে রানা কোন বিরতি নিল না, খপ্ করে ধরেই বন্দীদের একজনকে ছুঁড়ে দিল গাড়ির অন্ধকার গহ্বরে, বাকি দু'জন সঙ্গীকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে দেখে তাদের পিঠের উপর বন্ধ করে দিল দরজা, দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে গালাদের দিকে ফিরল, শুনতে পেল খোপে ঢুকে আটকে গেল বোল্টটা।

কদাকার চেহারাগুলোয় নগ্ন ঘৃণা ফুটে রয়েছে, চোখে আক্রোশ আর খুনের নেশা নিয়ে হাঁসফাঁস করছে গালারা, পিঠে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপ নিয়ে সামনের সারির লোকগুলোর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ভিড়ের ভিতর থেকে তর্জন-গর্জন শুরু হলো। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, রানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। মুখের বেশিরভাগ গ্রাস কেড়ে নেওয়া

হয়েছে, এই শেষ শিকারটাকে তারা পালাতে দেবে না।

নিজেকে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগল রানার, মনে হলো কয়েক মাইল দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে, পাজরের খাঁচায় অনুভব করতে পারছে হৃৎপিণ্ডের অবিরাম গুঁতো, তবে নূর আয়াঙকে ছাড়েনি ও, তার বাহুর নরম মাংস ছেড়ে দিলেও মুঠোর ভিতর ধরে রেখেছে ঘন কালো চুলের গোছা। চুলগুলো আঙুলে পৌঁচিয়ে নিয়ে মাথার পিছনের খুলির চামড়ায় টান দিল ও, বাঁকা হয়ে নিজের লোকদের দিকে ঘুরে গেল নূর আয়াঙের মুখ। অপর হাতের পিস্তলটা তুলল রানা গোত্রপ্রধানের কানে, ফুটোর ভিতর ঢোকাতে চেষ্টা করল মাজলটা।

'ওদের সাথে কথা বলো,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল রানা। 'তা না হলে পিস্তলের নলটা আরেক কান দিয়ে বেরবে।'

শব্দগুলো যদি নাও বুঝে থাকে, সুরটা বুঝল নূর আয়াঙ, হড়বড় করে অ্যামহারিক ভাষায় কথা বলল সে, থামবার আগেই সামনের সারির যোদ্ধারা এক পা পিছিয়ে গেল। নিতম্বীনার খোলে পিঠ ঘষে, প্রতি মুহূর্তে এক ইঞ্চি করে সরল রানা, অসহায় নূর আয়াঙের চুল ধরে তাকে নিজের সামনে আড়াল হিসাবে রাখল।

ওরা সরল, ওদের সঙ্গে ভিড়টাও সরল, গালারা দৃষ্টি আর নাগালের মধ্যে ধরে রাখতে চাইছে ওদেরকে। চাঁদের আলোয় গালাদের মুখে চকচক করছে ঘাম, চেহারা নিষ্ঠুর আর ক্রোধোন্মত্ত, খুনের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়বার চরম মুহূর্তে পৌঁছে ইতস্তত করছে। অন্ধকার থেকে বাঘের মত গর্জে উঠল একজন গালা, গমগমে কর্তৃত্বের সুর, মার মার কাট কাট ধ্বনি উঠল ভিড়ের চারদিক থেকে—সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে উঠল নূর আয়াঙের আতর্কিতকার। হাঁটু দিয়ে তার কিডনিতে গুঁতো মেরেছে রানা।

আরও আস্তে মারতে চেয়েছিল রানা, চায়নি নূর আয়াঙ ব্যথা পেয়ে আত্ননাদ করে উঠুক। গোত্রপ্রধানের কষ্ট মাত্রা ছাড়াচ্ছে দেখলে গালারা নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না।

ভিড়ের ভিতর চারদিক ঠালা-গুঁতোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। পিছনের সারিগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ঢোক গিলতে গিয়ে ব্যর্থ হলো রানা, গলা শুকিয়ে গেছে। বুঝতে পারল, আর সময় নেই।

‘অ্যানি, স্টার্ট দিতে পারবে?’ ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

অ্যানির অস্পষ্ট গলা ভেসে এল, ‘রেডি টু স্টার্ট।’

পায়ের পিছনে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের স্পর্শ পেল রানা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত শোরগোল স্তান করে দিয়ে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের রক্ত হিম করা একটা আওয়াজ শোনা গেল। চিৎকারটা শেষ দিকে লুলুউউ-লু-লুউউ উলুধ্বনির সুরে প্রলম্বিত হলো, হঠাৎ নেমে আসা নিস্তব্ধতার ভিতর রক্তপিপাসায় কাতর আধিভৌতিক করুণ আর্তির মত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আফ্রিকান যুবকদের যুদ্ধপ্রবণ হৃদয়ে ছলকে উঠল রক্ত, এই ব্যাকুল আহবান চাবুকের মত বাড়ি মারল উত্তেজনায় উত্তপ্ত চামড়ায়, গুঙিয়ে উঠল জনসমুদ্র, পাল্টা জবাবে চারদিক থেকে ভেসে এল রণহংকার।

‘মাসুদ রানা, দেখতে চাই কী করো তুমি! ওরা আসছে!’ ভাবল রানা, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নূর আয়াঙকে ধাক্কা দিল, ফেলে দিল গালাদের গায়ের উপর। যোদ্ধাদের পাঁচ-সাতজনকে নিয়ে পড়ল নূর আয়াঙ, তারা আছাড় খেলো পিছনের সারির গায়ে।

ইতিমধ্যে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ধরে ফেলেছে রানা। এই সংকটময় মুহূর্ত উপস্থিত হবে জানত ও, সেজন্যই বেছে নিয়েছে

নিতম্বিনীকে, জানে লৌহমানবীদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে লক্ষ্মী। কিন্তু প্রথমবার হ্যান্ডেল ঘোরাতে নিতম্বিনীর এঞ্জিন প্রতিবাদের সুরে খক খক করে উঠল, স্টার্ট নিল না।

‘প্লিজ, মাই ডার্লিং, প্লিজ!’ মরিয়া হয়ে আবেদন জানাল রানা, দ্বিতীয়বার হ্যান্ডেল ঘোরাতেও বিষম খেলো এঞ্জিন, খকখক করল তারপর হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে সাবলীল ছন্দে সচল থাকল। লাফ দিয়ে গাড়ির মাথায় উঠে যাবে রানা, ওর মাথার উপর খাড়া হলো একটা তরোয়াল, সবগে নেমে এল খুলি লক্ষ্য করে।

বাতাস চিরে নেমে আসছে ফলা, আওয়াজটা শুনতে পেল রানা, মাথাটা নামিয়ে নিল বাট করে। গাড়ির খোলে লাগল তরোয়ালের ফলা, আগুনের ফুলকি ছুটল চারদিকে। আবার তরোয়াল তুলল গালা সর্দার, মাটির উপর পিঠ দিয়ে পড়ল রানা, বেরেটার ট্রিগার টানল।

মাংসে বুলেট ঢুকবার ভোঁতা শব্দটা শুনতে পেল রানা, পিছন দিকে হেলে পড়ল লোকটা, হাত থেকে ছুটে গিয়ে শূন্যে ডিগবাজি খেলো তরোয়াল। আলখেল্লা পরা কুৎসিতদর্শন মূর্তিগুলো ধেয়ে এল চারদিক থেকে, চোখের পলকে হেঁকে ধরল রানা আর নিতম্বিনীকে, জনসমুদ্র খেপে গেছে।

‘ড্রাইভ, অ্যানি, ফর গডস সেক, ড্রাইভ!’ আত্ননাদ করে উঠল রানা, বগলের তলা দিয়ে মুখের সামনে একটা মাথা বেরিয়ে আসছে দেখে খুলিতে ঠেকিয়ে আবার টেনে দিল ট্রিগার। কাঁধে একটা হাত পড়ল, ফড়ফড় করে হিঁড়ে নিল শার্টটা। বগলের নীচ দিয়ে পিস্তল ধরা হাতটা পিছন দিকে লম্বা করল রানা, আবার গুলি করল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে সচল হলো নিতম্বিনী, খোল থেকে ছিটকে পড়ে গেল কয়েকজন গালা।

নিতম্বিনীর ঝাঁকিতে রানার হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তল। সে-ও ছিটকে পড়েছে। গালারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর, সারা শরীরে তাদের নির্দয় আঁচড় অনুভব করল রানা, গুরু হয়ে গেল ওকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া। অন্ধকার আর ভিড়ে কিছুই দেখতে পেল না রানা, শুধু আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল ওর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে নিতম্বিনী। জানে শেষ চেষ্টা, অসুরের শক্তি নিয়ে ডাইভ দিল রানা। গাড়িটা কতদূরে পরিষ্কার ধারণা ছিল না, খোলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আবার ছিটকে পড়ল ও। গাড়ি আর থেঁতলানো শরীরের মাঝখানে দূরত্ব বাড়ল, রানা নিজেও জানে না কীসের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো ও, সন্দেহ হলো হাতের জয়েন্টগুলো খুলে গেছে কিনা। একটা আঙুটা ধরে আছে রানা, নিতম্বিনী ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

থ্রটলে অ্যানির পায়ের চাপ বাড়তেই থাকল, সগর্জনে ছুটল নিতম্বিনী। সামনে মানুষের নিশ্চিহ্ন পাঁচিল, ধেয়ে আসা গাড়িটাকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ খুব কম লোকেরই হলো। অ্যানির চোখের সামনে ধপ ধপ করে পড়ল লোকগুলো, থ্যাচ থ্যাচ শব্দে বাড়ি খেলো গাড়ির সামনের প্লেটের সঙ্গে, রণহংকারের বদলে যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠল বাতাস। অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, গালারা যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। ভিড়ের শেষ মাথা ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল আর্মারড কার, সামনের ঢালে পড়ে আরও দ্রুত হলো গতি।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড রানাকে টেনে এনেছে নিতম্বিনী, তারপর আঙুটা ছেড়ে দিয়েছে রানা, গাড়ির পিছু পিছু দৌড়ে এক লাফে উঠে পড়েছে খোলের মাথায়। টারিটে হেলান দিয়ে হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও, দেখতে না পেলেও শব্দ শুনে বুঝতে পারল বিপদ এখনও কাটেনি।

গাড়ির কিনারা ধরে ঝুলে রয়েছে অনেকে, রানা ঘাড় ফেরাতেই সবচেয়ে কাছের লোকটা রণহংকার ছাড়ল, বাতাসে তার আলখেল্লা ফুলে উঠেছে, প্রায় ঢেকে দিয়েছে মাথাটা। খোলের কিনারা দু'হাতে ধরে টারিটে উঠে আসছে সে, হোরার হাতলটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে। তাকে আরও খানিক উঠতে দিল রানা, কিনারা ছাড়িয়ে কাঁধ দুটো উঁচু হতেই দুই পা এক করে বুকের মাঝখানে লাথি মারল, শূন্যে সিধে হলো লোকটা, পিছন দিকে কাত হয়ে মাটিতে পড়ল মাথা দিয়ে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়বার আগেই ভয়াব্র আর্তনাদের শব্দ থেমে গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা, গাড়ির মাথা অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে। হাত আর পা দিয়ে প্রতিবার একজন করে গালাকে কিনারা থেকে ফেলে দিল ও। ঢাল বেয়ে তীরবেগে নামছে নিতম্বিনী, ফুল থ্রটল দিয়ে রেখেছে অ্যানি, অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে ঝোপ আর গাছগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে সে। অবশেষে ঢাল থেকে নেমে এসে খোলা প্রান্তরে পৌঁছল আর্মারড কার।

হ্যাচ কাভারে দমাদম ঘুসি মেরে অ্যানির দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা, ধীরে ধীরে গতি কমাল সে, তারপর মৃদু একটা ঝাঁকির সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল নিতম্বিনী।

হ্যাচ খুলে উঠে এল অ্যানি, দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। আলিঙ্গনটা এড়ানোর মৃদু চেষ্টা করলেও সফল হলো না রানা, নিঃশ্বাসের শব্দ বাদ সাধতে চাইলেও উপভোগ্য নিস্তর্রতা নেমে এল দু'জনের মাঝখানে। আনন্দঘন মুহূর্তে বন্দীদের কথা মনে ছিল না, নিতম্বিনীর পেটের ভিতর তাদের কাশি আর নড়াচড়ার শব্দ প্রায় চমকে দিল ওদেরকে।

ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হলো অ্যানি, চাঁদের আলো লেগে তার

চোখ কোমল লোভে চকচক করে উঠল।

‘বেচারিরা তোমার প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে,’ ফিসফিস করে বলল অ্যানি। ‘ওদেরকে তুমি নরক থেকে তুলে এনেছ...,’ দেরি করে পৌছানোয় ওদের একজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি, কথাটা মনে পড়তেই ভাষা হারিয়ে ফেলল সে।

‘তা তো বুঝলাম,’ বলল রানা। ‘কিন্তু এখন ওদেরকে নিয়ে কী করা হবে বলতে পারো?’

‘রাসটা ক্যাম্পে নিয়ে যাই চলো, কামাল হাসান নিশ্চয়ই ন্যায্য একটা ব্যবস্থা করবেন।’

‘উঁহু,’ মাথা নাড়ল রানা। ‘আমার তা মনে হয় না। সবাই ওরা ইথিওপিয়ান আদিবাসী, ওদের নিয়ম-কানুন আমাদের মত নয়। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত—এটাই এখানকার রীতি, এক অর্থে ন্যায্যও বটে। শিফটারা চিরকাল কামাল হাসানকে জ্বালিয়ে মারছে, তাদের সামরিক উপদেষ্টাদের সাথে তিনি সদয় ব্যবহার করবেন এটা আশা করা যায় না। ভেবে দেখো, বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে লোকগুলোকে সিংহের মুখে ঠেলে দিতে চাও কিনা।’

‘ওহু গড, তারমানে আসলে আমরা বন্দীদের এখনও উদ্ধার করতে পারিনি?’

‘তা ছাড়া,’ বলল রানা, ‘সমস্যা আরও একটা আছে। বন্দীদের কামাল হাসানের হাতে তুলে দিলে কাল সকালেই নূর আয়াঙ এসে ফেরত চাইবে ওদের। কামাল হাসান ফেরত দিতে রাজি না হলে একটা ট্রাইবাল যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। উঁহু, এ ঝুঁকি নেয়া চলে না।’

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে অ্যানি বলল, ‘তা হলে একটাই উপায়। ওদেরকে ছেড়ে দাও, যেখানে খুশি চলে যাক ওরা।’

‘যেখানে খুশি বলতে তুমি বোঝাতে চাইছ ওয়েলস অভ চান্ডি,’ পূর্ব দিকে তাকাল রানা, চাঁদের আলোয় ধু-ধু প্রান্তর নির্জন আর ফাঁকা। ‘দেখা না গেলেও, গোটা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইথিওপিয়ান স্কাউটরা। এক মাইলও যেতে পারবে না, তার আগেই জবাই হয়ে যাবে বন্দীরা।’

‘ওদেরকে আমাদেরই পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তা হলে,’ বলল অ্যানি।

ঝট করে তার দিকে ফিরল রানা। ‘পৌঁছে দিতে হবে?’

‘গাড়িতে করে, ওয়েলস অভ চান্ডিতে...।’

‘শিফটারা আনন্দে বগল বাজাবে,’ হাসি মুখে বলল রানা।

‘ওদের কামানের কথা ভুলে গেছ দেখছি!’

‘যুদ্ধবিরতি ঘোষণার জন্যে সাদা পতাকা উড়বে গাড়ির মাথায়,’ বুদ্ধি দিল অ্যানি। ‘এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, রানা। সত্যি নেই।’

ঝাড়া এক মিনিট প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল রানা।

‘অনেক দূরের পথ, অ্যানি। চলো তা হলে, দেরি করে লাভ কী!’

নয়

হেডলাইট না জ্বলে গাড়ি চালাল ওরা, শিফটা বা আদিবাসী স্কাউটদের যতটা সম্ভব অন্ধকারে রাখতে চায় রানা। তবে চাঁদ যথেষ্ট উজ্জ্বল, সামনের পথ চিনতে বা শুকনো গভীর নালাটাকে এড়িয়ে যেতে কোন অসুবিধে হলো না। অবশ্য মাঝে-মধ্যেই ছোট কিন্তু গভীর গর্তে পড়ে ঝাঁকি খেলো নিতম্বিনী, নাকের সামনে দিয়ে হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠা শিয়াল বা নেকড়ে ছুটে পালাল।

অর্ধনগ্ন বন্দীরা গাড়ির পিছনের কমপার্টমেন্টে কাত হয়ে পড়ে আছে, সারাদিনের তুমুল যুদ্ধ আর ভয়ে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তাদের, পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়েছে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। এতই গভীর সে ঘুম, এঞ্জিনের বিকট আওয়াজ বা খোলের অনবরত ঝাঁকিও ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারল না। আগোছাল একটা স্তূপের মত পড়ে থাকল তারা।

শীত শীত করায় ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচবার জন্য টারিট থেকে নেমে এল অ্যানি, ড্রাইভিং সিটে রানার পাশে ছোট্ট জায়গাটুকু দখল করল। কিছুক্ষণ শান্ত গলায় রানার সঙ্গে কথা বলল সে, তারপর তার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এল, থেমে গেল এক সময়। এক পাশে ঢলে পড়ল সে, একটু হেসে তার সোনালি মাথাটা নিজের কাঁধে ঠিকমত বসিয়ে নিল রানা, তার পিঠ আর কোমরে হাত পেঁচিয়ে ধরে রাখল, যাতে পিছলে পড়ে না যায়। গায়ের আঁচ পেয়ে আরও কাছে সরে এল অ্যানি। পূর্ব আকাশে চোখ রেখে একমনে গাড়ি চালাল রানা।

শিফটা সেক্সিরা তাদের ক্যাম্পের সীমানার উপর নিয়মিত বিরতিসহ একজোড়া শক্তিশালী অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট সার্চলাইটের আলো ফেলেছে, তাদের সন্দেহ রাতের অন্ধকারে আদিবাসীরা হামলা করতে পারে। মরু আকাশের গায়ে সাদা আলোর লম্বা

একজোড়া টানেল ছুটে গেল একদিক থেকে আরেক দিকে। আলোটার দিকে লক্ষ্য রেখে এগোল রানা, দূরত্ব কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি মন্থর করল। জানে, নিশ্চয়তার ভিতর বহু মাইল দূর থেকে এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যাবে, তবে এঞ্জিনের গর্জন কম হলে দূর থেকে ধরা যাবে না ঠিক কোন্‌দিক থেকে আসছে আওয়াজটা।

এক সময় রানা আন্দাজ করল শিফটাদের ক্যাম্প আর দুই কি তিন মাইল সামনে। ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণিত করে অন্ধকার আকাশটাকে চিরে হাজার ফুট উপরে উঠল একটা স্টার শেল, বিস্ফোরিত হলো চোখ ধাঁধানো সাদা-নীল আলো, বহু মাইল জুড়ে নীচের মরুভূমিটাকে একটা মঞ্চের মত আলোকিত করে তুলল। অকস্মাৎ ব্রেক কষে নিতম্বিনীকে দাঁড় করাল রানা, শেলটা ধীরে ধীরে মাটিতে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। আলোর ভিতর নড়াচড়া করলেই আর্মারড কারের উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে শিফটার।

নিভে গেল স্টার শেলের আলো, অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে ফিরে এল। ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেছে অ্যানির, ঢুলুঢুলু চোখে রানার দিকে তাকাল সে, কপালে হাত তুলে চুল সরাল।

‘কী হলো, রানা?’

‘পৌছে গেছি,’ বলল রানা, পরমুহূর্তে আরেকটা স্টার শেল উঠল আকাশে, তার উজ্জ্বল আলোয় স্নান হয়ে গেল চাঁদটা।

‘ওদিকে,’ বলে একটা হাত তুলে অ্যানিকে দেখাল রানা, ওয়েলস অভ চান্ডির উপরে পাহাড়শ্রেণীর কিনারা পরিষ্কারই দেখা গেল। সাজানো অনেকগুলো সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিফটাদের ট্রাক বহর, স্টার শেলের আলোয় প্রতিটি কাঠামো

স্পষ্ট, মাইল দুয়েক দূরে। আচমকা মেশিনগানের একটানা আওয়াজ ভেসে এল, ছায়া লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করছে সেন্দ্রিরা। মেশিনগানের আওয়াজ থামবার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল।

‘মনে হচ্ছে সবাই ওরা জেগে আছে, অত্যন্ত নার্ভাস,’ চিন্তিত গলায় মন্তব্য করল রানা। ‘আর সামনে যাওয়া উচিত হবে না।’

‘ছেড়ে দিলে ওরা যেতে পারবে,’ বলল অ্যানি। ‘কাছেই তো।’

কয়েক সেকেন্ড কোন মন্তব্য করল না রানা, তারপর বলল, ‘সবাইকে নয়, একজনকে যেতে দেব আমরা।’

‘একজনকে...মানে?’

‘এটা যুদ্ধ, অ্যানি,’ বলল রানা। ‘নাচতে নেমে যেমন ঘোমটা দেওয়া চলে না, তেমনি যুদ্ধে নেমে দয়ার সাগর হওয়া সাজে না। তা ছাড়া, বিনিময়ে কিছু না পেয়ে বন্দীদের ফিরিয়ে দিলে আদিবাসীদের প্রতি অবিচার করা হয়। অন্তত চেষ্টা করে দেখা দরকার কিছু আদায় করা যায় কিনা।’

‘তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!’

‘সহজ ভাষায়, বন্দী বিনিময়। তিনজন ইটালিয়ান বন্দীর বিনিময়ে তিন-দশে ত্রিশজন আদিবাসী বন্দী চাইব আমরা।’

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ধারণাটা বাতিল করে দিল অ্যানি। ‘শিফটাদের ক্যাম্পে আমরা যেতে পারছি না, তোমার প্রস্তাব শোনার জন্যে ওরাও কেউ এখানে আসছে না...,’ তারপর তার মনে পড়ল, রানা বলেছে একজন বন্দীকে ছেড়ে দেবে সে। ‘...আচ্ছা বলো কীভাবে কী ভেবেছ, শুনি।’

‘শুনবে কেন, দেখো,’ প্রস্তাব দিল রানা। ‘ক্লল করে ড্রাইভারের সিট থেকে নামল ও, গাড়ির পিছনে চলে এল। তিনজন বন্দী জড়াজড়ি করে রয়েছে, ঘুমন্ত পুতুলের মত। একজন এমন বিকট

শব্দে নাক ডাকছে, ঠিক যেন হাঁপানি রোগাক্রান্ত একটা সিংহ। গায়ে ধাক্কা দিয়ে তিনজনকেই জাগাল ও। কোথায় রয়েছে, কী ঘটেছে ইত্যাদি স্মরণ করতে বেশ খানিক সময় নিল তারা। ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে অন্ধকার প্রান্তরে বের করে আনল রানা।

ঠাণ্ডা বাতাসে হি-হি করতে লাগল বন্দীরা, সম্ভ্রান্ত, নিজেদের চারদিকে বোকার মত তাকাল। এই সময় আবার একটা স্টার শেল বিস্ফোরিত হলো সরাসরি মাথার উপর, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে না পেরে হাত দিয়ে চোখ ঢাকল লোকগুলো।

তিনজনই ওরা অল্প অল্প ইংরেজি জানে। কী প্ল্যান করেছে সে সম্পর্কে কোন ধারণা না দিয়ে তিনজনকেই জেরা করল রানা। আধ ঘণ্টা জেরা করায় কয়েকটা মূল্যবান তথ্য জানা গেল। সেলাসী বাহিনীকে সাহায্য করতে যাচ্ছে শিফটারা, তবে তাদের প্রথম কাজ আদিবাসী রাসটা আর হারারি গোত্রগুলোকে নির্বংশ করা, কারণ সম্রাট হাইলে সেলাসী, মি. এক্স আর জেনারেল ফাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই দুই গোত্রের লোকেরা সবাই কমিউনিস্ট। তার মানে আদিবাসীরা যদি সারডি গিরিসংকট ছেড়ে সরে যায়, সেলাসী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য শিফটারা সরাসরি অগ্রসর হবে না, তারা বরং আদিবাসীদের পিছু ধাওয়া করবে। আদিবাসীদের হয় জিততে হবে, নয় ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। কী গুরুতর একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, উপলব্ধি করতে পারল রানা।

আরেকটা তথ্য হলো, কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরের জেনারেল ফাদের কাছ থেকে ট্যাংক আর এয়ারক্রাফট চেয়ে আবেদন জানিয়েছে। তার আবেদন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে বন্দীদের ধারণা। তাদের আরও ধারণা, খ্রিস্ট হাসান সালের সঙ্গে শিকারী বিড়ালের মত খেলছেন সম্রাট।

এরপর রানা ওদেরকে প্রস্তাবটা ব্যাখ্যা করল। গাড়িতে তারা দু'জন থাকবে, বাকি একজন হেঁটে রওনা হবে। ক্যাম্পে ফিরে কাউন্ট ডিকানডিয়া বা মেজর লুইগি রাকাকে প্রস্তাবটা দেবে সে। তিনজন ভাড়াটে ইটালিয়ান সৈনিকের বিনিময়ে ত্রিশজন আদিবাসী যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। আর্মারড কার নিয়ে আরও মাইলখানেক এগিয়ে অপেক্ষা করবে রানা, শিফটারা ওর প্রস্তাবে রাজি হলে গুলিবর্ষণ বন্ধ রাখবে, আকাশে আর কোন স্টার শেল ছুঁড়বে না। ত্রিশজন আদিবাসীকে নিয়ে আসবে ইটালিয়ান সৈনিক, তারপর দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে আবার ফিরে যাবে সে। আর শিফটারা যদি ওর প্রস্তাবে রাজি না হয়, দু'জন বন্দীকে নিয়েই সম্ভ্রষ্ট থাকবে রানা, তাদেরকে তুলে দেবে রাসটা গোত্রের প্রধান কামাল হাসানের হাতে। বলাই বাহুল্য, প্রস্তাবে রাজি হবার ভান করে শিফটারা যদি কোন রকম চালাকি করতে যায়, পরিণতির জন্য তারাই দায়ী থাকবে। রানা আর অ্যানিকে অসহায় ভাবলে ভুল করবে তারা, কারণ ওদের সঙ্গে আর্মারড কার ও ভিকার্স মেশিনগান রয়েছে।

ইটালিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক লোকটা রানার প্রস্তাব নিয়ে ফিরে যেতে রাজি হলো, বাকি দু'জনকে আবার ঢোকানো হলো গাড়ির ভিতর। বাইরে থেকে হ্যাচের তালা লাগাতে ভুল হলো না রানার। নিঃসঙ্গ ইটালিয়ান সৈনিকের পিছু পিছু ধীরগতিতে রওনা হলো আবার আর্মারড কার। লোকটাকে নির্দেশ দেওয়া আছে, আকাশে স্টার শেল উঠছে দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়বে সে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে পড়বে নিতম্বিনী, আলো নেভার পর আবার রওনা হবে।

শিফটারাদের ক্যাম্প যখন আর মাত্র এক মাইল দূরে, ব্রেক করল রানা, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ঘুরিয়ে নিল নিতম্বিনীর

নাক, ইটালিয়ান সৈনিক একাই রওনা হলো ক্যাম্পের দিকে। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

লোকটার গমনপথের দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে রানা, স্টার শেলের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল তাকে। মাথার উপর দু'হাত তুলে নাড়ছে, বোঝাতে চাইছে শত্রুপক্ষের কেউ নয় সে। মেশিনগান আর রাইফেলের গুলি থামল না, তবে বুলেটগুলো লোকটার দিকে আসছে না বলেই মনে হলো, অন্তত লাগল না একটাও। ক্যাম্প যখন আর মাত্র তিনশো কী সাড়ে তিনশো গজ দূরে, হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একদল ক্ষুদে ছায়ামূর্তি, নিমেষে ঘিরে ফেলল লোকটাকে। শিফটা সেম্ফিরা ক্যাম্পের সীমানা ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে নিঃসঙ্গ লোকটার পরিচয় জানবার জন্য।

মাটির ভাঁজে আবার হারিয়ে গেল তারা, সঙ্গে ভাড়াটে সৈনিকটাও।

পাঁচ মিনিট কাটল, সাত মিনিট, গুলিবর্ষণ থামল না। আকাশে এখনও একটা স্টার শেল জ্বলছে।

প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো অসহ্য লাগল অ্যানির, কথা না বলে পারল না। 'তোমার কি মনে হয়, আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে ওরা।'

'কাউন্ট নিজে একজন ইটালিয়ান, সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর রাকাও তাই,' বলল রানা। 'স্বজাতি দু'জন বন্দীকে তারা ফেরত পেতে চাইবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আদিবাসীদের না ছেড়ে, কোনও কৌশলের মাধ্যমে ফেরত পেতে চাইবে কিনা সেটা অবশ্য আলাদা প্রশ্ন। কাজেই আমাদের সাবধান থাকতে হবে।' ভিকার্স মেশিনগানটা নেড়েচেড়ে দেখল রানা। 'তোমার কাছে নিশ্চয়ই

কোনও অস্ত্র নেই?’

‘নেই, আবার আছেও,’ জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল অ্যানি।

‘ও, আচ্ছা-বুঝেছি, নেই আবার আছেও!’ উপর-নীচে মাথা দোলাল রানা।

‘হেসো না, সত্যি কথা বলছি,’ অ্যানি গম্ভীর। ‘মাইকেল আমাকে একটা অটোমেটিক হ্যান্ডগান দিয়েছে, কিন্তু আমি নিতে চাইনি। তার কথা হলো, আমরা নাকি প্রাগৈতিহাসিক যুগে রয়েছি, চারদিকে শুধু হিংস্র জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজেই আত্মরক্ষার জন্যে একটা অস্ত্র আমার সাথে থাকা দরকার। আমি তার সাথে একমত হতে পারিনি, বলেছি, আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে আলাদা ভাবে কোন অস্ত্রের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। রেগে যায় সে, পিস্তলটা আমার কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়।’

‘প্রসঙ্গক্রমে বলছি, মাইকেলের কথায় অত্যন্ত জোরাল যুক্তি আছে...।’

‘যুক্তি আছে কি নেই, আমি আশা করছি না সেটা আমাকে কেউ বলে দিক।’ রেগে উঠল অ্যানি। ‘স্বাধীন ইচ্ছা আমারও থাকতে পারে...।’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই—এমনকি মৃত্যুকে সাদর আলিঙ্গন করার স্বাধীন ইচ্ছেও তোমার থাকতে পারে। তা, কোথায় আছে সেটা?’

‘দাঁড়াও, মনে করতে দাও, কোথায় রেখেছি ভুলে গেছি।’

ব্যখ্যাটা পাওয়া গেল—‘নেই, আবার আছেও!’

টারিট থেকে হ্যাচ গলে নীচে নেমে গেল অ্যানি, ড্রাইভারের সিটের তলায় হাত গলিয়ে হাতড়াল কিছুক্ষণ, উপর থেকে তার অস্পষ্ট গলা শুনতে পেল রানা, ‘এখানেই তো রেখেছিলাম ছাই!’

পাওয়া গেল পিস্তলটা, চেক করে রানা দেখল ম্যাগাজিনে পাঁচটা গুলি রয়েছে। ‘তুমি এখানে অপেক্ষা করো, খানিকটা সামনে এগিয়ে ওত পেতে থাকব আমি। যদি দেখি শিফটাদের মতলব খারাপ, ফিরে আসব—সাথে সাথে গাড়ি ছেড়ে দেবে তুমি।’

‘কিন্তু...।’

‘খামো, আগে শেষ করি। যদি দেখো আমি ফিরছি না অথচ শিফটারা আসছে বা কামান দাগতে শুরু করেছে, বন্দীদের নিয়ে সোজা ফিরে যাবে আমাদের ক্যাম্প—আমার জন্যে কোনও অবস্থাতেই অপেক্ষা করবে না। মনে থাকবে?’

‘একা ফিরে যাব?’ অ্যানির গলা অস্বাভাবিক শান্ত।

‘যদি দেখো আমি ফিরিনি, তা হলে দুটোর একটা ঘটনা ঘটেছে বলে ধরে নেবে তুমি—হয় আমি মারা গেছি, নয়তো বন্দী হয়েছি। এ-কথা জানার পর, যেহেতু আমি মারা গেছি বা বন্দী হয়েছি, তুমিও মারা যেতে বা বন্দী হতে চাইবে?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

‘না, তা চাইব বলে মনে হয় না,’ জবাবে বলল অ্যানি। ‘তবে সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি একা ছাড়ব না। কোথাও যেতে হলে আমাকেও সাথে নিতে হবে তোমার।’

‘তা হলে নিতম্বিনী আর বন্দীদের পাহারা দেবে কে?’ জানতে চাইল রানা। ‘ভূতে?’

স্টার শেল নেভার পর রওনা হলো রানা, চাঁদের আলোয় অ্যানি তাকে মাত্র কিছুক্ষণ দেখতে পেল। এই ছিল, তারপর ভোজবাজির মত অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা। টারিটে বসে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও ঘামতে লাগল অ্যানি। স্টার শেল নিভে যাওয়ায় সামনেটা খুব বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না।

সার্চলাইটের আলোও অনেকক্ষণ হলো জ্বলছে না। কতটা সময় পেরুল-এক ঘণ্টা? পৌনে এক ঘণ্টার কম নয়।

মনে মনে একটা হিসাব করবার চেষ্টা করল সে। প্রস্তাবে রাজি হলে ত্রিশজন আদিবাসী বন্দীকে এক জায়গায় জড়ো করবে শিফটারা, অসংখ্য বন্দীর মধ্যে থেকে তাদেরকে বাছাই করতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। আহতদের ফেরত পাঠানোর সম্ভাবনা কম, বেছে বেছে সুস্থদের পাঠাবে তারা। ক্যাম্প থেকে রওনা হয়ে এক মাইল হেঁটে আসতে যথেষ্ট সময় নেবে বন্দীরা, আর যদি পিছমোড়া করে হাত বাঁধা থাকে তা হলে তো কথাই নেই, দ্বিগুণ সময় লাগবে।

একবার ইচ্ছে হলো সে-ও রানার পথ ধরে এগোয়। চিন্তাটা বাতিল করে দিল সে। তাতে যে শুধু রানার নির্দেশ অমান্য করা হবে তাই নয়, দায়িত্ব জ্ঞানহীনতারও পরিচয় দেওয়া হবে।

সময় বয়ে চলল। অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল অ্যানি, কিন্তু সামনে কিছুই নড়তে দেখল না। বাতাসের শৌ-শৌ ছাড়া আর কোন শব্দও নেই। হঠাৎ তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শিফটারা যদি পিছন বা অন্য কোনও দিক থেকে আসে? যদি ঘিরে ফেলে আর্মারড কার? ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল সে।

শিফটা ক্যাম্পের সীমানায় সেন্দ্ৰিদের সংখ্যা কমে গেছে, বেশিরভাগই ফিরে আসা ইটালিয়ান সৈনিককে নিয়ে ক্যাম্পের মাঝখানে কাউন্ট ডিকানডিয়ার তাঁবুতে ঢুকেছে তারা। এখনও যারা প্রহরায় রয়েছে, আগের চেয়ে সতর্ক, টহল দিচ্ছে নার্ভাস ভঙ্গিতে। ফেরত আসা ভাড়াটে সৈনিক কী খবর নিয়ে এসেছে কে জানে!

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকল

রানা। পঞ্চাশ গজ সামনে একজন সেন্দ্ৰি রয়েছে, আরও একশো গজ দূরে ট্রাক বহর, দাঁড়িয়ে রয়েছে সার সার, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার ফুটে আছে কাঠামোগুলো। ট্রাক বহরের কাছ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে, ডান পাশে, আরও তিনটে ট্রাক রয়েছে, ক্যানভাসে ঢাকা। বোঝাই যায়, ওগুলোকে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। কেন? তবে কি ওগুলোয় গোলাবারুদ রাখা হয়েছে?

ক্যাম্পের মাঝখান থেকে ভেসে আসা শোরগোলের শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা। এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি শিফটা কমান্ডাররা। সম্ভবত মুক্তি পাওয়া সৈনিককে জেরা করে জেনে নিচ্ছে, প্রস্তাবটা শিফটারাদের বিরুদ্ধে কোন ফাঁদ বা চাল কিনা।

আরও ভিতরে ঢুকবার একটা সুযোগ দেখতে পেল রানা। সামনের সেন্দ্ৰি ওর সামনে দিয়ে হেঁটে অনেক দূর চলে গিয়ে ফিরে আসছে আবার, ইচ্ছে করলে তার ফিরবার আগে সামনের দুরত্বটুকু পেরিয়ে ট্রাক বহরের কাছে বা ওগুলোর উল্টোদিকে পৌঁছানো রানার জন্য তেমন কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু কী লাভ? ভিতরে ঢুকলেই তো হবে না, বেরতেও হবে। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল ওর মাথায়।

এই সময় রানার ডান আর বাঁ দিক থেকে মেশিনগান ও রাইফেলের আওয়াজ থেমে গেল। সেই সঙ্গে ক্যাম্পের মাঝখানে সৈনিকদের ছোটোছুটি পড়ে গেল, সবাই যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। আকাশে আর কোন স্টার শেলও উঠল না।

ঝোপের ভিতর থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল রানা, কী ঘটছে জানা দরকার। ক্যাম্পফায়ারের আলোয় যা দেখল, হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। প্রস্তাবে রাজি হয়েছে শিফটারা, ক্যাম্পের সীমানা

ছাড়িয়ে আদিবাসী বন্দীদের নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে ভাড়াটে ইটালিয়ান সৈনিক-অবশ্য আঙনের লালচে আভায় চেনা গেল না সৈনিকটি আগের সেই লোক কিনা। একটা পাথরের গায়ে স্টেঁটে থাকল রানা, ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল দলটা, সোজা নিতম্বিনীর দিকেই যাচ্ছে। আদিবাসীদের চিনতে পেরেছে ও, চিনতে পেরেছে সৈনিকটিকেও।

প্রস্তাব মেনে নিয়েছে কর্নেল ডিকানডিয়া, কিন্তু সেটা ভান মাত্র। আর্মারড কারের পথরোধ করবার জন্য চমৎকার একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে সে। ক্যাম্পফায়ারের আলোয় সৈনিকদের পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, ট্রাক বহরের প্রথম আর দ্বিতীয় সারিতে উঠছে তারা। আলোছায়ার ভিতর সঠিক সংখ্যা বোঝা গেল না, তবে অন্তত হুঁটা ট্রাকে উঠছে তারা।

দ্রুত কাজ শুরু করল রানার মাথা। আদিবাসী বন্দীদের নিয়ে আর্মারড কারটাকে রওনা হতে দেবে শিফটার, তারপর বিশাল একটা বৃত্ত রচনা করে দু'দিক থেকে ওটার সামনের পথ আটকে দাঁড়াবে হুঁটা ট্রাক। হুঁটা ট্রাকে অন্তত তিনশো সৈনিক থাকছে, তিনশো রাইফেলের বিরতিহীন গুলিবর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া বা অগ্রাহ্য করা নিতম্বিনীর পক্ষে সম্ভব নয়, তার উপর দু'পাঁচটা মেশিনগান কি আর থাকবে না?

মনে উঁকি দেওয়া সম্ভাবনাটা এখন আর শুধু অ্যাডভেঞ্চারের পর্যায়ে থাকল না, আত্মরক্ষার একটা কৌশল বলে মনে হলো রানার। ট্রাক বহরের কাছে সবাই খুব ব্যস্ত, এমনকী সেন্টিরাও দায়িত্ব ভুলে সেদিকে তাকিয়ে আছে। এই সুযোগে ক্রল করে এগোল রানা। দ্রুত যতই কমল, সশস্ত্র শিফটা সৈনিকদের আরও পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। কেউ কেউ এমনকী ঘুম ভাঙবার পর গায়ে শার্ট চড়াবারও সময় পায়নি, হাতে রাইফেল ধরিয়ে দেওয়া

হয়েছে। নিঃসঙ্গ সেন্টিকে পিছনে ফেলে এল রানা, দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল মাটির উপর, গায়ের ছেঁড়া শার্টটা আগেই খুলে ফেলে দিয়েছে। ট্রাক বহরের উল্টোদিকে পৌঁছে গেছে ও। মাত্র দুশো গজ দূরে শিফটা সৈনিকরা হুটোপুটি করে ট্রাকে চড়ছে।

তিনটে ট্রাকের প্রথমটার আড়ালে রয়েছে রানা। ক্যানভাস ঢাকা পিছনটায় উঁকি দিয়ে দেখল, যা ভেবেছিল তাই। ট্রাকের পিছনে দশ-বারোটা অ্যামুনিশন বক্স আর থরে থরে সাজানো রাইফেল রয়েছে। তাড়াহুড়ো না করে শিষ দিল রানা, শান্ত পায়ে হেঁটে চলে এল ট্রাকের পাশে। ক্যাবের দরজা খুলে উঁকি দিল ভিতরে। কেউ নেই। শিফটারদের দিকে একটা চোখ রেখে সরে এল ট্রাকের সামনে। হাত রাখল ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডলে। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

তিন মিনিট পর হুঁটা ট্রাক ভরে গেল শিফটা সৈনিকে। ট্রাকের পাশে, মাটিতে, আরও অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবে হাবভাব দেখে বোঝা গেল অভিযানে তারা অংশগ্রহণ করছে না। হুঁটা ট্রাকের সামনে হুঁজন সৈনিক দাঁড়াল, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডলে হাত। একসঙ্গে স্টার্ট দেওয়া হবে। একটা ট্রাকেরও হেডলাইট জ্বলল না।

আর্মারড কারের দিকে আদিবাসী বন্দীরা বোধহয় অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গেছে, আন্দাজ করল রানা।

একসঙ্গে গর্জে উঠল হুঁটা ট্রাক, এক সেকেন্ড পর স্টার্ট নিল অস্ত্রশস্ত্রে ঠাসা সদ্য দখল করা রানার ট্রাকটাও। এক ছুটে ট্রাকের পাশে চলে এল ও, লাফ দিয়ে উঠে বসল ক্যাবে। শিফটা ট্রাকগুলো স্টার্টই নিয়েছে শুধু, এখনও সচল হয়নি, কারণ কাউন্ট ডিকানডিয়া প্রতিটি ট্রাক ড্রাইভারকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দীর্ঘ

ভাষণের মাধ্যমে উপদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে।

হঠাৎ গোলাবারুদ ভর্তি তিনটে ট্রাকের একটার জোড়া হেডলাইট জ্বলে উঠল। হতভম্ব হয়ে গেল শিফটারা। কর্কশ শব্দে হেসে উঠে কাউন্ট ডিকানডিয়া জোড়া আলোর দিকে একটা হাত তুলে বলল, ‘গর্দভটাকে ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে, ওকে আমার খুখু চাটাব! পই পই করে বারণ করলাম, কোন আলো জ্বালা চলবে না!’

কয়েকজন শিফটা হেডলাইট লক্ষ্য করে পা বাড়াল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। আলো জোড়া হঠাৎ সচল হয়ে উঠল। সবাইকে বিস্ময়ে পাথর করে দিয়ে ছুটল ট্রাকটা, প্রতি মুহূর্তে দ্রুত হলো গতি, দেখতে না দেখতে ক্যাম্প ছেড়ে খোলা প্রান্তরে গিয়ে পড়ল ক্যানভাস ঢাকা আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন ট্রাক।

ট্রাক বহরের সামনে রাগে লাফাতে শুরু করল কাউন্ট ডিকানডিয়া। এখনও তার ধারণা, বীরত্ব দেখানোর লোভে শিফটারদেরই একজন সৈনিক আর্মারড কারটাকে বাধা দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছে। ট্রাক ড্রাইভাররা কী করবে বুঝতে পারছে না, বোকার মত মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা, কাউন্টের কাছ থেকে এখনও তারা কোন নির্দেশ পাচ্ছে না।

গালিগালাচ এবং ভাষণ, দুটোই সমানে চালিয়ে যাচ্ছে কাউন্ট। ‘বেজন্মাটা গেছে যাক, নিজের প্রতি দরদ থাকলে আর ফিরে আসবে না। আর যদি বোকামি করে ফেরত আসে, সাথে সাথে ওর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে। সেক্ট্রিরা যে যার পোস্টে ফিরে যাও। স্টার শেল!’ হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তার। ‘স্টার শেল ছাড়ো! কামান দাগো! ধুলোর সাথে মিশিয়ে দাও আর্মারড কারটাকে। বন্দীরা এখনও পৌছায়নি, কামান দেগে উড়িয়ে দাও সব ক’টাকে!’

www.BanglaBook.org

রানার আন্দাজ প্রায় সঠিক প্রমাণিত হলো, আর্মারড কারের দিকে মাত্র অর্ধেক রাস্তা পেরিয়েছে বন্দীরা। হেডলাইট জ্বলে ট্রাকটাকে ধেয়ে আসতে দেখে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল তারা, তাদের পাশে ঘাঁচ করে ব্রেক করল রানা। ‘উঠে পড়ো, পিছনে উঠে পড়ো!’ জরুরী তাগাদা দিল রানা, ক্যাব থেকে মাথা বের করে ইশারায় দেখাল ট্রাকের পিছনটা। ইটালিয়ান সৈনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ‘তুমিও উঠে পড়ো!’

হেডলাইটের আলো দেখে ঘাবড়ে গেল অ্যানি। তারমানে কি রানা ধরা পড়েছে? শিফটারা এবার ওকে ধরতে আসছে? কী করবে ভেবে পেল না সে-আর্মারড কার আর বন্দীদের নিয়ে ছুটবে? কিন্তু সময় পাওয়া গেল না-বাড় তুলে কাছে চলে এল ট্রাক। বহু লোকের মিলিত কণ্ঠের হৈ-চৈ আর গান শুনতে পেল অ্যানি।

ঘাঁচ করে ব্রেক করল রানা, ক্যাব থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল। রানাকে দেখে নিজের অজান্তেই ককিয়ে কেঁদে উঠল অ্যানি, পরম স্বস্তিতে অবশ্য হয়ে গেল তার শরীর।

অল্প দু’চার কথায় বর্তমান অবস্থা বুঝিয়ে বলল রানা অ্যানিকে। শিফটারা ওদেরকে ফিরতে বাধা দেবে, বিপদ এড়িয়ে পালাতে হবে এখন। তার আগে মুক্ত করে দিতে হবে বন্দীদের।

হ্যাচ খুলে দু’জন বন্দীকে বের করা হলো। ট্রাক থেকে নেমে তাদের সঙ্গে যোগ দিল বয়স্ক ইটালিয়ান লোকটা। রানা বলল, ‘তোমরা মুক্ত।’ শিফটা ক্যাম্পের দিকে একটা হাত তুলল ও। ‘চলে যাও।’

বয়স্ক ইটালিয়ানটা ইতস্তত করল, তার যেন যাবার ইচ্ছে নেই। আর বাকি দু’জন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল রানার

দিকে, রানার কথা যেন বোধগম্য হয়নি।

‘কী হলো? দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?’ ধমক দিল রানা। ‘যাও!’

তবু ওরা নড়ল না।

‘কী হলো? কিছু বলবে?’ রেগে উঠল রানা, এখানে সময় নষ্ট হলে পথে বিপদে পড়তে হবে ওদেরকে।

‘ওদিকে কোথায় যাব?’ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল একজন বন্দী, সেই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ‘আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না...।’

‘ওদিকে তোমাদের ক্যাম্প!’ বলল রানা। ‘তোমরা মুক্ত! দৌড়াও, ছোটো!’ বন্দীদের দিকে এক পা এগোল ও।

ঘুরে দাঁড়াল ওরা, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে—সন্দেহ পিছন ফিরলেই রানা যদি গুলি করে। অগত্যা ওদের পিঠে ধাক্কা দিতে হলো রানাকে। তারপর ওরা হাঁটতে শুরু করল।

কিছু দূর গিয়ে বয়স্ক লোকটা আবার ফিরে এল।

‘আবার কী হলো?’ মারমুখো হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, অ্যানিকে নিয়ে নিতম্বিনীর উপর চড়তে যাচ্ছিল ও।

রানার দিকে নয়, সোজা এগিয়ে এসে অ্যানির সামনে থামল লোকটা। তার চোখে কৃতজ্ঞতার আলো। সবিনয় ভঙ্গিতে ঝুঁকে অ্যানির একটা হাত ধরল সে, হাতটা খানিক তুলে আলতোভাবে চুমো খেলো। ‘ধন্যবাদ, ম্যাডাম, অসংখ্য ধন্যবাদ!’

অ্যানির হাত ছেড়ে দিয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। ‘আপনার একটা উপকার করতে চাই। কোন দিক দিয়ে যাবেন আপনারা। দয়া করে বলবেন কী?’ একটা হাত তুলল সে। ‘ওদিক দিয়ে?’

‘কেন?’ জিজ্ঞেস করল রানা, ওদিকে গেলে কী ঘটবে জানা আছে ওর।

‘কাউন্ট কী প্ল্যান করেছেন আমি জানি। ওদিকে যাবেন না প্লিজ...’

হঠাৎ খেমে গেল লোকটা, দেখল করমর্দনের জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রানা। লুফে নেওয়ার ভঙ্গিতে রানার হাতটা ধরে খুব করে দু’হাতে ঝাঁকাল সে, চোখে পানি নিয়ে হাসছে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল সে।

অ্যানিকে নিয়ে নিতম্বিনীর টারিটে উঠে পড়ল রানা। ট্রাক চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে সদ্য মুক্তি পাওয়া গালাদের একজন, ত্রিশ জনের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম নয়—বারোজন। দু’টো গাড়ি এক সঙ্গে রওনা হবে, সামনে থাকবে আর্মারড কার।

রওনা হতে গিয়েও পূর্ব দিকে একবার তাকাল রানা, আর ঠিক তখনই অন্ধকার চিরে আকাশে উঠল একটা স্টার শেল। চোখ ধাঁধানো আলোটা নেভার অপেক্ষায় না থেকে আর্মারড কার ছেড়ে দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ওটার পিছু নিল ট্রাকটা।

কামানের গর্জন শোনা গেল কয়েক মিনিট পর, ইতিমধ্যে আরও প্রায় এক মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা। বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠল রানা। গোলাটা পড়ল নিতম্বিনীর ত্রিশ গজ সামনে, তবে অনেকটা ডান দিক ঘেঁষে। গোলাবারুদ ভর্তি ট্রাকের উপর শেল পড়লে কী হবে জানা আছে রানার। পরবর্তী শেলটা পড়ল বেশ অনেকটা পিছনে। শেষ স্টার শেল নিভে যাবার পর নতুন আরেকটা বেশ কিছুক্ষণ জ্বলল না, আর কোন কামানের গোলাও ছুটে এল না ওদের দিকে।

খানিক পর আবার স্টার শেল উঠল আকাশে, কামানও গর্জে উঠল, তবে ইতিমধ্যে নাগালের বাইরে চলে এসেছে ট্রাক আর আর্মারড কার। বুঝতে পেরে আবার ট্রাকের পিছন থেকে গান

গেয়ে উঠল আদিবাসীরা, অ্যামুনিশন বাজের গায়ে রাইফেল ঠুকে আনন্দ প্রকাশ করছে।

চল্লিশ মাইল পেরিয়ে এল ওরা। ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে নিতম্বিনীর গতি মন্তুর করল রানা। কাউকে কিছু বলতে হলো না, ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল যোদ্ধারা। অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের সঙ্গে অ্যানি দেখল আর্মারড কারটাকে ঘিরে ফেলল তারা, টারিট থেকে এক রকম ছোঁ দিয়ে রানাকে ছিনিয়ে নিল আট-দশ জোড়া কালো লোমশ হাত।

কামাল হাসানের ক্যাম্প ইতিমধ্যে মহা শোরগোল বাধিয়ে দিয়েছে গালা গোত্রের প্রধান নূর আয়াঙ। সদলবলে হাজির হয়েছে সে, কামাল হাসানের কাছে বিচার চায়। রানা আর অ্যানি তার মুখের গ্রাস তিনজন ইটালিয়ান বন্দীকে কেড়ে নিয়ে এসেছে, তার দাবি এই মুহূর্তে রানা আর অ্যানিকে তার হাতে তুলে দিতে হবে।

বহুযুগ পর এই প্রথম কামাল হাসানকে ভাবগম্ভীর চেহারা নিয়ে চুপ করে থাকতে দেখা গেল। বিশেষ করে রানার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বিশ্বাস করতে রাজি নন তিনি। তাঁর ধারণা, রানা যদি বন্দীদের মুক্ত করেই থাকে, তার পিছনে সঙ্গত কোন কারণ না থেকে পারে না।

নূর আয়াঙ হুমকি দিল, কামাল হাসান সুবিচার না করলে আইন নিজের হাতে তুলে নেবে সে।

এই সময় ক্যাম্পে ঢুকল আদিবাসীদের বিজয় মিছিল। শোরগোল শুনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ কামাল হাসান। মিছিলটা দেখে তাঁর দাঁতহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়ল। অকস্মাৎ ঘুরলেন তিনি, ছুটে ভিতরে ঢুকলেন, টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনলেন নূর আয়াঙ গালাকে। ‘যাও, বদলা নাও! করো বিচার!

ওই তো রানা, যাও!’

গোটা ক্যাম্প জ্যান্ত হয়ে উঠল। শিশুরা কেঁদে উঠল হারিয়ে যাওয়া বাবাকে আবার দেখতে পেয়ে, স্ত্রীরা পাগলিনীর মত ছুটল ফিরে আসা স্বামীদের বুকে আছড়ে পড়বার জন্য। একজন গালা ছুটে এসে গোত্রপ্রধানকে জানাল, তিনজন ইটালিয়ান বন্দীর বিনিময়ে ত্রিশজন যোদ্ধাকে কেড়ে নিয়ে এসেছে মাসুদ রানা, তাদের মধ্যে বারোজনই গালা-এই মুহূর্তে তাদের কাঁধেই সওয়ার হয়ে রয়েছে নমস্য উদ্ধারকর্তা।

কামাল হাসানের তর্জন-গর্জন আর লক্ষ্যবাম্পের সামনে টিকতে না পেরে চোরের মত পালিয়ে গেল নূর আয়াঙ। তার নিজের গোত্রের লোকজনই রানাকে নিয়ে এমন মেতে উঠেছে, এখন বিচারের কথা উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক।

দশ

চকচকে ফটোগ্রাফিক প্রিন্টের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল জেনারেল ফাদ। সিংহ বধের উল্লাস নিয়ে গর্বিত শিকারীর মত আর্মারড কার গরবিনীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট ডিকানডিয়া

লেকরেক। গরবিনীর খোল বাঁঝরা হয়ে রয়েছে, পিছনে পড়ে রয়েছে আদিবাসী রাসটা আর হারারি যোদ্ধাদের লাশ, রক্তে লাল হয়ে আছে তাদের শতচ্ছিন্ন আলখেল্লা। জেনারেল ফাদের জানা নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা লাশগুলো চাতুর্যের সঙ্গে সংগ্রহ করা হয়েছে, ওগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই শিফটাদের লাশ। এক দুই করে গুণল জেনারেল ফাদ, প্রায় দুশোর মত হবে। তারমানে, ভাবল সে, কাউন্ট ডিকানডিয়া তার রিপোর্টে কিছুই বাড়িয়ে লেখেনি। সত্যি তা হলে দু'হাজার আদিবাসীকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে শিফটার।

কর্নেল ডিকানডিয়া নিজের কৃতিত্ব ছবির সাহায্যে রেকর্ড করে রাখতে চাইলেও, এক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। ক্যামেরাম্যান সার্জেন্ট বানানটো সাতা বারবার পোজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও, মধ্যমাঠে গিয়ে গরবিনীর পাশে দাঁড়াতে রাজি হয়নি সে। অবশেষে মেজর রাকা রিপোর্ট দিল, শত্রুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছে। তবু সাহস হলো না কাউন্টের, মেজরকে সে নির্দেশ দিল: আর্মারড কারটাকে ক্যাম্পের দিকে অন্তত খানিকটা টেনে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করো, সেই সঙ্গে যোগাড় করো দুশো আদিবাসীর লাশ। মেজর সবিনয়ে জানাল, আদিবাসীরা মারা পড়েছে মাত্র জনা পঞ্চাশ, দুশো লাশ যোগাড় করা সম্ভব নয়। খেপে উঠে কাউন্ট বলল, ফটোয় দেখে লাশ চেনা সহজ কথা নয়। আদিবাসী না হলেও চলবে। বাকি দেড়শো লাশ শিফটাদের হোক না, ক্ষতি কী, তবে ওদের মাথায় বা হাতে লাল কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিয়ো, যাতে কমিউনিস্ট বলে চেনা যায়।

তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মেজর রাকা, কারণ ইতিমধ্যে তার জানা হয়ে গেছে যে জেনারেল ফাদ আর মি. এক্স কাউন্টকে যোদ্ধা হিসাবে নেপোলিয়নের সমকক্ষ বলে ভাবতে শুরু

করেছে।

ফটোটা নামিয়ে রেখে মি. এক্সের দিকে তাকাল জেনারেল ফাদ। ‘কাউন্ট দেখছি তাক লাগিয়ে দিল!’

‘ওকে ডেকে পাঠান,’ পরামর্শ দিল মি. এক্স। ‘ব্যক্তিগতভাবে ওকে আমাদের অভিনন্দন জানানো দরকার। তা ছাড়া, সেলাসী বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্যে আরও তাড়াতাড়ি অ্যাডভান্স করতে হলে তার আর কী সাহায্য দরকার তাও শোনা যাবে।’

হেডকোয়ার্টার থেকে তলব করা হয়েছে, খবর শুনেই পিলে চমকে উঠল কাউন্টের। যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিটি রিপোর্টে গাদা গাদা মিথ্যে তথ্য দিয়েছে সে, প্রথমেই তার ধারণা হলো সেগুলো সব ফাঁস হয়ে গেছে। কে ফাঁস করল? মেজরকে সে আগেই ভয় দেখিয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে সে যেন জেনারেল ফাদকে কোনও রিপোর্ট না পাঠায়। একটা হুমকি দিতেও ভোলেনি, তার সম্পর্কে কোন কথা জেনারেল ফাদকে লাগালে সেটা মাফিয়াচক্রের কানে উঠবে, ফলাফল অনুমেয়। ইঁশিয়ারিটা মেজরের অন্তরে পৌঁছানোর কথা। তার জানা থাকবার কথা, মাফিয়ার অশুভ দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কোন ইটালিয়ানের পক্ষে সম্ভব নয়।

মেজরকে ডেকে কাউন্ট বলল, ‘আমার বাহিনীতে একজন স্পাই আছে। তার পরিচয় এখনও আমি জানি না, কাজেই তুমিও সন্দেহের উর্ধ্ব নও। আমি আসমারায় যাচ্ছি, ওখান থেকে ফিরে তার পরিচয় জানব। জেনে রাখো, স্পাইয়ের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।’

সার্জেন্ট সাতা আর ড্রাইভারকে নিয়ে আসমারার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল কাউন্ট, সঙ্গে তিন ট্রাক ভর্তি দেহরক্ষী থাকল

একশোজন।

আসমারার প্রধান সড়কে পৌঁছে ক্যাসিনোর সামনে থামল রোলস-রয়েস। কাউন্টের মন খারাপ, জেনারেল ফাদ হয়তো তাকে পদচ্যুত করবে, তাই তার সঙ্গে দেখা করবার আগে শেষবারের মত একটু আনন্দ-ফুর্তি করে নিতে চায় সে।

ক্যাসিনোয় বীরোচিত সম্বর্ধনা পেল কাউন্ট। অল্প বয়েসী যুবতীরা তাকে হেঁকে ধরল। বেসুরো গলায় কাউন্ট বলল, 'যত পারো আমাকে আনন্দ দাও, কারণ আর হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না! সাতা, ক্যামেরা!' মেয়েরা তাকে কাঁধে তুলে নিল, খিল খিল করে হাসছে সবাই। মিছিল করে রওনা হলো তারা, তাদের সামনে দ্রুত পিছু হটল বানানটো সাতা, ঘন ঘন ক্যামেরার শাটার টিপল সে।

কয়েক ঘণ্টা পর। সদ্য দাড়ি কামিয়েছে কাউন্ট। তার ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করা হয়েছে। সাতা নিজের হাতে তার চুলে সুগন্ধ তেল ঢেলেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাকে পাউডারের পাফ বুলাল কাউন্ট। হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে বিষণ্ণ চিন্তে রওনা হবার আগে মেয়েদের চুমো খেলো সে, শেষ এক গ্লাস কনিয়াক গিলল, মন থেকে ভয় তাড়ানোর জন্য বেপরোয়া ভঙ্গিতে হাসল, তারপর মিছিল করে বেরিয়ে এল ক্যাসিনোর বাইরে। কড়া রোদের মধ্যে তাকে নিয়ে ছুটে চলল রোলস-রয়েস, হেডকোয়ার্টারের দিকে।

চারটের সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। হেডকোয়ার্টারের বিশাল গেট দিয়ে রোলস-রয়েস ঢুকছে, কাছের একটা গির্জা থেকে চারটে বাজার সময় সংকেত শোনা গেল। পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে আসা হলো কাউন্টকে, নির্জন করিডর ধরে উল্টো দিকে ছুটবার একটা প্রবণতাকে অতিকষ্টে দমন করল সে। অনুভব করল, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পেটের ভিতর ভূট-ভাট শব্দ হচ্ছে, নিজের ইচ্ছের

বিরুদ্ধে কাঁপছে চোখের পাতা। পথ-প্রদর্শক একজন সার্জেন্ট হলঘরের দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে।

ভিতরে ঢুকে কাউন্ট দেখল শিফটাদের অনেক অফিসার উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে ইটালিয়ান উপদেষ্টাদের সংখ্যাও কম নয়। নতুন ধরনের ইউনিফর্ম পরা কিছু লোক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তারা সবাই পাইলট। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাউন্ট-জেনারেল ফাদ একজন স্যাডিস্ট, লোকজনের সামনে তাকে অপদস্থ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত একটা শব্দের দ্বারা আক্রান্ত হলো কাউন্ট। কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল তার শরীর, মুখ লুকাল আঙ্গিনের আড়ালে। তারপর ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে আঙ্গিনের আড়াল থেকে উঁকি দিল সে। কামরা ভর্তি অফিসাররা উল্লাসে হাসছে, হাততালি দিচ্ছে, পরস্পরের কাঁধে আর হাতে চাপড় মারছে। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল কাউন্ট। ঝট করে পিছনে তাকাল সে, আরও অবাক হয়ে গেল সেদিকে কেউ দাঁড়িয়ে নেই দেখে। এতক্ষণে অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে উপলব্ধি করল সে, এত উত্তেজনা আর আনন্দ তাকে নিয়েই। অপ্রত্যাশিত হলেও, এই উষ্ণ সম্বর্ধনা তার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

আবার যখন সামনে তাকাল কাউন্ট, দেখতে পেল অফিসারদের ভিড় ঠেলে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ডদেহী আজরাইলের মত খোদ জেনারেল আবদেল কাদের ফাদ। পিছন দিকে আরেকবার তাকাল কাউন্ট, কিন্তু সবগুলো বন্ধ দরজার সামনে একজন করে সশস্ত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে দেখে পালানোর চিন্তা বাদ দিতে হলো তাকে। তবে নিজের অজান্তে পিছু হটতে শুরু করল সে।

মি. এক্সের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল জেনারেল ফাদ।
'দেখুন, দেখুন- কাউন্ট কেমন লজ্জা পাচ্ছেন!' চুল-দাড়িতে ঢাকা
প্রকাণ্ড মুখ নিয়ে ছুটে এল সে।

ছুটে এসে বুক জড়িয়ে ধরল জেনারেল ফাদ, তার বিশাল
বপুর চাপে কাউন্টের সমস্ত দম বেরিয়ে গেল। ফাদের বুক মুখ
ঠেকিয়ে হাঁপাতে লাগল সে।

'একজন বীরকে আলিঙ্গন করার সৌভাগ্য হলো আমার!'
হেঁড়ে গলায় ঘোষণা করল ফাদ, 'কাউন্ট ডিকানডিয়া আমার
মায়ের পেটের ভাই!'

ছাড়া পাবার আগেই রাগে দাঁত চাপল কাউন্ট ডিকানডিয়া,
সাতা ব্যাটা করছেটা কী!

'সম্ভাব্য সব রকম সাপোর্ট এখন পাওনা হয়েছে আপনার,'
জেনারেল তাকে আশ্বস্ত করল। 'সত্যি কথা বলতে কি, ওগুলো
আপনাকে দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমরা।' হেডকোয়ার্টারের
প্রাইভেট স্টাডিয়ামে এই মুহূর্তে ওরা শুধু তিনজন
উপস্থিত-কাউন্ট, জেনারেল ফাদ আর মি. এক্স। গোল টেবিলে
ভাঁজ খোলা একটা ম্যাপ আর মদ্যপানের সরঞ্জাম রয়েছে।

'আমার আর্মার দরকার,' ইতস্তত না করে বলল কাউন্ট, 'মোট
ইস্পাতের প্লেট চিরকালই তাকে আকৃষ্ট করে, নিরাপত্তার একটা
নিশ্চয়তা এনে দেয়।

'আমরা আপনাকে এক স্কোয়াড্রন হালকা সিভি থ্রি দেব,'
বলল ফাদ, 'অর্ডারটা টুকল প্যাডে। সিভি থ্রি মাস্কাতা আমলের
বাতিল ট্যাংক, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওগুলোর প্রচলন উঠে গেছে।
ইথিওপিয়ার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যারা গোপন ষড়যন্ত্রে
মেতেছে, নিজেদের পরিচয় আড়াল করবার জন্য টাকা-পয়সা

ইত্যাদি সবই জেনারেল ফাদ আর মি. এক্সের মাধ্যমে খরচ করতে
হয় তাদেরকে, তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ ভালভাবেই নিচ্ছে
ওরা দু'জন। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র কিনবার মত যথেষ্ট টাকা পেলেও,
খুঁজে খুঁজে পরিত্যক্ত অস্ত্র আর আর্মার কিনছে ওরা, বাকি টাকা
নিজেদের অ্যাকাউন্টে জমা করছে।

'আর এয়ার সাপোর্ট দরকার আমার।'

'ওয়েলস অভ চান্ডিতে আপনার এঞ্জিনিয়াররা কি একটা
ল্যান্ডিং স্ট্রিপ তৈরি করতে পারবে?' ম্যাপে আঙুল রেখে প্রশ্নটা
আরও স্পষ্ট করল ফাদ।

'এলাকাটা খোলা আর সমতল। তেমন কোন সমস্যা হবে বলে
মনে করি না,' আত্মহের সঙ্গে বলল কাউন্ট। 'মাই গড!-ভাবল
সে।-ট্যাংক, প্লেন, মেশিনগান! এসব পেলে ইতিহাসের পাতা
থেকে নেপোলিয়নের নাম পর্যন্ত মুছে দেবে সে।

'এয়ার স্ট্রিপ তৈরি হওয়া মাত্র রেডিও মেসেজ পাঠাবেন
আমার কাছে, ক্যাপরোনিস-এর একটা ফ্লাইট পাঠিয়ে দেব। তার
আগে ফুয়েল আর আর্মামেন্ট যা লাগে সব পাঠিয়ে দেয়া যেতে
পারে, অবশ্য আমার এয়ারফোর্স উপদেষ্টার সাথে কয়েকটা বিষয়ে
আলাপ করে নিতে হবে। তবে আমার মনে হয়, একশো কিলো
বোমা খুব কাজ দেবে ওখানে। হাই এক্সপ্লোসিভ, অ্যান্ড
ফ্র্যাগমেন্টেশন।'

'ইয়েস, ইয়েস,' ব্যাকুলকণ্ঠে সায় দিল কাউন্ট।

'আর নাইট্রোজেন মাসটারড-গ্যাস ব্যবহার করতে কোন
অসুবিধে নেই তো?'

'না! না! কোন অসুবিধে নেই!' প্রায় চিৎকার করে উঠল
কাউন্ট। কিছু পাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা তার স্বভাব নয়। যা

দেওয়া হবে সবই সে গিলবে।

‘গুড।’ বলল ফাদ, প্যাড আর পেন্সিল রেখে দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। ‘পেটে পা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে ফেলা উচিত!’

ভয়ানক চমকে উঠল কাউন্ট, বুঝতে পারল না তাকেই উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হলো কিনা। বিড়বিড় করে সে বলল, ‘পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।’

‘আমরা ইথিওপিয়ায় কমিউনিস্টদের শেষ দেখতে চাই।’

‘কোন রকম দয়া দেখানো চলবে না,’ গর্জে উঠল কাউন্ট।

‘এবার আরেকটা বিষয়।’ নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল মি. এক্স। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জেনারেল ফাদের দিকে তাকাল সে।

ফাদ হাততালি দিল। স্টাডির দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল একজন দীর্ঘদেহী ইটালিয়ান যুবক।

‘সিনর মাস্ত্রোনি-আমার এবং মি. এক্সের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন,’ বলল ফাদ। ‘পলিটিক্যাল ব্যাপারটা উনি খুব ভাল বোঝেন। সিনর মাস্ত্রোনি, আপনি শুরু করতে পারেন।’ কাউন্টের দিকে ফিরল সে। ‘সিনর মাস্ত্রোনি আপনাকে ক্ষেত্র-বিশেষে গাইড করবেন।’

সাদা গ্যাবার্ডিনের সুট পরে আছে মাস্ত্রোনি, চেহারায় আভিজাত্য। খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করল সে, তারপর শুরু করল, ‘এ সিদ্ধান্ত আমাদের যাঁরা মুরব্বি, তাঁদের। পরিচয় প্রসঙ্গে বৃহৎ শক্তি বলাই যথেষ্ট, আশা করি। তাঁরা চাইছেন, রাসটোফারিয়ান, গালা আর হারারি গোত্রগুলো যে বিশাল এলাকা জুড়ে বসবাস করছে সেখানে নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠুক। এই মুহূর্তে এলাকাগুলো কমিউনিস্ট সমর্থক কামাল হাসান আর তার ছেলে হাসান সালের দখলে রয়েছে। যুদ্ধে ওরা হেরে যাবার পর নতুন একজনকে শাসনকর্তা বা গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করার

সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

কাউন্ট ঠিক বুঝতে পারল না। আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য স্টাডিরূমে নেচে ওঠা উচিত হবে কিনা। জেনারেল ফাদকে সে তেমন ভয় পায় না, ভয় পায় তার হিংস্র চেহারাটাকে।

‘দীর্ঘ আলোচনার পর সমস্ত আয়োজন শেষ করে আনা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এ-ধরনের চুক্তিতে কোটি কোটি ডলার খরচ অর্থাৎ হাতবদল করার দরকার পড়ে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উপযুক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষ তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করবেন, তাঁর বিশাল যোদ্ধা বাহিনী নিয়ে যোগ দেবেন কাউন্ট ডিকানডিয়া বাহিনীর সাথে।’

হতাশায় চুপসে গেল কাউন্ট। ‘কে সে? কাকে নতুন গভর্নর নিয়োগ করা হচ্ছে?’

‘অদ্রলোক যে এলাকাটা আংশিক নিয়ন্ত্রণ করেন সেই এলাকাই দখল করার জন্যে লড়ছেন আপনি, কাউন্ট ডিকানডিয়া। আপনি সারডি গিরিসংকট দখল করে সারডি শহরে পৌঁছানোর পরপরই আমাদের এই গোত্রপ্রধান তাঁর দলবল নিয়ে আপনার সাথে যোগদান করবেন।’

‘তার নাম?’ আবার জিজ্ঞেস করল কাউন্ট। ‘কে সে?’

কিন্তু কথা বলবার নিজস্ব একটা ঢং রয়েছে রাজনৈতিক এজেন্ট মাস্ত্রোনির। ‘আপনার দায়িত্ব হবে এই গোত্রপ্রধানের সাথে মিলিত হওয়া, তারপর তাঁর শক্তির সাথে নিজের শক্তি এক করে সেলাসী বাহিনীর সাথে যোগ দেয়া। ভাল কথা, তাঁকে কিছু সোনা দিতে হবে-সে ব্যবস্থাও আপনি করবেন।’

‘সোনা? আমি সোনা পাব কোথায়?’ আকাশ থেকে পড়ল কাউন্ট।

‘রাসটা আর হারারি গোত্রগুলোর কাছে টন টন না হলেও মনকে মন সোনা রয়েছে,’ মাস্ত্রোনি বলল। ‘ওদেরকে পরাজিত করার পর সেই সোনা এক জায়গায় জড়ো করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। বেশি না, ভদ্রলোককে মাত্র দশ মন দিতে হবে।’

একটা ঢোক গিলল কাউন্ট। ‘আর আমি? আমার কী হবে? আমি কী পাব?’

‘আপনিই তো পাবেন হীরের টুকরোটা,’ বলল জেনারেল ফাদ, কিন্তু ব্যাখ্যা না করে মাস্ত্রোনির দিকে তাকাল সে।

‘সম্রাট হাইলে সেলাসীর বর্তমান বিপদ কেটে গেলে আপনাকে নিযুক্ত করা হবে গোটা ইরিত্রিয়ার গভর্নর,’ ঘোষণা করল মাস্ত্রোনি।

কাউন্ট অনুভব করল, একসঙ্গে এত আনন্দ ধারণ করবার শক্তি প্রকৃতি তাকে দেয়নি, অনুভব করল তার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণগুলো শিথিল হয়ে পড়ছে, এখুনি একবার বাথরুমে যেতে পারলে খুব ভাল হয়। ‘আমি তৃপ্ত, আমি আনন্দিত...,’ বলতে বলতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ‘আমার আর কিছু জানার নেই...।’ ইরিত্রিয়ার গভর্নর, তারমানে রাজা বনে যাবে সে।

কিন্তু মি. এক্স তার হাত ধরে মৃদু টান দিল, বৈঠক এখনও শেষ হয়নি।

‘ভদ্রলোক গালা গোত্রের একজন বীর,’ বলে চলেছে মাস্ত্রোনি। ‘এই মুহূর্তে সারডিতে আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি, তবে পরিস্থিতি বদলে যাবে...’ থামল সে, পকেট থেকে একটা এনভেলোপ বের করে বাড়িয়ে দিল কাউন্টের দিকে। ‘চুক্তিপত্রটা পড়ে দেখতে পারেন, তারপর সই করুন, প্লিজ।’

পড়ে দেখবার সময় কোথায় কাউন্টের, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে না পারায় ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে। এনভেলোপ থেকে কাগজটা কাঁপা হাতে বের করে ততখিক কাঁপা হাতে সই করল

সে, তার হাত আর স্বাক্ষরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল মাস্ত্রোনি।

তারপর সে অন্য আরেক প্রসঙ্গ তুলল। ‘আপনার রিপোর্টে আপনি তিনজন বিদেশীর কথা বলেছেন, কাউন্ট ডিকানডিয়া। যাদেরকে আপনি বুদ্ধিমত্তা চাতুর্য আর অসমসাহসের সাহায্যে বন্দী করেছিলেন, এবং যাদেরকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে আপনি দুশো শিফটাকে মুক্ত করে আনেন।’ বলাই বাহুল্য, বন্দী তিনজন ইটালিয়ান সম্পর্কে কাউন্ট তার রিপোর্টে কিছুই লেখেনি। ‘তিনজনের মধ্যে একজনের পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এই মেয়েটি আসলে কমিউনিস্টদের দালাল। জার্নালিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করেছে সে, কাজ করে একটা মার্কিন পত্রিকায়। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ইউরোপ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের অভিযোগ আগে থেকেই ছিল এখন নতুন করে যোগ হলো কমিউনিস্টদের সমর্থক। এই মেয়েটার পাঠানো রিপোর্ট এরইমধ্যে প্রচার করা হয়েছে সারা দুনিয়ায়, ফলে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো কিছু বাস্তব অসুবিধের মধ্যে পড়তে হতে পারে, তবে এখনই উদ্ভিগ্ন হবার মত কোন কারণ আমি দেখছি না...।’

‘সংক্ষেপ করুন, প্লিজ!’ ব্যাকুলকণ্ঠে আবেদন জানাল কাউন্ট। তার চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস ফেলছে ভয়ে ভয়ে, পেটের উপর কোনরকম চাপ যাতে না পড়ে।

‘আপনার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকল, কমিউনিস্টদের এই মেয়ে স্পাইটিকে যে-কোন মূল্যে ধরতে হবে। এবং ধরা পড়ামাত্র, ওই এলাকার নতুন গভর্নরের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে। এরপর আপনি আর মেয়েটার ব্যাপারে মাথা

ঘামাবেন না, বুঝতে পারছেন তো? নূর আয়াঙ গালা তাকে নিয়ে যাই করুন না কেন, আপনার সেটা দেখার বিষয় নয়, পরিষ্কার?’

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট, সবাই ধরে নিল এটা তার সম্মতি প্রকাশের ভঙ্গি, আসলে তা নয়—শারীরিক অস্বস্তিবোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় উন্মাদসুলভ আচরণ করছে সে।

‘বাকি দু’জন বিদেশী সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—ওরা সম্ভ্রাসবাদী। ওরা যদি বন্দী হয়, গুলি করে মেরে ফেলতে হবে, গায়েব করে দিতে হবে লাশ।’

‘আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন,’ বলল কাউন্ট, চেয়ার ছাড়বার চমৎকার একটা কৌশল পেয়ে সামান্য স্বস্তি বোধ করছে। কনিয়াক ভরা গ্লাসটা ধরল সে, মুখের কাছে তুলে ছেড়ে দিল। ভিজ়ে ইউনিফর্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ‘এক্সকিউজ মি, জেন্টলমেন,’ বলে বাথরুমের দিকে ছুটল।

ওয়েলস অভ চান্ডিতে ফিরে আসবার পর দিনকয়েক একটা ঘোরের মধ্যে কাটল কাউন্টের। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় না থেকে, যুদ্ধজয়ের শর্ত পালন না করে, নিজেকে সে ইরিত্রিয়ার গভর্নর হিসাবে প্রচার করে দিল। বিশাল একটা প্রদেশের গভর্নর মানে রাজা, কাজেই তার আচরণে রাজাসুলভ বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠল। কোন কাজ করে না, কেউ কোন অপরাধ করুক বা না করুক আশপাশে যাকে পায় তাকেই শুধু দণ্ড দেয়, সময় কাটায় যুবতী মেয়েদের কোলে মাথা রেখে। হুগা ছাড়িয়ে যেতে চলেছে নতুন ট্যাংক বহর পৌঁচেছে ক্যাম্পে, সেগুলো সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ দেখাল না। তারপর হঠাৎ একদিন হুঁটা ট্যাংকের সামনে হাজির হলো সে। ট্যাংক বহরের কমান্ডারকে নির্দেশ দিল, ‘চালাও, চালিয়ে দেখাও!’

ট্যাংকগুলো দ্রুতগতি, কুঁজবিশিষ্ট টারিট, ভোঁতা চেহারা ইত্যাদি দেখে তার মাথায় নতুন এক বুদ্ধি গজাল। কাউন্ট দেখল, ট্যাংকগুলো কোন বাধাই মানে না, আপনগতিতে নিজের পথে যেতে থাকে। একটা ট্যাংকের ভিতর ঢুকবার পর তার মনে হলো, দুনিয়ায় এরচেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হতে পারে না। বাহ, শিকারে যাবার জন্য এমন চমৎকার বাহন থাকা সত্ত্বেও বসে আছে সে!

কাউন্ট নির্দেশ দিল, ‘আয়োজন করো। ইরিত্রিয়ার গভর্নর শিকারে বেরাবেন!’

রাসটা আর হারারিরা ছটফটে, তাদের ধৈর্য নেই বললেই চলে। অল্প ক’দিনের যুদ্ধবিরতিতে একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়ল তারা, রোজই কিছু লোক তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আর গবাদি পশু নিয়ে ক্যাম্প ছাড়ল। ছোট ছোট দলগুলো ধীরগতিতে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল নিজেদের পাথুরে গ্রামগুলোর দিকে, ঠাণ্ডা আর প্রিয় আবহাওয়ার আশ্রয়ে। বাড়ি মানেই মিষ্টি একটা পরিবেশ, আরাম আর আনন্দ। যাবার সময় সবাই গোত্রপ্রধান কামাল হাসানের কাছ থেকে বিদায় নিল, তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলল, ডাকলেই আবার তারা যুদ্ধ করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে। তবু নিজের সেনাবাহিনী এভাবে আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর, একদণ্ডের জন্যও ভুলতে পারলেন না যে তাঁদের পবিত্র জন্মভূমির এক প্রান্তে সদলবলে ওত পেতে বসে রয়েছে শিফটা বাহিনী।

বেশিরভাগই অবশ্য রয়ে গেল, তবে আকারে ছোট হয়ে যাওয়ায় আদিবাসী বাহিনীর ভিতর উত্তেজনা আর উদ্বেগ বেড়ে

গেল কয়েক গুণ। প্রতি দিনই নতুন নতুন গুজব ছড়াল, কারও সাধ্য নেই সত্যি মিথ্যে যাচাই করে দেখে। রানা আর মাইকেলও কম উদ্বিগ্ন নয়, যার যার ডিপার্টমেন্টে শৃংখলা বজায় রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল ওরা।

রাতের অন্ধকারে পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র পেরিয়ে শিফটা ক্যাম্পের কাছাকাছি আরেকবার যেতে হলো রানাকে। গরবিনীকে শিফটার ক্যাম্পের দিকে কেন টেনে নিয়ে গেছে বোধগম্য হলো না ওর। হুড পরানো বুল'স আই লণ্ডনের আলোয় আর্মারড কারের পার্টসগুলো এক এক করে খুলল ও, ওকে সাহায্য করল আব্বাস। বেন্টলি এঞ্জিনটা ভাগ ভাগ করে চটের বস্তায় ভরা হলো, গাধাগুলো যাতে বইতে পারে। ভোরের দিকে গিরিসংকটের নীচে ক্যাম্পে ফিরে এসেও থামল না রানা, ভাগ্যদেবীর অচল পার্টস ফেলে দিয়ে নতুন পার্টস ফিট করল। ছোটখাট মেরামত দরকার হলো বাকি দুটো গাড়িরও। কাজ শেষ করবার পর তৃপ্তিবোধ করল রানা, আদিবাসীদের আর্মার শক্তি প্রায় আগের পর্যায়ে ফিরে এসেছে, তিনটে কার নিয়ে একটা স্কোয়াড্রন, প্রতিটি গাড়ি বহু বছর আগে কারখানা থেকে বেরবার সময় যেমন নিখুঁত ছিল আজও প্রায় তেমনি নিখুঁত।

মাইকেলও ইতিমধ্যে আদিবাসীদের কয়েকজনকে ট্রেনিং দিয়ে ভিকার্স মেশিনগান চালানো শিখিয়ে ফেলেছে। অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনীর লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করে সংক্ষিপ্ত একটা কোর্স শেষ করাল সে, ট্রেনারের ভূমিকায় তার সঙ্গে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গানাররাও থাকল। ভিকার্স মেশিনগানের ছত্রছায়া কীভাবে ব্যবহার করতে হবে শেখানো হলো অশ্বারোহী বাহিনীকে, পদাতিক বাহিনীকে শেখানো হলো পিছু হটবার সময়ও কীভাবে শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষতিসাধন সম্ভব।

www.BanglaBook.org

গিরিসংকট ধরে পিছু হটবার পথটা সার্ভে করবার সময় বের করে নিল মাইকেল। প্রতিটি ডিফেন্সিভ পজিশন চিহ্নিত করল সে, গিরিসংকটের খাড়া গায়ে প্রতিটি মেশিনগান নেট আর সাপোর্ট ট্রেন্ড তৈরি হওয়ার সময় সশরীরে উপস্থিত থেকে সুপারভাইজ করল। চুলের কাঁটার মত বাঁকা ট্র্যাক ধরে এগোবার সময় প্রতিটি বাঁকে ওদের মুশলধারা গুলিবর্ষণের সামনে পড়তে হবে শিফটাদের, একই সঙ্গে পিছনের ট্রেন্ডে লুকিয়ে থাকা পদাতিক সৈন্যরা বেরিয়ে এসে শত্রুপক্ষের পিছু হটবার পথও বন্ধ করে দেবে।

গিরিসংকট বেয়ে উঠবার পুরোটা ট্র্যাক সমান করা হয়েছে, প্রয়োজনের সময় যাতে আর্মারড কারগুলো পিছু হটে পারে। সব কাজ শেষ, সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা, কিন্তু প্রত্যাশিত হামলা হচ্ছে না বলে সবাই ভারি অস্থির।

এমন সময় হঠাৎ একদিন নতুন ধরনের একটা গুজব শোনা গেল। গুজবের কোন কমতি নেই, কাজেই কোনটাই তেমন গুরুত্ব পায় না, কিন্তু এটার উৎস ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। শিফটা ঘাঁটির উপর রাতদিন নজর রাখছে একদল স্কাউট, তারাই নিজেদের চোখে দেখে এসে রিপোর্ট করল কামাল হাসানের কাছে।

অদ্ভুতদর্শন কয়েকটা বাহন, ঝড়ের বেগে ছোট্টে, চাকা বা পা কিছুই নেই। বাহনগুলো প্রায় রোজই গোটা মরু চষে বেড়াচ্ছে, খোলা প্রান্তরেও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে।

রিপোর্ট শুনে রানা আর মাইকেলের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকালেন কামাল হাসান, জিজ্ঞেস করলেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

'চাকা নেই,' চিন্তিত দেখাল মাইকেলকে, রানার দিকে ফিরল, উঁচু করল একটা ভুরু। 'কী হতে পারে বুঝতেই পারছ, কী?'

‘পারছি,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘তবে নিজেদের গিয়ে একবার দেখে আসা দরকার।’

আকাশে চাঁদ আধখানা হলেও, তার আলোয় ইস্পাতের তৈরি ট্রাকের গভীর দাগ পরিষ্কার চেনা গেল মাটিতে। হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল রানা, খুঁটিয়ে দেখল দাগগুলো, উপলব্ধি করল ওর সবচেয়ে ভীতিকর আশংকাটাই সত্যি হতে চলেছে। ওর প্রিয় লৌহমানবীগুলোকে এবার লড়তে হবে ট্রাক লাগানো আরও অনেক ভারি বাহনের সঙ্গে। ওগুলোয় কী আছে কল্পনা করে নিল রানা—রিভলভিং টারিট, বড় বোর-এর দ্রুতবর্ষণক্ষম ভারী আগ্নেয়াস্ত্র।

কী ঘটতে পারে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল ও। ভারি আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছুটে এল একটা মিসাইল, নিতম্বিনীর সামনের আর্মার ভেদ করে এঞ্জিন কমপার্টমেন্টে ঢুকল, সব চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে গেল খোল ভেঙে নিয়ে, যাবার সময় ছাতু করে দিয়ে গেল পথে ক্রুদের যে-ক’জনকে পেল। ‘ট্যাংক,’ বিড়বিড় করে বলল ও। ‘ব্লাডি ট্যাংক!’

‘আমি বলব, আমাদের মধ্যে একজন শ্যেন স্কাউট রয়েছে,’ বলল মাইকেল, চঞ্চলার টারিটে আয়েশ করে বসে রয়েছে সে। ‘নবিস কেউ হলে ধরে নিত দাগগুলোর জন্যে নিশ্চয়ই কোন ডাইনোসর দায়ী—কিন্তু শ্যেনদৃষ্টি মাসুদ রানাকে ফাঁকি দেয়া অত সহজ নয়।’ কথা শেষ করে চুরটের শেষ মাথাটা টারিটের পাশে ঘষে নেভানোর জন্য হাত লম্বা করল সে, জানে কাজটা খেপিয়ে তুলবে রানাকে।

গম্ভীর চেহারা নিয়ে সিধে হলো রানা। ‘তোমার আগামী জন্মদিনে উপহারটা পাবে—একটা ছাইদানি।’ রাইফেল, মেশিনগান

বা কামানের গোলাগুলি খেয়ে ওর আর্মারড কার ঝাঁঝরা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ওটার গায়ে জ্বলন্ত তামাক ঘষে নোংরা করলে ওর পিণ্ডি জ্বলে যায়, জানে সেই উদ্দেশ্যেই কাজটা করা হলো।

‘দুঃখিত, ওল্ড চ্যাপ,’ অবাধ নিঃশব্দ হাসি ফুটল মাইকেলের ঠোঁটে। একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আর কখনও হবে না। ছোট্ট একটা পরীক্ষা করার লোভ সামলাতে পারিনি। ট্রেনিং পাওয়া আর্টিলারির লোক যদি না হও, তোমার এত লাগে কেন? মেজর বা কর্নেল, কী?’

জবাব না দিয়ে আঙটা ধরে গাড়ির মাথায় চড়ল রানা, হ্যাচ গলে নেমে পড়ল ড্রাইভিং সিটে, এঞ্জিনের আওয়াজ যতটা সম্ভব কম রেখে ছেড়ে দিল চঞ্চলাকে, খোলা প্রান্তর ধরে ধীরগতিতে এগোল ওরা।

সেই পুরনো চিন্তাটা ফিরে এল রানার মাথায়, ওদের তিনজনের কথা ভাবছে, যেমন রোজই ভাবে। অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, মাইকেল যেখানে শুদ্ধ মানুষ হয়ে উঠবার সুযোগ খুঁজছে সেখানে তার কাছ থেকে অ্যানিকে কেড়ে নেওয়ার মত নির্মম আচরণ ওর দ্বারা সম্ভব নয়। অ্যানিকে সত্যি পছন্দ করে ও, জানে মাইকেল না রানা এই উভয়সংকটসূচক প্রশ্ন নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার দ্বিধায় ভোগাটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। মাইকেলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবার পর অ্যানি একটা পবিত্রতা অর্জন করেছে, তারপর নৈতিক কারণেই রানা আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ওদের মিলন আর প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে রানার মনে। ভাল হত যদি এখানেই শেষ হত সমস্যাটা।

রানা সতর্ক হবার পর কয়েক হণ্টা কেটে গেছে। ইতিমধ্যে

বেশ কয়েকবার মাইকেলের অনুপস্থিতিতে রানার তাঁবুতে এসেছে অ্যানি। খোলা প্রান্তরে বা গিরিখাদে কাজ করবার সময়ও রানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে মেয়েটা। রানা চেষ্টা করেছে সে যেন মনে কোন আঘাত না পায়। ইঙ্গিতে মাইকেলের প্রশংসা করেছে ও, নিজের বাউণ্ডুলে জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, ওকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলে ঠকতে হতে পারে। আভাসে প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছে অ্যানি, সাড়া না পেয়ে রেগে গেছে সে, এমনকি রানাকে এ প্রশ্ন শুনতে হয়েছে—তুমি কি কাপুরুষ? নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টা করেছে রানা, হাসি মুখে অনাগ্রহ দেখিয়েছে। সৎ পরামর্শ দিয়ে বলেছে, যে তোমাকে পেলে উপকৃত হবে, সমস্ত দ্বিধা আর ভাবাবেগ ঝেড়ে ফেলে তার কাছেই যাওয়া দরকার তোমার। কিন্তু অ্যানি বোঝেনি, বা বুঝতে চায়নি। যতই দিন যাচ্ছে, রানার প্রতি ততই ঝুঁকে পড়ছে সে। তবে মাইকেলের প্রতি যে তার টান নেই তা নয়। অ্যানি আর মাইকেলের মধ্যে এখনও কৌতুক আদান-প্রদান হয়। মাঝে মাঝে ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছে রানা—ক্যাম্পের উপর খাড়া কোন পাথরের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে হাঁটছে, কথা বলার সময় ঝুঁকে আছে পরস্পরের দিকে। দু'দিন একই সময়ে দু'জনেই ওরা ক্যাম্পে অনুপস্থিত ছিল—পুরোটা সকাল। অকস্মাৎ খিলখিল শব্দে অ্যানির হেসে ওঠা, কিংবা অস্ফুট কোন মন্তব্য শুনবার জন্য ঝুঁকে মাইকেলের ঘনিষ্ঠ হওয়া, মাইকেলের শ্রুতিমধুর কৌতুক বা লক্ষ্যহীন বহুল অঙ্গভঙ্গি দেখে কৃত্রিম রাগ বা বিস্ময় প্রকাশ করা ইত্যাদি আগের মত নির্ভেজাল আছে, কিন্তু তারপরও অ্যানি মাইকেলকে ডিঙিয়ে রানাকেই যেন পেতে চায়।

অ্যানিকে পরিষ্কার করে কিছু বলা রানার জন্য অত্যন্ত কঠিন।

আমি তোমাকে পছন্দ করি, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি না বা তোমার প্রেমিক হতে চাই না, এ-ধরনের কথা মুখ ফুটে কেউ বলে না, বলা উচিত নয়।

আর মাইকেলকে সত্যি পছন্দ করে রানা—শুধু পছন্দ নয়, তারচেয়েও বেশি, উপলব্ধি করে ও। দু'জন পুরুষমানুষের গভীর বন্ধুত্ব কখনও ব্যাখ্যা করা যায় না। মাইকেলের সুদর্শন চেহারার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা রানার পক্ষে সম্ভব নয়। তার বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দারুণ উপভোগ করে ও। তার স্মার্ট, পালিশ করা চকচকে বহিরাবরণ, অতি-অভিনয় দোষে দুষ্ট ভূমিকা, বেরোয়া জীবনদর্শন, কৃত্রিম স্বার্থপরতার নীচে অন্য এক জাতের পুরুষ লুকিয়ে আছে, যাকে সত্যিকার একজন মানুষ হিসাবে চিনতে ভুল হয়নি রানার। তাকে কতটুকু ভালবাসে ও, নিজেও কী জানে?

‘সে আমার বন্ধু,’ ঠোঁটে ক্ষীণ, বাঁকা হাসি নিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল রানা, চঞ্চলাকে নিয়ে এগোচ্ছে দক্ষিণ আর পূব দিকে, জানে আকাশের গায়ে লালচে হয়ে থাকা অংশটার নীচেই শিফটাদের ক্যাম্প। ‘তাকে আমি ভালবাসি।’

কিন্তু মাইকেল অত্যন্ত চালাক, এরইমধ্যে রানার আচরণে নিরন্তর একটা ভাব লক্ষ্য করেছে সে। আভাসে ইঙ্গিতে জানতেও চেয়েছে, খেলা ভাল জমছে না কেন? এখন যদি সে ঘুণাঙ্করেও টের পায়, রানা প্রতিযোগিতায় কোন দিন ছিল না বা নেই—বলা যায় না, স্রেফ অ্যানির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে। তার পক্ষে এ-ধরনের আচরণ যে সম্ভব, বেশ বুঝতে পারে রানা। নিলে জিতে নেব, এটা তার শুধু মুখের কথা ছিল না।

কাজেই, সেই পুরনো সিদ্ধান্তটাই বহাল থাকল—আরও কিছু

দিন অভিনয় করে যেতে হবে রানাকে।

এক সময় টারিট থেকে হ্যাচ গলে নীচের দিকে ঝুঁকল মাইকেল, রানার কাঁধে টোকা দিল। ‘সামনে, বাঁ দিকে একটা নালা। ওটাতেই বোধহয় কাজ হবে।’

চঞ্চলাকে সেদিকে ঘুরিয়ে নিল রানা, কয়েক সেকেন্ড পর থামল। ‘কিন্তু বেশি গভীর,’ মন্তব্য করল ও।

‘সূর্য ওঠার পর তাতে বরং সুবিধেই হবে, রিজ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাব, আর পুব দিকে গোটা প্রান্তরে চোখ রাখা যাবে।’ হাত তুলে শিফটা সার্চলাইটের আভা আর তার সামনের খোলা মরুভূমিটা দেখাল মাইকেল। ‘সম্ভবত ওদিকেই রোজ ওরা খেলাধুলো করে। এখান থেকে দেখতে কোন অসুবিধে নেই। এখনই আমাদের আড়াল নিতে হয়, ওল্ড চ্যাপ।’

ওদের প্ল্যান হলো শিফটা স্কোয়াড্রনের গতিবিধি দেখবার জন্য সারাটা দিন ব্যয় করবে, রাতের অন্ধকারে আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে ফিরে যাবে ক্যাম্পে। মাইকেলের যুক্তি মেনে নিল রানা, চঞ্চলাকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নালার ভিতর নামল। এক সময় থামল ও, আর্মারড কারের শুধু টারিটের খানিকটা অংশ পাড় ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে থাকল, দূর থেকে দেখে চেনা যাবে না। পশ্চিম দিকে মুখ করে থাকল চঞ্চলা, ওটার সামনে মসৃণ একটা ঢাল, প্রয়োজনের সময় ঢালটা বেয়ে দ্রুত উঠতে পারবে ওরা, হঠাৎ করে পালানোর দরকার হতে পারে।

এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, হাতে কুড়াল নিয়ে খোলা মরুতে হাঁটল দু’জন পাশাপাশি, কাঁটাঝোপ কেটে এনে ঢেকে দিল টারিটের বেরিয়ে থাকা অংশটুকু।

বালি ভর্তি একটা বালতিতে স্পেয়ার ক্যান থেকে গ্যাসোলিন ঢালল রানা, নালার তলায় এনে আগুন ধরাল তাতে। গায়ে

আগুনের আঁচ থাকায় মরুর হিম বাতাস কাঁপ ধরাতে পারল না, ওদিকে কফির জন্য পানিও গরম হচ্ছে। দু’জনেই ওরা চুপচাপ, যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন। ‘আমার মনে হয়, আমাদের একটা সমস্যা আছে,’ অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের দিকে।

‘যত পিছনেই তাকাই, সমস্যাবহুল পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাচ্ছি, এই দৃশ্য ছাড়া আর তো কিছু আমি দেখতে পাই না, ওল্ড চ্যাপ,’ মৃদুকণ্ঠে বলল মাইকেল। ‘তবে কয়েকটা ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করলে—যেমন, অভিশপ্ত একটা মরুভূমিতে আটকা পড়েছি, আশপাশের সঙ্গী-সাথীরা সবাই অসভ্য আর রক্তখেকো খুনী, শিফটা বাহিনীর সাথে শিক্ষিত, সভ্য ইটালিয়ানরাও আমাদের খুন করার চেষ্টা করছে, ক্যাশ হয় কিনা সন্দেহ আছে এমন একটা চেক ছাড়া পকেট খালি, শত মাইলের মধ্যে ভাল কোন মদের বোতল দেখতে পাচ্ছি না, আর শিগ্গিরি পালাবার কোন সম্ভাবনাও নেই ইত্যাদি দেখেও যদি না দেখার ভান করি, তা হলে বলব, ওল্ড চ্যাপ, আমার আকার-আকৃতি এখন পর্যন্ত অবিকৃতই আছে, কাজেই আমিও বেশ সুখে আছি, কী?’

‘আমি অ্যানির কথা ভাবছিলাম।’

‘আহ! অ্যানি!’

‘তুমি জানো আমি ওর প্রেমে পড়েছি।’

‘আমাকে তুমি অবাক করলে,’ আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় নিঃশব্দে শয়তানী হাসি হাসল মাইকেল। ‘সে জনোই কি ভাবাবেগে ভেজা মুখ হাঁ করে হাবার মত ঘুর-ঘুর করছ ক’দিন ধরে, হান্সা হান্সা করছ মিলনের মরুশুমে ষাঁড় যেমন করে? ওড লর্ড, তুমি না বললে আমার কল্পনাতেও আসত না!’

‘আমি সিরিয়াস, মাইকেল।’

‘ওটাই তো তোমার এক নম্বর সমস্যা, ওল্ড চ্যাপ। সব কিছুই তুমি অতিরিক্ত সিরিয়াসলি নাও। তিন ভাগের দু’ভাগ সম্ভাবনা, বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার মনে এরইমধ্যে আইভি লতায় ঢাকা কটেজের স্বপ্ন মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে, কটেজের সামনে সুন্দর বাগান, বাড়ির পিছনে ছোট সুইমিং পুল, অদূরে বিশাল গম খেত, একধারে বনভূমি, খোঁয়াড়ে হাজার দেড়েক গরু-মেষ, পুকুরে বড় বড় মাছ-মিলছে তো, কী?’

‘ছবিটা অনেকটা ওরকমই-প্রায়,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল রানা। ‘ইঁয়া ব্যাপারটা সিরিয়াস।’

‘এ-ব্যাপারে আর কার কী ভূমিকা? তুমি আর আমি, কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?’

বুক পকেট থেকে দুটো চুরট বের করল মাইকেল, একটা রানার দুই ঠোঁটের মাঝখানে গুঁজে দিল, শুকনো একটা গাছের ডালে আঙুন ধরিয়ে রানার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিল সেটা। বিদ্রূপাত্মক হাসি খসে পড়েছে তার ঠোঁট থেকে, চিন্তিত গলা, কিন্তু তার মুখের ভাব আঙুনের অনিশ্চিত আলোয় বুঝতে পারা কঠিন। ‘কর্নওয়ালের কাছাকাছি, জায়গাটা চিনি আমি। দেড়শো একর। ছবির মত সুন্দর পুরনো একটা ফার্মহাউস, অবশ্যই। ছোটখাট কিছু মেরামতের কাজ করতে হতে পারে, নিজের রুচি মত এক আধটু বদলে নেব, তবে শেডের তলায় গরু আর ঘোড়াগুলো ভারি স্বাস্থ্যবান। তুমি জানো, ওল্ড চ্যাপ, নিজের হাতে দুধ দোয়াতে ভালবাসি আমি? জীবনের মজাটা তো গাঁয়েই হে, শিকার করো, মাছ ধরো, গম ফলাও, এলাকার মাথা হয়ে থাকো, সাধারণ মানুষের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করো। চেক ভাঙিয়ে যা টাকা পাব, তার সাথে ব্যাংক লোন বিয়োগ করে যা দাঁড়াবে, বোধহয় হয়ে

যাবে, কী?’

এরপর দু’জনেই ওরা চুপ করে থাকল, কাপে কফি ঢেলে আঙুন নেভাল রানা, নড়েচড়ে মাইকেলের দিকে মুখ করে বসল আবার।

‘ব্যাপারটা অতটুকুই সিরিয়াস,’ অবশেষে নিস্তদ্ধতা ভাঙল মাইকেল।

‘তা হলে শান্তি বা সমঝোতায় আসার কোন উপায় নেই? ভদ্রলোকের চুক্তি সম্ভব নয়?’ ঠোঁটের কাছে মগ তুলে বিড়বিড় করল রানা।

‘প্রাণ থাকতে নয়,’ বলল মাইকেল। ‘সেরা লোকটিকে জিততে দাও, এবং কথা দিচ্ছি প্রিয় গাভীর প্রথম বাচ্চাটার নাম রাখব আমরা তোমার নামের সাথে মিলিয়ে, প্রতিজ্ঞা করলাম।’

আবার ওরা চুপ করে গেল, যে যার নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক, মগে চুমুক দিল, টান দিল চুরটে।

‘দু’জনের একজন ঘুমালে পারি,’ এক সময় বলল রানা।

‘টস করে দেখা যাক কে ঘুমাবে,’ পকেট থেকে সেই মুদ্রাটা বের করে আঙুলের টোকায় শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো মাইকেল।

‘হেডস,’ বলল রানা।

ছুঁড়ে দিয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে কজির উপর মুদ্রাটা থামল মাইকেল। ‘তোমার কপাল মন্দ, ওল্ড চ্যাপ।’ পয়সাটা পকেটে চালান করে দিয়ে মগের অবশিষ্ট কফি মাটিতে ফেলে দিল সে, নালার নরম বালির উপর একটা কমল বিছাল। খানিক পরই তার নাক ডাকবার আওয়াজ পেল রানা।

ভোরে আস্তে করে নাড়া দিয়ে তার ঘুম ভাঙাল রানা, ঠোঁটে আঙুল রেখে সাবধান করল। দ্রুত সজাগ হলো মাইকেল, চোখ পিট পিট করে ঘুম তাড়াল, দু'হাত দিয়ে সরিয়ে সমান করল মাথার চুল। কোন প্রশ্ন না করে একটা গড়ান দিয়ে দাঁড়াল সে, চঞ্চলার আড়ালে থেকে পিছু নিল রানার।

আজকের ভোর যেন লাল আর সোনালির নিঃশব্দ বিস্ফোরণ, পূর্ব আকাশের অর্ধেকটা রাঙিয়ে তুলেছে; উঁচু পার্বত্য এলাকাগুলোর মাথায় সোনালি আগুন জ্বলছে, নীচের ছায়াগুলো ধূসর-নীল। অস্তগামী আধখানা চাঁদ হাঙরের সাদা দাঁতের মত, পশ্চিম দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে।

‘শুনতে পাচ্ছ?’ জিজ্ঞেস করল রানা, মাথা ঘুরিয়ে নিস্তব্ধ ভোরে কান পাতল মাইকেল।

কাঁপা কাঁপা একটা শব্দ।

‘কী?’

মাথা ঝাঁকাল মাইকেল, চোখে বিনকিউলার তুলল। ধীরে ধীরে রোদ লাগা রিজগুলোর উপর দৃষ্টি বুলাল।

‘ওদিকে,’ তীক্ষ্ণ, চাপা কণ্ঠে বলল রানা, ওর হাত অনুসরণ করে বিনকিউলার ঘোরাল মাইকেল।

কয়েক মাইল দূরে, অস্পষ্ট আকৃতি নিয়ে কালো কয়েকটা বিন্দু সমতল প্রান্তরের ডেবে থাকা একটা অংশে নড়াচড়া করছে। এত দূরে আর ঘন ছায়ার ভিতর যে গ্লাসের ম্যাগনিফায়িং লেন্সেও পরিষ্কার নয়, কাঠামোগুলো ভাল করে চেনা গেল না।

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ওরা, ওদের সামনে বিশাল শুকনো পুকুর-আকৃতির গর্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে ধীর গতিতে সরে যাচ্ছে বিন্দুগুলো, ওগুলোর সামনে একটা ঢাল ক্রমশ উঠে গেছে উপর দিকে, সারির প্রথম বিন্দুটা এরইমধ্যে ঢাল বেয়ে

উঠতে শুরু করেছে। কিনারা ছাড়িয়ে উঠে এল সেটা, সোনালি সূর্যের উজ্জ্বল রোদে চকচক করে উঠল গা, কাঠামোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার ধরা পড়ল ওদের চোখে।

‘সিভি থ্রি ক্যাভলরি ট্যাংক,’ ইতস্তত না করে বলল মাইকেল। ‘ফিফটি হর্স পাওয়ার আলফা এঞ্জিন। ফ্রন্টাল আর্মার টেন সেন্টিমিটারস। ঘণ্টায় আঠারো মাইল টপ স্পীড।’ সে যেন ক্যাটালগে চোখ রেখে পড়ে যাচ্ছে। ‘মোট ত্রু তিনজন-ড্রাইভার, লোডারগানার আর কমান্ডার। যতদূর বুঝতে পারছি, মাউন্টিঙে ওটা ফিফটি-এম এম স্প্যাভাউ। এক হাজার গজের মধ্যে লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ, রেট অভ ফায়ার প্রতি মিনিটে পনেরো রাউন্ড।’

সে থামবার আগেই সামনের ট্যাংকটা রিজ-এর পরবর্তী ঢালের কিনারা দিয়ে নেমে গেল, এক এক করে বাকি পাঁচটা বিন্দুও অনুসরণ করল সেটাকে, ওগুলো অদৃশ্য হবার পর এঞ্জিনের আওয়াজও আর শোনা গেল না।

চোখ থেকে গ্লাস নামিয়ে মুচকি হাসল মাইকেল। ‘বুঝতেই পারছ, ওল্ড চ্যাপ, আমরা খানিক বেকাদায় পড়ে গেছি। ওই স্প্যাভাউগুলোয় রয়েছে রিভলভিং টারিট।’

‘আমাদের আর্মার কারের স্পীড বেশি,’ সোজা-সাপটা বলল রানা; সেই মায়ের মত, যার ছেলেদের তিরস্কার করা হয়েছে।

‘ওই একটাই সুবিধে,’ মন্তব্য করল মাইকেল। ‘আর সব দিক থেকে আমরা নিকৃষ্ট হয়ে গেছি।’

‘ব্রেকফাস্ট চলবে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। তারপর অনেকটা আপনমনে বিড়বিড় করল, ‘সারাটা দিন আটকা পড়ে থাকা!’

টিনের কৌটা থেকে স্টু বেরল, গরম করা হলো বালতির আগুনে। তারপর কাগজে মোড়া রুটি চায়ের মগে ডুবিয়ে খেলো

ওরা। শেষ করবার আগেই আকাশের অনেকটা উপরে উঠে এল সূর্য।

‘শুলাম,’ বলে চঞ্চলার খোলের পাশে, ছায়ায় কমল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল রানা, হাঁটু ভাঁজ করা আকৃতিটা দেখতে হলো বিশাল এক বাদামি কুকুরের মত।

টারিটের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল মাইকেল, খোলা প্রান্তরের দিকে চোখ, সেদিকে এরইমধ্যে তাপ-তরঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছে। পালাবদলের সময়টা ভালই বেছেছে বলে নিজেকে অভিনন্দন জানাল সে, রাতে বেশ ক’ঘণ্টা ভাল ঘুম হয়েছে, আর এখন সকালের ঠাণ্ডার ভিতর বসে থাকতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আবার যখন রানার পালা শুরু হবে, মুচকি হেসে সে ভাবল, আকাশের নীচে প্রান্তর হয়ে উঠবে জ্বলন্ত তন্দুর, চঞ্চলার খোল হয়ে উঠবে অদৃশ্য আগুন।

‘এক নম্বরটাকে দেখতে পাও কিনা দেখো,’ বিড়বিড় করল সে, অলসভঙ্গিতে চোখে বিনকিউলার তুলে দিগন্তরেখার উপর দৃষ্টি বুলাল। চুপিসারে এগিয়ে এসে শিফটা টহলদাররা চমকে দেবে ওদেরকে, সে সম্ভাবনা নেই। অভিজ্ঞ সৈনিকের সতর্ক দৃষ্টির সাহায্যে এই জায়গাটি নির্বাচন করেছে সে, চুরট ধরাবার আগে সেজন্য আরেকবার নিজেকে অভিনন্দন জানাল।

‘এবার, জরুরী একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাও, মাই ডিয়ার মাইকেল,’ আবার বিড়বিড় করল সে। ‘তোমার আর্টিলারি নেই, মাইনফিল্ড বা আর্মার-ভেদী গান নেই অথচ এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ধ্বংস করতে হবে—কীভাবে তা সম্ভব?’

সমস্যাটা নিয়ে ঝাড়া দু’ঘণ্টা মাথা ঘামাল মাইকেল। সমাধান একটা পেল বটে, কিন্তু সেটা নির্ভর করেছে নির্দিষ্ট একটা দিক থেকে, নির্দিষ্ট একটা জায়গায়, নির্দিষ্ট সময়ে ট্যাংকগুলোর

আসবার উপর। ‘উঁহু, ব্যাপারটা অবাস্তব হয়ে দাঁড়াচ্ছে!’ তারমানে আরও চিন্তাভাবনা করতে হবে।

আরও এক ঘণ্টা পেরোল। মাইকেল উপলব্ধি করল, একটাই মাত্র উপায় আছে যার সাহায্যে শিফটা ট্যাংকগুলো নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করবার জন্য প্ররোচিত হবে। ‘সেই পুরনো গাধা আর মুলোর গল্প,’ ভাবল সে। ‘এখন শুধু আমাদের একটা মুলো দরকার।’ চট করে রানা যেদিকে শুয়ে আছে সেদিকে একবার তাকাল সে। এই তিন ঘণ্টায় একবারও নড়েনি রানা। দীর্ঘ, ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া বুঝবার উপায় নেই বেঁচে আছে কিনা। রানা এমন নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে এতটা গভীর ঘুম ঘুমাতে পারে দেখে কেন কে জানে সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করল মাইকেল।

প্রথর রোদ মাইকেলের মাথায় আগুন ঢালছে। লোমকূপ থেকে বেরবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যাচ্ছে ঘাম, চামড়ায় রয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ মিহি লবণের প্রলেপ। চোখে বিনকিউলার তুলে আবার দিগন্তের দিকে তাকাল সে।

তাপ-তরঙ্গে অস্পষ্ট হয়ে আছে দিগন্তরেখা, কাছাকাছি রিজগুলোর প্রায় কোন অস্তিত্বই ধরা পড়ল না। গরম বাতাস দ্রুত জায়গা বদল করল, পানির মত ভারি আর পুরু, কোথাও মৃদুমন্দ গতিতে, কখনও দমকা ঝোড়ো স্বভাব নিয়ে; অলসভঙ্গিতে মোচড় খেলো, পাক খেলো ঘূর্ণির মত।

ঘন ঘন চোখ পিট পিট করল মাইকেল, মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে ফেলে দিল ঘামের ফোঁটা। হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল সে। রানার পালা শুরু হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি দেখে মুহূর্তের জন্য কুরুদ্ধি চাপল মাথায়, ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেবে নাকি? রোদের মধ্যে খোলের মাথায় আর গরম চুলোর মাথায় বসে

থাকা একই কথা। আরেকবার ছায়ায় নেতিয়ে থাকা রানার দিকে তাকাল সে। আবার কথাটা ভাবল, দেবে নাকি ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে?

এই সময় ভারি, উত্তপ্ত বাতাস অদ্ভুত একটা শব্দ বয়ে আনল। কাঁপা কাঁপা, কোমল একটা শব্দ; অনেকটা যেন মৌমাছির গুঞ্জন। বুঝবার কোন উপায় নেই কোন্ দিক থেকে আসছে, হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে সতর্ক হলো মাইকেল, সমস্ত ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সজাগ। মিলিয়ে গেল আওয়াজটা, আবার ফিরে এল, এবার আগের চেয়ে জোরাল-মাটির বিশৃংখল উত্থান-পতন ও উত্তপ্ত বাতাসের অস্থির আলোড়ন ওর কানের সঙ্গে কৌতুক করছে। আচমকা শব্দের মাত্রা অনেকটা বেড়ে গেল, ভোঁতা গর্জনের মত, কাঁপিয়ে দিল চারদিকের বাতাস।

গ্লাস জোড়া ঝট করে পুব দিকে ঘোরাল মাইকেল। তার মনে হলো গোটা পুব দিক থেকে উৎসারিত হচ্ছে আওয়াজটা, পাথুরে তীরভূমিতে পশুসুলভ হিংস্রতা নিয়ে সমুদ্রের আছড়ে পড়বার মত।

মাত্র এক নিমেষের জন্য নৃত্যরত তাপ-তরঙ্গ সরে গেল সামনে থেকে, ছোট্ট ফাঁকের ভিতর গাঢ় রঙের অস্পষ্ট একটা বিকট আকৃতি দেখতে পেল মাইকেল, আকারে বিশাল, থামের মত মোটা পা নিয়ে অচেনা এক দানব যেন, সম্ভবত তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। পরমুহূর্তে তাপ-তরঙ্গ ঢেকে দিল ফাঁকটুকু, হতচকিত মাইকেলকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিল, সত্যিই কি জিনিসটা দেখেছে সে? কিন্তু গর্জনটা তো আর মিথ্যে নয়! আওয়াজটা এখন আকাশ বাতাস সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে।

‘রানা,’ ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকল সে, জবাবে আরও বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল রানা, পাশ ফিরে শুলো। টারিট থেকে শুকনো একটা ডাল ভেঙে ছুঁড়ে দিল মাইকেল, লাগল রানার ঘাড়ের পিছনে।

রাগের সঙ্গে ঘুম ভাঙল রানার, ঘুসি মারবার জন্য শক্ত করল মুঠো। ‘কী পেয়েছ...!’ খেঁকিয়ে উঠল ও।

‘এখানে এসো, তাড়াতাড়ি!’ রুদ্ধশ্বাসে ডাকল মাইকেল।

‘কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,’ বিড়বিড় করে বলল রানা, টারিটের উপর মাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, চোখে গ্লাস তুলে পুব দিগন্তে তাকিয়ে আছে। আওয়াজটা আগের চেয়ে ভারি হয়েছে, গম্ভীর সুরে মেঘ ডাকবার মত, কিন্তু তাপ-তরঙ্গের দেয়াল আর চোখ-ধাঁধানো রোদ এমন নিরেট যে ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না।

‘ওই যে!’ চোঁচিয়ে উঠল মাইকেল।

‘ওহ্ মাই গড!’ আত্ননাদ করে উঠল রানা।

অকস্মাৎ বিশাল আকৃতিটা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, লাফ দিল ওদের দিকে। অত্যন্ত কাছে, কুচকুচে কালো আর লম্বা, তাপ-তরঙ্গের ভিতর বলে কাঠামোটা এবড়োখেবড়ো আর কিছুতকিমাকার, প্রতি মুহূর্তে আকার আর আকৃতি বদলে যেতে লাগল-কখনও মনে হলো চারটে মাস্তুল নিয়ে একটা পালতোলা জাহাজ, কালো পালগুলো বাতাসে ফুলে আছে, পরমুহূর্তে আকৃতি বদলে গিয়ে জিনিসটা দেখতে হলো বেঙাচির মত, আলোড়িত স্বচ্ছ পানির মত বাতাসে সাঁতার কাটবার চঙে ভাসছে।

‘কী ওটা?’ কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল মাইকেল, হাঁপিয়ে উঠল সে।

‘কী জানি!’ অজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা। ‘তবে জিনিসটা শব্দ করছে শিফটাদের এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকের মত, আর তেড়ে আসছে এদিকেই!’

এগারো

শিফটা ট্যাংক স্কোয়াড্রন-এর লিডার ক্যাপটেন লোকটা অত্যন্ত রাগী, তার উপর বেচারার স্বপ্নটা ভেঙে গেছে, ফলে তার ভিতর মাখাচাড়া দিয়েছে অশুভ প্রতিহিংসা।

লোকটা রোমান্টিক, ঝুঁকিবহুল অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনবার ব্যাকুল একটা ইচ্ছা সর্বক্ষণ তাকে তাড়া করে ফিরছে। সব সময় ইঙ্গিত করা আঁটসাঁট ইউনিফর্ম পরে থাকে সে, চেহারা নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে রাখে, চলাফেরার মধ্যে ক্ষিপ্ত একটা ভঙ্গি থেকেই যায়। তার ধারণা ছিল, সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছুবে সে, অসভ্য আদিবাসীদের মিছিলের উপর ট্যাংক চালাবে, বেতন বাদেও লাশ গুণে হাজার দশেক ডলার উপরি আয় করবে, বিজয়ীর বেশে ফিরে যাবে অন্য কোন যুদ্ধে। কিন্তু ওয়েলস অভ চান্সিতে এসে দেখল, শয়তানের ঔরসজাত একটা মরণতে আটকা পড়েছে সে, যেখানে দিনের পর দিন তার প্রিয় ফাইটিং মেশিনগুলোকে পাঠানো হয় বুনো পশু খুঁজে বের করার কাজে, সেগুলোকে খেদিয়ে আগে থেকে নির্ধারিত একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হয়, ওখানে উন্মাদ এক কাউন্ট সেগুলোকে গুলি করে মারবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

এতে করে ক্যাপটেনের গর্ব আর যুদ্ধজয়ের অভিলাষ যে পরিমাণে চূর্ণ হলো তার তুলনায় ট্যাংকগুলোর ক্ষতির পরিমাণ-জ্বালানির খরচ, বা হীরের মত শক্ত বালিতে ঘষা খেয়ে ট্র্যাকের ক্ষয়-সামান্যই বলা চলে।

তার পদমর্যাদা ছোট হতে হতে গেমকীপারে নেমে এসেছে, স্রেফ একটা বেয়ারা বানানো হয়েছে তাকে। প্রতিটি দিনের

www.BanglaBook.org

বেশিরভাগ সময় প্রায় কেঁদে ফেলবার অবস্থায় কাটে ক্যাপটেনের, এই অবমাননা তার আর সহ্য হয় না। সম্ভাব্য জ্বালাময়ী ভাষায় প্রতি সন্ধ্যায় পাগল কাউন্টের কাছে অভিযোগ জানায় সে, প্রতিবাদে মুখর হয়, কিন্তু পরদিন সকালে আবার বাধ্য হয় মরণ উপর হিংস্র পশুদের ট্যাংক নিয়ে ধাওয়া করতে।

ইতিমধ্যে গোটা সাতেক সিংহ আর বুনো কুকুর মারা পড়েছে, তবে নিহত হরিণের সংখ্যা অনেক। খেদিয়ে যখন অপেক্ষারত কাউন্টের কাছে নিয়ে আসা হয়, সব ক'টা আধমরা হয়ে গিয়েছিল, ঘামে ভিজে চকচক করছিল গা, চোয়াল থেকে লালা ঝরছিল, খোলা প্রান্তরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাড়া খাবার পর তখন ওগুলোর দাঁড়াবার শক্তিও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

পশুদের এই দুর্বলতা বা দুর্দশা কাউন্টের শিকার করবার আনন্দে এতটুকু বিঘ্ন ঘটতে পারেনি, সে বরং কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যে ওগুলোকে যথেষ্ট দৌড় খাটিয়ে ক্লান্ত করবার পরই কেবল তার দিকে খেদিয়ে আনতে হবে। হুমকি দিয়ে বলেছে, যদি দেখে যে কোন পশু সশব্দে হাঁপাচ্ছে না তা হলে তার খুব রাগ হবে, আর তার রাগ যে কী জিনিস ক্যাপটেনকে সেটা বানানটো সাতার কাছ থেকে জেনে নিতে বলেছে। কাউন্টের চাই সহজ শিকার, আর সুন্দর ফটোগ্রাফ, প্রাণের উপর ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়।

শিকারের সংখ্যা যত বাড়বে, তত বাড়বে ফটোগ্রাফের সংখ্যা, কাজেই ট্যাংক আসবার পর মহাফুর্তিতে আছে কাউন্ট। কিন্তু ক'দিন যেতেই সমস্যা দেখা দিল, কারণ ডানাকিল মরণ অগুনতি বন্যপ্রাণীর ভরণপোষণের সামর্থ্য রাখে না। তাড়া খেয়ে কিছু পশু মারা পড়ল, কিছু পালিয়ে গেল। ভারি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে

উঠল কাউন্ট। ট্যাংক স্কোয়াড্রনের ক্যাপটেনকে ডেকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করল সে, নিজের অজান্তে লোকটার অতৃপ্তি আর প্রতিহিংসা বাড়িয়ে দিল বিপুল পরিমাণে।

বুড়ো মন্দাটাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্যাপটেন, প্রথমে জ্যাস্ত একটা হাতি বলে চিনতেই পারেনি, খোলা প্রান্তরে বিশাল একটা মনুমেন্ট অথবা ক্ষুদ্রে পাহাড় বলে মনে হয়েছিল।

হাতিটা প্রকাণ্ড, ছিন্নভিন্ন কান দুটো প্রাচীন জাহাজের জোড়া পালের মত, চামড়ার অসংখ্য গভীর ভাঁজ একটা জাল বুনে রেখেছে, তার মাঝখানে ছোট ছোট চোখ দুটোয় রাজ্যের বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা। তার একটা দাঁত ঠোঁটের কাছে ভাঙা, অপরটা যেমন লম্বা তেমনি মোটা আর হলুদ, বাঁকের শেষ মাথায় ডগাটা ঘষা খেয়ে খেয়ে, গোল আর ভোঁতা হয়ে আছে।

হাতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সিকি মাইল দূরে ট্যাংক থামাল ক্যাপটেন, বিনকিউলারের সাহায্যে ওটার আকার আর মতিগতি বুঝবার চেষ্টা করল, তারপর ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা, সর্ব গৌঁফ জোড়ার নীচে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল প্রতিশোধপরায়ণ হাসি, কালো চোখে ঝিক করে উঠল অশুভ একটা আলো।

‘তা হলে, মাই কর্নেল, শিকার চাই তোমার, তাই না?’ আপনমনে ফিসফিস করল সে। ‘পাবে, শিকার তুমি পাবে। কথা দিচ্ছি।’

খুব সতর্কতার সঙ্গে পূর্ব দিক থেকে এগোল ক্যাপটেন, অত্যন্ত ধীর গতিতে ট্যাংকটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল, মাটির উপর যেন একটা পোকা চরছে। কিন্তু সাত ঘাটের পানি খাওয়া হাতির চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়, ঘাড় ফিরিয়ে ওদেরকে আসতে দেখল সে। তার কান অসম্ভব চওড়া আর টান টান হয়ে

উঠল, লম্বা শুঁড় বাতাস টানল, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢুকে গেল মুখের ভিতর, স্বাদ গ্রহণ করল বাতাসের, নিঃশ্বাস ফেলল উপরের ঠোঁটের ওলফ্যাকটরি গ্ল্যান্ডে, কিন্তু তকিমাকার আকৃতিটার গন্ধ বুঝতে চায়।

বুড়োটা খুব বদমেজাজী, শিকারীরা তাকে আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে কয়েক হাজার মাইল তাড়া করে ফিরেছে, দাগ আর ভাঁজে ভরা তার প্রাচীন পেটের ভিতর তীর, বর্শা আর জ্যাকেট পরানো বুলেটের সংখ্যা কম নয়। এই বয়সে এখন সে শুধু একটু একা থাকতে চায়—যুবতী বা সন্তান উৎপাদনক্ষম হস্তিনীর চাহিদা ফুরিয়েছে তার, শিশু হাতিদের সঙ্গে খেলা করবার মন নেই, ইচ্ছে নেই নেতৃত্ব দিয়ে হাতির পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর, একগুঁয়ে শিকারীর পাল্লায় পড়তে চায় না। নির্জন, প্রায় জনপ্রাণীশূন্য মরুতে সেজন্যই চলে এসেছে সে; শেষ বয়সটা, নির্বাঞ্ছিত নিরিবিলিতে কাটিয়ে দিতে চায়। ধীর গতিতে, থেমে থেমে, ওয়েলস অভ চাল্ডির দিকে যাচ্ছে সে, ওখানকার পানি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে শেষবার খেয়েছে বুড়ো, তখন ছিল তার যৌবন কাল।

অচেনা আকৃতিটা সর্গর্জনে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তেল পোড়ার গন্ধ পেল সে, ভারি অস্বস্তি আর বিরক্তি বোধ করল। মাথা ঝাঁকাল বুড়ো, বিশাল কান ঝাপটে আরেক দিকের বাতাস নিল শুঁড়ে, একাধারে নালিশ আর হুমকির সুরে ডাক ছাড়ল একটা।

গুড়ি গুড়ি এগিয়ে এল অচেনা আকৃতি, শুঁড় গুটিয়ে বুকুর কাছে তুলে আনল বুড়ো, কান দুটো অর্ধেকটা পিছিয়ে এনে ডগাগুলো গুটাল—কিন্তু ট্যাংক স্কোয়াড্রনের ক্যাপটেন বিপদ-সংকেত চিনতে পারল না, যেমন আসছিল তেমনি আসতে থাকল সে।

পরমুহূর্তে হামলা করল হাতি, দ্রুতগতি বিশাল আকৃতি নিয়ে। তার দুই জোড়া পায়ের চাপে মাটির সঙ্গে সঁটে গেল কাঁটারোপ, থর থর করে কেঁপে উঠল মাটি, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল গুরুগম্ভীর ড্রাম পেটানোর আওয়াজ। দৌড় শুরু করবার জন্য কোন সময় নেয়নি সে, এই বয়সেও তার ক্ষিপ্ততা তাক লাগানোর মত, আর গতিও এত দ্রুত যে এক নিমেষে প্রায় ধরে ফেলল ট্যাংকটাকে।

ধরতে পারলে, দানবীয় সবটুকু শক্তি ব্যবহার না করেই শ্রেফ মৃদু একটা ধাক্কা ট্যাংকটাকে উল্টে দিত সে। কিন্তু ড্রাইভারও তারই মত ক্ষিপ্ত, লম্বা করা গুঁড়ের ঠিক নীচে দিয়ে ট্যাংক ঘুরিয়ে নিল সে, তারপর ফুলস্পীডে ছুটল, এক দৌড়ে পার করে দিল আধ মাইল। ধাওয়া করেছিল হাতি, খানিকদূর এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

‘মাই ক্যাপটেন, দানবটাকে আমি স্প্যান্ডাউ দিয়ে ঘায়েল করি,’ অনুমতি প্রার্থনা করল গানার। হাতিটার ধাওয়া উপভোগ করেনি সে।

‘না! না!’ আনন্দ আর উত্তেজনায় আর বেশি কিছু বলতে পারল না ক্যাপটেন।

‘হিংস্র, বদমেজাজী আর খুব বিপজ্জনক,’ ক্যাপটেনকে বোঝাবার চেষ্টা করল গানার।

‘ঠিক!’ খুশিতে হেসে উঠল ক্যাপটেন, তৃপ্তিতে দুই হাতের তালু এক করে ঘষল। ‘আমার তরফ থেকে কাউন্টের জন্যে ওটা একটা বিশেষ উপহার।’

ছয়টা ট্যাংকই ব্যবহার করল ক্যাপটেন, এক এক করে ছয়বার হাতিটার কাছাকাছি গেল ড্রাইভাররা। এরপর, ওগুলোকে ধাওয়া করে কোন ফল হচ্ছে না বুঝতে পেরে, বিরক্ত হয়ে সে চেষ্টা বাদ দিল হাতিটা। তার পেট থেকে প্রতিবাদমুখর গুড় গুড় শব্দ বেরিয়ে

এল, মোচড় খেলো লেজ, চোখের পিছনের গ্ল্যান্ড থেকে পানি বেরিয়ে এসে ভিজে একটা মোটা দাগ তৈরি করল ধুলো মাখা গালে, তাড়া খেয়ে ছুটে চলল পশ্চিম দিকে, পিছনে নিয়ে আসছে এক লাইনে ছয়টা ট্যাংক। তবে এখনও সে রেগে আছে।

‘জানি তুমি বিশ্বাস করবে না,’ প্রায় নরম সুরে বলল মাইকেল। ‘আমি নিজেও ঠিক জানি না বিশ্বাস করা উচিত কিনা। তবে, দৃষ্টিভ্রম যদি না হয়, ওটা একটা হাতি-ছয়টা শিফটা ট্যাংকের একটা স্কোয়াড্রনকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে, সোজা আমাদের দিকে।’

‘বিশ্বাস আমিও করি না,’ বলল রানা। ‘যদিও তুমি যা দেখেছ আমিও তাই দেখেছি—কিন্তু, এ কীভাবে সম্ভব? তারমানে ওটাকে ওরা ব্লাডহাউন্ডের মত ট্রেনিং দিয়েছে! তা কী সম্ভব, নাকি পাগল হতে আর বেশি দেরি নেই আমার?’

‘দুটোই সত্যি,’ বলল মাইকেল। ‘যদি পরামর্শ দেই, লেজ তুলে পালাবার জন্যে আমাদের তৈরি হওয়া দরকার, তুমি কিছু মনে করবে? তোমার মনে হচ্ছে না, এভাবে ওদের কাছে চলে আসাটা নিরাপত্তার জন্যে হুমকিস্বরূপ, ওল্ড চ্যাপ, কী?’

লাফ দিয়ে ত্র্যাক্স হ্যাভেলের সামনে পড়ল রানা।

ড্রাইভারের হ্যাচ গলে ঝুপ করে নেমে এল মাইকেল, ব্যস্ত হাতে ইগনিশন আর থ্রটল সেটিং অ্যাডজাস্ট করল। ‘অল সেট,’ বলল সে, উদ্বিগ্ন চোখে কাঁধের উপর দিয়ে বারবার তাকাল।

এক হাজার গজের মধ্যে চলে এসেছে হাতি। সমান বেগে আসছে সে, লম্বা পা ফেলে, হাঁটা ও দৌড়ের মাঝামাঝি—একটা গতি, কোনরকম বিরতি বা বিশ্রাম না নিয়ে যে-কোন হাতি এই

ভঙ্গিতে ত্রিশ মাইল পেরিয়ে যেতে পারে।

‘আমাকে সাথে নিয়ে আত্মহত্যা করতে চাও, কী?’ চৈচিয়ে উঠল মাইকেল।

আবার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাল রানা, কিন্তু চঞ্চলা কোন সাড়া দিল না, এমনকী রানাকে উৎসাহ দিয়ে পরের বার একটু কাশলও না।

মূল্যবান একটা মিনিট পেরিয়ে গেল। দুই হাঁটুতে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁপাচ্ছে রানা।

‘এই শালার বজ্জাত কারটা...’, শুরু করল মাইকেল।

রানার আঁতকে ওঠায় কোন কৃত্রিমতা নেই, ঝট করে সিধে হলো ও। ‘গাল দিয়ো না, তা হলে কোনদিনই স্টার্ট নেবে না। আবার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাল। ‘বিপদের সময় গোলমাল করতে নেই, লক্ষ্মী সোনা!’ ফিসফিস করল ও, গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে হ্যান্ডেল ঘোরাল।

কাঁধের উপর দিয়ে আরেকবার দ্রুত তাকাল মাইকেল। বিপজ্জনক মিছিলটা কাছে, অত্যন্ত কাছে চলে এসেছে। ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে মাথা বের করে একপাশে কাত হলো সে, চঞ্চলার এঞ্জিন-কাউলিঙে আদর করে হাত বুলাল, নরম সুরে বলল, ‘রাগ কোরো না, মাণিক। রাগের মাথায় কী বলেছি ভুলে যাও। এবার হাসো তো, সুন্দরী!’

মাথার উপর ও চারধারে জোড়া ক্যানভাসের পর্দা, একদল শিকারীকে নিয়ে কোলাপসিবল ক্যাম্প চেয়ারে বসে রয়েছে কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকেরেক। টুকরো বরফ সহযোগে ঠাণ্ডা পানীয় আর হালকা নাস্তা পরিবেশন করছে মেস সার্ভেন্টরা, ক্যানভাস অনবরত পতপত করায় মরুর গরম সহ্য করবার মত যথেষ্ট বাতাস লাগছে

গায়ে।

দারুণ খোশমেজাজে রয়েছে কাউন্ট, তার একটা কারণ পেটটা কোন গোলমাল করছে না। ছ’জন অফিসারকে আপ্যায়ন করছে সে, সবাই তারা ভাড়াটে যোদ্ধা, শিফটাদের উপদেষ্টা অথবা বিভিন্ন পদমর্যাদায় কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে-বলাই বাহুল্য, ছ’জনই তারা শ্বেতাঙ্গ। এই মুহূর্তে সবাই তারা শিকারীর পোশাক পরে রয়েছে, সবার হাতের কাছে একটা করে স্পোর্টিং রাইফেল।

‘আমার মন বলছে আজ আমরা খুব ভাল শিকার পাব। খেদাড়েদের যেভাবে ভড়কে দিয়েছি, জান-প্রাণ বাজি রেখে খুঁজছে ওরা।’ হাসল কাউন্ট, একটা চোখ টিপল, কর্তব্য মনে করে পাল্টা হেসে দায়িত্ব পালন করল অফিসাররা। ‘সত্যি কথা বলতে কি, আমি আশা করছি...।’

‘মাই কাউন্ট! মাই কাউন্ট!’ ভূতে পাওয়া লোকের মত দিশেহারা চেহারা নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল বানানটো সাতা। ‘ওরা আসছে! রিজ থেকে আমরা ওদের দেখতে পেয়েছি!’

‘আহ্!’ গভীর তৃপ্তির সঙ্গে আওয়াজটা ছাড়ল কাউন্ট। ‘চলো তা হলে দেখা যাক আমাদের ট্যাংক বহরের মহৎপ্রাণ ক্যাপটেন আজ আমাদের জন্যে কী নিয়ে আসছে!’ সাদা মদ ভর্তি গ্লাসটা তিন চুমুকে শেষ করল সে, তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করবার জন্য শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এল সাতা, তারপর তার দিকে মুখ করে পিছু হটতে হটতে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ডিনো যেখানে রোলস-রয়েসের তোবড়ানো গা থেকে ধুলো পরিষ্কার করছে।

ছোট মিছিলটা, কাউন্টের রোলস-রয়েসের নেতৃত্বে, নিচু

রিজের ঢাল বেয়ে নেমে এল মাচাগুলোর মাঝখানে।

নিচু একটা চওড়া উপত্যকার উপর মাচাগুলো, তৈরি করেছে ইটালিয়ান এঞ্জিনিয়াররা। মোটা বাঁশ এসেছে আসমারা থেকে, লাল মাটি খুঁড়ে অনেক গভীরে পৌঁতা হয়েছে সেগুলো, মাচা যাতে কাঁটাঝোপের চেয়ে বেশি উঁচু না হয়। মাচা হলেও, ভিতরে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি মাচাকে ঘাসের তৈরি বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে, রোদ ঠেকানোর জন্য, বেড়ার গায়ে গর্ত করা আছে খেদিয়ে নিয়ে আসা পশুদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়বার জন্য। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হতে পারে, তাই ক্যাম্প চেয়ার রাখা হয়েছে একটা করে। একটা মাচাকে শুধু বার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে বরফ থেকে গুরু করে সম্ভাব্য সব রকম মদ আর হালকা নাস্তাও পাওয়া যাবে। ল্যাট্রিনের সংখ্যা দুটো-একটা সবার জন্য, অপরটি একা কাউন্টের জন্য। দ্বিতীয় ল্যাট্রিনে তাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভুল বা ইচ্ছে করে কেউ যাতে ঢুকে পড়তে না পারে, শুধু ওটার মাথার উপরই রঙিন কাপড়ের পর্দা।

এক সার মাচা, মাঝখানেরটা কাউন্টের। আকারে তারটাই সবচেয়ে বড়, ভিতরে আরাম-আয়েশের আয়োজনও ব্যাপক। মাচার জায়গাটি এমনভাবে বাছা হয়েছে, খেদিয়ে নিয়ে আসা বেশির ভাগ পশু ওটার সামনে দিয়েই যাবে। ইতিমধ্যে তার জুনিয়র অফিসাররা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে দুর্ভাগ্যক্রমে কাউন্টের চেয়ে তাদের কপালে যদি বেশি শিকার জোটে তা হলে কি হেনস্তাই না সহ্য করতে হবে। কোন ক্লাস্ত পশু যদি তাদের সামনে দিয়ে যায়, প্রথম গুলিটা কাউন্ট না করবার আগে অন্য কেউ সেটার দিকে রাইফেল পর্যন্ত তুলতে পারবে না। এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করায় একজন ক্যাপটেনের পদমর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাকে লেফটেন্যান্ট বানানো হয়েছে, তারপর তাকে

www.BanglaBook.org

আর অভিযানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আইন অমান্যকারী দ্বিতীয় অফিসারকে চাকুরিচ্যুত করে ফেরত পাঠানো হয়েছে আসমায়ায়।

হাত আর কোমর ধরে কাউন্টকে রোলস থেকে নামাল সাতা, তিনজন সৈনিক কাঁধে তুলে নিল তাকে, সিঁড়ি বেয়ে তুলে দিয়ে এল মাচায়। স্যাণ্ডুইচ করল ডিনো, পিছু হটে রোলস-রয়েসে চড়ল আবার, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেল রিজের উল্টোদিকে।

ক্যানভাস চেয়ারে আরাম করে বসল কাউন্ট। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জ্যাকেটের বোতাম খুলল সে, বরফে ভেজানো একটা রুমাল নিল সাতার হাত থেকে। কাউন্ট তার মুখ থেকে মিহি ঘাম মুছছে, দামী হুইস্কির একটা বোতল খুলল সাতা, বরফ ভরা বালতিতে আরও কয়েকটা বোতল রয়েছে। হুইস্কি ভর্তি লম্বা গ্লাসটা কাউন্টের সামনে ফোল্ডিং টেবিলের উপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল সাতা। এরপর ম্যানলিকার রাইফেলটা লোড করল, সদ্য খোলা নতুন প্যাকেট থেকে চকচকে কার্টিজ বেরাল।

ভিজে কাপড়টা ফেলে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল কাউন্ট, বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে তাপদৃষ্টি প্রান্তরে তাকাল, তাপ-তরঙ্গের ভিতর ঘাসের চাপড়া আর কাঁটাঝোপগুলো নাচছে। ‘আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, বুঝলে সাতা, আজ আমরা শিকার করে ভারি আনন্দ পাব।’

‘পাবেনই তো, মাই কাউন্ট!’ বিশ্বস্ততার সঙ্গে সাই দিল সার্জেন্ট বানানটো, খর্বকায় শরীর নিয়ে কাউন্টের চেয়ারের পিছনে সশ্রদ্ধভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, বুকের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে ধরে রেখেছে ম্যানলিকারটা। ‘আনন্দ পাওয়াই তো আপনার কাজ!’

‘কাম অন, ডার্লিং,’ কর্কশ গলা, ক্র্যাক হ্যাভেলের উপর ঝুঁকে দম

নিল, চিবুক থেকে ঘামের ফোঁটা পড়ল বুকের কাছে শাটে, এবার নিয়ে বোধহয় একশোবার হ্যান্ডেলটা ঘোরাল রানা। ‘স্টার্ট না নিলে আমরা ডুবব, সুইটহার্ট!’

হ্যাচ থেকে চঞ্চলার টারিটে উঠে এল মাইকেল, মরিয়া হয়ে আরেকবার তাকাল পিছন দিকে। অনুভব করল, হঠাৎ কী যেন একটা অচল হয়ে গেল তার পেটের ভিতর, দমটা আটকে গেল গলায়। বিশাল হাতি আর মাত্র দুশো গজ দূরে, হেঁটে আসছে সোজা ওদের দিকে, বিশাল কালো কান বাতাসে ঝাপটা মারছে, কুঁৎকুঁতে চোখ জোড়ায় আক্রোশ আর ঘৃণা।

ওটার ঠিক পিছনে, দু’দিকে ছড়ানো, ধাওয়া করে আসছে শিফটা ট্যাংক বহর। ট্যাংকের নিটোল গোলাকৃতি ফ্রন্টাল আর্মার রোদ লেগে চকচক করছে, শিফটাদের বহুরঙা পতাকা পতপত করছে বাতাসে, প্রতিটি হ্যাচ থেকে বেরিয়ে আছে কালো হেলমেট পরা ট্যাংক কমান্ডারের মাথা। বিনকিউলার চোখে থাকায় প্রত্যেক কমান্ডারের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল মাইকেল, এত কাছে চলে এসেছে তারা।

আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার, চঞ্চলকে পাশ কাটিয়ে যাবে শিফটা ট্যাংকগুলো। কমান্ডাররা যে ওদেরকে দেখতে পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাতিটা ট্যাংকগুলোকে সরাসরি নালার দিকে টেনে আনছে, চঞ্চলার টারিটে ডালপালা থাকলেও শিফটারা একশো গজের ভিতর চলে এলে ঠিকই চিনতে পারবে ওটাকে।

পালাবার উপায় নেই, আত্মরক্ষারও সুযোগ নেই। শত্রুরা যেদিক থেকে আসছে তার ঠিক উল্টোদিকে মুখ করে রয়েছে ভিকার্স মেশিনগান, সেটা বল মাউন্টিঙের উপর থাকায় এই মুহূর্তে প্রয়োজন মত ঘোরানোও সম্ভব নয়। চঞ্চলার উপর অকস্মাৎ অন্ধ আক্রোশে কেঁপে উঠল মাইকেল, ঝেঁড়ে একটা লাথি মারল

টারিটে। ‘দুশ্চরিত্রা!’ খেঁকিয়ে উঠল সে, দাঁত চাপল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাগের সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল চঞ্চলা, স্টার্ট নিল, সাবলীল যান্ত্রিক শব্দে চালু থাকল কোন বিরতি ছাড়াই।

আঙুটা ধরে এক লাফে চঞ্চলার উপর উঠে এল রানা, ভিজে চুল থেকে ঘাম ঝরল চারদিকে, চেহারা লাল, মাইকেলের দিকে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছে। ‘চঞ্চলা বুঝতে পেরেছে তুমি ওকে আদর করছ!’

‘সব মেয়ের বেলাতেই সাইকোলজিক্যাল একটা মুহূর্ত থাকে, আঘাত বা অপমান তখন অনুকূল ফল দেয়, কী?’ ঠোঁট টিপে হাসল মাইকেল, চেহারায় পরম স্বস্তি, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল টারিটের আশ্রয়ে। হ্যাচ গলে কন্ট্রোলে নেমে গেল রানা।

থ্রটলে চাপ দিল রানা, এক বাঁকিতে মাথা থেকে সব ডালপালা ফেলে দিল চঞ্চলা, নালার মেঝেতে আলগা বালির উপর ঘুরতে শুরু করল চাকাগুলো, লাল ধুলোর ভিতর ঢাকা পড়ল ওরা। ঢাল বেয়ে উঠে এল আর্মারড কার, খোলা প্রান্তর ধরে ছুটল-লম্বা করা গুঁড়ের ডগা আরেকটু হলে নাগাল পেয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে বুড়ো হাতিটাকে যথেষ্ট খোঁচানো হয়েছে। রাগ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, এখন তার শুধু উন্মাদ হতে বাকি। আঙুনে ঘি পড়লে যা হয়, গুঁড়ের ডগায় নতুন আরেকটা উপদ্রব চঞ্চলকে দেখে তারও ঠিক সেই অবস্থা হলো। এতক্ষণ দ্রুতবেগে, হন হন করে হেঁটে আসছিল সে, তার বিপুল শক্তি আর সহ্যক্ষমতা এক বিন্দু খরচ হয়নি, কিন্তু এবার সে খেপে গেল। মত্ত হাতির পায়ের ধাক্কায় ভূমিকম্প শুরু হলো, একনাগাড়ে সহস্র বজ্রপাতের শব্দ বেরিয়ে এল তার পেট থেকে। খুলির সঙ্গে সঁটে গেল কান দুটো, বুকের কাছে কুণ্ডলী পাকাল গুঁড়টা।

উঁচু নিচু পাথুরে মাটির উপর চঞ্চলার চেয়ে বেশি তার গতি, সচল পাহাড়ের মত আর্মারড কারটাকে ধাওয়া করল সে-বিশাল, রোমহর্ষক, অজেয়।

সতর্ক ক্যাপটেন হাতিটাকে শান্তভাবে খেদিয়ে আনছিল, হাতি তার আসুরিক শক্তি ব্যয় করুক তা সে চায়নি। লোকটার ইচ্ছে, সে তার কমান্ডিং অফিসারের সামনে এমন একটা শিকার পরিবেশন করবে যার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পূর্ণ অটুট, অথচ মেজাজ উঠে আছে তুঙ্গে।

টারিটে বসে আনন্দে বগল বাজাচ্ছে লোকটা, আপন মনে হাসছে আর মাথা দোলাচ্ছে, কারণ শিকারীদের মাচা আর মাত্র এক মাইল দূরে। এই সময় হঠাৎ তার সামনের মাটি থেকে বিস্ফোরিত হলো ধুলো, ভিতরে একটা আস্ত আর্মারড কারকে ছুটতে দেখা গেল। ক্যাপটেনের ট্যাংকগুলো যদি পুরনো হয়, আর্মারড কারটাকে বলতে হয় প্রাচীন। সামরিক ইতিহাসের সচিব বইতে এগুলোর ছবি দেখেছে সে।

কী দেখছে, বিশ্বাস করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার। সংবিৎ ফিরল একটা ঝাঁকি খেয়ে। বহুরঙা পতাকা দেখে চিনতে পেরেছে ওটা শত্রুপক্ষের বাহন। ‘অ্যাডভান্স!’ গর্জে উঠল ক্যাপটেন। ‘স্কোয়াড্রন, অ্যাডভান্স!’ তরোয়ালের খাঁজে হাতড়াতে শুরু করল সে। ‘এনগেজ দ্য এনিমি!’

তার দু’পাশ থেকে সগর্জনে সামনে বাড়ল দুটো ট্যাংক, ক্যাপটেনের ট্যাংককে পিছনে রেখে ধাওয়া করল আর্মারড কারটাকে।

তরোয়াল না পেয়ে, হেলমেট খুলে মাথার উপর সেটা ঘন ঘন দোলাল ক্যাপটেন। ‘চার্জ!’ গলার রগ ফুলে উঠল। ‘ফরওয়ার্ড ইনটু ব্যাটল!’ এতদিনে বেয়ারা অর্থাৎ খেদাড়ের চাকরি থেকে

অব্যাহতি পেয়েছে সে, ফিরে পেয়েছে যোদ্ধার ভূমিকা।

ক্যাপটেনের উত্তেজনা সংক্রমিত হলো অন্যান্য ট্যাংক কমান্ডারদের মধ্যেও। সামনের দুটো ট্যাংকে যারা রয়েছে তাদের নাকের ডগায় ধুলোর মেঘ, লালচে মেঘের ভিতর অতিকায় হাতি, হাতির ঠুঁড়ির ডগায় আর্মারড কার। ট্যাংক দুটোর ত্রুণা দেখতেই পেল না নীচে পনেরো ফুট গভীর একটা নালা রয়েছে, কিনারা থেকে ঝপ করে নেমে গেছে খাড়া গা। ওগুলো এমনভাবে বিধ্বস্ত হলো যেন আকাশ থেকে একশো কিলো বোমা ফেলা হয়েছে। সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কায় রাইডিং হুইলগুলো ট্যাংক থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল, ভারি ইস্পাতের ট্রাকগুলো আলগা হয়ে ঐকেবেঁকে উড়ে গেল ঠিক যেন একজোড়া হিংস্র কেউটে। সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হলো রিভলভিং টারিট, সেই সঙ্গে ত্রুণের শরীর কোমরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো প্রায় নিখুঁতভাবে, যেন প্রকাণ্ড এক কাঁচি দিয়ে মাঝখান থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে।

টারিটে কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে মাইকেল দেখল দুটো ট্যাংক অদৃশ্য হয়ে গেল মাটি থেকে, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ধুলোর পাহাড় লাফিয়ে উঠল আকাশে। ‘দুটো গেল,’ চিৎকার করল সে।

‘আরও চারটে আছে,’ বলল রানা, এবড়োখেবড়ো মাটির উপর দিয়ে চঞ্চলাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও। ‘কিস্ত জাম্বো জেটের খবর কী?’

‘খবর জানতে চেয়ো না!’

মাটি যতই উঁচু-নিচু হোক, কোন বাধাই মানছে না রানার জাম্বো জেট। হাতিটার সামনে আর্মারড কার অনবরত লাফাচ্ছে, ধরা দিয়েও দিচ্ছে না, পিছনে জোড়া ট্যাংকের সংঘর্ষজনিত কর্কশ আওয়াজ, সব মিলিয়ে উন্মাদ করে তুলল তাকে।

‘এখনও সে আমাদের প্রতিবেশী, ঘাড়ে চাপতে চায়,’ ব্যগ্রকণ্ঠে আবার বলল মাইকেল। হাতি ইতিমধ্যে এত কাছে চলে এসেছে যে সেটার দিকে মুখ তুলে তাকাতে হলো তাকে। তাকিয়ে আছে, দেখল বুক থেকে তুলে ঝুঁড়ের কুণ্ডলী লম্বা করল হাতি, তাকে পেঁচিয়ে টারিট থেকে তুলে নেওয়ার জন্য সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ‘যত জোরে পারো, ওল্ড চ্যাপ! তা না হলে অচিরেই দেখতে পাবে জাম্বো জেট তোমার ঘাড়ের ওপর বসে আছে।’

বারো

‘গর্দভটাকে আমি বারণ করেছি শিকারকে যেন বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া না করে,’ খেঁকিয়ে উঠল কাউন্ট। ‘কতবার বলেছি, সাতা? দশ-বারো বার হবে?’

‘বত্রিশ বার, মাই কাউন্ট!’

‘প্রথম দিকে খুব তাড়া করতে হবে, এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে ওগুলো, তারপর শেষ এক মাইল শান্তভাবে খেদিয়ে মাচার দিকে আনতে হবে।’ রাগের সঙ্গে গ্লাসে একটা চুমুক দিল কাউন্ট। ‘লোকটা নেহাতই বোকা, ওর বাপ ছিল বোকা, চোদ্দগুটি ছিল বোকার হৃদ। জানে না নিজের কী ক্ষতি করছে। তুমি তো জানো, সাতা, আশপাশে বোকা লোক থাকলে আমার সহ্য হয় না, গা

জ্বালা করে।’

‘গায়ে আগুন ধরে যায়, মাই কাউন্ট।’

‘বলতে পারো, লোকটাকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়? আসমারায় ফেরত পাঠাব? বরখাস্ত করব? নাকি...,’ কথা শেষ না করে হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করল কাউন্ট, কর্কশ আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ করে উঠল চেয়ারটা। ‘সাতা,’ বিড়বিড় করল সে, চেহারায় উদ্বেগ ফুটছে। ‘ওদিকে কী যেন অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটছে!’

বেড়ার ফুটো দিয়ে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকল দু’জন। ধুলোর সচল মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারপর কী যেন দেখে আঁতকে উঠল কাউন্ট।

‘সাতা, এ কি সম্ভব?’ জিজ্ঞেস করল সে, কপালে ঘাম ফুটি ফুটি করছে।

‘না, মাই কাউন্ট,’ সার্জেন্ট বানানটো সাতা আশ্বস্ত করল তাকে, যদিও গলায় তেমন জোর পেল না। ‘দৃষ্টিভ্রম, মাই কাউন্ট। এ সম্ভব নয়।’

‘তুমি ঠিক জানো, সাতা?’ কাউন্টের চাপা কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল।

‘না, মাই কাউন্ট। ঠিক জানি না।’

‘আমিও না, সাতা। দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?’

‘জিনিসটা দেখতে...,’ গলায় শব্দ আটকে গেল, দ্রুত বার দুই ঢোক গিলল সাতা। ‘বলতে ইচ্ছে করছে না, মাই কাউন্ট,’ ফিসফিস করল সে। ‘আমার ধারণা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।’

ঠিক সেই মুহূর্তে, পলায়নরত আর্মারড কার আর ভূমিকম্পের জন্য দায়ী হাতিটাকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে শিফটা ট্যাংক

বহরের ক্যাপটেন ওগুলোর উপর ফায়ার ওপেন করল-গর্জে উঠল পঞ্চগশ এম এম স্প্যাডাউ।

বলা উচিত, ওগুলোর উপর নয়, ওগুলোর দিকে গোলাবর্ষণ করল সে। আবার, ঠিক ওগুলোর দিকেও নয়-তার সামনে ধুলোর পাহাড় মোচড় আর পাক খাচ্ছে, সেটার দিকে অর্থাৎ আন্দাজের উপর নির্ভর করে গোলাবর্ষণ করল সে। ধুলো তার দৃষ্টিপথে বাধা তৈরি করেছে, মাঝে মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে গাড়ি আর পশু। লক্ষ্যস্থির করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, কারণ হাতির নাগালের বাইরে থাকবার জন্য আর্মারড কারটা ঐকেবঁকে ছুটছে, শেলগুলো এমন জায়গায় গিয়ে বিস্ফোরিত হলো যেখানে আর্মারড কার বা হাতি এক সময় ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে নেই।

‘ফায়ার!’ হুংকার ছাড়ল ক্যাপটেন। ‘কীপ ফায়ারিং!’

তার গানার এক এক করে ছয়টা হাই-এক্সপ্লোসিভ শেল ছুঁড়ল সামনের প্রান্তরে। অন্যান্য ট্যাংকের গানাররা ক্যাপটেনের কামান গর্জে উঠল শুনে উৎসাহিত বোধ করল, তারাও বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করল তার দৃষ্টান্ত।

আতংক মিশ্রিত দিশেহারা ভাব স্তম্ভিত করে তুলেছে কাউন্ট আর সাতাকে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে, দ্বিতীয় দফার প্রথম শেলটা তাদের মাচার সামনের দেয়ালে লাগল। নরম, ভঙ্গুর ঘাসের বেড়ায় লেগে শেল বিস্ফোরিত হলো না বটে, কিন্তু হাই-এক্সপ্লোসিভ শেলটা ছুটে গেল কাউন্টের বাম কানের আঠারো কি সতেরো ইঞ্চি পাশ দিয়ে। বাতাসের তীব্র শব্দ ও আলোড়নে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো কাউন্ট। পিছনের বেড়া চুরমার করে দিয়ে খোলা প্রান্তর ধরে আরও এক মাইল ছুটে গেল শেলটা, তারপর মাটিতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো।

‘আমাকে যদি কাউন্টের আর দরকার না হয়...।’ অবিশ্বাস্য

ব্যস্ততার সঙ্গে একটা স্যাঁলুট ঠুকল সাতা, নিজেকে সামলে নিয়ে কাউন্ট তাকে বাধা দেওয়ার আগেই পিছনের বেড়ার দেয়ালে সদ্য তৈরি গর্ত লক্ষ্য করে ডাইভ দিল সে, মাটিতে পড়েই প্রাণপণে দৌড়াল।

সাতা একা নয়। প্রতিটি মাচা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল শিকারীরা, তাদের সম্মিলিত বাঁচাও বাঁচাও চিৎকারে এঞ্জিনগুলোর কান ফাটানো আওয়াজ, কামানের গর্জন, আর হাতির হুংকার প্রায় চাপা পড়ে গেল।

চেয়ার থেকে উঠবার চেষ্টা করল কাউন্ট, কিন্তু পা জোড়া তার সঙ্গে বেঁধেমানী করল, কেউ দেখলে ভাবত বসে বসে লাফ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে লোকটা। মড়ার মত শুকনো সাদাটে অবয়বে মস্ত হাঁ হয়ে আছে মুখ, কিন্তু ভিতর থেকে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। কাউন্ট বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, প্রায় অচল-শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে আর একবার সে শুধু বসা অবস্থা থেকে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারল। লাভের মধ্যে, সামনের দিকে কাত হয়ে পড়ল চেয়ারটা, মাচা থেকে নিষ্ক্ষিপ্ত হলো কাউন্ট, নীচের গর্তে পড়ে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেলো, দু’হাত দিয়ে ঢাকল মাথাটা।

মাটিতে, গর্তের ভিতর পড়ে আছে কাউন্ট, ভাবছে গর্ত থেকে বেরতে পারবে কিনা, বেরিয়ে ছুটেতে পারবে কিনা। এই সময় মাচাগুলোর গায়ে ফুলস্পীডে ধাক্কা খেলো আর্মারড কার, ঘাসের দেয়াল আর বাঁশের খুঁটি পাখির পালকের মত উড়ে গেল চারদিকে, এক লাফে পেরিয়ে গেল গর্তটা। ঘুরন্ত ঢাকাগুলো কাউন্টের অসাড় শরীর ছুঁতে ছুঁতে ছুঁলো না, তবে মনখানেক বালি আর কাঁকর মেশানো মাটি ফেলে গেল তার গায়ে।

কাঁপা পায়ে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে, দাঁড়বার চেষ্টা করল কাউন্ট, প্রায় সফল হতে চলেছে, এমন সময় অতিকায় বুড়ো হাতিটা সদ্য অস্তিত্ব হারানো মাচার উপর দিয়ে ছুটে গেল। তার একটা প্রকাণ্ড পা কাউন্টের কাঁধ ছুঁলো কি ছুঁলো না, কাঠের উপর করাত চালানোর মত কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, গর্তের ভিতর আবার মুখ খুবড়ে পড়ল সে। হাতির সেদিকে ভ্রক্ষেপ নেই, আগের মতই দূরদিগন্ত লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে সে, এখনও ধাওয়া করছে আর্মারড কারটাকে।

মাটি কাঁপতে শুরু করে জানিয়ে দিল আরও একটা ভারি কিছুর আগমন ঘটতে যাচ্ছে। মাটি খুঁড়ে আরও ভিতরে ঢুকে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল কাউন্ট—কানে তালো লেগে গেছে, মাথা ঘুরছে, আতংকে পশু। এই অবস্থায় কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারবে না সে, হঠাৎ দেখল গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্যাংক বহরের কমান্ডার অর্থাৎ ক্যাপটেন, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে জিঙেস করল, ‘শিকার উপভোগ্য হয়েছে তো, মাই কর্নেল?’

আরও অনেক পরে ফিরে এল বানানটো সাতা, অতি কষ্টে গর্ত থেকে তুলল কাউন্টকে, গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিল, ধরে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে এল রোলস-রয়েসে। পুরোটা সময় ভয়ে ভয়ে থাকল সাতা, তার কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। কারণ একনাগাড়ে অশ্লীল গালিগালাজ আর রোমহর্ষক হুমকি দিয়ে চলেছে কাউন্ট, কার বাপের সাধি তার সামনে দাঁড়ায়।

ট্যাংক বহরের ক্যাপটেন ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে গেল। কাউন্টকে গাড়িতে তুলবার সময় সাতাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল সে, কাউন্ট মার মার করে উঠল, ‘খবরদার, আমাকে ছুঁয়ো না! আমার গায়ে তোমার মত কাপুরুষের ছোঁয়া লাগলে কবরে আমার চোদ্দপুরুষের শাস্তি বিনষ্ট হবে। তোমাকে কর্তব্য অবহেলার দায়ে

অভিযুক্ত করা হলো! তুমি দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে! বানরের লেজের তলায় যে ফুটো থাকে, তুমি তাই!’

রোলস-রয়েসে তোলা হলো কাউন্টকে, গাড়ি ছেড়ে দিল ডিনো। হঠাৎ লাফ দিয়ে সিটের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল কাউন্ট, ক্যাপটেনের দিকে থুথুর কণা ছিটিয়ে আবার শুরু করল, ‘তুমি যুগের কলংক! তুমি ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট! আমি তোমার জন্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের ব্যবস্থা করব...।’ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল তার চিৎকার, রিজ বেয়ে উঠে পড়ল রোলস-রয়েস, শিফটা ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে ওরা। বহু দূর থেকেও দেখা গেল আকাশের গায়ে হাত ছুঁড়ছে কাউন্ট ডিকানডিয়া।

ওদের পিছু নিয়ে মরুর আরও বহু পথ পেরিয়ে এল হাতি, অনেক আগেই পিছিয়ে পড়া ট্যাংক বহর তার নাগাল পাবার আশা ত্যাগ করেছে। শেষ এক মাইল পেরোবার সময় আর্মারড কারের সঙ্গে তার দূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়ল, অবশেষে সে-ও গুঁড়ের প্যাঁচে মাইকেল সেভারসকে জড়িয়ে নেওয়ার আশা ত্যাগ করল, দাঁড়িয়ে পড়ল খোলা প্রান্তরের মাঝখানে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে বিশাল আকৃতি এদিক ওদিক দুলছে, যদিও এখনও কান ঝাপটাচ্ছে সে, সবেগে শূন্যে তুলে দিচ্ছে গুঁড়-শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানানোর তার এই ভঙ্গি অনেকটাই ক্রোধোন্মত্ত মানুষের সঙ্গে মিলে যায়।

নির্জন ধু-ধু প্রান্তরে হাতিকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে আর্মারড কার, টারিটের পাশে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র ভঙ্গিতে তাকে স্যাঁলুট করল মাইকেল। তারপর দুটো চুরুট ধরাল সে, হ্যাচের ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকল, একটা চুরুট ধরিয়ে দিল রানার হাতে। ‘দিনটাকে স্বর্ণ ডিম্বপ্রসবিনী বলা যেতে পারে, ওল্ড চ্যাপ,

কী? ইস্পাতের একজোড়া দানবকে প্রাং করে দিয়েছি, বাকিগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছি সুস্থ মানসিকতা!’

‘কী রকম?’ ব্যাখ্যা দাবি করল রানা, কৃতজ্ঞচিত্তে টান দিল চুরটে।

‘এরপর ট্যাংকম্যানরা আমাদের দেখলে, পরিণতির কথা ভেবে ইতস্তত করবে না—ভাদ্রমাসে মরদগুলো আমার মাদী কুকুরটাকে যেভাবে তাড়া করে, ওরাও সেভাবে আমাদের পিছু নেবে।’

‘তোমার ধারণা, আমাদের জন্যে সেটা শুভ হবে?’ চোখে অবিশ্বাস, প্রশ্নটা করবার জন্য মুখ থেকে চুরট নামাল রানা।

‘তবে আর বলছি কী!’ রানাকে আশ্বস্ত করল মাইকেল।

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালাল, দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়শ্রেণী। তারপর জিজ্ঞেস করল ও, ‘প্রাং? কী ধরনের শব্দ হলো ওটা?’

‘টুপ করে এইমাত্র মনে পড়ল,’ বলল মাইকেল। ‘অর্থবহ, কী?’

খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে কাউন্ট, পরনে শুধু সিল্ক আভারঅয়্যার, তাতে বংশমর্যাদার নিদর্শনগুলো লাল আর নীল সুতো দিয়ে বোনা।

তার নরম, ফ্যাকাসে, দাগহীন শরীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট, আঁচড়ের দাগে ভরা, চামড়া লাল হয়ে আছে, ক্ষতগুলো থেকে বরছে দামী রক্ত।

একাধারে ব্যথা ও আরামে গোঙাচ্ছে কাউন্ট—শার্টের আস্তিন ভাঁজ করে তার উপর ঝুঁকে রয়েছে বানানটো সাতা, কাউন্টের পিঠ আর পায়ের পিছনে অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগাচ্ছে সে, মাঝে

মধ্যে ম্যাসেজের সাহায্যে শিথিল করবার চেষ্টা করছে পেশীগুলো।

‘আরেকটু আস্তে, সাতা। বুঝতে পারছ না, আমি মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছি!’

‘অত্যন্ত দুঃখিত, মাই কর্নেল,’ কাতর কণ্ঠে বলল সাতা। কাউন্ট আবার গোঙাতে শুরু করল, মোচড় খেলো বিছানার উপর। নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যাচ্ছে সাতা, কিন্তু চেহারায় ব্যাকুলতা নিয়ে কী যেন ভাবছে সে।

‘মাই কর্নেল, আমি কি কথা বলতে পারি?’ হঠাৎ এক সময় অনুমতি প্রার্থনা করল সার্জেন্ট।

‘না,’ ধমকে উঠল কাউন্ট। ‘শেষবার যথেষ্ট উদারতার সাথে তোমার বেতন পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। না, সাতা, বেতন প্রসঙ্গে তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না।’

‘মাই কর্নেল, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। এমন একটা বিপদের সময়ে বেতনের মত তুচ্ছ বিষয়ে কথা বলার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।’

‘শুনে ভারি খুশি হলাম, সাতা।’ ব্যথায় উহ্ করে উঠল কাউন্ট। ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওখানটায়, ভাল করে ডলো...ভাল করে!’

কাউন্টের কাঁধ ডলতে ডলতে, কয়েক সেকেন্ড পর, আবার মুখ খুলল সাতা। ‘আপনি যদি ইটালিয়ান বীর জেনারেলদের জীবনী পড়েন, তা হলে দেখতে পাবেন, জুলিয়াস সীজার ও...ও...ও,’ তোতলাতে শুরু করল সে, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে অন্য কোন বীরের নাম উল্লেখ করতে চায়, কিন্তু নাম খুঁজে পাচ্ছে না। ‘...ও...ঠিক আছে, জুলিয়াস সীজারকেই উদাহরণ হিসেবে ধরুন।’

‘বেশ।’

‘এমনকি স্বয়ং জুলিয়াস সীজারও নিজের হাতে তরোয়াল ঘোরাননি। সত্যিকার গ্রেট কমান্ডাররা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁরা পরিচালনা করেন, প্ল্যান দেন, আদেশ করেন—নিকৃষ্ট মরণশীলদের।’

‘তা ঠিক, সাতা।’

‘যে-কোন একটা চাষাও তরোয়াল ঘোরাতে বা বন্দুক চালাতে পারে—কিন্তু নেহাতই গাধা-গরু ছাড়া আর কী বলা যায় তাদের, আপনিই বলুন?’

‘তাও সত্যি।’

‘নেপোলিয়ানের কথাই ধরুন না, কিংবা ধরুন...’ আবার আমতা আমতা করে থেমে গেল সাতা।

‘আচ্ছা, নেপোলিয়ান হলেই চলবে—তার কথাই ধরলাম,’ উৎসাহ দিল কাউন্ট।

‘তিনি যখন যুদ্ধ করলেন, সংঘর্ষের জায়গা থেকে দূরেই থাকলেন, একবারও কাছে ভিড়লেন না। ইতিহাসে আমরা পাই নেপোলিয়ান আর ওয়েলিংটন যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়েছিলেন, ওয়াটারলু-তে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী ছিল? দু’জনের মাঝখানে ছিল কয়েক মাইলের ব্যবধান। তারা নিজেদের বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন, পরিচালনা করেছেন...।’

‘তুমি আসলে ঠিক কী বলতে চাইছ, সাতা?’

‘মাফ করবেন, মাই কর্নেল—আমার আবেদন, আপনার সাহস যেন আপনাকে অন্ধ করে না দেয়; আপনি বীরশ্রেষ্ঠ, শত্রুরা আপনার নাম শুনেই আধমরা হয়ে যায়, কাজেই সত্যিকার একজন কমান্ডারের দূরে সরে থাকার ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আপনারও উচিত...’ দীর্ঘ বাক্যটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গঠনরীতি বদলে প্রশ্নাকারে শেষ করল সে, ‘...মাই

কর্নেল, আমি কি অযৌক্তিক কিছু বলছি?’

অধীর আগ্রহ আর উত্তেজনার সঙ্গে কাউন্ট কী বলে শুনবার অপেক্ষায় থাকল সাতা। কথাগুলো বলবার জন্য সবটুকু সাহস একত্রিত করতে হয়েছে তাকে। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে সে, কথাগুলো শুনবার পর কাউন্ট যদি তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়, তাও ভাল, তবু কাউন্টের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আর সে যাবে না। কাউন্টের পাশেই তার জায়গা, কাউন্টকে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা যায় তা হলে তারও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

‘প্লিজ, মাই কাউন্ট। আপনি আমাদের দিকেও একটিবার মুখ তুলে তাকান! ঈশ্বর না করুন, আপনার যদি কিছু হয়, আমরা স্রেফ এতিম হয়ে যাবো! মহাপরাক্রমশালী বীরদের মত আপনিও নিজের নিরাপত্তার দিকটা নিয়ে ভাবুন...।’

কাউন্টের মনের কথাই বলেছে সাতা, সে-ও গত ক’দিন ধরে ভাবছে কোন অজুহাতে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকা যেত! পৈত্রিক প্রাণের উপর কার না মায়া আছে। ‘সাতা,’ কাউন্ট বলল, ‘তুমি একজন দার্শনিক।’

বিনয়ে বিগলিত হলো সাতা। ‘আপনি আমাকে অতিরিক্ত সম্মান দিচ্ছেন, মাই কাউন্ট।’

‘না, সাতা! না! এ তোমার ন্যায্য পাওনা! হতে পারে তোমার জন্ম হয়েছে রাস্তার ধারে বা নর্দমার পারে, কিন্তু তুমি একটা প্রতিভা।’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নত করল সাতা।

‘আমার সাহসী যোদ্ধাদের প্রতি আমি অন্যায় করেছি,’ বলল কাউন্ট। তার বেদনাকাতর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল, উদ্ভাসিত

হয়ে উঠল মুখ, চোখে জ্বলে উঠল কীসের যেন একটা আলো, সদ্য মুক্তি পাওয়া কয়েদীর চোখেই সচরাচর দেখা যায় আলোটা। ‘এতদিন আমি শুধু নিজের কথাই ভেবেছি—নিজের গর্ব, নিজের সম্মান। বেপরোয়া হয়ে উঠেছি, বিপদের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছি মৃত্যুর মুখে, ভেবে দেখিনি কী মূল্য দিতে হতে পারে। একবারও মনে পড়েনি আমি না থাকলে আমার সাহসী যোদ্ধারা এতিন হয়ে যাবে, নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে।’

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল সাতা। ‘আপনার বিকল্প কোথায় পাব আমরা?’ প্রায় কেঁদে ফেলবার অবস্থা হলো তার।

‘সাতা।’ পিতাসুলভ নরম সুরে ডাকল কাউন্ট, সাতার কাঁধে একটা হাত রাখল। ‘ভবিষ্যতে অবশ্যই আমাকে আরও কম স্বার্থপর হতে হবে।’

‘মাই কাউন্ট, শুনে কী যে আমার আনন্দ হচ্ছে সে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না!’ কেঁদেই ফেলল সাতা, চান্ডি ক্যাম্পে নিরাপদে সময় কাটানোর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে, ভাবতেও পারেনি সে। ‘আপনার কাজ হলো কমান্ড করা।’

‘প্ল্যান দেয়া,’ বলল কাউন্ট।

‘পরিচালনা করা,’ কাঁদতে কাঁদতে হাসল সাতা।

‘আমার ভয়, এটাই আমার নিয়তি।’

‘ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্ব।’ উত্তেজনা খাটিয়ার উপর বসে পড়েছিল কাউন্ট, তাকে ধরে ধীরে ধীরে আবার শুইয়ে দিল সাতা।

‘সাতা,’ বলল কাউন্ট। ‘শেষবার তোমার বেতন নিয়ে কবে আমরা আলোচনা করি বলতে পারবে?’

‘অনেক মাস পেরিয়ে গেছে, মাই কাউন্ট।’

‘এসো, বিষয়টা নিয়ে এখনি আলোচনাটা সেরে ফেলি,’ বলল কাউন্ট। ‘তুমি তো একটা রত্ন—অমূল্য! ধরো, আরও এক হাজার

লিরা, প্রতি মাসে?’

‘মনে উঁকি দিয়েছিল দেড় হাজার লিরার কথা,’ সঙ্করণ সুরে বিড়বিড় করল বানানটো সাতা।

লজ্জার লেশমাত্র নেই, বানানটো সাতার আবিষ্কৃত সামরিক দর্শন নিজের বলে চালিয়ে দিল কাউন্ট ডিকানডিয়া। সেদিন সন্ধ্যায় অফিসার্স মেসে তার অফিসাররা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করল কাউন্টকে, মদ আর ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে দর্শনের সারমর্ম ব্যাখ্যা করল সে। শিফটা বাহিনীর পিছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনার ধারণাটি শুধু যে বাস্তবসম্মত তাই নয়, ভারি উৎসাহব্যঞ্জকও বটে। অফিসারদের উৎসাহ হঠাৎ করে ভাটা পড়ল যখন তারা জানতে পারল যে নতুন দর্শন তাদের কারও জন্য প্রযোজ্য নয়, একা শুধু কাউন্টের বেলায় খাটবে। বাকি সবাইকে ঈশ্বরের পবিত্র নামে আত্মবলি দেওয়ার সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ অকৃপণভাবে দান করা হবে। বলাই বাহুল্য, এই পর্যায়ে দর্শনটির জনপ্রিয়তা সর্ব নিঃপর্যায়ে নেমে এল।

সবশেষে, বেশিরভাগ প্রতিবাদ ও আপত্তি অগ্রাহ্য করে, কাউন্ট সিদ্ধান্ত দিল—নতুন দর্শন মাত্র তিনজনের জন্য প্রযোজ্য হবে। তার আর সাতার নামের সঙ্গে আরেকটা নাম যোগ হলো, মেজর লুইগি রাকা। এখন থেকে এই তিনজনই খার্ড ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দেবে।

নতুন ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে খুশি হলো মেজর লুইগি রাকা। এতদিন শিফটা বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে নামকাওয়াস্তে ছিল সে, কাউন্ট নাক গলানোয় যুদ্ধ পরিচালনায় তেমন কোন ভূমিকা সে রাখতে পারেনি। নতুন দর্শনের কথা

শুনেই সে বুঝতে পারল, ভয়ে গা বাঁচাতে চাইছে কাউন্ট। সে ভাবল, এই সুযোগটাই নিতে হবে তাকে। কাউন্টকে পিছিয়ে থাকবার উৎসাহ দিয়ে সুযোগ মত নিজে সামনে এগিয়ে আসবে সে, শিফটা বাহিনীকে নিজের খুশিমত পরিচালনা করবে। বুদ্ধিটা তাকে এতই আত্মহারা করে তুলল, নিজের তাঁবুতে ফিরল সে বগলের তলায় এক বোতল স্থানীয় তেজ নিয়ে।

পরদিন সকালে তীব্র মাথাব্যথা নিয়ে বাহিনীর সামনে উপস্থিত হলো মেজর, তার চোটপাট আর মারমুখো ভাব দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল শিফটার। সাত সকালেই দেখা গেল, মেজরের নির্দেশে সৈনিকরা তাদের রাইফেল পরীক্ষার করতে বসেছে। ইউনিফর্মের তামার বোতাম ঘষে মেজে চকচকে করা হলো, গলার কাছে শেষ বোতামটিও লাগাতে হলো সবাইকে। কাজের সময় কেউ সিগারেট ধরাতে পারল না, নির্দিষ্ট সময়ের পর ল্যাট্রিনের দিকে কাউকে যেতে দেখা গেলে বাধা দেওয়া হলো, এমনকী প্রস্রাব করবার সময়ও বেঁধে দেওয়া হলো, প্রতি ছ'ঘণ্টায় একবার। বাহিনীর প্রতিটি গ্রুপের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করল মেজর রাকা, দায়িত্ব আর কাজ ভাগ করে দিল সবাইকে। মোটা ছড়ি দিয়ে দু'চার ঘা লাগাল দু'একজনকে, স্রেফ কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য।

বিকেলে অনার গার্ডদের প্যারেড প্রত্যক্ষ করল মেজর। সদ্য তৈরি এয়ারফিল্ডের শেষ মাথায় থামল তারা, বিমানবহরের প্রথম চালান হিসাবে একটা প্লেন আজ আসবার কথা। অনুষ্ঠানে কাউন্ট ডিকানডিয়াও উপস্থিত।

ওটা একটা ক্যাপরনি বম্বার, এঞ্জিনের সংখ্যা তিন। উত্তর আকাশের কোণ থেকে অলসভঙ্গিতে উড়ে এল সেটা, কাঁচা মাটির দীর্ঘ রানওয়ের উপর বার কয়েক চক্কর দিল, তারপর লাল ধুলোর ঝড় তুলে নেমে এল নীচে।

রূপালি ফিউজিলাজ থেকে প্রথমে নামল জেনারেল ফাদ আর মি. এন্ড্রের রাজনৈতিক প্রতিনিধি, সিনর মাস্ত্রোনি। পরনে সদ্য ভাঁজ খোলা লিনেনের সুট, ভাবগম্ভীর চেহারা। কাউন্ট অপেক্ষা করে থাকল, তার ধারণা মাস্ত্রোনি তাকে স্যাঁলুট করবে। কিন্তু তা করছে না অথচ সময়ও বয়ে চলেছে, ধৈর্য হারিয়ে সে-ই মাস্ত্রোনিকে ঠকাস করে স্যাঁলুট করল। এতক্ষণে ক্ষীণ হাসি ফুটল মাস্ত্রোনির ঠোঁটে—কাউন্টের মত সে-ও অপেক্ষা করছিল। স্যাঁলুটের উত্তরে মাথার পানামাটা দু'আঙুলে ধরে সামান্য একটু উঁচু করল, তারপর মুহূর্তের জন্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করল তারা।

আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে পাইলটের দিকে ফিরল কাউন্ট। কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিল সে, 'আমি তোমার মেশিনে চড়তে চাই।' ইতিমধ্যে ট্যাংকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সে, প্রকৃতপক্ষে ট্যাংক বহর আর তার ক্যাপটেনের প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে তার।

মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার পর ক্যাপটেন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বদলেছে কাউন্ট। তাকে বহিষ্কার করেনি, আসমারায় ফেরত পাঠায়নি, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনেও দাঁড় করায়নি—লোকটার জন্য আরও ভীতিকর একটা শাস্তির ব্যবস্থা করেছে সে। ক্যাপটেনের সার্ভিস রিপোর্টে দু'পৃষ্ঠা জুড়ে অভিযোগ আর দুর্নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বলা হয়েছে এর মত অযোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেয়াদপ, কাপুরুষ ক্যাপটেন জীবনে কখনও দেখেনি কাউন্ট। কাউন্ট জানে, লোকটার ক্যারিয়ার ধ্বংস করবার জন্য এই রিপোর্ট জাদুমন্ত্রের মত কাজ করবে। মনের মত প্রতিশোধ নিতে পেরে তৃপ্তি বোধ করেছে সে, তবে ট্যাংক সম্পর্কে তার আর কোন আগ্রহ নেই। এখন তার অধীনে একটা প্লেন

পাঠানো হয়েছে। প্লেনে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা অত্যন্ত উত্তেজক আর রোমান্টিক অভিজ্ঞতা হবে, সন্দেহ কী!

‘এনিমি পজিশনের ওপর দিয়ে উড়ে যাব আমরা,’ আবার বলল কাউন্ট, ‘মাটি থেকে যথেষ্ট ওপর থাকব, সম্মানসূচক একটা দূরত্ব অবশ্যই থাকা উচিত।’ আসলে সে বলতে চাইছে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে থাকতে হবে প্লেনটাকে।

‘পরে,’ বলল মাস্ত্রোনি, তার কথার মধ্যে এমন কর্তৃত্বের সুর ফুটল যে মর্যাদাসচেতন কাউন্টের শিরদাঁড়া ঝট করে খাড়া হয়ে গেল। লোকটার দিকে কটমট করে তাকাল সে।

‘জেনারেল ফাদ ও মি. এক্সের ব্যক্তিগত বার্তা বহন করছি আমি,’ বলল মাস্ত্রোনি, কাউন্টের আগুনে দৃষ্টি গ্রাহ্যই করল না।

কুকড়ে ছোট হয়ে গেল কাউন্ট আর তার মর্যাদাবোধ। ‘তা হলে এক গ্লাস ওয়াইন,’ বিড়বিড় করে বলল সে, মাস্ত্রোনির হাত ধরে অপেক্ষারত রোলস-রয়েসের দিকে এগোল।

‘প্রিন্স হাসান সালেকে সম্রাট হাইলে সেলাসী গৃহবন্দী করে রেখেছেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে একজন কমিউনিস্ট। কিন্তু গৃহবন্দী থাকলেও, গুজব রটেছে যে প্রিন্স নাকি সামরিক সাহায্য চেয়ে কমিউনিস্ট নেতাদের কাছে গোপন বার্তা পাঠিয়েছে। তার বার্তায় সম্ভবত কাজও হয়েছে, কমিউনিস্টদের বিরাট একটা বাহিনী উত্তর থেকে রওনা হয়েছিল আগেই, তারা ডেসি রোড হয়ে লেক টানার দিকে যাবে সেলাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত গেরিলাদের সাথে মিলিত হবার জন্যে—ধারণা করা হচ্ছে, ডেসি রোডে পৌঁছে দু’ভাগে ভাগ হবে তারা, এক ভাগ চলে আসবে সারডিতে, প্রিন্স হাসানের বাবা কামাল হাসান আর তার আদিবাসী বাহিনীকে শিফটাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করার জন্য। ভয়ের কিছু

নেই, কমিউনিস্ট বাহিনীকে ধাওয়া করে ধ্বংসের জন্যে শিফটাদের আরেকটা বাহিনী উত্তরে আদাজল খেয়ে লেগেছে। তবে তারা যদি ডেসি রোডে পৌঁছুতে সমর্থ হয়, তা হলে আপনার এবং এই এলাকার ভাবী গভর্নর নূর আয়াঙ গালার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে। কী করতে হবে আপনি জানেন।’

গভীর মনোযোগ দিয়ে মাস্ত্রোনির কথাগুলো শুনল কাউন্ট, দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। ‘খুব ভাল করে জানি।’

‘ডেসি রোডে কমিউনিস্টদের বাধা দেয়ার জন্যে নূর আয়াঙ গালার সাহায্য দরকার আমাদের। আমি এসেছি তার সাথে আপনার একটা চুক্তি তদারক করতে। সে আর তার বাহিনী যদি আপনাকে সাহায্য করে, সারডি গিরিসংকট পেরিয়ে কমিউনিস্ট বাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্যে আপনিও অ্যাডভান্স করতে পারবেন। এবার, দশ মন সোনার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। কোথায় সেটা?’

‘কথা ছিল আদিবাসীরা পরাজিত হলে তাদের স্বর্ণালংকার লুঠ করা হবে,’ বলল কাউন্ট। ‘কিন্তু প্লেন পৌঁছুতে দেরি হওয়ায় এখনও আমরা আক্রমণে যেতে পারিনি...।’

‘মি. এক্স ও জেনারেল ফাদ জানতেন সোনা সংগ্রহে ব্যর্থ হবেন আপনি, তাই তাঁরা কয়েক বাস্ক সোনার বার পাঠিয়ে দিয়েছেন—মন পাঁচেক হবে,’ বলল মাস্ত্রোনি। ‘এবার শুনুন, জনাব নূর আয়াঙের সাথে দেখা করার কী আয়োজন করা হয়েছে। কয়েকজন লোক আমার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে পাহাড়ে, তারাই জনাব নূর আয়াঙের সাথে দেখা করে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছে। আমরা তাঁর সাথে দেখা করে প্রতিশ্রুতি অনুসারে সোনার বাস্ক হস্তান্তর করব। আজ রাতেই বৈঠক। গাইড হিসেবে লোক

আছে আমার সাথে। বৈঠকের স্থান ঠিক করা হয়েছে এখান থেকে আশি কিলোমিটার দূরে, সন্ধ্যার পরপরই রওনা হব আমরা। মাঝরাতে বৈঠক, আশা করি সময়মতই পৌঁছুতে পারব।’

‘ভেরি গুড,’ খুশি মনে বলল কাউন্ট। ‘সৈনিক বা ট্রাক যা লাগে সব আপনি নিয়ে যেতে পারবেন।’

ট্রাফিক পুলিশের মত একটা হাত তুলল মাস্ত্রোনি। ‘মাই ডিয়ার কর্নেল, জনাব নূর আয়াঙের সাথে দেখা করার জন্যে আমাদের যে প্রতিনিধিদল যাচ্ছে, আপনিই তার নেতৃত্ব দেবেন।’

‘অসম্ভব!’ এত সহজে তার নতুন দর্শন বিসর্জন দিতে রাজি নয় কাউন্ট। ‘এখানে আমার কত কাজ, আক্রমণের জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে।’ সময়সীমা মধ্যরাত, স্থান বিপজ্জনক ডানাকিল মরু, কে জানে নতুন কী বিপদ ওত পেতে আছে ওখানে!

‘চুক্তিপত্রে আপনাকে সই করতে হবে, সহযোগিতার এই নতুন দুয়ার খুলতে হলে আপনার শারীরিক উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, বুঝতে পারছেন না? আপনার ইউনিফর্ম গালাদের প্রভাবিত করবে...।’

‘আমার কাঁধ!’ হঠাৎ ব্যথায় গুঁড়িয়ে উঠল কাউন্ট। ‘এমন আঘাত পেয়েছি, ডাক্তার আমাকে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছে! আমার বদলে আমার একজন অফিসার যাবে। ট্যাংক বহরের ক্যাপটেন। তার ইউনিফর্ম আমার চেয়ে কোন অংশে কম...।’

মাথা নাড়ল মাস্ত্রোনি। ‘না।’

‘তা হলে আমার একজন মেজরকে নিয়ে যান,’ প্রস্তাব দিল কাউন্ট। ‘মেজর লুইগি রাকা, লোকটা বাকচাতুরী জানে বটে!’

‘না।’

‘তা হলে আপনি নিজেই...।’

‘জেনারেল ফাদ বলেছেন, প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন

আপনি। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, রেডিও অপারেটরকে এখনি আসমারার সাথে যোগাযোগ করতে বলুন।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাউন্ট, হাঁ করল, মুখ বন্ধ করল আবার, মনে মনে ত্যাগ করল শিফটা বাহিনীর পিছনে ওয়েলস অভ চান্ডির নিরাপদ আশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকার সংকল্প। ‘ঠিক আছে, ঈশ্বরের নামে সন্ধ্যার পর রওনা হব আমরা।’

বোকার মত আবার বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি নয় কাউন্ট। সন্ধ্যা-উত্তর লালিমার ভিতর চান্ডি থেকে রওনা হলো কনভয়, সামনে একজোড়া সিভি থ্রি ট্যাংক থাকল এসকর্ট হিসাবে, তার পিছনে চার ট্রাক ভর্তি শিফটা সৈনিক, মাঝখানে রোলস-রয়েস, আর পিছনে থাকল বাকি ট্যাংক দুটো।

রোলস-রয়েসে রয়েছে কাউন্টের দু’পাশে মাস্ত্রোনি আর তার গালা গাইড। কাঠের একজোড়া বাস্ত্রের উপর পা দিয়ে রেখেছে মাস্ত্রোনি। সামনের সিটের নীচে রয়েছে আরও দুটো বাস্ত্র, সিটের উপর দিয়ে উঁকি মেরে মাঝে মধ্যেই সেগুলোর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে সে। গাইড গালা লোকটার বয়স হবে তিরিশের মত, গোত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সে-ও কুৎসিত কদাকার চেহারার অধিকারী, তার উপর সারা মুখে ফোঁটা আকৃতির বসন্তের আর লম্বা আকৃতির কাটাকুটির দাগ, হিংস্র খুনীর পরিচয় আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। পরনে সাদা আলখেল্লা, বছরখানেক বা তারও বেশি হলো ওটার রঙ কালো হয়ে গেছে। সিকি সেকেন্ড তার ঘ্রাণ নিল কাউন্ট, পরমুহূর্তে সুগন্ধী মাখানো রুমালটা চেপে ধরল নাকে।

‘লোকটাকে বলুন সে যেন সামনের একটা ট্যাংকে গিয়ে বসে,

ক্যাপটেনের সাথে,’ মাস্ত্রোনিকে বলল কাউন্ট। ‘ডিনো, গাড়ি থামাও!’

রোলস-রয়েস দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখতে পেয়ে সামনের ট্যাংক জোড়াও থেমে গেল। সিটের উপর দাঁড়াল কাউন্ট, সামনের একটা ট্যাংকের টারিটে ক্যাপটেনকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল, ‘এদিকে এসো, তোমার কমান্ডার তোমাকে ডাকছে।’

ট্যাংক থেকে নেমে এল ক্যাপটেন। ‘তোমাকে ছোট্ট একটা শাস্তি দিলাম, ক্যাপটেন,’ বলল কাউন্ট, পাশে বসা লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখাল সে। ‘এ হলো একজন গালা, আমাদের গাইড। একে তোমার পাশে বসতে দিতে হবে!’ নির্দেশ দেওয়ার সময় কাউন্টের চোখ জোড়া আত্মতৃপ্তিতে জ্বলজ্বল করে উঠল।

গালা গাইডকে নিয়ে ট্যাংকের টারিটে ফিরে গেল ক্যাপটেন।

আলো না জ্বলে গাড়ি চালান ওরা, প্রান্তর জুড়ে চাঁদের আলো থাকলেও দু’পাশের আকাশ-হোঁয়া পাহাড়ের পাদদেশ অন্ধকারে ঢাকা। নির্দিষ্ট জায়গায় নিঃসঙ্গ একজন অশ্বারোহী ওদের জন্য অপেক্ষা করছে, কাঁটা ঝোপের কালো আকৃতির পাশে আরও কালো একটা ছায়ামূর্তি। অ্যামহারিক ভাষায় তার সঙ্গে কথা হলো মাস্ত্রোনির।

‘জনাব নূর আয়াঙ গালায় ভয়, তার সাথে বেঈমানী করা হতে পারে,’ কাউন্টকে বলল মাস্ত্রোনি। ‘এসকট এখানে রেখে লোকটার সাথে শুধু গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে আমাদের।’

‘না!’ চৈচিয়ে উঠল কাউন্ট। ‘না! না! অসম্ভব! আমি রাজি হব না!’

কাউন্টকে রাজি করাতে দশ মিনিট লাগল, বার কয়েক জেনারেল ফাদ আর মি. এক্সের ভয় দেখানোয় কাজ হলো। এই দশ মিনিটে শুকিয়ে যেন অর্ধেক হয়ে গেল কাউন্ট, হাঁপাতে

হাঁপাতে আবার রোলস-রয়েসে চড়ল সে। ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু পাহাড়ী পথ ধরে ধীরগতিতে এগোল গাড়ি। আধ ঘণ্টা এগোবার পর পাথর ছড়ানো ঢালের নীচে থামতে হলো ডিনোকে। এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে। আরও পাঁচ মিনিট ব্যয় হলো কাউন্টকে রাজি করাতে। কাঠের দুটো বাক্স রশি দিয়ে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে রাখা হলো, বাকি দুটো কাঁধে তুলে নিল ডিনো আর সাতা। ছোট্ট দলটার মাঝখানে থাকল কাউন্ট, হাতে পিস্তল। হোঁচট খেতে খেতে এগোল ওরা।

এঁকেবেঁকে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ, চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় পা ফেলতে সামান্য ভুল করলে সরাসরি নীচের খাদে পড়তে হবে। পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে থাকল কাউন্ট, মাস্ত্রোনি তার একটা হাত ধরে আছে। খোলা, চওড়া একটা জায়গায় উঠে এল ওরা, সামনে পিরিচ আকৃতির একটা বিশাল গর্ত, গর্তের কিনারায় কুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে কালো ভূতের মত প্রহরীরা। গালাদের সম্পর্কে, তাদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে, অনেক গল্প শুনেছে কাউন্ট, ভাগ্যের ফেরে তাদের মাঝখানে পড়তে হবে তাকে, ঘুণাঙ্করেও কখনও ভাবেনি সে। পায়ে জোর পেল না, ধড়ফড় করে উঠল বুক। ইচ্ছে হলো বসে পড়ে, কিন্তু মাস্ত্রোনি তাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে। ভূতগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল, তাদের শুধু চোখের সাদা অংশ দেখা যায়, বাকি সব অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আছে। ঢাল বেয়ে পিরিচের ভিতর নামল ওরা।

নীচে খোলা মাঠে লাল কার্পেটের উপর অনেকগুলো তাকিয়া, সেগুলোর মাঝখানে বহরঙা সিল্কের আলখেল্লা পরে বিশালকায় এক লোক আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে রয়েছে, তার মাথার পিছনে কাঠের দুটো নিচু স্তম্ভের মাথায় জ্বলছে একজোড়া প্যারাক্সিন

ল্যাম্প। নূর আয়াঙের দু'পাশে বসেছে দুই যুবতী, কোমরের উপর স্বর্ণালংকার ছাড়া কোন আবরণ নেই। প্রথমেই কাউন্টের চোখ পড়ল মেয়ে দুটোর বুকের উপর। অন্য কোন পরিস্থিতি হলে নিজেকে চাঙা হয়ে উঠবার অনুমতি দিত সে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সে প্রশ্ন ওঠে না—এখনকার জরুরী কাজটা হলো পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে শিফটা বাহিনীর যতটা সম্ভব পিছনে ফিরে যাওয়া।

‘গালা, হারারি ও রাসটাফারিয়ানদের ভাবী গভর্নর,’ নূর আয়াঙের সামনে কাউন্টকে নিয়ে বসল মাস্তোনি, পরিচয় করিয়ে দিল। কাউন্ট দেখল, গালা প্রধানের একেকটা আঙুল সাগরকলার মত মোটা, প্রতিটি আঙুলে পাথর বসানো সোনার আঙুটি। কাউন্টকে দেখে, কেন কে জানে, হেসে গড়িয়ে পড়ল মেয়ে দুটো। নূর আয়াঙ গালা তাদের নগ্ন উরুতে সশব্দ থাবা মেরে চুপ করাল।

অ্যামহারিক ভাষায় নূর আয়াঙ বলল, ‘খোশ আমদেদ।’

মাস্তোনিকে হুকুম করল কাউন্ট, ‘যথোপযুক্ত জবাব দিন!’ তার কণ্ঠস্বর কর্কশ।

দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করল মাস্তোনি। তার কথায় কান না দিয়ে একদৃষ্টে কাউন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল নূর আয়াঙ গালা। কাউন্টের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে তার মনে হলো, কর্নেল অত্যন্ত বদমেজাজী, সত্যিকারের বীরযোদ্ধারা যেমন হয়ে থাকে। কাউন্টের চেহারা, ল্যাম্পের আলোয়, থমথমে লাগল তার চোখে—শক্তিমান পুরুষের নমুনা। কর্নেলের কালো ইউনিফর্মে লটকে থাকা মেডেল, পদক আর ব্যাজগুলো গুণতে শুরু করে শেষ করতে পারল না সে। শুনতে পেল কাউন্ট ক্রোধোন্মত্ত ঝাঁড়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সব মিলিয়ে সাংঘাতিক প্রভাবিত হলো নূর আয়াঙ গালা।

এরপর ল্যাম্পের আলোয় উদয় হলো ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু ডিনো আর সাতা, সঙ্গে একজন প্রহরী, প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে কাঠের বাস্ক। বাস্কের ভারে প্রত্যেকের শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে আছে। বাস্কগুলো গালা প্রধানের সামনে নামানো হলো।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল নূর আয়াঙ, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল মাস্তোনির বক্তৃতা। কার্পেটের বাইরে অন্ধকার, অন্ধকার থেকে বহু লোকের গুঞ্জন ভেসে আসছে, সেদিকে ভয়ে ভয়ে বারবার তাকাচ্ছে কাউন্ট। রক্ত হিম করা আরেকটা চিৎকার বেরিয়ে এল গালাপ্রধানের গলা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের গুঞ্জনও এবার থেমে গেল। ফিসফাস থামল, তবে অদৃশ্য ভিড়টা এগিয়ে এল কার্পেটের আরও কাছাকাছি, কারণ গোত্রপ্রধানের দেহরক্ষীরা কাঠের বাস্ক খুলতে শুরু করেছে।

দড়িডা খোলা হলো। এরপর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নূর আয়াঙ, কোমরের ছোরা বের করে সামনে এগোল সে, ছোরার ডগা দিয়ে একটা বাস্কের ডালা তুলল।

বাস্ক ভর্তি সোনার বার দেখে দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখ। কয়েক সেকেন্ড নড়ল না সে, তারপর হাত দুটো লম্বা করে দিল সে, দুই মুঠোয় সোনার কয়েকটা বার নিয়ে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারে। গালাদের মধ্যে ছড়োছড়ি শুরু হলো।

উঁকি মেরে কাউন্টও বাস্কের ভিতরটা দেখল একবার। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তার সম্পত্তির পরিমাণ কম নয়, তবু এক সঙ্গে এত সোনা দেখে মাথাটা একবার ঘুরে উঠল। ‘এ তো সাত রাজার ধন!’ বিড়বিড় করল সে। ‘আর পাচ্ছে কিনা একটা অসভ্য জন্মদ! জেনারেল ফাদের এ ভারি অন্যায় আচরণ!’

নিচু গলায় মাস্তোনি বলল, ‘কিন্তু ভেবে দেখুন, যুদ্ধ শেষ হলে

আপনি কী পাচ্ছেন! গোটা ইরিত্রিয়া!’

থপ থপ পা ফেলে নিজের জায়গায় ফিরে এল নূর আয়াঙ, গদিতে বসে তাকিয়ায় হেলান দেওয়ার বদলে হেলান দিল কাউন্টের গায়ে, তার কাঁধে আধ মন ওজনের একটা চাপড় মেরে খ্যাক খ্যাক করে হাসল কিছুক্ষণ, অপর হাতটা দিয়ে মেয়েদের একজনের ঘাড় ধরল, তাকে প্রায় শূন্যে তুলে নামিয়ে আনল কাউন্টের কোলের উপর। ‘এটা আপনার,’ অ্যামহারিক ভাষায় ঘোষণা করল সে।

‘যথোপযুক্ত জবাব দিন,’ মাস্ত্রোনিকে নির্দেশ দিল কাউন্ট।

কিন্তু মাস্ত্রোনি কিছু বলবার আগে নূর আয়াঙই শুরু করল।

সে খামবার পর মাস্ত্রোনি কাউন্টকে বলল, ‘উনি আধুনিক রাইফেল আর মেশিনগান চাইছেন।’

কোলে গালা যুবতীকে নিয়ে কাউন্ট প্রশ্ন করল, ‘আমাদের পজিশন কী?’

‘অবশ্যই তাঁকে আমরা ও-সব দিতে পারি না! এক মাস, কিংবা এক বছর পর উনি আর আমাদের মিত্র নাও থাকতে পারেন। গালাদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলার উপায় নেই।’

‘যথোপযুক্ত জবাব দিন।’

‘উনি আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়তা দাবি করছেন যে কমিউনিস্টদের স্পাই মেয়েটা আর বিদেশী দুই সন্ত্রাসবাদী গ্রেফতার হওয়ামাত্র ওঁর হাতে তুলে দিতে হবে।’

‘আপত্তি করার কোন কারণ আছে কি?’

‘ওঁর হাতে তুলে দিলেই বরং বেঁচে যাই আমরা, ওদের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হৈ-চৈ শুরু হলে বলতে পারব, আমরা কিছু জানি না।’

‘কিন্তু ওদেরকে তার এত কেন দরকার? ওরা তো বরং আমার

বীর যোদ্ধাদের টরচার করেছে, ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বন্দীদের! ওদের শাস্তি দেয়ার অধিকার একা আমার...।’

‘শাস্তির কথা যদি ওঠে, আপনার চেয়ে বরং উনিই ভাল দিতে পারবেন। উনি যে শাস্তি দেবেন, দুঃস্বপ্নেও আপনি তা কোন দিন দেখবেন না।’ নূর আয়াঙের দিকে ফিরল সে, অ্যামহারিক ভাষায় জানাল, ‘আমরা কথা দিলাম, ওদেরকে আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওদের নিয়ে যা খুশি করতে পারবেন আপনি।’

কালো আর মোটা চোঁট প্রসারিত করে হাসল নূর আয়াঙ, পাশে বসা মেয়েটার গাল টিপে দিল।

দেখাদেখি কাউন্টও তার কোলে বসা ধুমসী মেয়েটার গাল টিপে দিল। ইতিমধ্যে নূর আয়াঙ গালা তাকে কামড়ে বা খামচে দেয়নি দেখে, ধীরে ধীরে তার সাহস ফিরে আসতে শুরু করেছে। মাস্ত্রোনিকে সে বলল, ‘ভাবী গভর্নরকে বলুন, বিনিময়ে আমার কিছু তথ্য দরকার। শত্রুপক্ষের শক্তি কতটুকু জানতে চাই আমি-রাইফেল আর মেশিনগানের সংখ্যা, লোকবল, গিরিসংকটে ঢোকার মুখে ক’টা আর্মারড কার রয়েছে। জানতে চাই ট্রেঞ্চগুলোর পজিশন, স্ট্রং পয়েন্ট, আর বিশেষ করে, নূর আয়াঙের বাহিনী এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় রয়েছে।’ আঙুলের গিঁট গুণে প্রতিটি বিষয় উল্লেখ করেছে সে, মাথা একদিকে কাত করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথাগুলো গিলছে নূর আয়াঙ গালা।

‘ফাঁদে ফেলতে হলে টোপ দিতে হবে?’ প্রশ্ন করল মাইকেল। ‘হ্যাঁ, তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।’

চঞ্চলার ছায়ায় পাশাপাশি উবু হয়ে বসে রয়েছে ওরা, রানার হাতে ছোট একটা শুকনো ডাল সেটা দিয়ে বালির উপর ম্যাপ

আঁকছে সে, মাইকেলের সঙ্গে আলোচনা করছে শিফটাদের নতুন শক্তিকে কীভাবে ঠেকানো যায়।

‘অশ্বারোহী পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না। একবার কাজ হয়েছে, দ্বিতীয়বার আশা করা বোকামি হবে।’

কথা বলল না মাইকেল, রানার আঁকা জটিল ম্যাপটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল।

‘ট্যাংক কমান্ডারকে ওষুধ যা দেয়ার দেয়া হয়েছে। এরপর আর্মারড কারের ছায়া দেখলেই হয়, তেড়ে আসবে ঠিক তোমার পোষা...।’

‘হ্যাঁ, জানি।’ মাইকেল হাসছে না। ‘আবার আমার মনে হচ্ছে, একজন সামরিক অফিসারের কথা শুনিছি আমি।’

‘আমরা একটা কার পাঠাব,’ বলল রানা। ‘একটাই যথেষ্ট। আরেকটাকে রিজার্ভ রাখব-এখানে।’ বালির ম্যাপে আঙুল রাখল সে। ‘প্রথম কারটা যদি কোন বিপদে পড়ে বা...।’

‘যদি হাই-এক্সপ্লোসিভ একটা শেল ওটাকে গুঁড়িয়ে দেয়, বলতে চাইছ?’

‘ঠিক তাই। তা যদি ঘটে, দ্বিতীয় কারটা গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠবে, আর ওটার দিকে ধেয়ে আসবে ওরা।’

‘পানির মত সোজা, ওল্ড চ্যাপ, কোন ব্যাপারই না। অখ্যাত প্রতিভা মাসুদ রানার ওপর পুরোপুরি আস্থা আছে আমার।’

‘প্রথম কারে কে থাকবে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এসো টস করি,’ প্রস্তাব দিল মাইকেল, রূপালি মুদ্রাটা ভোজবাজির মত বেরিয়ে এল তার হাতে, রানা হেড বলায় আঙুলের টোকা দিয়ে সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে, সশব্দে দু’হাতের তালু এক করে ধরে ফেলল।

এক করা তালু খুলল মাইকেল। ‘তোমার কপাল খারাপ, ওল্ড

চ্যাপ! টেইলস!’

আফ্রিকার মামবা সাপের মত ছোবল মারল রানার হাত, মাইকেলের কজি চেপে ধরল ও।

‘কী হলো!’ প্রতিবাদ জানাল মাইকেল। ‘তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না যে আমি...’, অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ বাঁকাল সে।

‘নো অফেন্স,’ আশ্বস্ত করল রানা, মাইকেলের হাতটা টেনে নিল নিজের দিকে, তালুতে রাখা মুদ্রাটা পরীক্ষা করল এপিঠ-ওপিঠ।

‘পয়সার গায়ে ওটা কার ছবি আমি জানি না,’ সহাস্যে বলল মাইকেল। ‘কিন্তু তোমাকেও স্বীকার করতে হবে, খাসা একখানা মাল, কি? ঠোঁটের হাসিটা দেখছ? যেন, চুমো খেতে বলছে...।’

রানা তার কজি ছেড়ে দিল, ঠিকই আছে মুদ্রা। ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, অপ্রতিভ ভাবটা লুকোবার জন্য হাঁটু থেকে ধুলো ঝাড়ল। ‘চলে এসো, আব্বাস,’ ডাকল ও। ‘আমরা বরং এখুনি তৈরি হয়ে নিই।’ ওদিকে প্রস্তুতি চলছে, তার তদারকিতে ব্যস্ত আব্বাস খায়ের, নিজের দায়িত্ব আরেকজনকে বুঝিয়ে দিয়ে পা বাড়াল রানার দিকে।

‘গুড লাক, ওল্ড চ্যাপ,’ রানার পিছন থেকে বলল মাইকেল। ‘মাথা নিচু করে রেখো। তোমার কিছু হলে হৃদয়ে যে পেরেকটা বিধবে তার ব্যথা আমার সহ্য হবে না।’

তেরো

টারিটের কিনারায় বসে হ্যাচের ভিতর পা ঝুলিয়ে দিয়েছে রানা,

মুখ তুলে তাকিয়ে আছে পাহাড়গুলোর দিকে। ওগুলোর শুধু নীচের ঢাল দেখা গেল; খাড়াভাবে উঠে হারিয়ে গেছে আকাশ-ছোঁয়া, দিগন্ত বিস্তৃত ঘন কালো মেঘের ভিতর।

ধীরে ধীরে গোটা আকাশ দখল করে নিচ্ছে মেঘ। ডানাকিল মরুতে প্রবেশ করবার পর এই প্রথম অদৃশ্য হলো সূর্য। মেঘ থেকে হিম বয়ে নিয়ে এল ঝড়ো বাতাস, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রানার।

ওর পাশে টারিটে বসে রয়েছে আব্বাস, কালো মেঘের দিকের চোখ। ‘তুমুল বৃষ্টি হবে।’

‘এদিকে?’

‘নাহ্। তবে পাহাড়গুলো একেবারে ভেসে যাবে।’

মেঘেদের নড়াচড়া দেখে রানার মনে হলো, ওখানে যেন ব্যাপক রণ-প্রস্তুতি চলছে। কিছুক্ষণ পর সেদিকে পিছন ফিরল ও, তাকাল পূর্ব দিকে। বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরে খানিক পর পর এক আধটা গাছ বা কাঁটারোপ, কোন প্রাণী নেই, কিছুই নড়ছে না। স্কাউটরা রিপোর্ট করেছে, শিফটারা অ্যাডভান্স করবে। কিন্তু তার কোন আলামত চোখে পড়ল না। আবার ঘুরল রানা, চোখে বিনকিউলার তুলে গিরিসংকটের নীচের ঢালগুলোয় দৃষ্টি বুলাল, ওদিক থেকে শত্রুপক্ষের গতিবিধি টের পেলে সংকেত দিয়ে জানাবে মাইকেল। পাথরের বিশাল স্তূপ আর অসংখ্য ঢাল ছাড়া দেখবার কিছু নেই।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি আরও নীচে নামিয়ে আনল রানা, পাহাড়শ্রেণীর পাথুরে বিস্তৃতির পর ছোট ছোট লাল বালিয়াড়ি মাখাচাড়া দিয়ে রয়েছে, যেন স্থির হয়ে আছে অসংখ্য ঢেউ। প্রান্তরের মাটি ওদিকে আঁচড়ানো, কোঁচকানো; কর্কশ ঘাসে মোড়া, তারপর গুরু হয়েছে কাঁটারোপ আর অচেনা গাছের জঙ্গল। বেশ

লম্বা আর ঘন, কয়েকশো আদিবাসী অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। রানা জানে, এই মুহূর্তে ধৈর্যের সঙ্গে কর্কশ মাটির উপর শুয়ে রয়েছে তারা।

গোটা প্ল্যানটা রানার। শুধু টোপ দিয়ে শিফটা ট্যাংকগুলোকে ফাঁদে ফেলা নয়, সেগুলোকে কীভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হবে সে বুদ্ধিও ওর মাথা থেকে গজিয়েছে।

আব্বাসের নেতৃত্বে একশো আদিবাসী আর পঞ্চাশটা উট সারডি শহর থেকে ঘুরে এসেছে। রেল স্টেশনের শান্টিং ইয়ার্ড থেকে উটের পিঠে চাপিয়ে মরুভূমিতে নামিয়ে আনা হয়েছে অনেকগুলো লম্বা আর ভারি স্টীল রেইল।

রেইলগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার ব্যাখ্যাও পাওয়া গেছে রানার কাছ থেকে। প্রতিটি গ্রুপে বিশজন লোক রেখেছে সে, রেইল নিয়ে ট্রেনিংও দিয়েছে তারা। এখন শুধু দেখতে হবে শিফটারা উদয় হয় কিনা, উদয় হলে তাদের ট্যাংকগুলোকে রানার চঞ্চলা নিচু বালিয়াড়ির দিকে টেনে আনতে পারে কিনা।

আর্মার-এর সাহায্য ছাড়া, মাইকেল ও রানার ধারণা, শিফটারাদের ওরা এক হুগা আটকে রাখতে পারবে গিরিসংকটের মুখে। ওদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আয়োজনে হারারি আর রাসটারা পজিশন নিয়েছে বাঁ দিকে আর মাঝখানে, আর গালারা পজিশন নিয়েছে ডান দিকে। ভিকার্স মেশিনগানগুলো এমন পজিশনে রাখা হয়েছে, আর্মারড কাভার ছাড়া শিফটারা এগোতে চেষ্টা করলেই শয়ে শয়ে মারা পড়বে।

গিরিসংকটে ঢুকতে হলে কামান আর বোমারু বিমানের সাহায্য পেতে হবে তাদের।

গিরিসংকটের মুখ দখল করা এক কথা, ভিতরে ঢুকে এগোতে

পারা সম্পূর্ণ অন্য কথা। প্রতিটি বাঁকে অ্যামবুশ পাতা আছে, নিরাপদ আড়াল থেকে শিফটাদের উপর পাথর আর গুলিবর্ষণ করবে আদিবাসীরা। তবে শেষ পর্যন্ত শিফটারা সারডি শহরে পৌঁছুতে পারবে, কারণ সংখ্যায় তারা আদিবাসীদের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু তাতে আরও সাতদিন সময় লাগবে।

গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে সারডিতে শিফটারা পৌঁছুবার পর কী ঘটবে সবাই তা জানে, কিন্তু কেউ আলোচনা করতে চায় না। এক কি দু'দিন হয়তো আর্মারড কারের সাহায্যে তাদেরকে গিরিসংকটের মুখে আটকে রাখতে পারবে রানা, তার বেশি নয়। সারডি দখল করবার পর শিফটারা দ্রুতগতিতে ডেসি রোডের দিকে ছুটবে—ফাঁদের চোয়াল বন্ধ করবার জন্য। কার ভাগ্যে কী ঘটবে তা নির্ভর করবে কে পালাতে পারবে আর কে পারবে না তার উপর।

পরিস্থিতি ও আয়োজন সম্পর্কে সবই প্রিন্স হাসান সালেকে আদিস আবাবায় টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছে। অনেক দেরি করে উত্তর একটা এসেছে বটে, কিন্তু সেটা বয়ে নিয়ে এসেছে ভীতি আর দুঃসংবাদ।

আভাসে প্রিন্স সালে জানিয়েছে, রাজধানীতে নজরবন্দী রাখা হয়েছে তাকে। তবে এখনও সম্রাটকে বোঝাবার আশা ত্যাগ করেনি সে। তার ধারণা, আরেকবার সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলেই তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সে মিথ্যে বলে প্রমাণ করতে পারবে, তখন সেলাসী বাহিনীর সাহায্য পাওয়া আদিবাসীদের জন্য কোন সমস্যা হবে না। রানা আর মাইকেলের প্রতি আবেদন জানিয়েছে সে, কোন রকমে আর দু'হুগা গিরিসংকট দখল করে রাখুন, তারপর আপনাদের আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। সে আরও আভাস দিয়েছে, সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বার্তা পাঠানো

হয়েছে আরেক পক্ষকে, সম্ভবত অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবে।

তারমানে মরু প্রান্তরে আরও এক হুগা টিকে থাকতে হবে ওদেরকে। তা সম্ভব কিনা নির্ভর করছে শিফটাদের আর্মার-এর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষটার কী পরিণতি দাঁড়ায় তার উপর। রানা আর মাইকেলের হিসাবে, স্কাউটদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারেও বটে, শিফটাদের ট্যাংকের সংখ্যা চারটে। একটা মাত্র আঘাতে চারটেই অচল করে দিতে হবে ওদের, গিরিসংকটের গোটা প্রতিরক্ষা এই একটি বিষয়ের উপর ঝুলে আছে।

এক সময় রানার মনে হলো, দিবাস্বপ্ন দেখছে সে। অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটতে পারে, হিসাবের মধ্যে যেগুলো ধরা হচ্ছে না। ওর কাঁধে একটা হাত রাখল আব্বাস।

‘মাসুদ ভাই! সংকেত!’

ঝট করে পাহাড়ী ঢালগুলোর দিকে তাকাল রানা, চোখে বিনকিউলার তুলবার দরকার হলো না। টয়লেট ব্যাগ থেকে শেভিং-মিরর বের করে সঙ্গে রেখেছে মাইকেল, হেলিয়োগ্রাফের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করছে ক্ষুদে আয়নাটা। অত দূর থেকেও আলোর উজ্জ্বল প্রতিফলন রানার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

‘উপত্যকা ধরে এগিয়ে আসছে ওগুলো, পাশাপাশি চারটে ট্যাংক সাপোর্ট হিসেবে রয়েছে ট্রাক ভর্তি পদাতিক বাহিনী।’ সংকেত পড়া শেষ করল রানা, হ্যাচ গলে ঝুপ করে নেমে গেল চঞ্চলার ড্রাইভিং সিটে, একই সঙ্গে লাফ দিয়ে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের সামনে পড়ল আব্বাস।

‘দ্যাট’স মাই ডার্লিং!’ চঞ্চলার এঞ্জিন জ্যাস্ত হয়ে উঠতেই ধন্যবাদ দিল রানা, আব্বাস হ্যাচ গলে টারিটে উঠে আসতেই তাকে বলল, ‘ঘোরার সময় প্রতিবার জানাব তোমাকে।’

‘ইয়েস, মাসুদ ভাই!’ ছেলেটার চোখ দুটুকরো অঙ্গারের মত জ্বলছে দেখে নিঃশব্দে হাসল রানা।

‘দাদুর মতই রক্তপিপাসু!’ ক্লাচ ছেড়ে দিল ও। চঞ্চলার গতি দ্রুত বাড়ল, ঢালের নীচ থেকে কিনারা পেরিয়ে উঠে এল ওরা, খোলা প্রান্তরে ধুলোর মেঘ উঠে দুনিয়ার সবাইকে জানিয়ে দিল ওদের অস্তিত্ব।

শিফটা ট্যাংকের রেখাটা সোজা ওদের দিকে ছুটে আসছে, ওদের পাশে দেড় মাইল দূরে এখনও।

‘ঘুরছি,’ সতর্ক করল রানা।

পাল্টা চিৎকার করে আব্বাস জানাল, ‘রেডি!’ টারিটের উপর, ভিকার্স মেশিনগানের পিছনে উবু হয়ে বসে রয়েছে সে, মেশিনগানের মাজল বরাবর ট্যাংকগুলোকে পেলেই গুলি করবার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি।

দ্রুত, বন বন করে হুইল ঘোরাল রানা। দূরবর্তী গাঢ় রঙের পোকা আকৃতির শিফটা আর্মার-এর দিকে ঘুরে গেল চঞ্চলা, সরাসরি ওগুলোর দাঁত লক্ষ্য করে ছুটল।

রানার মাথার উপর গর্জে উঠল ভিকার্স, খালি কার্তুজগুলো পাথর বৃষ্টির মত নেমে এল হ্যাচ গলে, ঠন ঠন আওয়াজ করল ইস্পাতের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, পোড়া করডাইটের আকস্মিক ঝাঁঝে রানার চোখে পানি বেরিয়ে এল।

চোখ পিট পিট করে রানা দেখল বিদ্যুৎ-সাদা ট্রেসার খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে ছুটছে। সামনের একটা ট্যাংকের কাছাকাছি পড়ল সেটা। প্রায় দেড় মাইল দূরে হলেও, ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে লাফিয়ে ওঠা ধুলোর ক্ষুদে ঝর্ণাগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেল ও। ‘গুড বয়!’ আব্বাসের প্রশংসা করল, কারণ চঞ্চলা অনবরত ঝাঁকি খাওয়া সত্ত্বেও এত দূর

থেকে লক্ষ্যভেদে প্রায় সফল হয়েছে সে। অবশ্য সিভি থ্রির মোটা আর্মার ভেদ করতে পারবে না বুলেটগুলো, তবে কোন সন্দেহ নেই ক্রুদের খেপিয়ে তুলতে পারবে, প্ররোচিত করবে ধাওয়া করে পাল্টা আঘাত হানবার জন্য।

ঘটলও ঠিক তাই। কমান্ডার টার্গেটের দিকে লক্ষ্যস্থির করবার নির্দেশ দেওয়ায় ট্যাংকটার টারিট ঘুরে গেল। স্প্যাডাউ-এর মোটা ব্যারেল দ্রুত খাটো হলো, তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, সরাসরি ওটার মাজল-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা।

ধীরে ধীরে তিন পর্যন্ত গুণল ও। ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করে তৈরি হতে তার বেশি সময় লাগবে না। তারপরই রানা চোঁচিয়ে উঠল, ‘ঘুরছি!’

দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, ফলে দুই চাকার উপর সচল থাকল চঞ্চলা, শত্রুদের সামনে থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে। চোখের কোণে মাজল ফ্ল্যাশ-এর আভা দেখতে পেল ও, প্রায় পরমুহূর্তেই পাশ ঘেঁষে ছুটে যাওয়া শেলের গর্জন শুনতে পেল।

‘সান অভ আ গান-দ্যাট ওয়াজ ক্লোজ!’ বিড়বিড় করল ও, ভাইজর আর হ্যাচ খুলবার জন্য হাত তুলল। বন্ধ চঞ্চলার ভিতর থাকায় কোন লাভ নেই, আর্মারড কারের যে-কোন অংশ পাতলা কাগজের মত ছিঁড়ে ফেলবার ক্ষমতা রাখে স্প্যাডাউ। বিপজ্জনক শেষ মুহূর্তগুলোয় দৃষ্টিসীমা বরং অব্যবহৃত থাকা দরকার।

শিফটা লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় ছুটছে চঞ্চলা, পাশে তাকিয়ে রানা দেখল চারটে ট্যাংকই এখন ফায়ার করছে, তবে এবড়োখেবড়ো মাটিতে ঝাঁকি খাচ্ছে সব ক’টা। চঞ্চলার দিকে ঘুরবার জন্য দিক বদলাতে বাধ্য হয়েছে ওগুলো, পদাতিক

বাহিনীকে পিছনে রেখে এগিয়ে আসতে হয়েছে লাইনের বাইরে, দ্রুত ধাবমান চঞ্চলাকে ধাওয়া করবে নাকি খেমে শেল ছুঁড়বে সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করায় মন্ত্র হয়ে পড়েছে গতি। চারটে ট্যাংক, প্রায়ই একটার সামনে পড়ে যাচ্ছে আরেকটা।

‘আয় শালারা!’ বিড়বিড় করল রানা। ‘যুদ্ধের সাধ তোদের মিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি,’ বিপজ্জনক এই মুহূর্তেও নিঃশব্দে হাসছে রানা।

কাছেই একটা শেল বিস্ফোরিত হলো, বালি আর কাঁকর বৃষ্টি হলো হ্যাচের ভিতর। এতক্ষণে সঠিক রেঞ্জ আন্দাজ করতে পেরেছে শিফটারা। যে-কোন পরবর্তী শেল আর্মারড কার ভেদ করতে পারে। একটা কিছু করা দরকার।

মুখ থেকে বালি ফেলে চিৎকার করল রানা, ‘ঘুরছি! গুলি চালাও!’

সাবলীলভাবে শিফটা লাইনের দিকে ঘুরে গেল চঞ্চলা। চোখ ভরা অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে শিফটারা দেখল ওদের দিকে তেড়ে আসছে আর্মারড কার।

মাঝখানের দূরত্ব ভয়ানক কমে এল। একনাগাড়ে গুলি করছে আব্বাস। শিফটা লাইন এত কাছে চলে এসেছে যে সামনের ট্যাংকটার গায়ে ভিকার্স বুলেটের মাথা ঠুকবার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। বাঁকের প্রথম ট্যাংকটাকে বেছে নিয়েছে আব্বাস, ওটাতাই রয়েছে বহরের কমান্ডার।

‘ঠিক,’ বিড়বিড় করে সায় দিল রানা, ‘ব্যাটার রক্ত গরম করে তোলো...।’ খেমে গেল রানা, মাথার কাছে বজ্রপাতের মত বিকট আওয়াজ হয়েছে, যেন কোন দানব হাজার মন ওজনের একটা হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরেছে ইস্পাতের খোলে-প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আরেক দিকে ছুটল চঞ্চলা, চাকাগুলো ঘুরে গেছে।

‘শেল লেগেছে!’ ভাবল রানা, মুছে গেছে ট্রাকের হাসি। বিকট শব্দে কানে তাল লাগে গেছে ওর, পোড়া রঙ আর গরম ধাতুর উৎকট গন্ধ পেল নাকে। ভয়ে ভয়ে হুইল ঘোরাল ও, পরম স্বস্তি বোধ করল চঞ্চলা ঘুরতে শুরু করায়। শিফটা লাইনের দিকে পিছন ফিরল আর্মারড কার।

নিজের কমপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, বাইরে মাথা বের করেই বুঝল ভাগ্য কতটুকু সহায়তা করছে ওদের। ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে গাড়ির মাথায় একটা লোহার আঙটা লাগিয়েছিল ও, অ্যামুনিশনের বাক্স রশি দিয়ে বাঁধবার জন্য, শেল সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। খোলের গায়ে দাঁত বসালেও, ফুটো করতে পারেনি।

‘তুমি ঠিক আছ, আব্বাস?’ নিজের সিটে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ওরা পিছু নিয়েছে, মাসুদ ভাই,’ পাল্টা চিৎকার করে জানাল আব্বাস, আঘাতটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। ‘ধাওয়া শুরু করেছে-ওরা সবাই।’

‘ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছি-এই রওনা হলাম!’ বলল রানা, শিফটারাদের দিকে আগেই পিছন ফিরেছে চঞ্চলা, এবার গতি বাড়িয়ে ঐক্যবঁকে ছুটল-রেঞ্জ আর লক্ষ্য বদলাতে বাধ্য হবে শিফটা গানাররা।

শেলের বিরতিহীন বিস্ফোরণ ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল, তবে একটাও চঞ্চলাকে ছুঁতে পারল না। প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে কেঁপে উঠল ওরা।

‘অনেক দূরে চলে আসছি আমরা, মাসুদ ভাই,’ হাঁক ছেড়ে বলল আব্বাস, ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখতে পেল নিজের অজান্তেই কখন যেন হ্যাচ খুলে মাথাটা বাইরে বের করে রেখেছে

ও।

‘আহত পাখি,’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল রানা। শিফটাদের কাছ থেকে বেশি দূরে সরে এলে, সমূহ আশংকা আছে ধাওয়া বাদ দিয়ে নিজেদের পথে ফিরে যাবে তারা।

পাশে, কাছাকাছি আরেকটা শেল বিস্ফোরিত হলো, স্লান ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল আর্মারড কার, এই সুযোগে রানা ভান করল আহত হয়েছে ওরা-থ্রটলের উপর থেকে চাপ কমাল, ফলে নাটকীয়ভাবে মস্তুর হলো চঞ্চলার গতি, ঐক্যবৈক্যে এগোবার মধ্যে কোন নিয়মিত প্যাটার্ন থাকল না, ডানা ভাঙা পাখির মত ছোট ছোট লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে।

‘কাছে চলে আসছে এবার,’ উল্লাসে চোঁচিয়ে উঠল আব্বাস।

‘এত খুশি হবার কিছু নেই,’ বিভ্রিভি করল রানা, কান ঘেঁষে ছুটে যাওয়া একটা শেলের গর্জনে চাপা পড়ে গেল ওর কথা।

‘এখনও ওরা আসছে, দূরত্ব কমে যাচ্ছে!’ রানাকে সাবধান করল আব্বাস। ‘এখনও ফায়ার করছে!’

‘জানি!’ চঞ্চলার সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করছে রানা, ঘন ঘন এক দিক থেকে আরেকদিকে ঘোরাল চাকাগুলো। চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল ও। ঢেউ আকৃতির প্রথম বালিয়াড়িটা আধ মাইল সামনে। কিন্তু সেটার কাছে পৌঁছুতে মনে হলো এক যুগ পেরিয়ে গেছে। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে মাটি, হেলেনদুলে বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এল চঞ্চলা, ধুলো আর কাঁকরের স্তূপ বাতাসে উড়িয়ে আরেক দিকে নামতে শুরু করল, ধাওয়ারত শিফটা ট্যাংকগুলো ওদেরকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না।

বালিয়াড়ি থেকে নামবার সময় চঞ্চলাকে ঘুরিয়ে আড়াআড়ি পজিশনে নিয়ে এল রানা, পিছলে নামতে দিল গাড়িটাকে, তারপর হঠাৎ ব্রেক করে দাঁড় করাল। পিছু হটল আর্মারড কার, বালিয়াড়ির

মাথার দিকে ঘুরে গেল নাক, ধীরগতিতে আবার উঠতে শুরু করল মাথার দিকে।

চঞ্চলার খোলটা বালিয়াড়ির আড়ালে থাকল, চূড়ার উপর জেগে থাকল, শুধু টারিট।

‘সাবাস মাসুদ ভাই, সাবাস!’ টারিটের উপর দাঁড়িয়ে এক পাক নেচে নিল আব্বাস, সে তার ভিকার্স আবার শত্রুদের দিকে তাক করতে পারছে। রূপ করে বসে পড়ে থেমে থেমে গুলি ছুঁড়ল সে খোলা প্রান্তর ধরে ছুটে আসা চারটে ট্যাংক লক্ষ্য করে।

বালিয়াড়ির পিছনে স্থির পজিশন থেকে গুলি করায় প্রতিটি বিস্ফোরণের প্রতিটি বুলেট ধেয়ে আসা খোলগুলোর গায়ে লাগাতে পারল সে।

‘যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে,’ বলল রানা, আন্দাজ করল এরপর নাকের সামনে মুলো না থাকলেও ধাওয়া করবে গাধাগুলো। বালিয়াড়ি থেকে ট্যাংকগুলো এখন আর পাঁচশো গজও দূরে নয়, ক্ষুদ্রে টার্গেট চঞ্চলার টারিটেও যে-কোন সময় একটা শেল লাগিয়ে দিতে পারে। ‘চলো হে, পালাই!’

আর্মারড কার ঘুরিয়ে নিল রানা, বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে সবেগে নেমে এল ওরা। দু’পাশে আর সামনে কাঁটারোপ আর গাছপালা চলে এল, ওগুলোর আড়ালে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে পলকের জন্য দেখতে পেল রানা। কৌপীন ছাড়া কারও পরনে কিছু নেই, বুকো স্টীলের লম্বা রেইল নিয়ে একজনের পিছনে একজন, এক লাইনে শুয়ে আছে-তাদের মধ্যে দু’জনে উন্মাদের মত গড়ান দিয়ে চঞ্চলার পথ থেকে সময় থাকতে সরে গেল।

এক বালিয়াড়ি থেকে নেমে আরেক বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এল চঞ্চলা, চূড়ায় উঠবার পর শ্লথ হলো গতি, ধুলোর ভিতর ঢাকা

পড়ে গেল খোলটা, থ্রটলে চাপ দিয়ে গতি বাড়াতেই লাফ দিয়ে
অপরদিকের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

দ্বিতীয় বালিয়াড়ি থেকে পুরোপুরি নামবার আগেই চঞ্চলার
ব্রেক কষল রানা, খোলা হ্যাচ থেকে বেরিয়ে গাড়ির পাশে বালির
উপর লাফিয়ে পড়ল, আব্বাসও অনুকরণ করল ওকে। বালিতে
পড়েই সিধে হলো, ঢাল বেয়ে ছুটল চূড়ার দিকে।

চূড়ার কিনারা থেকে উঁকি দিল ওরা, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথম
বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এল শিফটাদের চারটে ট্যাংক। সগর্জনে ঢাল
বেয়ে নামতে শুরু করল ওগুলো।

ট্র্যাকের নীচে চ্যাপ্টা হলো কাঁটাঝোপ আর গাছপালা। এক
নিমেষে জ্যাক হয়ে উঠল জঙ্গল নগ্ন কালো মূর্তিতে। দানবীয় গর্জন
বেরিয়ে আসছে খোলগুলো থেকে, কিন্তু কোন কিছুর পরোয়া না
করে হাজার হাজার পিপড়ের মত আদিবাসী যোদ্ধারা হেঁকে ধরল
ওগুলোকে।

প্রতিটি স্টীল রেইল বিশজন লোকের হাতে রয়েছে, বিশাল
গাছের কাণ্ডের মত সেটাকে ধরাধরি করে ছুটল তারা, প্রতিটি
ট্যাংককে চারদিক থেকে আক্রমণ করল, রেইলের শেষ মাথা
সবেগে ঢুকিয়ে দিল শিকলের আঙুটার সঙ্গে সংলগ্ন চাকার দাঁতের
মাঝখানে।

রেইল সঙ্গে সঙ্গে আটকে গেল, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের
তীব্র তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজে রিরি করে উঠল গা, বিশজনের হাত
থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল রেইলের অপর প্রান্তটা, আকস্মিক
ধাক্কা খেয়ে চিৎপটাং হলো সবাই। দরদী একজন এঞ্জিনিয়ার
উপস্থিত থাকলে মেশিনগুলো নিজেদের ভেঙে টুকরো টুকরো
করতে গিয়ে যে শব্দ করছে তা শুনে হয়তো ভাবত জ্যাক প্রাণীরাই
যেন যন্ত্রণায় আতর্জনাদ করছে।

স্টীলের রেইল জকি হুইল ছিঁড়ে বের করে আনল, সেটিং
থেকে ছেড়ে দেওয়া স্প্রিংয়ের মত বেরিয়ে এল ট্র্যাকগুলো, সপাং
সপাং শব্দে চাবুক মারল বাতাসে, ধুলোর মেঘ আর গাছপালার
ভিতর ঘন ঘন আছাড় খেয়ে একসঙ্গে যেন একশো অজগর
মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের ভিতর থেমে গেল সব, চারটে ট্যাংক
স্থির হয়ে গেছে, অঙ্গহানির ফলে মেরামতের অযোগ্য, ওগুলোর
চারপাশে পড়ে আছে চার-পাঁচজন আদিবাসীর লাশ, ট্র্যাকগুলো
বিহীন হয়ে ছড়িয়ে পড়বার সময় আঘাত করেছে ওদেরকে।
ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে শরীরগুলো, কারও হাত আছে তো মাথা নেই,
দশ মনী পাথর দিয়ে যেন প্রত্যেককে খেঁতলানো হয়েছে।

যারা বেঁচে আছে, সংখ্যায় তারা কয়েকশো, নিরাপদ আড়াল
আর দূরত্ব থেকে ছুটে এসেছে এরইমধ্যে, ঘিরে ফেলেছে
ট্যাংকগুলোকে। প্রায় নগ্ন, লু-লু আওয়াজের সঙ্গে উল্লাসে নৃত্যরত,
গলা ছেড়ে হাসছে, খালি হাতে দমাদম ঘুসি মারছে ইস্পাতের
খোলে।

খোলের ভিতর শিফটা অথবা ইটালিয়ান গানাররা এখনও
মরিয়া হয়ে শেল ছুঁড়ছে, কিন্তু এখন আর তাদের টারিট ঘুরছে না,
একটা কামানও টার্গেটের উপর লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না। তারা
অন্ধও বটে—কারণ বারোজন আদিবাসীকে একটা করে বালতি
দিয়ে রেখেছে রানা, বালতিতে আছে এঞ্জিনের তেলের সঙ্গে ধুলো
মেশানো কাদা—ড্রাইভার আর গানারের ভাইজরে মুঠো মুঠো কাদা
লাগিয়ে দিয়েছে তারা। ট্যাংকের ভিতর শিফটা ত্রুণা বন্দী, বাইরে
কয়েকশো লোকের বিজয়োল্লাস, দ্বিতীয় কারের আওয়াজটা তাই
শুনতেই পেল না রানা।

রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টোদিকের বালিয়াড়ির মাথায় থামল গাড়িটা। ঘটাং করে খুলে গেল জোড়া হ্যাচ কাভার, খোল থেকে লাফিয়ে নীচে নামল মাইকেল আর বৃদ্ধ কামাল হাসান।

গোত্রপ্রধানের সঙ্গে তরোয়াল রয়েছে, ঢাল বেয়ে দমকা বাতাসের মত নেমে আসবার সময় মাথার উপর সেটা বন বন করে ঘোরালেন তিনি, তাঁর সাদা আলখেল্লা ফুলে উঠল পিছনে, রণহুংকার ছাড়তে ছাড়তে ছুটলেন নিজের যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। আদিবাসীদের উল্লাস আর অচল ট্যাংকগুলো দেখে প্রাচীন যোদ্ধার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে।

দুই বালিয়াড়ির সমতল মেঝেতে নেমে এল মাইকেল, মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালাউট করল ওকে-কিস্ত বিদ্রোহীরা ভাবটুকুর মধ্যে সত্যিকার সম্মান লুকিয়ে রয়েছে, উপলব্ধি করল রানা। পাশাপাশি ছুটে দু'জনেই ওরা ঝোপের মাঝখানে নেমে এল, এখানে বালির নীচে লুকানো রয়েছে গ্যাসোলিন ভরা কয়েকটা ক্যান।

কাজে হাত দেওয়ার আগে রানার বাহুতে হালকা ঘুসি মারল মাইকেল। ‘একাই হ’টাকে পঙ্গু করে দিয়েছ, ওল্ড চ্যাপ। এর চেয়ে কম কিছু তোমার কাছে আমি আশা করিনি। যদি অস্বীকার করো এ-জন্মে নয়, তা হলে আমি বলব গত জন্মে একজন ব্রিগেডিয়ার ছিলে তুমি, কী?’

আদিবাসীরা বালি সরিয়ে ফেলেছে, রানা আর মাইকেল দুটো করে ক্যান নিয়ে রওনা হলো ট্যাংকগুলোর দিকে। একটা ক্যান আব্বাসের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, এরইমধ্যে কাছের ট্যাংকটার টারিটে উঠে পড়েছে সে, তার পাশে দাঁড়িয়ে তরোয়ালের ডগা দিয়ে একটা হ্যাচ খুলবার চেষ্টা করছেন কামাল হাসান। জ্বলন্ত

অঙ্গারের মত আলো বিকিরণ করছে বৃদ্ধের চোখ জোড়া, লু-লু রণহুংকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, মুক্তোর মত সাদা কৃত্রিম দাঁতগুলো নড়বড় করছে মুখের ভিতর, শত্রুহননের সুযোগ পেয়ে প্রায় উন্মাদ।

গ্যাসোলিন ভর্তি ক্যানটা টারিটের উপর রাখল আব্বাস, ড্যাগারটা কোমর থেকে টেনে নিয়ে ধাতব ছিপির মাঝখানে গাঁথল। হিস হিস শব্দে স্বচ্ছ তরল গ্যাসোলিন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

‘ভাল করে ভেজাও,’ চিৎকার করল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে নিঃশব্দে হাসল আব্বাস, ক্যান উপুড় করে তরল গ্যাসোলিন ঝরাল ট্যাংকের গায়ে। গন্ধটা তীব্র, গরম ইস্পাতে পড়ামাত্র বাষ্প হয়ে উড়ে গেল খানিকটা।

পরবর্তী ট্যাংকের দিকে ছুটে এল রানা, বিধ্বস্ত জকি হুইলে পা রেখে টারিটে উঠবার সময় প্যাঁচ ঘুরিয়ে ছিপি খুলল ক্যানের। ফরওয়ার্ড মেশিনগানের স্থির ব্যারেলটাকে এড়িয়ে টারিটের উপর সিঁধে হয়ে দাঁড়াল ও, খোলার মাথায় গ্যাসোলিন ঢালল যতক্ষণ না ভিজে গিয়ে রোদের ভিতর চকচক করে উঠল ইস্পাত। নাট-বল্টু-জু আর নগণ্য ফুটো-ফাটা দিয়ে তরল ফুয়েল ট্যাংকের ভিতরও চুইয়ে চুইয়ে ঢুকল।

‘পিছাও,’ হাঁক ছাড়ল মাইকেল। ‘সবাই পিছাও!’ বাকি দুটো ইস্পাতের লাশ নিজের হাতে ভিজিয়েছে সে, পিছিয়ে গিয়ে উঠে পড়েছে বালিয়াড়ির মাথায়, ঠোঁটের কোণে ঝুলছে লম্বা কালো একটা চুরট, এখনও ধরায়নি, হাতে একটা দিয়াশলাই।

হালকা লাফ দিয়ে ট্যাংক থেকে নীচে নামল রানা, ক্যান উপুড় করে ছুটল মাইকেলের দিকে, পিছনে রেখে আসছে গ্যাসোলিনের

মোটা একটা রেখা।

‘তাড়াতাড়ি! জলদি!’ আবার তাগাদা দিল মাইকেল।

আব্বাসও তার পিছনে গ্যাসোলিনের মোটা একটা রেখা তৈরি করছে, ছুটে আসছে মাইকেলের দিকে।

‘এমন কেউ নেই ওই বুড়ো ভামটাকে এদিকে সরিয়ে আনে?’ অসহায় চোখে রানার দিকে তাকাল মাইকেল। সবচেয়ে কাছের ট্যাংকটার কাছে একটা মাত্র মূর্তি উন্মাদের মত লাফালাফি করছে, রণহুংকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, মাথার উপর তরোয়াল ঘুরিয়ে ট্যাংকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে ত্রুদের। হাতের ক্যান ফেলে দিয়ে সেদিকে ছুটল আব্বাস, কিন্তু তরোয়ালের ভয়ে কাছে ঘেঁষতেই সাহস হলো না তার, সাহায্যের জন্য রানার দিকে তাকাল। হাতের খালি ক্যানটা ফেলে এগিয়ে গেল রানা। ঘুরন্ত তরোয়ালের নীচে মাথা নিচু করে ঢুকল ও, এক হাতে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধের হাড়সর্বশ্ব কোমর, শূন্য তুলে নিল শরীরটা, ধরিয়ে দিল আব্বাসের বাড়ানো জোড়া হাতে। আব্বাস তাকে বুকে নিয়ে ছুটল, এখনও হাত-পা ছুঁড়ছেন কামাল হাসান, তরোয়ালটা মাথার উপর খাড়া করে রেখেছেন।

দিয়াশলাইয়ের কাঠি জেলে চুরট ধরাল মাইকেল, তারপর কাঠিটাকে ভালভাবে জ্বলতে দিল। ‘অর্ডার দিন, ব্রিগেডিয়ার,’ রানার দিকে ফিরে গম্ভীর কণ্ঠে অনুমতি প্রার্থনা করল সে, ‘সার।’

হেসে ফেলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

গ্যাসোলিনে ভেজা মাটিতে অগ্নিসংযোগ করল মাইকেল। প্রথমে কিছুই ঘটল না। তারপর একটা ধাক্কা অনুভব করল ওরা, কানের পর্দায় বাড়ি খেলো বাতাস, দপ করে আগুন ধরে গেল গ্যাসোলিনে। চোখের পলকে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে সগর্জনে আগুনের কয়েকটা রেখা ট্যাংকগুলোর দিকে ছুটল। রক্তবর্ণ

অগ্নিশিখা নাচল, মোচড় খেলো, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল ট্যাংকগুলোর চারধারে। এক সময় আগুনের পাঁচিলে ঢাকা পড়ে গেল ওগুলো।

বালিয়াড়ির উপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আদিবাসী যোদ্ধারা, নিজেদের আয়োজন করা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। একা শুধু কামাল হাসান আগুনের কিনারায় নাচানাচি করছেন, তাঁর তরোয়ালের ফলায় প্রতিফলিত হচ্ছে লাল আগুন।

সামনের ট্যাংকের হ্যাচগুলো সশব্দে খুলে গেল, উত্তপ্ত বাতাসে লাফিয়ে বেরিয়ে এল তিনটে মূর্তি, লাল পাঁচিলের ভিতর অস্পষ্ট, দেখে মনে হলো তিনজনই বুক চাপড়াচ্ছে, আসলে ইউনিফর্মের আগুন নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে ত্রুরা। পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়ে এল লোকগুলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন ধরে গেছে, আক্ষরিক অর্থেই তিনটে অগ্নিমূর্তি।

তাদের দিকে ছুটে গেলেন কামাল হাসান, বাতাসে শিস কাটল তাঁর তরোয়ালের ফলা। ট্যাংক কমান্ডারের মাথা আগুনে পোড়া কালচে কাঁধ থেকে লাফ দিয়ে বিছিন্ন হলো, নিখুঁতভাবে তরোয়াল চালিয়েছেন বৃদ্ধ। মাথাটা কমান্ডারের পিছনে পড়ল, একটা বলের মত গড়িয়ে নেমে এল ঢাল বেয়ে। ধড়টা ধীরে ধীরে নিচু হলো, প্রথমে ভাঁজ হলো হাঁটু জোড়া, ঘাড় থেকে শূন্য খাড়া হলো রক্ত স্রোত।

রক্ত হিম করা হুংকার ছেড়ে বাকি দু’জনের দিকে তেড়ে গেলেন কামাল হাসান, তাঁর লোকেরা হিংস্র পশুর মত গর্জে উঠে অনুসরণ করল তাঁকে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল রানা, রাগে লাল হয়ে আছে চেহারা, কিন্তু পা বাড়াতেই ওকে ধরে ফেলল মাইকেল।

‘ইজি, ওল্ড চ্যাপ,’ রানাকে টেনে রাখল সে। ‘তোমার

বয়স্কাউট ভূমিকা এখানে কোন কাজে আসবে না।’

কয়েকশো আদিবাসী যোদ্ধা বাকি দুই ট্যাংকের বেরিয়ে আসা ব্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, হিংস্র আক্রোশে ফুঁসে উঠেছে জনতা, কে তাদের ঠেকাবে।

রানাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল মাইকেল। ‘তোমার বা আমার কোন ব্যাপার নয়, ওল্ড চ্যাপ। খেলায় তো হারজিত আছেই—ওরা হেরে গেছে, খেসারত দিতে হবে না?’ হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, ওকে নয়, নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মাইকেল। চোখের সামনে নিরুপায় লোকগুলোকে মেরে ফেলেছে আদিবাসী যোদ্ধারা, তার ভাল না লাগবারই তো কথা।

খানিকদূর হেঁটে এসে চঞ্চলার গায়ে হেলান দিল ওরা, দু’জনেই একটু একটু হাঁপাচ্ছে। পকেট হাতড়ে সামান্য দোমড়ানো একটা চুরট বের করল মাইকেল, যত্নের সঙ্গে সিধে করল সেটাকে, আশ্তে করে গুঁজে দিল রানার ঠোঁটে। ‘তোমাকে আমি আগেও বলেছি, প্র্যাকটিক্যাল হবার চেষ্টা করো—ভাবাবেগ কোন কাজের জিনিস নয়। ওদের বাধা দিতে গেলে তোমাকেও ওরা ফেড়ে ফেলবে।’ চুরটটা ধরিয়ে দিল সে।

খানিক থেমে প্রসঙ্গ বদল করল মাইকেল, ‘বড় সমস্যাটার সমাধান হয়েছে। ট্যাংক নেই তো দুশ্চিন্তাও নেই। এখন আর গিরিখাদের মুখে শিফটাদের এক হপ্তা আটকে রাখা কোন সমস্যা নয়।’

হঠাৎ করে আবছা হয়ে গেল সূর্য, দ্রুত নেমে গেল তাপমাত্রা। দু’জনেই ওরা একযোগে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। গত এক ঘণ্টায় মেঘের বিপুল সমাবেশ পাহাড়ের মাথা থেকে সরে এসে গোটা আকাশ ঢেকে ফেলেছে, সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলেছে গোটা পাহাড়শ্রেণীর মাথা। ডানাকিল মরুর উপরে এমন কোন

ফুটো নেই যার ভিতর দিয়ে আকাশ দেখা যায়। প্রান্তরের দূর প্রান্তে এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দু’এক ফোঁটা ওদের গায়েও পড়ল।

‘ভাল লক্ষণ, কী?’ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে গর্জে উঠল মেঘ, দপ করে নিভে গেল মাইকেলের হাসি, গোটা আকাশ জুড়ে ছুটোছুটি শুরু করল সরা সরা বিদ্যুৎ রেখা।

মেঘের গর্জন সত্ত্বেও আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। পরস্পরের দিকে ভুরা কুঁচকে তাকাল, তারপর কান পাতল।

‘মা জননী মেরীর কিরে, ব্যাপারটা অদ্ভুত!’ মেঘের গুরুগুরু ডাকের ভিতর থেকে মেশিনগানের আওয়াজ আলাদাভাবে চিনতে পারছে মাইকেল, রানার দিকে তাকাতে সে-ও মৃদু মাথা ঝাঁকাল। ‘ওদিক থেকে তো কোন ফায়ারিং হবার কথা নয়!’ ওদের পিছন, অর্থাৎ সরাসরি যেন গিরিখাদের মুখ থেকে আসছে আওয়াজটা।

‘এসো দেখি!’ বলল রানা, চঞ্চলার হ্যাচ থেকে বিনকিউলারটা তুলে নিয়ে আলগা লাল বালির উপর দিয়ে সবচেয়ে উঁচু বালিয়াড়ির দিকে ছুটল ও।

মেঘ আর বৃষ্টি গিরিখাদের মুখ ঝাপসা করে রেখেছে, তবে মেশিনগানের আওয়াজ এখন বিরতিহীন।

‘দুর্ঘটনা বা ছোটখাট কোন সংঘর্ষ নয়,’ বিড়বিড় করল মাইকেল।

‘ফুল-স্কেল ফায়ার ফাইট,’ একমত হলো রানা, চোখে এখনও বিনকিউলার।

‘কী ব্যাপার, মাসুদ ভাই?’ বালির ঢাল বেয়ে বালিয়াড়ির মাথায় ওদের পাশে উঠে এল আব্বাস। তার পিছু পিছু আসছেন বৃদ্ধ কামাল হাসান, পরিশ্রম এবং উত্তেজনায় এখনও হাঁপাচ্ছেন

তিনি।

‘ঠিক বুঝতে পারছি না, আব্বাস।’ চোখ থেকে রানা বিনকিউলার নামায়নি।

‘রহস্যময়, কী?’ মাথা নাড়ল মাইকেল। ‘দক্ষিণ থেকে শিফটারা এগোলে, পাহাড়ের নীচে আমাদের পজিশনের সামনে পড়বে তারা, আর উত্তর থেকে এলে গালাদের সামনে পড়বে। ওদিকে নূর আয়াঙ খুব শক্ত ঘাঁটি গেড়ে আছে। শিফটারাদের সাথে ওদের যুদ্ধ হলে আমরা শুনতে পেতাম। না, গালাদের হটিয়ে দিয়ে শিফটারা আসতে পারে না...!’

‘আর আমরা রয়েছি মাঝখানে,’ বলল রানা। ‘শিফটারা তা হলে ঢুকল কীভাবে?’

‘কিছুই তো বুঝতে পারছি না!’ গোলাগুলির আওয়াজ আগের মতই শোনা যাচ্ছে।

এই সময় বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলেন কামাল হাসান। দুই কোমরে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, একটু জিরিয়ে নিলেন, তারপর মুখ থেকে বের করলেন দাঁতগুলো। সাদা একটা রুমালে জড়ালেন সেগুলো, রেখে দিলেন আলখেল্লার গোপন একটা পকেটে। দাঁত খুলে নেওয়ায় তাঁর মুখের চেহারা বিধ্বস্ত দেখাল, আবার তিনি তাঁর প্রকৃত বয়স ফিরে পেলেন।

বুড়ো দাদুর কাছে ধাঁধার উত্তর জানতে চাইল আব্বাস, তার আগে নিজেদের ও গালাদের পজিশন সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিল সে। শুনবার সময় দুই পায়ে মাঝখানে বালিতে ঘষে তরোয়ালের ফলায় লেগে থাকা কালচে রক্ত মুছলেন তিনি। কথা বলতে শুরু করলেন হঠাৎ করে, বুড়ো মানুষের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর।

‘আমার দাদু বলছেন, নূর আয়াঙ গালা হলো গণোরিয়ায় আক্রান্ত একটা হায়েনার শুকনো বিষ্ঠা,’ দ্রুত অনুবাদ করল আব্বাস। ‘তিনি আরও বলছেন, আমার কাকা, প্রিন্স হাসান সালে, তাকে বিশ্বাস করে মারাত্মক ভুল করেছেন।’

‘বুঝলাম! কিন্তু এর মানে কী?’ জানতে চাইল রানা। বিনকিউলারটা আবার সারডি গিরিখাদের মুখের দিকে তুলে কিছু দেখা যায় কিনা পরীক্ষা করল। হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল ও, ‘ধেভেরি! সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! মেয়েটার কি মাথাখারাপ? কিরে খেয়ে বলল, এই একবার অন্তত নাক গলাবে না...কিন্তু ঠিকই এসে পড়েছে!’

বৃষ্টির ভিতর অস্পষ্ট, মাথার উপর ঘন কালো মেঘ নিয়ে, হেলেদুলে এগিয়ে আসতে দেখা গেল নিতম্বিনীকে। এখনও খানিকটা দূরে, তবু রাহেলা বানুর মাথাটা পরিষ্কার চিনতে পারল রানা টারিটের উপর। বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে ছুটল ও।

‘রানা!’ এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল অ্যানির গলা, নিতম্বিনী এখনও থামেনি। ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে বেরিয়ে রয়েছে তার মাথা, বাতাসে তার ভিজে চুল উড়ছে, সাদা মুখে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো।

‘এর মানে কী?’ রাগের সঙ্গে পাঁটা চিৎকার করল রানা।

‘গালারা!’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাহাকার করে উঠল অ্যানি। ‘ওরা চলে গেছে! সবাই! চলে গেছে!’

অকস্মাৎ ব্রেক করে হ্যাচ থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ল অ্যানি, তাকে ধরে সিঁধে করল রানা।

‘কী বলছ! চলে গেছে মানে?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল, এইমাত্র পৌঁছুল সে।

টারিটের মাথা থেকে, জ্বলন্ত চোখ নিয়ে, জবাব দিল বানু, ‘চলে গেছে মানে ধোঁয়ার মত গায়েব হয়ে গেছে। পালিয়েছে!’

‘তারমানে আমাদের বাম দিকের পজিশন...?’ মাইকেল হতবাক হয়ে পড়ল।

‘খালি। কেউ নেই সেখানে। শিফটারা এগিয়ে এসেছে, ঢুকে পড়েছে ভিতরে, কোন গুলি খরচ না করেই। দলে দলে, শয়ে শয়ে। আমাদের ক্যাম্প ছাড়িয়ে এসে পড়েছে গিরিখাদের মুখে।’

‘রানা, আমাদের হারারি আর রাসটা গোত্রের সব ক’জন মারা পড়ত! পাইকারী গণহত্যা ঘটতে যাচ্ছিল! ওর দাদুর নামে হুকুম দেয় বানু, ডান দিকের পজিশন ছেড়ে এগিয়ে এসেছে আমাদের যোদ্ধারা!’

‘হায় আল্লাহ!’

‘ওরা এখন লড়াই করে গিরিখাদে ফেরার চেষ্টা করছে—কিন্তু মেশিনগানের সাহায্যে গিরিখাদের মুখ কাভার দিয়ে রেখেছে শিফটারা। কী যে অবস্থা, মুখে বললে তুমি বুঝবে না! মরুভূমি ঢাকা পড়ে গেছে রক্ত আর লাশে!’

‘সব শেষ! যা কিছু অর্জন করেছিলাম, এক ধাক্কায় সব হারিয়েছি! আজকের ব্যাপারটা একটা ফাঁদ ছিল, ট্যাংকগুলোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আক্রমণটা ছিল বাঁ দিক থেকে—কিন্তু শিফটারা জানল কীভাবে গালারা পালিয়ে গেছে?’

‘আমার দাদু যেমন বলেন, একটা সাপ বা একজন গালাকে বিশ্বাস করতে নেই।’

‘রানা, আর দেরি করা উচিত নয়!’ ওর হাত ধরে বাঁকাল অ্যানি। ‘আমাদের ফেরার পথ বন্ধ করে দেবে ওরা।’

‘ঠিক,’ বলল রানা। ‘গিরিখাদে ফিরে যেতে হবে আমাদের, ভেতরে নিয়ে গিয়ে ডিফেন্সের প্রথম লাইনে দাঁড় করাতে হবে

যোদ্ধাদের, তা না হলে ছুটতে ছুটতে সেই একেবারে আদিস আবাবায় পৌঁছে যাবে শিফটারা।’ ঝট করে আবাসের দিকে ফিরল সে। ‘আমরা যদি এই লোকগুলোকে সাথে নেই,’ হাত তুলে বালিয়াড়ির নীচে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধনগ্ন নিরস্ত্র আদিবাসীদের দেখাল ও, ‘যদি ওদেরকে গিরিখাদের মুখ দিয়ে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করি, শিফটা মেশিনগান সব ক’টাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যেতে পারে না ওরা, পায়ে হেঁটে ঘুর পথ ধরে গিরিখাদে পৌঁছুতে পারবে না?’

‘ওরা পাহাড়ী লোক,’ শান্তভাবে, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল আবাস।

‘গুড। ওদের তা হলে বলে দাও, গিরিখাদে নেমে প্রথম জলপ্রপাতের কাছে যেন অপেক্ষা করে। প্রথম জলপ্রপাত, আমাদের এক হবার জায়গা।’

‘আর আমরা কী করব?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

‘গিরিখাদের মুখ হয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের,’ বলল রানা। ‘আর্মারড কারগুলোকে সাথে না রেখে আর কোন উপায় নেই। আঁটসাঁট একটা ঝাঁক বেঁধে ছুটব আমরা। প্রার্থনা করো, শিফটারা আর্টিলারি বসানোর কাজ এখনও শেষ করার সুযোগ পায়নি। লেট’স গো!’

কামাল হাসানের পাঁজরে খোঁচা দিল মাইকেল, ‘চলো।’

‘গাড়িতে ওঠো,’ অ্যানিকে নির্দেশ দিল রানা। ‘এঞ্জিন স্টার্ট দাও। বাকি দুটো গাড়ি নিয়ে আসছি আমরা। লাইনের মাঝখানে থাকবে তোমার নিতম্বিনী, ফুলস্পীডে ছুটবে। গিরিখাদে না পৌঁছে কোন কারণেই থামবে না। বুঝতে পারছ কী বলছি?’

থমথমে চেহারা নিয়ে মাথা বাঁকাল অ্যানি।

‘কী ব্যাপার, তোমার মাথায় অন্য কোন চিন্তা আছে নাকি?’

কর্কশ গলায় জিঙেস করল রানা।

রানার দিকে কেমন ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকল অ্যানি, কী যেন বলতে চেয়েও পারছে না।

‘কী হলো, কিছু বলবে?’

বিড়বিড় করল অ্যানি, ‘রানা, আমি তোমাকে ভালবাসি।’ কিন্তু এতই ক্ষীণ কণ্ঠে যে রানা তার একটা শব্দও শুনতে পেল না বা শুনতে না পাবার ভান করবার সুযোগ পেল। রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, বাধা দিল মাইকেল।

‘বুঝতে পারছ না, কীসের মধ্যে থেকে আসতে হয়েছে ওকে?’ অ্যানির দিকে ফিরল সে, কয়েক পা এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরল। ‘রানার কথায় কিছু মনে কোরো না তুমি, মাথায় অনেক দায়িত্ব নিয়ে ফেলে মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না ও। এসো, তোমাকে আমি গাড়িতে তুলে দিই।’

রানার দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অ্যানি, কোমর ধরে নিতম্বিনীর টারিটে তাকে তুলে দিল মাইকেল, ফিসফিস করে বলল, ‘দুর্লভ কোন জিনিস অপাত্রে দান করা হচ্ছে দেখলে মনে বড় ব্যথা পাই, ডার্লিং!’

মুখে কিছু বলল না, চটাস চটাস আওয়াজ তুলে ঘন ঘন হাততালি দিল বানু।

‘আরেকটা কথা,’ বলল মাইকেল, ইতিমধ্যে আব্বাসকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে রানা। ‘সব জিনিসেরই একটা মোক্ষম সময় আছে। তুমুল যুদ্ধ চলছে, চারদিকে রক্ত আর লাশ, আহত মানুষের আহাজারিতে কান পাতা দায়, যে-কোন মুহূর্তে একটা গুলি ছুটে এসে ভবলীলা সঙ্গ করে দিতে পারে, এমন একটা সময়ে আমাকে প্রেম নিবেদন করে দেখো—উপযুক্ত সাড়া পাবার নিশ্চয়তা দিতে পারি। কিন্তু সবাই কি আর আমার মত প্রেমের কাঙাল, বলো?’

রানার গমনপথের দিকে এখনও তাকিয়ে আছে অ্যানি, সে তার দৃষ্টি ধীরে ধীরে মাইকেলের দিকে ফিরিয়ে আনল। শান্ত, নিরুত্তাপ কণ্ঠে জিঙেস করল, ‘তুমি কিছু বলছিলে আমাকে?’

‘শুনতে পাওনি, কী? সেই যেদিন থেকে পরিচয় সেদিন থেকেই তো বলছি—জিনিসটা আমার দরকার,’ বলে আর দাঁড়াল না মাইকেল, হন হন করে এগোল কামাল হাসানের হাত ধরে।

‘লাভলি! ওয়াভারফুল!’ চেষ্টা করে উঠল বানু। এখনও হাততালি দিচ্ছে সে। ‘ওহ, মিস অ্যানি, আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে!’

‘তোমার আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই,’ স্লান গলায় বলল অ্যানি। ‘কেননা, কিছুই তুমি বোঝোনি।’

‘বুঝিনি? আমি?’ খিল খিল করে হেসে উঠল বানু। ‘এ-কথা তুমি বলতে পারলে? জানো, এ-বিষয়ে আমি একজন এক্সপার্ট? বুঝেছি কিনা পরীক্ষা করো তা হলে। রানা একটা গবেট, বলতে পারো সে বোঝোনি। কিন্তু আমি ঠিকই বুঝেছি। না, শুনতে পাইনি কিন্তু তোমার ঠোট নড়া দেখে জেনে ফেলেছি কী বলেছ—রানা আমি তোমাকে ভালবাসি। কী, ঠিক বলিনি?’

তবু উৎসাহ বোধ করল না অ্যানি, চেহারায বিষাদ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। বলল, ‘কিন্তু তুমি বুঝতে পারায় কী লাভ, বলো? যাকে বোঝাতে চাই সে দিনে দিনে দূরে সরে যাচ্ছে...’

‘দূরে সরে যাচ্ছে? রানা?’ আকাশ থেকে পড়ল বানু। ‘কী বলছ তুমি, মিস অ্যানি?’

‘ঠিকই বলছি, বানু।’ মাথা নিচু করল অ্যানি। ‘রানা কেমন যেন এড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে। বেশ বুঝতে পারছি...’

‘এটা নিয়ে এত চিন্তা কোরো না তো!’ পরামর্শ দিল বানু। ‘তাই যদি হয়, তারও ওষুধ আছে। রানাকে আপাতত বাদ দাও,

প্রথম প্রেমিক হিসেবে মাইকেলকে গ্রহণ করো তুমি। ঈর্ষার আগুনে পুড়ুক রানা, তারপর দেখবে...।’

কথা না বলে অ্যানি শুধু মাথা নাড়ল।

‘তা হলে টোপ ফেলো! সত্যিকার টোপ। যা দেখলে পুরুষমানুষের মাথার ঠিক থাকে না!’ ফিসফিস করে বুদ্ধি দিল বানু, ঠোঁটে ষড়যন্ত্রের হাসি। ‘বাঘকে রক্তের স্বাদ পেতে দাও!’

‘ভেবেছ দিইনি?’ মুখে নয়, মনে মনে বলল অ্যানি। ‘কিন্তু আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও। এরপর কী করব, আমি জানি না।’ মুখে বলল, ‘এ-প্রসঙ্গ থাক, বানু। সামনে ভারি বিপদ!’

চোদ্দো

ক্লান্ত আর নির্জীব হয়ে পড়েছেন কামাল হাসান, তাঁকে টেনে ঢালের উপর তুলতে হিমশিম খেয়ে গেল মাইকেল। পায়ে বেধে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে ভেবে তাঁর কাছ থেকে তরোয়ালটা চাইল সে, কিন্তু বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে বিপুলবেগে মাথা ঝাঁকালেন, বোঝাতে চাইলেন নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতে রাজি নন তিনি।

হঠাৎ ওদের মাথার উপর আকাশে একটা শব্দ হলো, যেন নরকের সমস্ত বাতাস ছুটে এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল স্বর্গটিকে। তীক্ষ্ণ শব্দটা পাশ কাটাল, ওদের সামনে আর পাশে ঢালের গায়ে বিস্ফোরিত হলো বালি আর অগ্নিশিখা, টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উঠল আর্মারড কারের পঞ্চগশ ফিট নীচে।

‘কামান!’ বলল মাইকেল। ‘এবার রওনা হতে হয়, ওল্ড ম্যান!’ বৃদ্ধের পিঠে ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার আর

দরকার হলো না। কামানের গোলা বিস্ফোরিত হতে দেখে সাহস ও শক্তি দুটোই ফিরে পেয়েছেন তিনি, শূন্যে লাফ দিলেন একটা, গলা চিরে বেরিয়ে এল রণহংকার, আলখেল্লার গোপন পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন নকল দাঁতের খোঁজে।

‘আরে করো কি, না!’ আঁতকে উঠে দু’হাত বাড়াল মাইকেল, অনেক কষ্টে আবার জাপটে ধরল বৃদ্ধকে, টেনে নিয়ে চলল গাড়ির দিকে। কামাল হাসান খেপে গেছেন, পায়ে হেঁটে নাক্সা তরোয়াল হাতে যুদ্ধযাত্রা করতে চান। মাইকেল তাঁকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেলে কী হবে, পিছন ফিরে অদৃশ্য শত্রুপক্ষের উদ্দেশে বিরতিহীন রণহংকার ছাড়ছেন তিনি।

পরবর্তী গোলাটা বিস্ফোরিত হলো চূড়ার অনেক সামনে, আওয়াজ পেলেও দেখতে পেল না ওরা।

‘প্রথমটা কম দূরত্ব পেরোল, দ্বিতীয়টা বেশি,’ বিড়বিড় করল মাইকেল, কামাল হাসানকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে হিমশিম খাচ্ছে সে। ‘তৃতীয়টা কোথায় পড়বে?’

প্রায় গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় এল সেটা। এল ধূসর রঙা প্রান্তরের উপর দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা পথ ধরে, নিচু মেঘের ভেলা ভেদ করে, আকাশ কাঁপিয়ে। ভিতরে ঢুকল টারিটের পিছন দিয়ে, গাড়ির মোটা প্লেট ভেঙে। বিস্ফোরিত হলো ক্যাব-এর ইস্পাত মেঝেতে।

কাণ্ডজে ঠোঙার মত ফেটে গেল গাড়িটা। সঙ্গে আগুনের লালচে শিখা আর কমলা রঙের ধোঁয়া নিয়ে গোটা টারিট আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেল।

হ্যাঁচকা টানে কামাল হাসানকে বালির উপর ফেলে দিল মাইকেল, তাঁর পিঠের উপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়ল নিজে।

ওদের চারদিকে আগুন আর ইস্পাতের টুকরো বৃষ্টির মত ঝরল কয়েক সেকেন্ড, তারপর আবার মাইকেলের নীচে মোচড় খেতে শুরু করলেন কামাল হাসান। কিন্তু মাইকেল তাঁকে ছাড়ল না, সে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত আর্মারড কারের দিকে। বিধ্বস্ত খোল থেকে বেরিয়ে এল চোখ-ধাঁধানো আলোকমালা-গ্যাসোলিন আর ভিকার্সের অ্যামুনিশন আতসবাজির মত ছুটোছুটি শুরু করল।

বিস্ফোরণের আওয়াজ এক সময় থামল। সাবধানে মাথা তুলে তাকাল মাইকেল। সেই মুহূর্তে আরেকটা অ্যামুনিশন বেলেট আগুন ধরল, সাদা ট্রেসার ছুটে এল ওদের দিকে। বাট করে আবার মাথা নামিয়ে নিল মাইকেল।

‘উঠে পড়ো, কামাইল্যা, দোস্তো,’ অবশেষে বলল মাইকেল। ‘চলো দেখি, লিফট নিয়ে বাড়ি ফেরার উপায় হয় কিনা।’ এই সময় সগর্জনে অপর দিকের ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে এল কুৎসিতদর্শন চঞ্চলা, ওদের মাথার উপর ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘গড!’ চিৎকার করল রানা, ড্রাইভারের হ্যাচ খুলে মাথা তুলল ও। ‘আমি ভেবেছিলাম তোমাদের নিয়ে মারা গেছে ভাগ্যদেবী! ভাবলাম, যাই, টুকরোগুলো পাওয়া যায় কিনা দেখি।’

কামাল হাসানকে তুলে দিয়ে, নিজেও আঁচড়ে-খামচে চঞ্চলার টারিটে উঠে পড়ল মাইকেল। ‘ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে,’ গম্ভীর গলায় বলল সে। ‘তোমাকে আমার শোধ করতে হবে দুটো ঋণ।’

‘হিসাবটা পাঠিয়ে দেব,’ কথা দিল রানা, পরমুহূর্তে মাথা নিচু করল, চঞ্চলার পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল একটা গোলা, বিস্ফোরিত হলো চূড়ার এক কোণে। চোখেমুখে বালি আর ধোঁয়ার ধাক্কা খেলো ওরা।

‘বেঁচে থাকার স্বার্থে আমাদের বোধহয় এখান থেকে নড়া দরকার, কী?’ মৃদুকণ্ঠে বলল মাইকেল। ‘অবশ্য তোমার যদি অন্য কোন প্ল্যান না থাকে।’

প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে তীরবেগে নামতে শুরু করল চঞ্চলা, নীচের শক্ত মাটিতে নেমে এসে দিক বদলাল রানা, মেঘ আর বৃষ্টি ঢাকা গিরিখাদের মুখ লক্ষ্য করে ছুটল।

ওদেরকে আসতে দেখল অ্যানি, ওদের সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখায় সে-ও রওনা হলো। সমতল প্রান্তর ধরে পাশাপাশি ছুটল জোড়া আর্মারড কার, বৃষ্টির ভিতর দিয়ে আবার সগর্জনে ধেয়ে এল একটা গোলা, বিস্ফোরিত হলো ওদের পঞ্চাশ ফুট সামনে, ধূমায়িত গর্তটাকে এড়াবার জন্য সামান্য দিক বদলাতে হলো ওদেরকে।

‘দেখতে পাচ্ছ, ব্যাটারিটা কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

হ্যাচের উপর ওয়েল্ডিং করা একটা আংটা ধরে নিজেকে খাড়া রেখেছে মাইকেল, মুখে বৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, চোখ জোড়া কৌচকানো। ‘সম্ভবত গালাদের ছেড়ে যাওয়া পজিশনে রয়েছে ওরা, যত্ন করে খোঁড়া আর্মার ট্রেঞ্চগুলোয়।’

‘সরাসরি ওদের ওপর হামলা করা সম্ভব?’ পরামর্শ চাইল রানা।

‘না, ওল্ড চ্যাপ। পজিশনগুলো আমার নির্বাচিত, সাংঘাতিক নিরাপদ। সরাসরি গিরিখাদের মুখের দিকেই চলো-ভেতরে দ্বিতীয় পজিশনটাই আমাদের একমাত্র ভরসা, জলপ্রপাতের ধারে।’ বুদ্ধ কামাল হাসান গাড়ি থেকে অর্ধেকটা ঝুলছেন, তাঁর পেটে একটা হাঁটু গেড়ে রেখেছে মাইকেল। ‘এই শালার বুড়ো আমাকে জ্বালাতন করে মারল!’

পেটে হাঁটু নিয়ে ঝুলে থাকলে কী হবে, দ্রুতগতি গাড়িতে চড়বার আনন্দে দাঁতহীন মাড়ি বের করে নিঃশব্দে হাসছেন কামাল হাসান, নিকট ভবিষ্যতে যুদ্ধ করবার সম্ভাবনা থাকায় সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে তাঁর। মাইকেলের পাঁজরে পায়ের ধাক্কা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি, বললেন, ‘হাউ ডু ইউ ডু?’

‘আরও ভাল থাকতে পারলে ভাল হত, ওল্ড বয়,’ খেদ প্রকাশ করল মাইকেল, পরমুহূর্তে ঝট করে মাথা নিচু করল সে, প্রায় মাথা হুঁয়ে বেরিয়ে গেল পরবর্তী শেলটা।

‘ব্যাটারা উন্নতি করছে,’ স্কোভের সুরে বলল সে।

‘প্র্যাকটিস করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছে,’ পাল্টা চিৎকার করল রানা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল মাইকেল, ‘আয় বৃষ্টি ঝোঁপে!’ সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল মেঘ, গোটা প্রান্তর বৈদ্যুতিক সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে গুরু হলো মুষলধারে তুমুল বৃষ্টি।

‘অবিশ্বাস্য, মেজর সেভারস! তাজ্জব ব্যাপার!’ রানার পাশ থেকে বলল আব্বাস। ‘আপনি জাদু জানেন নাকি?’

‘এ কিছু না, মাই সান,’ কৃতিত্বের দাবিদার হতে অস্বীকৃতি জানাল মাইকেল। ‘বলতে পারো, এ স্রেফ ওপরওয়ালার সাথে সরাসরি যোগাযোগ।’

বৃষ্টি যেন সাদা ঘন কুয়াশা, ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। আন্দাজের উপর গাড়ি চালাচ্ছে রানা, চারদিকে বিশ গজের বেশি কী আছে দেখবার উপায় নেই। মুষলধারে বৃষ্টি গুরু পর থেকে শিফটারা কামান দাগছে না, টার্গেট হারিয়ে ফেলেছে তারা।

খানিক পর বিস্ময় প্রকাশ করল মাইকেল, ‘গুড লর্ড, আর কতক্ষণ এরকম চলবে?’ ভিজে চুরটটা হুঁড়ে ফেলে দিল সে।

‘চার মাস,’ পাল্টা চিৎকার করল আব্বাস। ‘এখন থেকে চারমাস চলবে একটানা।’

‘কিংবা তুমি যতক্ষণ না থামতে বলো,’ বলল রানা, ওর ভিজে আর ক্লান্ত চেহারায় নিঃশব্দ হাসি ফুটল, চোখ ঘুরিয়ে তাকাল পাশের গাড়িটার দিকে।

নিতম্বিনীর টারিট থেকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করল ওকে বানু। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে, অর্ধেক শরীর হ্যাচের ভিতর। ভিজে কাপড় সঁটে আছে বুকের সঙ্গে, স্তন জোড়া মনে হচ্ছে উন্মুক্ত, গাড়ির ঝাঁকির সঙ্গে সেগুলোও লাফাচ্ছে অনবরত।

হঠাৎ করে বৃষ্টিতে ঝাপসা সামনের প্রান্তর ছুটন্ত মূর্তিতে ভরে উঠল। রাসটা আর হারারি গোত্রের প্রতিটি যোদ্ধা লম্বা আলখেল্লা পরে রয়েছে, হাতে অস্ত্র, হোঁচট খেতে খেতে দৌড়াচ্ছে সবাই গিরিখাদের মুখের দিকে।

টারিটে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহ দিল আব্বাস, কথা শেষ করে রানাকে বলল, ‘ওদের বললাম, প্রথম জলপ্রপাতের নীচে পজিশন নেব আমরা—খবরটা ওরা ছড়িয়ে দেবে।’

আদিবাসী যোদ্ধাদের উদ্দেশে আবার কিছু বলবার জন্য মুখ খুলল সে, এই সময় আঁতকে উঠল রানা, ব্রেক করল, লাশের একটা বিশাল স্তূপকে পাশ কাটাবার জন্য ঘুরিয়ে নিল চঞ্চলাকে।

‘এখানেই শিফটা মেশিনগানাররা পায় ওদেরকে,’ নিতম্বিনীর টারিট থেকে চিৎকার করে জানাল বানু, আর ঠিক যেন তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য ঘন বৃষ্টি ভেদ করে ভেসে এল মেশিনগানের আওয়াজ।

লাশের স্তূপ অসংখ্য, সেগুলোকে এড়ানোর জন্য কিছুটা সময় ব্যস্ত থাকতে হলো রানাকে, তারপর সুযোগ পেয়ে ঘাড়

ফেরাল নিতম্বিনীর দিকে, জানতে চায় অ্যানি ঠিকমত অনুসরণ করতে পারছে কিনা।

‘আরে, কী ব্যাপার!’ রানা বুঝতে পেরেছে ওরা একা। ‘গেল কোথায়!’ চঞ্চলাকে দাঁড় করাল ও। ‘এমন বেয়াদপ মেয়ে তো দেখিনি!’ পিছন দিকে ছুটল আর্মারড কার, সগর্জনে। বৃষ্টির মধ্যে কিছুই দেখছে না ও।

ওর পিছন থেকে সকৌতুকে বলল মাইকেল, ‘তোমার কথায় একটু যেন হতাশার সুর, কী?’

‘এমন হতে পারে,’ বলল রানা, ‘ওকে পাবার পর উপলব্ধি করব না পাওয়াই ভাল ছিল! স্বাধীনচেতা একটা মেয়ের সাথে প্রেম করতে ভারি মজা, কিন্তু তার সাথে ঘর বাঁধা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ।’

‘তারমানে কী, প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছ তুমি, ওল্ড চ্যাপ?’

‘জীবন থাকতে নয়!’ ঘোষণা করল রানা, জানে ওর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সামান্য আভাস পেলেও অপমানিত বোধ করবে মাইকেল।

‘ও, বুঝছি!’ মাইকেল গম্ভীর হলো। ‘আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নেয়াটাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য, তারপর হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কী?’

‘সেটা কী তোমারও উদ্দেশ্য নয়, মাইকেল?’

জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল মাইকেল। দৃঢ়কণ্ঠে, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলল সে, ‘না। অ্যানিকে আমি যদি জয় করতে পারি, আমার জীবনের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ হবে ও। ওকে সুখী দেখার জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করব আমি।’

মাইকেলের কথা শুনে আনন্দে ভরে উঠল রানার বুক। একটা ব্যাপারে কোন খাদ নেই, রানা অ্যানিকে সত্যি ভালবাসে। এ

ভালবাসা পবিত্র এবং দৈহিক মিলনের উর্ধ্বে। অ্যানি সুখী হলে ওর চেয়ে বেশি খুশি হবে না কেউ।

বৃষ্টির ভিতর হঠাৎ দেখা গেল নিতম্বিনীকে। মাইকেল গুঙিয়ে উঠল, ‘ও মাই গড!’

নিতম্বিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে, অ্যানি আর বানু গাড়ির নীচে। অসংখ্য লাশের ভিতর ছোটোছুটি করছে দু’জন, নিহতদের ভিড়ে যারা আহত অবস্থায় পড়ে আছে তাদের উৎসাহ দিয়ে বলছে হামাগুড়ি দিয়ে আর্মারড কারে ঢোকো। রক্তাক্ত এক যোদ্ধাকে ধরাধরি করে তুলল ওরা, নিতম্বিনীর দিকে এগোল, আহতরা অনুসরণ করল ওদের।

‘অ্যানি, চলে এসো!’ হাঁক ছাড়ল রানা।

‘তুমি চাও, এদের এখানে ফেলে যাই আমরা?’ পাল্টা চিৎকার করল অ্যানি।

এক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না রানা, লক্ষ করল মাইকেল ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে বিদ্রোহিত হাসি। ‘জলপ্রপাতের কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছুতে হবে আমাদের,’ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করল ও। ‘আহতদের এখুনি সাথে না নিলেও চলবে, কারণ শিফটারা ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। আমাদের যোদ্ধারা যারা বেঁচে আছে তাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে আমরা দ্বিতীয় পজিশনে পৌঁছুতে পারি কিনা তার ওপর...’ কিন্তু বৃথাই ব্যাখ্যা করছে রানা, মেয়ে দুটো ওর দিকে পিছন ফিরে নিজেদের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

‘অ্যানি!’ আবার ডাকল রানা।

‘তোমরা যদি সাহায্য করো, সময় আরও কম লাগবে,’ জবাব দিল অ্যানি।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চঞ্চলার টারিট থেকে নেমে এল রানা, মাইকেল আর আব্বাসও তাকে অনুসরণ করল।

আহত রাসটা আর হারারি যোদ্ধাদের তোলা হলো দুটো আর্মারড কারে। গাড়ি দুটোর খোল ভরাট হবার পর সম্ভ্রষ্ট হলো অ্যানি।

‘পনেরো মিনিট নষ্ট করলাম,’ ঘড়ি দেখে বলল মাইকেল। ‘এই দেরির কারণে আমরা মারা যেতে পারি, হারাতে পারি গিরিখাদটা।’

‘ওগুলোর চেয়ে এই কাজটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল অ্যানি, আর কিছু শুনবার অপেক্ষায় না থেকে স্টার্ট দিল সে, ছেড়ে দিল গাড়ি।

সামনে আরও আহত লোক দেখল ওরা, হামাগুড়ি দিয়ে পথের সামনে চলে এল, হাত তুলে কাতর অনুরোধ করল তুলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু আর কাউকে নেওয়ার জায়গা নেই। করুণ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কারও কিছু করবার থাকল না।

একবার বৃষ্টির বেগ কিছুটা হালকা হয়ে যাওয়ায় চারদিকে এক মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হলো ওদের দৃষ্টিসীমা, সেই সঙ্গে মঞ্চে ফেলা স্পটলাইটের মত এক টুকরো রোদ আলোকিত করে তুলল ওদেরকে, চকচকে আলো নিয়ে হেসে উঠল ইম্পাতের খোল। সঙ্গে সঙ্গে শিফটাদের মেশিনগান গর্জে উঠল মাত্র দুশো গজ দূর থেকে, বুলেটের আকস্মিক ধাক্কায় ছিটকে পড়ল দশ-বারোজন যোদ্ধা, পরমুহূর্তে ঝপ করে নেমে এল বৃষ্টির ঘন পর্দা, আবার আড়াল হয়ে গেল সব।

গিরিখাদের নীচে মেইন ক্যাম্পে পৌঁছুল ওরা, চারদিকে সব এলোমেলো হয়ে আছে। কামানের অসংখ্য গোলা আর মেশিনগানের হাজার হাজার গুলি বিশাল ক্যাম্পটাকে মাটির সঙ্গে

মিশিয়ে দিয়েছে। ঘোড়ার লাশ আর নিহত মানুষ কাদার ভিতর আংশিক ডুবে আছে, এখানে সেখানে পথ ভোলা দু’একটা কুকুর বা হারিয়ে যাওয়া এক-আধটা শিশু ছাড়া জ্যান্ত প্রাণী বলতে কোথাও কিছু নেই।

ক্যাম্পের চারদিকে পাথুরে মাটিতে ছাড়া ছাড়াভাবে এখনও যুদ্ধ চলছে, ঢালের গায়ে শিফটাদের ইউনিফর্ম আর মাজল-ফ্যাশ দেখতে পেল ওরা। মাঝে মধ্যেই একেকটা শেল সগর্জনে ছুটে গেল মাথার উপর দিয়ে, দৃষ্টিসীমার বাইরে কোথাও বিস্ফোরিত হলো।

‘সরাসরি গিরিখাদের মুখের দিকে চলো,’ টারিট থেকে বলল মাইকেল। ‘এখানে থেমে না।’

কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে এগোল চঞ্চলা, যে ঢালগুলোয় যুদ্ধ চলছে তার নীচে ও আড়ালে রয়েছে পথটা। সারডি নদী পেরোল ওরা, হাঁ করে থাকা গিরিখাদের বিশাল মুখের দিকে এগোল।

‘আমার লোকেরা ওদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে!’ গর্বের সঙ্গে চিৎকার করল আব্বাস। ‘গিরিখাদ নিজেদের দখলে রেখেছে ওরা! ওদের সাহায্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।’

‘আমাদের ঠিকানা প্রথম জলপ্রপাত,’ রানার সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এই প্রথম গলা চড়াল মাইকেল। ‘ওরা লড়ছে, ভাল কথা—কিন্তু শিফটাদের এখানে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, বিশেষ করে কামান চলে আসার পর। প্রথম জলপ্রপাতে জড়ো হতে পারলে আমাদের আশা আছে।’ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, কিন্তু যেখানে থাকবার কথা সেখানে নিতম্বিনীকে দেখতে পেল না। ‘সর্বনাশ হয়েছে! আবার!’

‘কী ব্যাপার, মাইকেল?’ হ্যাচ থেকে মাথা তুলল রানা, উদ্ভিগ্ন।

‘ওরা আবার...!’

‘কারা...?’ জিঙেস না করলেও চলত রানার, কারণ ঘাড় ফেরাতেই নিতম্বিনীকে দেখতে পেল ও, পথ ছেড়ে বাক নিয়েছে অ্যানি, আর্মারড কার নিয়ে সগর্জনে ছুটে চলেছে ক্যাম্পের দূর প্রান্তে।

‘ধরো ওটাকে!’ গর্জে উঠল মাইকেল। ‘সামনে গিয়ে বাধা দাও!’

চঞ্চলাকে ঘুরিয়ে নিল রানা, আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিতম্বিনীর পথরোধ করবার জন্য ছুটল। গাছপালা আর বৃষ্টির ভিতর হারিয়ে গেল নিতম্বিনী।

পাঁচ মিনিট পর আবার সেটাকে দেখা গেল, ভাঙাচোরা তাঁবুর পাশে ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিকে হুড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তৈজস-পত্র, কাপড়চোপড়, খাবার দাবার। টারিটে উবু হয়ে বসে গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় লক্ষ্য করে ভিকার্স মেশিনগান থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করছে বানু, জবাবে শিফটাদের তরফ থেকে ছুটে আসা বুলেটগুলো সশব্দে লাগছে ইস্পাতের খোলে। ছুটন্ত শিফটা সৈনিকদের দু’একজনকে দেখতে পেল রানা, চঞ্চলাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আব্বাসকে সুযোগ করে দিল গুলি করবার।

কিছু বলতে হলো না, থেমে থেমে গুলি করল আব্বাস। ঝোপঝাড় থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেল শিফটার। হ্যাচ থেকে বেরিয়ে টারিটে দাঁড়াল রানা, চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল নীচের দিকে।

নিতম্বিনী থেকে বেরিয়ে এসেছে অ্যানি উইসপার, মুশলধারে বৃষ্টি আর থকথকে কাদার ভিতর ঘুর ঘুর করছে সে, যেন মেশিনগানের গুলি সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই।

‘অ্যানি!’ সংবিলম্বে ফিরে পেয়ে ডাকল রানা।

অ্যানি তাকাল না, কাদার ভিতর থেকে কী যেন একটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল সে, চিৎকার করে উঠল উল্লাসে। এতক্ষণে ওদের দিকে ফিরল সে, নিতম্বিনীর দিকে ছুটল, কয়েক ফুট দূর থেকে পাশ কাটাল রানাকে।

‘এসব কী শুরু করেছে তুমি...’, রাগের সঙ্গে বলল রানা।

‘টাইপরাইটার আর টয়লেট ব্যাগ,’ ব্যাখ্যা করল অ্যানি, দুটোই সে বুকের সঙ্গে শক্ত করে ধরে আছে। ‘একটার ভেতর রয়েছে আমার মেক-আপ, আর দ্বিতীয়টা ছাড়া কাজ করব কীভাবে, তুমিই বলো?’ এরপর ভিজে বিড়ালের মত হাসল সে। ‘এবার আমরা যেতে পারি, ধর্মাবতার জনাব মাসুদ রানা।’

গিরিখাদের ভিতর ক্রমশ উপর দিকে উঠে গেছে পথ, ঢালু পথে কাকভেজা মানুষ আর পশুর বিশৃংখল মিছিল। ভেজা পাথরে বারবার পা পিছলে যাচ্ছে ঘোড়া আর গাধার। বারোটা উটের পিঠে ভিকার্স মেশিনগানগুলোকে দেখতে পেয়ে পরম স্বস্তি বোধ করল রানা, কাঁধে টোকা দিয়ে আরও কয়েকটা উটের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মাইকেল, সেগুলো অ্যামুনিশনের বাস্ক বহন করছে। তার লোকেরা যার যার দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করেছে। মেশিনগান বা অ্যামুনিশনের বাস্ক হাতছাড়া করেনি।

‘ওদের সাথে যাও, আব্বাস,’ নির্দেশ দিল রানা। ‘দেখবে ওগুলো যেন নিরাপদে প্রথম জলপ্রপাতের নীচে পৌঁছায়।’ লাফ দিয়ে চঞ্চলা থেকে নেমে গেল আব্বাস। গাড়ি দুটো মিছিলের সঙ্গে ধীরগতিতে এগোল।

‘ওরা কি আর যুদ্ধ করতে পারবে?’ সন্দেহ প্রকাশ করল

মাইকেল, তাকিয়ে আছে বিশ্বস্ত যোদ্ধাদের দিকে। বৃষ্টিতে ভিজে হি-হি করে কাঁপছে সবাই।

‘পারবে,’ আশা প্রকাশ করল রানা, তাকাল গোত্রপ্রধান কামাল হাসানের দিকে। ‘আপনি কী বলেন?’

আলখেল্লার আস্তিন সরিয়ে বাহুর পেশী ফুলিয়ে রানাকে দেখালেন কামাল হাসান। রণহুংকার ছাড়লেন তিনি, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হাউ ডু ইউ ডু?’

প্রথম জলপ্রপাতের নীচে চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ একটা বাঁক, সাবধানে মোড় ঘুরল চঞ্চলা।

‘এখানে থামো,’ বলল মাইকেল, কামাল হাসানকে নিয়ে নেমে গেল সে।

গাড়ির মাথা থেকে রানা বলল, ‘দায়িত্ব ভাগ হয়ে যাওয়া দরকার, মাইকেল।’

দাঁড়াল মাইকেল, ঘুরল, মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। ‘বলো।’

‘গাড়ি নিয়ে তুমি আর অ্যানি সারডি শহরে চলে যাও,’ ইঙ্গিতে খেলের ভিতরটা দেখাল রানা, ‘ওদের চিকিৎসা দরকার। যে-কোন বড় একটা বাড়ি দখল করবে, হাসপাতাল বানাবে সেটাকে। কাজটা বরং অ্যানির ওপর ছেড়ে দাও, ব্যস্ত থাকলে মাথায় কুবুদ্ধি চাপবে না। যদি দেখো তাতেও কাজ হচ্ছে না, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে ওকে-,’ হাসল রানা, পরমুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে উঠল চেহারা। ‘প্রিন্স হাসান সালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। এখানকার পজিশন সম্পর্কে জানাবে তাকে। বলবে গালারা পালিয়েছে, চেষ্টা করে আমি বড়জোর এক হপ্তা দখলে রাখতে পারব গিরিখাদ। বলবে, অ্যামুনিশন দরকার আমাদের-দরকার খাবার, ওষুধ, কম্বল। সাপ্লাই সহ একটা ট্রেন যদি সারডিতে

পাঠাতে পারে, সবচেয়ে ভাল হয়। ট্রেন পেলো আহতদেরও আমরা পাঠাতে পারব...।’

‘কিন্তু এ-সব দায়িত্ব তুমি আমাকে কেন দিচ্ছ?’ মাইকেল ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, মোটেও বিস্মিত হয়নি। ‘মেজর বলতে এখানে একমাত্র আমি, কী? যুদ্ধ করার দায়িত্ব তো আমার পাবার কথা!’

‘তাও পারে,’ জবাব দিল রানা। ‘কাজগুলো সেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছ তুমি। আসার সময় যত বেশি সম্ভব খাবারদাবার নিয়ে আসবে,’ ইঙ্গিতে গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসী যোদ্ধাদের দেখাল ও। ‘খালি পেটে এরা যুদ্ধ করবে কীভাবে?’

‘সব ঠিক আছে,’ বলল মাইকেল। ‘কিন্তু সারডিতে কে যাবে তা জানার জন্যে টস করতে হবে, ওল্ড চ্যাপ।’

‘কেন, আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই?’ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল রানা। ‘ভেবেছ শিফটাদের আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারব না?’

‘তোমার সামরিক অভিজ্ঞতার ওপর আমার শ্রদ্ধা আকাশচুম্বি, ওল্ড চ্যাপ,’ ততখিক গম্ভীর সুরে বলল মাইকেল। ‘স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আমার-আমি বিশেষ করে রণকৌশল সম্পর্কে বলছি। তবে কথা হলো, এই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করছে না, এই যা। টস করে দেখা যাক, ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।’ পকেটে হাত গলিয়ে তাঞ্জানিয়ান শিলিংটা বের করল সে।

চঞ্চলার টারিট থেকে এক লাফে নেমে পড়ল রানা। ‘টস যদি করতে হয়, আমি করব,’ বলে মাইকেলের হাত থেকে একরকম

প্রায় কেড়ে নিল শিলিংটা।

‘হেডস!’ ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসি নিয়ে বলল মাইকেল।

শিলিংটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাতের তালুতে নিল রানা। মুখ তুলল ধীরে ধীরে।

ভারি গলায় হেসে উঠল মাইকেল, ‘তোমার কপাল খারাপ, ওল্ড চ্যাপ, কী?’

নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে আবার চঞ্চলার টারিটে উঠে পড়ল রানা।

‘শোনো হে,’ কামাল হাসানের কাঁধে হাত রেখে রানার দিকে মুখ তুলল মাইকেল, ‘যদি পারো কিছু চুরট নিয়ে এসো। ধোঁয়া না গিলে প্রাণত্যাগ করতে আমার কষ্ট হবে। দেখো, বৃষ্টিতে আবার ভিজিয়ে ফেলো না যেন। আর, হ্যাঁ, আমার সম্পত্তিটার দিকে একটু নজর রেখো—কিন্তু সাবধান, খুব বেশি নজর যেন না পড়ে...!’

চঞ্চলাকে পিছিয়ে নিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি হলো রানা, দেখল যোদ্ধাদের বিশৃংখল ভিড়টাকে খেদিয়ে পজিশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মাইকেল।

মাথার উপর তরোয়াল খাড়া করে রণহুংকার ছাড়লেন বৃদ্ধ কামাল হাসান। রানার দিকে চেয়ে বললেন, ‘হাউ ডু ইউ ডু?’

পনেরো

হাইল্যান্ডের উপর ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে আকাশ, দুই দিন আর তিন রাত ধরে বিরতিহীন বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। কমিউনিস্টদের বিশাল একটা বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে রওনা

হয়েছিল, মেঘ আর বৃষ্টি প্রথম দলটাকে রক্ষা করেছে। আশা আরাডাম-এর কাছাকাছি ছিল দ্বিতীয় দলটা, আকাশে মেঘ না থাকায় ক্যাপরোনি বম্বারগুলো নগ্ন ও অসহায় অবস্থায় পায় তাদের, বোমা বর্ষণের পর যারা বেঁচেছিল তারা প্রাণ হারায় শিফটা বাহিনীর অতর্কিত হামলায়। দশ হাজার শিফটাকে নিয়ে ডেসি রোডের দিকে রওনা হয়েছে জেনারেল ফাদ আর মি. এক্স। পনেরো হাজার কমিউনিস্টকে খতম করে এখন তারা ধাওয়া করছে প্রথম দলটাকে, আশা আরাডাম থেকে আগেই যারা রওনা হয়ে গেছে।

হাইল্যান্ডের আকাশ মেঘে ঢাকা হলে কী হবে, প্রিন্স হাসান সালে ক্যাপরোনি বম্বারগুলোর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। মাঝে-মাঝে বিরতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চক্রর দিচ্ছে ওগুলো, ক্ষুধার্তের মত খুঁজছে মেঘের গায়ে কোন ফাঁক পাওয়া যায় কিনা। মেঘ সরে গেলে কী লোভনীয় টার্গেটই না পাবে তারা—ডেসি রোডের বারো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কমিউনিস্ট বাহিনীর আঠারো হাজার গেরিলা। থকথকে কাদায় পথ চলা দায়, যোদ্ধারা ঠাণ্ডায় কাঁপছে, পেট খালি, মনে ভয় যে—কোন মুহূর্তে পিছন থেকে ঝাপিয়ে পড়বে শিফটা ট্যাংক বা আকাশ থেকে নেমে আসবে আগুনে বোমা।

তুর্মুল বৃষ্টি শিফটাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করেছে। কাদা আর গর্তের ভিতর তাদের প্রকাণ্ড ট্রুপ-ক্যারিয়ারগুলো ঘন ঘন আটকা পড়ছে, শুকনো নালাগুলো ভরে উঠেছে তীব্রগতি পানিতে। ভাড়াটে ইটালিয়ান এঞ্জিনিয়ারদের বিশ্রাম নেই, প্রতি দু’পাঁচশো গজ পরপর একটা করে ব্রিজ তৈরি করতে হচ্ছে তাদের।

কমিউনিস্ট বাহিনীর এই দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছিল মাহমুদ

বাশার, সামরিক ট্রেনিং থাকায় সদ্য দলভুক্ত প্রিন্স হাসান সালেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে। ডেসি রোড ধরে ছোট একটা দল নিয়ে সারডিতে পৌঁছানোর কথা হাসান সালের, বাহিনীর সিংহভাগ চলে যাবে লেক টানার দিকে, যেখানে সেলাসী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে কমিউনিস্টদের মূল শক্তি। কিন্তু দলত্যাগী গালাদের অতর্কিত এক হামলায় প্রাণ হারিয়েছে মাহমুদ বাশার, নেতৃত্ব চলে এসেছে প্রিন্সের হাতে। কমিউনিস্টদের হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরী বার্তা এসেছে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে লেক টানায় পৌঁছুতে হবে তাকে। বাহিনীর গতি মন্তর হলেও, প্রিন্স হিসাব করে দেখেছে, ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছুতে পারবে সে।

কাদায় লেপা ফোর্ড সেডান-এর ব্যাক সিটে বসে রয়েছে প্রিন্স, গায়ে ভিজে গ্রেটকোট, গাড়ির ভিতর বৃষ্টি না থাকলেও ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে তার হাত, শেষ কবে ঘুমিয়েছে মনে করতে পারছে না।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে প্রিন্স হাসান সালে। পনেরো হাজার দক্ষ-অদক্ষ গেরিলা যোদ্ধা রয়েছে তার দায়িত্বে। তাদের নিয়ে সময় মত লেক টানায় পৌঁছুতে হবে তাকে। পিছনে ধাওয়া করে আসছে জেনারেল ফাদ আর তার বিশাল বাহিনী। সামনে কী অবস্থা তার জানা নেই। তবে আন্দাজ করতে পারে সে-শিফটাদের ডানাকিল কলাম ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সারডি গিরিখাদ দখল করে নিয়েছে, কিংবা হয়তো উঠে এসেছে সারডি শহরে। সে জানে, কামাল হাসানের ক্ষুদ্রে বাহিনী সমতল প্রান্তরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে গিরিখাদের মুখ দখল করে রাখতে। তার ভয়, রানা আর মাইকেলের ভঙ্গুর প্রতিরোধ তখনই করে দিয়ে এক পাল হিংস্র নেকড়ে মত ডেসি রোডে ছুটে

আসবে শিফটার, কমিউনিস্ট বাহিনীর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

তার আরও একটা ভয়, দলত্যাগী গালাদের নিয়ে। রাসটা আর হারারি নেতৃত্ব তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ভুল করেছিল। আশা আরডামে যেমন, তেমনি ডানাকিল মরতেও বেঈমানী করেছে তারা। ডেসি রোডের দু'পাশে পাহাড়ী ঢাল আর গুহার আড়ালে লুকিয়ে আছে দলত্যাগী গালারা, সুযোগ পেলেই কমিউনিস্টদের ছোটখাট দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ-ধরনের একটা আক্রমণেই নিহত হয়েছে মাহমুদ বাশার। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল প্রিন্স-সারডি গিরিখাদ বা সারডি শহরে রানা আর মাইকেলের বিরুদ্ধে নূর আয়াও গালা কী করছে কে জানে।

সামনের দিকে ঝুঁকে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল প্রিন্স। রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক মাঝখানে দেখা গেল রেল লাইন। সম্ভ্রষ্ট বোধ করল সে, ড্রাইভারের দিকে ফিরে গাড়ির স্পীড বাড়তে বলল। যোদ্ধাদের মিছিল দু'পাশে রেখে সামনে এগোল ফোর্ড সিডান।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে পৌঁছল গাড়ি, রাস্তার ধারে অপেক্ষারত গেরিলা অফিসারদের পাশে থামল ড্রাইভার। মাথায় হ্যাট পরে গাড়ি থেকে নামল প্রিন্স, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরল অফিসাররা। কার কী দরকার, নতুন দুঃসংবাদ, অস্তিত্বের পক্ষে হুমকিস্বরূপ পরিস্থিতি, সবাই এক যোগে জানাতে শুরু করল। শুনতে শুনতে মন আরও খারাপ হয়ে গেল প্রিন্সের।

ওরা না থামা পর্যন্ত চুপ করে শুনল প্রিন্স, তারপর বলল, 'সারডির টেলিফোন লাইন এখনও খোলা?'

'গালারা এখনও ওটা কাটেনি। ওটা রেললাইন ধরে যায়নি, গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে, সেজন্যেই বোধহয় এখনও ওদের

নজরে পড়েনি।’

‘সারডি স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করো, ওখানে কারও সাথে আমার কথা বলতে হবে। গিরিখাদে কী ঘটছে জানতে হবে আমাকে।’

রেললাইনের ধারে অফিসারদের রেখে পাহাড়ের দিকে রওনা হলো প্রিন্স, গাড়িতে বসে সে তার বাবা, মেয়ে, ভাই আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবল। মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছে তারা, বেস্টম্যান গালা আর অত্যাচারী শিফটাদের হাতে প্রাণ দিচ্ছে।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর গাড়ির পাশে ছুটে এল একজন টেকনিশিয়ান। ‘কমরেড, সারডির লাইন খোলা। আপনি কথা বলবেন?’

সারডি-ডেসি টেলিফোন লাইনে একটা ফিল্ড-টেলিফোন ফিট করা হয়েছে। মাথার উপর টেলিগ্রাফ পোল থেকে ঝুলছে তামার তার। হ্যান্ডসেটটা ধরিয়ে দেওয়া হলো প্রিন্সের হাতে।

সারডি রেলওয়ে চত্বরে, স্টেশন মাস্টারের অফিস কামরার পাশে, লম্বা গুদাম ঘরে ঠাঁই পেয়েছে ছয়শো আহত যোদ্ধা। টিনের ছাদ বহু জায়গায় ফুটো, বৃষ্টির পানি অনবরত ঝরছে। অল্প কিছু গমের বস্তা ছাড়া গোটা গুদাম খালিই ছিল, আহতদের জায়গা করে দিতে অসুবিধে হয়নি। তবে বিছানা, কম্বল, চাদর ইত্যাদি কিছুই নেই, চটের খালি বস্তা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

নরক কি এরচেয়ে খারাপ কিছু? প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কোন আড়াল বা সরঞ্জাম নেই, পানি নেই, নেই অ্যান্টিসেপটিক, ওষুধ, শুকনো কাপড় বা গরম খাবার। ক্ষতগুলোয় ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। আহতদের চিৎকারে কান পাতা দায়। দুর্গন্ধে প্রাণ বাঁচে না।

দু’দিন আগে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে অ্যানি উইসপার। সেই থেকে সার সার পড়ে থাকা আহতদের মাঝখানে কেটে গেছে তার সময়, অতীত আর ভবিষ্যৎ ভুলে শুধু বর্তমান নিয়ে বেঁচে আছে সে, মনে রাখেনি নিজের অস্তিত্বের কথাও। গুদামের আবছা আলোয় মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা, চোখের নীচে ঘন কালি জমেছে, পিঠ আর কাঁধ ব্যথায় আড়ষ্ট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকায় দুটো পা ফুলে গেছে তার। তার লিনেন পোশাকে রক্তের দাগ তো আছেই, দুর্গন্ধময় আরও একাধিক তরল পদার্থ শুকিয়ে গেলেও দাগগুলো মুছে যায়নি। এখনও অবিরাম কাজ করে চলেছে সে, ব্যথায় টন টন করছে বুকটা আহতদের জন্য তেমন কিছুই করতে পারছে না বলে।

করবার মধ্যে পানির জন্য কেউ ছটফট করলে তার মুখে মগ ধরছে অ্যানি, নিজের ত্যাগ করা ময়লা থেকে অচল কাউকে সরিয়ে আনছে, কেউ মারা যাচ্ছে দেখলে তার করুণ আবেদন ভরা কালো হাত নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে, শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে লোকটার মুখ ঢেকে দিচ্ছে চটের বস্তায়, ইঙ্গিতে অতি পরিশ্রমে শান্ত পুরুষ সহকারীদের ডেকে লাশ সরাবার নির্দেশ দিচ্ছে। কিছু বলবার দরকার করে না, লাশ সরিয়ে নেওয়ার পর লোকগুলো বাইরে থেকে আরেকজন আহতকে নিয়ে আসছে। বৃষ্টির মধ্যে এরকম আরও অনেক আহত লোক কাতরাচ্ছে, কেউ মারা গেলে তবে তাদের একজনের জায়গা হবে গুদামের ভিতর।

হারারি সহকারীদের একজন তার কাঁধে টোকা দিল। তাকাল অ্যানি, কিন্তু লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে সময় নিল খানিক। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে, দু’পাশে হাত দুটো মেলে দিয়ে তাল সামলাল, একবার মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তারপর

লোকটাকে অনুসরণ করে কাদা আর বৃষ্টির ভিতর দিয়ে উঠন পেরুল, চলে এল স্টেশন অফিসে।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল অ্যানি, খসখসে গলায় নিজের নামটা উচ্চারণ করল।

‘মিস উইসপার, আমি প্রিন্স হাসান সালে,’ তার কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা আর অস্পষ্ট, টিনের ছাদে বৃষ্টির শব্দ হতে থাকায় আরও আবছা শোনা। ‘আমি ডেসি ক্রসরোড থেকে বলছি।’

‘ট্রেন,’ বলল অ্যানি, গলায় জোর ফিরে আসছে। ‘প্রিন্স সালে, তুমি কথা দিয়েছিলে ট্রেন পাঠাবে, সেটা কোথায়? এই মুহূর্তে ওষুধ দরকার আমাদের—অ্যান্টেসেপটিক, অ্যানেসথেটিক—বুঝতে পারছ না? এখনও আমাদের হাতে ছয়...প্রায় সাতশো আহত লোক রয়েছে! ওদের ক্ষত পচে যাচ্ছে, এক এক করে পশুর মত মারা যাচ্ছে!’ হঠাৎ বুঝতে পারল উনুাদিনীর মত চিৎকার করছে সে।

‘মিস উইসপার। ট্রেন...আমি দুঃখিত। ট্রেন আমি পাঠিয়েছিলাম। সাপ্লাই সহ। মেডিসিন। আর একজন ডাক্তার। কাল সকালে রওনা হয়েছিল ওটা, কাল সন্ধ্যায় এই ক্রসরোড পেরিয়ে গেছে...।’

‘তা হলে কোথায় সেটা?’ দ্রুত জিজ্ঞেস করল অ্যানি। ‘ট্রেনটা এখানে পৌঁছায়নি কেন? তুমি বুঝতে পারছ না এখানে কী পরিস্থিতিতে রয়েছি আমরা...।’

‘আমি দুঃখিত, মিস অ্যানি। ট্রেনটা তোমাদের ওখানে পৌঁছুবে না। সারডির পনেরো মাইল দূরে লাইন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেটাকে। নূর আয়াঙের লোকেরা...গালারা। লাইন তুলে ফেলেছে তারা, ট্রেনে যারা ছিল সবাইকে মেরে ফেলেছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কোচগুলোয়...।’

দু’জনের মাঝখানে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল, যান্ত্রিক শব্দগুঞ্জন ছাড়া কেউ কিছু শুনতে পেল না।

‘মিস উইসপার, লাইনে আছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমি কী বলছি বুঝতে পারছ তুমি?’

‘হ্যাঁ, পারছি।’

‘ওখানে কোন ট্রেন পৌঁছুবে না।’

‘না।’

‘ডেসি ক্রসরোড আর সারডির মাঝখানের রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেছে নূর আয়াঙ।’

‘হ্যাঁ।’

‘তোমরা কোন সাহায্য পাচ্ছ না, সারডি থেকে রেলওয়ে লাইন ধরে পালিয়ে আসার পথও তোমাদের জন্যে বন্ধ। পাহাড় আর পথের ওপর দশ হাজার লোক নিয়ে অপেক্ষা করছে নূর আয়াঙ। রাস্তার পাশে ঢালের ওপর তার অবস্থান এতই শক্তিশালী যে গোটা একটা সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে। আমরা চেষ্টা করব সারডিতে পৌঁছুতে, আমাদের সাথে পনেরো হাজার যোদ্ধা রয়েছে, কিন্তু পারব কিনা জানি না...।’

‘আমরা আটকা পড়েছি,’ ফিসফিস করে বলল অ্যানি।

‘আমাদের সামনে শিফটা। পিছনে গালা।’

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল, তারপর প্রিন্স জানতে চাইল, ‘শিফটারা এখন কোথায়, মিস উইসপার?’

‘গিরিখাদের প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছে তারা, শেষ জলপ্রপাতটা যেখানে পথের ওপর ঝুলে আছে...,’ থামল অ্যানি, কান থেকে রিসিভার সরাল, গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল, তারপর আবার

কানে রিসিভার ঠেকিয়ে বলল, ‘শিফটাদের মেশিনগানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তুমি। এখন তারা সারাক্ষণ ফায়ার করছে। একেবারে কাছে।’

‘মিস উইসপার, তুমি একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে পারবে মাসুদ রানা আর মেজর সেভারসের কাছে?’

‘পারব।’

‘তাদের বোলো, আরও আঠারো ঘণ্টা দরকার আমার। তারা যদি কাল দুপুর পর্যন্ত শিফটাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তা হলে ওরা কাল সন্ধ্যার আগে ক্রসরোডে পৌঁছুতে পারবে না। তাতে করে আরেকটা দিন ও আরেকটা রাত সময় পাব আমি। বলবে, তারা যদি কাল দুপুর পর্যন্ত শিফটাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, গোটা ইথিওপিয়ান জাতি তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। সে, তুমি আর মি. মাসুদ রানা-তোমাদের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব আমরা।’

‘ঠিক আছে,’ বলল অ্যানি, গলা দিয়ে শব্দ বেরতে চায় না।

‘ওদের বোলো, কাল দুপুরের মধ্যে আমার সাধের মধ্যে যা কিছু সম্ভব সব আমি করব সারডি থেকে তোমাদের উদ্ধার করার জন্যে। ওদের বোলো, দুপুর পর্যন্ত যেন ঠেকিয়ে রাখে শিফটাদের, তারপর আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করব তোমাদেরকে...।’

‘বলব।’

‘আরও বলবে, কাল দুপুরে আমাদের যোদ্ধাদের নির্দেশ দিতে হবে তারা যেন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে আমি কী করতে পারলাম তা টেলিফোন করে জানাব তোমাকে...!’

‘প্রিন্স সালে, আহতদের কী হবে? যারা পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়তে

অক্ষম?’

আবার নিস্তব্ধতা; তারপর প্রিন্সের অস্পষ্ট, ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ‘গালাদের হাতে পড়ার চেয়ে ওদের বরং শিফটাদের হাতে পড়া ভাল।’

‘হ্যাঁ,’ শান্তভাবে সায় দিল অ্যানি।

‘আরেকটা কথা, মিস উইসপার।’ ইতস্তত করল প্রিন্স, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, ‘কোন অবস্থাতেই শিফটাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না তুমি। এমনকী চরম কোন পরিস্থিতিতেও নয়। তারচেয়ে...’ শব্দটার উপর জোর দেওয়ার জন্য দু’বার উচ্চারণ করল সে, ‘তারচেয়ে অন্য যে-কোন পরিণতি তোমার জন্যে ভাল হবে।’

‘কেন?’

‘আমাদের গুপ্তচরদের কাছ থেকে জেনেছি, তোমাদের তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তোমাকে বলা হয়েছে কমিউনিস্টদের চর, আর ওদের দু’জনকে টেরোরিস্ট। তোমাকে তুলে দেয়া হবে নূর আয়াঙের হাতে, সে-ই তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। তারচেয়ে যে-কোন পরিণতি তোমার জন্যে ভাল।’

‘বুঝেছি,’ ফিসফিস করে বলল অ্যানি, নূর আয়াঙের কুৎসিত চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতে শিউরে উঠল সে।

‘শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই যদি করতে না পারি, তোমাদের জন্যে পাঠাব আমার...’ এখানেই শেষ, হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এমনকী যান্ত্রিক শব্দ-কোলাহলও শুনতে পেল না অ্যানি। আরও প্রায় এক মিনিট যোগাযোগ পাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু নিস্তব্ধতা ভাঙল না। ক্রেডলে রিসিভার রেখে চোখ বুজল

সে, দেয়ালে হেলান দিল ভারসাম্য রক্ষার জন্য। জীবনে কখনও এতটা নিঃসঙ্গ বোধ করেনি সে, এতটা ক্লান্ত হয়নি কখনও, এরকম ভয়ও কখনও পায়নি।

উঠানে নেমে মুখ তুলল অ্যানি, আকাশের দিকে তাকাল। বুঝতে পারেনি সময় কীভাবে বয়ে গেছে, দিনের আলো আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে। তবে মেঘের রাজ্যে ভাঙচুর শুরু হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক উপরে উঠে গিয়ে ইতস্তত করছে পাহাড়চূড়ার কাছাকাছি, গায়ে কোথাও কোথাও আলোর পৌঁচ চোখে পড়ল—মেঘ ভেদ করে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করছে রোদ।

তা যেন না ঘটে, মনে মনে প্রার্থনা করল অ্যানি। এই ক’দিন একটানা বৃষ্টির মধ্যে দু’বার কিছুক্ষণের জন্য সরে গিয়েছিল মেঘ, প্রতিবার শিফটা বোমারগুলো একেবারে নীচে দিয়ে সগর্জনে ছুটে আসে গিরিখাদের উপর। দু’বারই ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে প্রচুর, ট্রেঞ্চ ছেড়ে পরবর্তী পজিশনে পিছিয়ে না এসে উপায় ছিল না। বন্যার পানির মত গুদামে এসে ঢুকছে আহত লোকজন।

‘বৃষ্টি হোক,’ প্রার্থনা করল অ্যানি। ‘প্লিজ গড, লেট ইট রেইন অ্যান্ড রেইন।’

মাথা নিচু করে গুদামে ঢুকে পড়ল সে, নাকে প্রচণ্ড ঘুসির মত লাগল উৎকট দুর্গন্ধ। মৃত্যুপথযাত্রীরা গোঙাচ্ছে। চারদিকে চিৎকার। অ্যানি দেখল, কাঠের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে এখনও ডাক্তারকে সাহায্য করছে বানু। ছেঁড়া ক্যানভাস টাঙিয়ে যৎসামান্য আড়াল পাবার চেষ্টা করা হয়েছে, টেবিলের উপর রশির শেষ মাথায় ঝুলছে একজোড়া পেট্রোম্যাক্স ল্যাম্প।

জার্মান ডাক্তার ভদ্রলোক বিধ্বস্ত একটা পা কাটছেন, হাঁটুর নীচে। যুবক হারারি যোদ্ধাকে গায়ের জোরে চেপে ধরে রেখেছে

চারজন সহকারী।

রোগীকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল অ্যানি, তারপর বানুকে ডাকল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দু’জনে, বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে তাজা বাতাস নিল বুক ভরে, দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকল, প্রিন্সের সঙ্গে কী কথা হয়েছে ধীরে ধীরে বলে গেল অ্যানি। ‘তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কোন শব্দই আর হলো না।’

‘বুঝেছি,’ মাথা ঝাঁকাল বানু। ‘তার কেটে দিয়েছে। আরও আগে কেন কাটেনি নূর আয়াঙ, সেটাই আশ্চর্য। তারটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে তো, নাগাল পেতে সময় লেগেছে।’

‘গিরিখাদে নামবে তুমি, বানু? রানা আর মাইকেলকে খবরটা দেয়া দরকার। নিতম্বিনীকে নিয়ে আমিই যেতাম, কিন্তু ট্যাংকে ফুয়েল নেই বললেই চলে। রানাকে আমি কথা দিয়েছি একটা ফোঁটাও অপব্যয় করব না। পরে আমাদের কাজে লাগবে...।’

‘ঘোড়া নিয়ে গেলে বরং তাড়াতাড়ি হবে,’ ক্ষীণ হাসল বানু। তা ছাড়া, আব্বাসকে কাছে পাবার এই সুযোগ আমি ছাড়ি কেন?’

‘না, সময় খুব বেশি লাগবে না,’ বলল অ্যানি। ‘ওরা তো একেবারে কাছে সরে এসেছে।’

শিফটাদের মেশিনগানের আওয়াজ শুনবার জন্য দু’জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। শুধু মেশিনগান নয়, একইসঙ্গে বিস্ফোরিত হচ্ছে কামানের গোলা, ওদের পায়ের নীচে ঘন ঘন কেঁপে উঠছে মাটি।

‘মিস অ্যানি, রানাকে তুমি কোন ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠাতে চাও না?’ ধনুকের মত পিঠ ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন কলল বানু। ‘সে হয়তো তোমার আশায় খাবি খাচ্ছে। আমি কি তাকে বলব যে তার

অভাবে তোমার শরীরের চাহিদা মিটছে না...?’

‘বানু!’ আঁতকে উঠল অ্যানি। ‘তাকে যদি তুমি এ-ধরনের অশ্লীল ইঙ্গিত দাও...।’

‘অশ্লীল কথাটার মানে কী, মিস অ্যানি?’ সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ বেড়ে গেল বানুর।

‘নোংরা, অভদ্র।’

‘অশ্লীল,’ পুনরাবৃত্তি করল বানু, মুখস্থ করে রাখছে। ‘ভারি সুন্দর একটা শব্দ।’ শব্দটা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করল সে, ‘আমার শরীরের অশ্লীল চাহিদা তোমার অভাবে মিটছে না!’

‘বানু, ঠাট্টা নয়,’ সাবধান করে দিল অ্যানি, ‘এ-ধরনের কথা তুমি যদি বলো ওকে, আমি তোমাকে নিজ হাতে খুন করব।’

‘কেন, এর মধ্যে ক্ষতি কী দেখলে তুমি? প্রেমে পড়লে কত কিছুই তো বলে বা করে মানুষ!’ বানু বিস্মিত।

‘ওখানে তোমার ভুল হয়েছে, গোড়াতেই।’ অ্যানি বিষণ্ণ বোধ করল। ‘আমি বুঝতে পেরেছি, রানা আমার প্রেমে পড়েনি।’

‘কথাটা তুমি আগেও আমাকে বলেছ,’ চিন্তিত কণ্ঠে বলল বানু। ‘ব্যাপারটা আমার বোধগম্য নয়। কোন মেয়ে একটা ছেলেকে চাইলে পাবে না, এ আবার কী কথা? ওরা তো পাগলা কুকুরের মত হয়ে থাকে, একটু সুযোগ দিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তুমি কিনা বলছ...।’

‘তোমার একবারও মনে হয়নি, রানা তাদের দলে পড়ে না?’

‘তা হলে বাদ দাও ওর কথা,’ রানার উপর রেগে গেছে বানু। ‘এসো, আমরা বরং মাইকেলকে ফাঁসাই।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল অ্যানি, অকস্মাৎ হিংস্র উল্লাসধ্বনির সঙ্গে শোনা গেল আতর্জিতকার, সেই সঙ্গে উঠনটা ছুটন্ত মানুষের ভিড়ে ভরে উঠল। রেল লাইনের দু’পাশের গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়

থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল তারা, উঠনে ঢুকে সদ্য আগত আহত যোদ্ধাদের উপর একদল নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। বারান্দার অন্ধকার কোণ থেকে ওরা দেখল, গালারা সিঁড়ি উপকে বারান্দায় উঠে এল, পড়ে থাকা অসহায় আহতদের উপর এলোপাতাড়ি ছোরা চালাচ্ছে।

বাধা দেওয়ার জন্য ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন জার্মান ডাক্তার, করুণা ভিক্ষার ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, একটা লম্বা তরোয়ালের ধাক্কা খেলেন বৃকে, ফলার ডগাটা ভোজভাজির মত আধ হাত বেরিয়ে এল দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখান দিয়ে।

‘ওরা গালা!’ ফিসফিস করল বানু, আতংকে পঙ্গু হয়ে গেছে দু’জনই। পৈশাচিক আনন্দে উলু-ধ্বনির মত আওয়াজ করতে করতে গুদামের ভিতর ঢুকে পড়ল কয়েকশো গালা, শুরু হলো অবিশ্বাস্য হত্যায়ত্ত।

টিনের দেয়ালে অনেক ফুটো, তার একটায় চোখ রেখে একজন গালাকে দেখল অ্যানি, হাতে লোড করা রাইফেল, সার সার শুয়ে থাকা আহতদের সামনে দিয়ে হাঁটছে, গুলি করছে প্রত্যেকের মাথায় মাজল ঠেকিয়ে।

আরেকজন গালাকে দেখল অ্যানি, হাতে লম্বা ড্যাগার, আহত রাসটা বা হারারি যোদ্ধার গলা কাটবার ঝামেলায় না গিয়ে হ্যাঁচকা টানে চটের বস্তা সরিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে ড্যাগার গাঁথছে তলপেটের নীচে।

আহত যোদ্ধাদের আতর্জনাদ আর খুনীদের উল্লাসধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। অ্যানিকে টেনে সরিয়ে নিল বানু, লাফ দিয়ে উঠনে নামল ওরা। ‘গাড়ি!’ হাঁপিয়ে উঠল অ্যানি।

‘ঈশ্বর, গাড়ির কাছে পৌঁছে দাও আমাদের!’

নিতম্বিনী রয়েছে স্টেশন বিল্ডিংয়ের পিছনে, লোকো শেডের প্রসারিত ছাদের নীচে। পাশাপাশি ছুটল ওরা, শেডের কোণে পৌঁছে বাঁক ঘুরল, উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা দশ-বারোজন গালার ঠিক সামনে পড়ে গেল।

বৃষ্টির মধ্যে কুৎসিত কালো চেহারাগুলো পলকের জন্য দেখতে পেল অ্যানি, খোলা মুখের ভিতর নেকড়েসুলভ দাঁত, খুনের নেশায় আধবোজা চোখ। নাকে ঢুকল উৎকট ঘামের গন্ধ।

পরমুহূর্তে মোচড় খেলো অ্যানির শরীর, বাঘের সামনে হরিণ যেমন মোচড় খেয়ে আরেক দিকে বাঁক নেয়। ঘুরে পিছন ফিরবার সময় পেল সে, কিন্তু ছুটে পালাবার সুযোগ হলো না, একটা শক্তিশালী হাত খামচে ধরল তার কাঁধ।

ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেল ব্লাউজটা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটল অ্যানি, কিন্তু শুনতে পেল লোকগুলো তাকে ধাওয়া করে আসছে, রোমহর্ষক লু-লু চিৎকার পাগল করে তুলল তাকে।

তার সঙ্গে ছুটছে বানু। স্টেশন বিল্ডিংয়ের কোণ লক্ষ্য করে ছুটছে ওরা, তার চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছে সে। আগুনের ফুলকি দেখা গেল, ওদের বাঁ দিক থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, ওদের সামনে দেয়ালে লাগল বুলেটটা। চোখের কোণ দিয়ে অ্যানি আরও অনেক ছুটন্ত গালাকে দেখতে পেল, শহরের মেইন রোড থেকে কাছে চলে আসছে, ওদের সামনের পথে বাধা দেওয়ার ইচ্ছে।

ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে বানু, চঞ্চলা হরিণীর মত দ্রুতগতি তার পা, তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে পারছে না অ্যানি। দশ কদম আগে স্টেশনের বিল্ডিংয়ের কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল বানু।

বাঁক ঘুরেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বানু, তার সামনে নিতম্বিনীকে ঘিরে কমলা রঙের আগুন নাচানাচি করছে, হ্যাচগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। ওদের আগেই আর্মারড কারের কাছে পৌঁছে গেছে গালারা।

নিতম্বিনী জ্বলছে, পনেরো-বিশজন গালা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে ধেই ধেই করে নাচছে ওটার চারধারে। ভিকার্স অ্যামুনিশন বিস্ফোরিত হতে শুরু করায় ছিটকে দূরে সরে গেল তারা।

মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়েছে বানু, তার কাছে পৌঁছুতে ওই এক সেকেন্ডই লাগল অ্যানির।

‘সেডার জঙ্গল!’ ফুঁপিয়ে উঠল বানু, দিক বদলানোর সময় অ্যানির বাহু খামচে ধরল সে।

রেললাইনের ওপারে জঙ্গলটা দুশো গজ দূরে, তবে গভীর আর অন্ধকার এবড়োখেবড়ো মাটি আড়াল করে নদীর পাড় ঘেঁষে উঁচু হয়ে আছে। এক ছুটে খোলা জায়াগায় বেরিয়ে এল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে বিশ-বাইশজন গালা পিছু নিল, আবার শুরু হলো লু-লু উলু-ধ্বনি।

গালাদের সামনে ছুটছে অ্যানি, খোলা উঠনটা যেন অনন্ত বিস্তৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করছে তাকে। মাটি পিচ্ছিল, কাদার ভিতর গোড়ালি ডেবে যাচ্ছে, এক দিকে কাত হয়ে ছুটল সে।

দীর্ঘ পা ফেলে অনায়াসে ছুটে চলেছে বানু, এক লাফে রেললাইন পেরিয়ে গেল সে, জঙ্গলের কিনারা আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট সামনে।

রেললাইন পেরোতে গিয়ে অ্যানি অনুভব করল তার একটা পা বেধে গেছে, পরমুহূর্তে কাদার উপর আছাড় খেলো সে। উঠতে চেষ্টা করল, খাড়া হলো হাঁটুর উপর। জঙ্গলের কিনারা থেকে ঘাড়

ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল বানু, ইতস্তত করল, মসৃণ গাঢ় মুখে বিস্ফারিত হয়ে আছে বিশাল সাদা চোখ জোড়া।

‘পালাও!’ চিৎকার করল অ্যানি। ‘পালাও! রানাকে বলো!’ অন্ধকার জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল বানু, একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল ডালপালা।

রাইফেলের একটা বাঁট শরীরের পাশে আঘাত করল অ্যানিকে, পাঁজরের নীচে। ঠাণ্ডা পিচ্ছিল কাদার ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, ব্যথায় অন্ধকার দেখল চোখে। শুধু টের পেল অনেকগুলো নির্দয় হাত ওর পরনের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে নিচ্ছে। চোখ খুলবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু সারা মুখে ভেজা চুল থাকায় কিছুই দেখতে পেল না। হাত-পা ছুঁড়ল, বৃথাই, কারণ পুরুষগুলো সংখ্যায় অনেক। ওকে ধরে দাঁড় করাল তারা, হঠাৎ কর্তৃত্বসূচক একটা ভারি কণ্ঠস্বর চাবুকের মত শব্দ করল। শরীর থেকে সরে গেল হাতগুলো।

মুখ তুলল অ্যানি, চামড়া ছেঁড়া কোমর আর তলপেটে ব্যথা নিয়ে কুঁজো হয়ে আছে। কাদা আর চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, কিন্তু তবু ক্ষত-বিক্ষত চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গালা সর্দারকে চিনতে পারল সে। এই কুৎসিতদর্শন পশুটাই গিরিখাতে তাকে অপমান করেছিল, সেবার তার হাত থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল মাইকেল। এখনও লোকটা নীল আলখেল্লা পরে আছে, বৃষ্টির পানিতে ভেজা, তার বীভৎস মুখে নিঃশব্দ হাসি দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠল অ্যানির।

ষোলো

ট্রেঞ্চগুলোর সামনের কিনারায় বালির বস্তা আর ডালপালা ফেলে নিরাপদ আড়াল তৈরি করা হয়েছে, চৌকো অবজারভেশন ফাটলের সামনে গিরিপথের নীচের দৃশ্য দেখতে কোন বাধা নেই।

বালির বস্তার উপর একটা কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিল মাইকেল, ফাঁকে চোখ রেখে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ভিতর তাকাল। ক্রল করে এগিয়ে এসে ফ্যারিং স্টেপ-এর উপর সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, মাইকেলের মুখভাব লক্ষ করছে। আভিজাত্যের গর্বে মাটিতে যার পা পড়ত না সেই মাইকেল সেভারসের সারা মুখ লাল মাটিতে লেপা, গায়ে আর কাপড়ে দুনিয়ার ময়লা লেগে আছে। চোয়াল ঢাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি বিবর্ণ রঙের পৌচ বলে মনে হলো, গৌফটা আকৃতি হারিয়ে হাস্যকর লাগছে দেখতে। গত এক হুস্তায় গোসল করবার বা কাপড় পাল্টানোর সুযোগ হয়নি। মুখে নতুন কয়েকটা রেখা আর ভাঁজ দেখতে পেল রানা, বিশেষ করে ঠোঁটের কোণে আর চোখের চারধারে-উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর ব্যথার প্রতিনিধিত্ব করছে ওগুলো। কিন্তু রানার দিকে চোখ পড়তে নিঃশব্দে হাসল সে, একটা ভুরু খানিকটা উপরে তুলে নাচাল, শয়তানী বুদ্ধি বিক্ করে উঠল চোখে। যদিও গন্ধ ছুটেছে বাম হাতের ব্যান্ডেজ থেকে।

কথা বলতে যাবে মাইকেল, এই সময় ওদের নীচে থেকে গিরিখাদের গভীর গাঢ় ছায়া ধরে উপর দিকে ছুটে এল একটা গোলা। দু'জনেই ওরা মাথা নিচু করল, গোলাটা বিস্ফোরিত হলো কাছাকাছি, কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করল না। গত কয়েক দিনে এত কাছাকাছি এরকম দু'তিনশো গোলা পড়েছে।

‘মেঘ সরে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই,’ বলল মাইকেল, দু'জনেই ওরা পাহাড়ের মাঝখানে সরু আকাশের দিকে তাকাল।

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘কিন্তু যথেষ্ট দেরি করে সরছে। আর বিশ মিনিট পর অন্ধকার হয়ে যাবে।’

দেরি হয়ে গেল বম্বারগুলোর জন্য, কারণ মেঘ সম্পূর্ণ সরে গেলেও চান্ডির এয়ারফিল্ড থেকে উড়ে আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে পাইলটদের।

‘কাল যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, আবার আসবে ওগুলো।’

‘কালকের কথা কাল ভাবব,’ বলল রানা, কালো বম্বারগুলোর কথা মনে করতে না চাইলেও চোখের সামনে ফুটে উঠল দৃশ্যগুলো।

যতবার আকাশ সামান্য পরিষ্কার হয়েছে, গিরিখাদের উপর বম্বারের আওয়াজ পেয়েছে ওরা। শিফটা আর্টিলারি স্মোক মার্কার ছুঁড়তে শুরু করে ওদের দ্রৈশ্য লক্ষ্য করে। ক্যাপরোনি বম্বারগুলো একেবারে নীচে দিয়ে উড়ে আসে, গিরিখাদের দু'পাশের পাথুরে পাঁচিলে ডানাগুলো এই লাগে এই লাগে অবস্থা। এত কাছ দিয়ে উড়ে গেল সেগুলো, কাঁচ ঘেরা ককপিটে হেলমেট পরা এয়ারম্যানদের পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে ওরা।

ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বম্বারগুলো, ফিউজিলাজ থেকে খসে পড়ল কালো জিনিসগুলো। একশো কিলো বোমাগুলো সরাসরি খাড়া নেমে এল, বিস্ফোরণের শব্দে শরীর ও মন অসাড়া

হয়ে গেল ওদের। ওগুলোর তুলনায় কামানের গোলাকে পটকা বলা যায়। নাইট্রোজেন মাসটারড ভরা ক্যানগুলো প্রথমে ড্রপ খেলো বার কয়েক, তারপর পাথুরে ঢালের উপর বিস্ফোরিত হলো-হলুদ, জেলির মত তরল পদার্থ, চারদিকে একশো ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল এক নিমেষে।

প্রতিবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা একের পর এক আসতে থাকল বম্বারগুলো, ফিরবার আগে ওদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে গুঁড়িয়ে দিল যে শিফটাদের পদাতিক বাহিনীকে ঠেকানোর কোন উপায় থাকল না। প্রতিবার দ্রৈশ্য ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ওরা, পিছু হটে উঠে আসতে হয়েছে পরবর্তী পজিশনে।

এটাই ওদের শেষ পজিশন, ওদের দু'মাইল পিছনে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিট পাথরের প্রাকৃতিক তোরণ, গিরিখাদের নামবার মুখে। আরও সামনে সারডি শহর আর ডেসি রোডের দিকে খোলা পথ।

‘চেষ্টা করে দেখো না একটু ঘুমোতে পারো কিনা,’ বলল রানা, নিজের অজান্তেই মাইকেলের বাম হাতের দিকে তাকাল। হেঁড়া শার্ট দিয়ে বাঁধা গোটা হাতটাই ফুলে আছে, গলার সঙ্গে একটা স্প্রিঙে বুলছে বুকের কাছে। ব্যাণ্ডেজের তেমন কোন কাজ হয়নি, রক্ত আর পুঁজ অবাধে বেরিয়ে আসছে কিনারা দিয়ে। ক্ষতটার নগ্ন চেহারা কী রকম জানে রানা, যতবার তাকিয়েছে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে ও। কাঁধ থেকে কজি পর্যন্ত ছাল তুলে নিয়েছে নাইট্রোজেন মাসটারড, যেন গোটা হাত ফুটন্ত পানিতে চেপে ধরা হয়েছিল। ওষুধ কোথায় পাবে, গ্রিজ ঢালা হয়েছে ক্ষতের উপর, কী উপকার হবে কে জানে।

‘আগে অন্ধকার হোক,’ বিড়বিড় করল মাইকেল, ভাল হাতটা

দিয়ে চোখে বিনকিউলার তুলল। ‘কেমন অদ্ভুত লাগছে আমার। নীচেটা বড় শান্ত।’

আবার ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, ক্লাস্তির চরমে পৌঁছে কথা বলবার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে।

‘বড় বেশি চুপচাপ,’ আবার বলল মাইকেল, হাতটা সরাতে গিয়ে ব্যথায় উফ করে উঠল। ‘গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার সময় নেই ওদের। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোনোর কথা।’ তারপর প্রসঙ্গ বদলে বলল, ‘তুমি বিশ্বাস করবে, ওল্ড চ্যাপ, একটা চুরটের বিনিময়ে এই মুহূর্তে একটা টেসটিকল হারাতেও আপত্তি করব না আমি, কী?’ হাসল সে। ‘যখন সবচেয়ে বেশি দরকার...।’

হঠাৎ থেমে গেল সে, পরমুহূর্তে দু’জনেরই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল।

‘আমি যা শুনছি, তুমিও কি তাই শুনছ?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

‘আমারও তাই ধারণা।’

‘আসার তো কথাই, হ্যাঁ, অবশ্যই,’ বলল মাইকেল। ‘এত দেরি হলো কেন সেটাই আশ্চর্য। তবে আসামারা থেকে দূরত্বও তো কম নয়। চুপচাপ থাকার কারণটা তা হলে বোঝা গেল, ওগুলো আসার অপেক্ষায় ছিল ওরা।’

নিমন্ত্রণ গিরিখাদের ভিতর নতুন শব্দটা চিনতে ভুল হবার কোন কারণ নেই। এখনও অস্পষ্ট, তবে পাথরের উপর ইস্পাতের ঘর্ষণ টের পেতে অসুবিধে হলো না। প্রতি মুহূর্তে শব্দটা বাড়ছে। এখন ওরা এঞ্জিনের মৃদু গর্জনও শুনতে পাচ্ছে।

‘ট্যাংক,’ বলল মাইকেল। ‘ব্লাডি ট্যাংক।’

‘সন্ধ্যার আগে এখানে ওরা পৌঁছুতে পারবে না,’ আন্দাজ করল রানা। ‘রাতে হামলা করার ঝুঁকি নেবে বলেও মনে হয় না।’

‘না,’ সমর্থন করল মাইকেল। ‘কাল সকালে আসবে ওরা।’

‘সেন্স ডিম আর গরম কফির বদলে ট্যাংক আর বোমারু?’

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ বাঁকাল মাইকেল। ‘সেরকমই ভয় করছি, ওল্ড চ্যাপ।’

কাঁধে হাত আর চোখে আলোর ছোঁয়া পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রানার। উঠে বসবার চেষ্টা করবার জন্য সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি এক করতে হলো। আধ ভেজা কম্বলটা গা থেকে সরিয়ে চোখ কুঁচকে ল্যাম্পটার দিকে তাকাল ও, কিছুই দেখতে পেল না। ঠাণ্ডায় প্রতিটি পেশী অসাড় হয়ে গেছে ওর, কপাল আর মাথা লোহার মত ভারি। সকাল হয়ে গেছে বিশ্বাস হতে চাইল না।

‘কে?’

‘আমি, মাসুদ ভাই।’

এতক্ষণে ল্যাম্পের পিছনে আব্বাস খায়েরের থমথমে চেহারাটা দেখতে পেল রানা। ‘চোখ থেকে আলোটা সরাবে?’ কর্কশ গলায় বলল ও।

রানার পাশে হঠাৎ উঠে বসল মাইকেল সেভারস। ভিজে কাপড়ে দু’জনেই ওরা ট্রেঞ্চের ভিতর কাদার উপর ঘুমিয়ে ছিল। ‘কিছু ঘটেছে, কী? জড়ানো গলায় বলল সে, ক্লাস্তিতে মত্ত হয়ে গেছে সে-ও।

ল্যাম্প সরিয়ে নিল আব্বাস, তার পাশে দাঁড়ানো একহারা গড়নের রাহেলা বানুর উপর পড়ল আলোটা। ঠাণ্ডায় ঠক-ঠক করে কাঁপছে মেয়েটা, ব্লাউজ আর স্কার্ট দুটোই ভিজে, ঝোপের কাঁটা আর গাছের ডাল লেগে তার হাত ও পায়ের চামড়া কেটে গেছে, ছিঁড়ে গেছে স্কার্ট আর ব্লাউজ।

রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে, রানা দেখল আতংকে বিকৃত হয়ে আছে মেয়েটার মুখ। কথা বলতে চেষ্টা করল বানু, কিন্তু থরথর করে শুধু ঠোঁট কাঁপল, কোন শব্দ বেরল না। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ‘মিস অ্যানি...’, নিজেকে সামলে নিয়ে পিছিয়ে এল বানু। ‘ওরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে...!’

‘তোমাকে এখানে থাকতে হবে,’ বলল রানা, ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা, ট্রেঞ্চগুলোর কাছ থেকে আধ মাইল পিছনে রয়েছে চঞ্চলা। ‘ভোরে একটা জোরাল হামলা হবে, তুমি না থাকলে ওরা ঠেকাতে পারবে না।’

‘আর্মারড কারে আমিও থাকছি, রানা,’ শান্তভাবে বলল মাইকেল, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে। ‘অ্যানি ওদের হাতে বন্দী, আর আমি এখানে বসে থাকব, এ তুমি...’, হঠাৎ থেমে ক্ষীণ হাসল সে। ‘তোমার ওপর ফাদারলি একটা চোখ রাখার জন্যেও আমার উপস্থিতি দরকার, ওল্ড চ্যাপ। অন্তত এই একবার কামাল হাসানকে নিজেদের গা বাঁচানোর জন্যে ঝুঁকি নিতে হবে।’

কথা বলতে বলতে আর্মারড কারের কাছে পৌঁছে গেল ওরা, গিরিখাদের মাথার নীচে এবড়োখেবড়ো মাটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা। হাত বাড়িয়ে চঞ্চলার গা থেকে ক্যানভাস কাভারটা সরাল মাইকেল, আব্বাসের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

‘যাই ঘটুক না কেন,’ তাকে বলল ও, ‘ভোরের আগেই ফিরে আসব আমরা। যদি না ফিরি, কী করতে হবে তুমি জানো। এই ক’দিন ভাল ট্রেনিং পেয়েছ তুমি।’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল আব্বাস।

‘যতক্ষণ পারো ঠেকিয়ে রাখবে। তারপর পিছিয়ে গিরিখাদের

মাথায় চলে এসে শেষ কর্তব্যটি সারবে। ঠিক আছে? মাত্র দুপুর পর্যন্ত, তাই না? চেষ্টা করলে ওদেরকে আমরা ওই সময় পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারব-ট্যাংক নিয়ে আসুক আর যাই নিয়ে আসুক, কী বলো?’

‘হ্যাঁ, মাসুদ ভাই, পারব ঠেকিয়ে রাখতে। আপনি আমাকে দোয়া করুন।’

আব্বাসের মাথার চুল এলোমেলো করে দিল রানা।

‘আরেকটা কথা, ওল্ড সান,’ বলল মাইকেল। ‘তোমার দাদুকে আমি আপন ভাইয়ের মত ভালবাসি-কিন্তু শালার বুড়োটাকে যেভাবে হোক সামলে রাখতে হবে তোমার। দরকার হলে বেঁধে রাখবে।’ আব্বাসের কাঁধে চাপড় মারল সে, দখল করা শিফটা রাইফেলটা হাত বদল করল, ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল চঞ্চলার টারিটে।

কোমর ধরে বানুকে গাড়ির মাথায় তুলে দিল রানা, চঞ্চলার সামনে এসে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাল।

প্রায় খাড়া শেষ কয়েকশো গজ ঢাল বেয়ে গিরিখাদের মাথায় উঠে এল চঞ্চলা, পাশ কাটাল মশালের আলোয় মাটি কাটবার কাজে ব্যস্ত রাসটা আর হারারি লোকজনদের। গিরিখাদ ধরে শিফটাদের ট্যাংক আসছে জানবার পর থেকে ওদেরকে কাজে লাগিয়েছে রানা আর মাইকেল, কোন বিরতি ছাড়া পালা করে মাটি কেটে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে ওরা।

অ্যানিকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও, দু’জনেই ওরা লক্ষ করল আদিবাসী কর্মীরা নিখুঁতভাবে কাজটা করছে। অ্যান্টি-ট্যাংক প্যাঁচিল, প্রায় সাত ফুট উঁচু করা হয়েছে, গ্র্যানিট পাথরের তৈরি, তার উপর মাটি ফেলা হয়েছে-প্যাঁচিলের সামনে গভীর গর্ত।

পাঁচিলের মাঝখানে সরু একটা ফাঁক রয়েছে এখনও, চঞ্চলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

‘ওদের বলো, বানু, ফাঁকটা এবার বন্ধ করে দিক,’ নির্দেশ দিল মাইকেল। ‘গাড়ি নিয়ে আমরা আর গিরিখাদে ফিরব না।’

পাঁচিলটার সবচেয়ে উঁচু অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন হারারি কমান্ডার, তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করল বানু। জবাবে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

প্রকৃতির তৈরি গ্র্যানিট পাথরের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল চঞ্চলা, ওদের সামনে পিরিচ আকৃতির উপত্যকা আর সারডি শহর।

শহর জ্বলছে।

আর্মারড কার থামাল রানা, খেলের মাথায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল ওরা লাল অগ্নিশিখার দিকে, মেঘের গায়েও লালচে আভা ফুটে রয়েছে। উপত্যকার চারদিকে আকাশ-ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় পাঁচিলগুলো অস্পষ্টভাবে দেখা গেল।

‘সে কি এখনও বেঁচে আছে?’ ওদের সবার ভয় একযোগে বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে, তবে জবাব দিল একা শুধু বানু।

‘ও ধরা পড়বার সময় নূর আয়াঙ শহরে ছিল কিনা জানি না, থাকলে বেঁচে নেই।’

নিম্নস্তরতার ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস করুণ বিলাপের মত লাগল ওদের কানে। পুরুষ দু’জন অটল পাথরের মত তাকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারে, দু’জনেই রাগ আর ভয়ের হাতে বন্দী।

‘তবে নূর আয়াঙের স্বভাব হলো পাহাড়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা,’ আবার বলল বানু। ‘যুদ্ধ থামলে লুঠপাট করার জন্যে নেমে আসে সে। সে না আসা পর্যন্ত তার লোকেরা খুন-খারাবিতে হাত দেয় না। আর অ্যানির ব্যাপারটা তো আরও আলাদা-নূর আয়াঙ ওকে কষ্ট পেয়ে মরতে দেখবে, গাভীদের সাথে ব্যস। শুনেছি,

ছোট ছোট ছুরি দিয়ে জ্যান্ত একজন মানুষের ছাল ছাড়িয়ে নিতে পারে ওরা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তারপরও নাকি মানুষটা অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে...।’

ঠাস করে বানুর গালে চড় মারল মাইকেল। তারপরই বিড়বিড় করল সে, ‘দুঃখিত, মাই গার্ল!’

চোখে ভরা পানি নিয়ে মাইকেলের কাঁধে মাথা রাখল বানু। ‘তোমার ভেতর কী হচ্ছে আমি জানি, মাইকেল।’

ঘটনাটা দেখেও যেন দেখল না রানা, চেহারায় ধ্যানমগ্ন একটা ভাব নিয়ে এখনও দূরে তাকিয়ে আছে ও।

সংবিশ্রিত ফিরল মাইকেলের ডাকে। ‘আমি তৈরি, ওল্ড চ্যাপ। তোমার কী খবর?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরল রানা। ‘হ্যাঁ, আমিও তৈরি, মাইকেল।’ হ্যাচ গলে ড্রাইভারের সিটে নেমে গেল ও।

*

ফ্রন্ট-লাইন ট্রেঞ্চগুলোর কাছে ফিরে এল আব্বাস খায়ের। গিরিখাদের মাথার উপর সরু আকাশের ক্ষীণ আলোর আভাস দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল সে, ঠিক বুঝতে পারল না ভোর হতে যাচ্ছে কিনা। এরইমধ্যে ট্রেঞ্চের ভিতর নড়াচড়া শুরু হয়েছে, প্যারাক্রাফিন ল্যান্স তুলে ওর মুখে আলো ফেলল গোত্রপ্রধানের একজন দেহরক্ষী। আব্বাসকে চিনতে পেরে স্বস্তি বোধ করল সে। ‘উনি আপনার খোঁজ করছিলেন।’

ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে লোকটার পিছু নিল আব্বাস। সাবধানে পা ফেলে এগোতে হলো তাকে, কাদার উপর শয়ে শয়ে আদিবাসী যোদ্ধারা শুয়ে রয়েছে।

ধূসর একটা কম্বলের ভিতর নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন কামাল

হাসান, মেইন ট্রেন থেকে খানিকটা দূরে বড় একটা গছের
ভিতর বসে রয়েছেন তিনি। গর্তের খোলা মাথাটা তাঁর ক্যানভাস
দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে, মাটিতে ছোট একটা আগুন
জ্বলছে, চারদিকে ধোঁয়া। দেহরক্ষী আর সর্দাররা ঘিরে রয়েছে
কামাল হাসানকে, শান্তভাবে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল
আব্বাস। গোত্রপ্রধান মুখ তুলে তাকালেন।

‘বিদেশী বন্ধুরা কি চলে গেছে?’ জিজ্ঞেস করলেন কামাল
হাসান, খক খক করে কাশলেন খানিক, প্রাচীন শরীরটা অসম্ভব
ঝাঁকি খেলো।

‘ভোরে ওঁরা ফিরে আসবেন, হামলা শুরু হবার আগেই,’ রানা
আর মাইকেলের পক্ষ নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল আব্বাস, তারপর
ধীরে ধীরে ওদের চলে যাওয়ার কারণ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে
ব্যাখ্যা দিল সে।

মাথা ঝাঁকালেন কামাল হাসান, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন
আগুনের দিকে, তার চোখে লাল অগ্নিশিখা নাচতে লাগল।
আব্বাস থামতেই কাঁপা কাঁপা, ঝগড়াটে গলায় কথা বললেন
তিনি, ‘এটা একটা সংকেত-স্রষ্টা আমাকে বলছেন, কামাল, আর
দেরি কোরো না। বিদেশী সমরনায়কের পরামর্শ অনেক শুনেছি,
বহু কষ্টে বহুদিন ধরে বুকে চেপে রেখেছি প্রতিশোধের গনগনে
আগুন। আর নয়, আব্বাস, আর নয়! আমার মা ছিল সিংহী,
বীরঙ্গনার গর্ভে আমার জন্ম-নিজেকে আর কত দিন দাবিয়ে
রাখব? অনেক দিন হলো শত্রুরা আমাকে লাথি মারছে, আমি সহ্য
করেছি, কিন্তু আর নয়!’

খক খক করে কাশলেন তিনি।

‘অনেক দৌড়েছি আমরা, শুধু পেছন দিকে। এবার আমরা
রুখে দাঁড়াব শত্রুর বিরুদ্ধে। যাও, সবাইকে ঘুম থেকে তোলো।

সবাইকে বলো, হাজার বছরের পুরনো সংকেত বাজবে-বাজবে
আমার ড্রামগুলো।’ কমল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে এক
লাফে সিঁধে হলেন কামাল হাসান। ‘ড্রামের শব্দ শুনতে বলো
সবাইকে।’ আশপাশ থেকে চাপা গর্জন শোনা গেল, দেহরক্ষী আর
সর্দারদের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। ‘ভোর হওয়া পর্যন্ত বাজবে
আমার ড্রাম,’ বলে চলেছেন কামাল হাসান। ‘তারপর যখন ড্রাম
থামবে, তখনই সময়!’ কারও খেয়াল নেই সম্পূর্ণ নগ্ন দাঁড়িয়ে
আছেন তিনি, তাঁর নিজেরও না। ‘আর ঠিক সেই মুহূর্তে, আমি
কামাল হাসান, তোমাদের সামনে থাকব, ছুটে যাব শত্রুর উদ্দেশে,
তাদের খেদিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব মরণভূমিতে, ঠেলে ফেলে দেব
সাগরে। নিজেদের যারা বীরযোদ্ধা বলে মনে করে, পবিত্র
মাতৃভূমির উপর যাদের এতটুকু মায়া আছে, যারা স্বাধীনতা আর
প্রচুর বিয়ে করার অধিকারে বিশ্বাস করে, অবশ্যই তারা আমাকে
অনুসরণ করবে।’ লু-লু উলুধ্বনিতে তাঁর বাকি কথা চাপা পড়ে
গেল, গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন তিনি।

সর্দারদের একজন এক মগ তেজ ধরল গোত্রপ্রধানের সামনে।
‘চা-টুকু খেয়ে নিন, হজুর!’

মগের ভিতর না তাকিয়ে ঢক ঢক করে তেজটুকু গলাধঃকরণ
করলেন কামাল হাসান।

লাফিয়ে সামনে এগিয়ে এল আব্বাস, বুড়ো দাদুর একটা বাছ
চেপে ধরল সে। ‘দাদু!’

ঝট করে তার দিকে ফিরলেন কামাল হাসান, চোখে আগুন
ঝরছে। ‘তুমি যদি মেয়েমানুষের মত করো, তোমাকে আমি নাতি
বলে স্বীকার করব না! আমার গায়ে যখন হাত দিয়েছ, তখন
আমার মত করে চিন্তা করতে চেষ্টা করো। কোথায় দাঁড়িয়ে আছি

আমরা? পিঠ কোথায়? কোথায় যেতে চাই?’

হঠাৎ দাদুর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ দিবালোকের মত পরিষ্কার বুঝতে পারল আব্বাস। উপলব্ধি করল, তার দাদু কী করতে চাইছেন। তার দাদু বুঝতে পেরেছেন, স্রষ্টা আদিবাসীদের উপর সম্ভ্রষ্ট নন, তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, এখন যুদ্ধ করলেও হারতে হবে, না করলেও মরতে হবে। এই যখন পরিস্থিতি, একটা স্বাধীনচেতা জাতির সামনে আর কী করণীয় থাকে, আত্মত্যাগ করা ছাড়া?

নতুন আর প্রাচীরের মধ্যে নিঃশব্দে বিনিময় হলো উপলব্ধি আর সমঝোতার বার্তা।

কামাল হাসান বললেন, ‘যদি তোমার বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে থাকে, তা হলে আমার আশীর্বাদ পাবার জন্যে নত হও।’

দাদুর পায়ের উপর মাথা ঠেকাল আব্বাস। তার নগ্ন ঘাড়ে গরম এক ফোঁটা পানি পড়ল। চোখে বিস্ময় নিয়ে মুখ তুলল আব্বাস। বৃদ্ধ কামাল হাসান হাসছেন, কিন্তু দু’গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে চোখের পানি। বিড়বিড় করে তিনি বললেন, ‘একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ দেব আমরা, ভাই। এ আমার আনন্দের কান্না!’

সতেরো

ছোট একটা কুঁড়েঘর, মাটির সঁয়াতসেঁতে মেঝেতে পড়ে আছে অ্যানি উইসপার। সম্ভবত সারডি শহরের এই একটাই ঘরে আগুন ধরানো হয়নি। ঘরটা শহরের এক প্রান্তে, মেঝেতে কিলবিল করছে

কেঁচো, নরম স্পর্শ নিয়ে মোচড় খাচ্ছে অ্যানির গায়ে। হুঁদুরগুলো ছোট, কিন্তু এরইমধ্যে শিকারের অসহায় অবস্থা টের পেয়ে গেছে ওগুলো, ক্ষুদে ধারাল দাঁত দিয়ে কাপড়ে আর চামড়ায় কামড় বসাচ্ছে। কাদার মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফট করছে অ্যানি।

তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, এক করে বাঁধা হয়েছে গোড়ালি জোড়াও।

বাইরে থেকে ভেসে আসা আগুনের শৌ-শৌ আওয়াজ পরিষ্কারই শুনতে পাচ্ছে অ্যানি, মাঝে মধ্যে ছাদ ধসে পড়বার আওয়াজও চিনতে পারছে। বুঝতে পারছে, বাইরে বহু গালা ভিড় করে আছে, অনর্গল কথা বলছে তারা, হাসাহাসি করছে। তেজ খেয়ে প্রায় সবাই ওরা মাতাল হয়ে আছে। তাদের শোরগোল ছাপিয়ে মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে রাসটা আর হারারি বন্দীদের আতঁচিৎকার। বন্দীদের বেশিরভাগকেই জবাই করা হয়ে গেছে, দু’পাঁচজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের টেসটিকল কাটবার জন্য-সেটা নূর আয়াঙের উপস্থিতিতে ঘটবে। সবার মধ্যে একটা অপেক্ষার ভাব। দখল করা শহরে যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে নূর আয়াঙ গালা।

ঘরের ভিতর কতক্ষণ পড়ে আছে অ্যানি জানে না। তার হাত আর পায়ের কোন সাড়া নেই, নাইলনের রশিতে শক্ত গিঁট দেওয়া হয়েছে, মাংস কেটে ভিতরে ডেবে গেছে। পাঁজরের নীচে যেখানে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারা হয়েছিল, জায়গাটা ব্যথায় টন-টন করছে সারাক্ষণ। আধ খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাস ঢুকছে, ঠকঠক করে কাঁপছে সে। দু’সারি দাঁত বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। যতবারই পাশ ফিরতে চেয়েছে অ্যানি, বুকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড প্রতিবার লাথি মেরেছে তার পেটে।

এক সময় প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল অ্যানি, তবে পুরোপুরি নয়। আচ্ছন্ন একটা ভাবের ভিতর তলিয়ে যেতে যেতেও বাইরের কোলাহল শুনতে পেল সে, মনে হলো অস্তিত্ব হারিয়ে শূন্যে ভাসছে তার শরীর, সময় থেমে গেছে নাকি বয়ে চলেছে ধারণা নেই। মনের ভয় দূর হয়ে গেল, শারীরিক কষ্ট অনুভব করল না।

এই দুর্দশার মধ্যে কতক্ষণ কেটেছে জানে না, আরেকটা লাখি খেয়ে সচেতন হলো অ্যানি। সারা শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল সে, বুঝতে পারল, বাইরে লোক সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। মনে হলো, কয়েক হাজার লোক একযোগে কী যেন একটা দাবি জানাচ্ছে। একজন লোক টেনে তুলল তাকে, এতক্ষণে সে দেখল গার্ডের সংখ্যা বেড়ে তিনজন হয়েছে। তাদের দু'জন তার শরীরে হাত দিল, বাকি একজন মেঝেতে বসে ছুরি দিয়ে কেটে দিল গোড়ালির বাঁধন। সিঁধে হলো লোকটা, অ্যানির হাতের বাঁধনও কেটে দিল সে। পিঠ আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাকি দু'জনের হাত গা থেকে খসাতে চেষ্টা করল সে, পরমুহূর্তে অনুভব করল হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পড়ে যাচ্ছে সে।

কিন্তু না, তাকে পড়তে দেওয়া হলো না। তিনজন লোক নিজেদের হাতের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখল তাকে, টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

কুঁড়েঘরের সামনে সরু রাস্তাগুলো গালাদের ভিড়ে ঢাকা পড়ে আছে। দোরগোড়ায় অ্যানিকে দেখামাত্র কৃৎসিত চেহারাগুলো সামনের দিকে ঝুঁকল ভাল করে দেখবার জন্য। চারদিকে ধোঁয়া আর অসংখ্য মশাল, গার্ডদের কর্কশ নির্দেশে ভিড় সামান্য একটু ফাঁক হলো, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে অ্যানিকে টেনে নিয়ে চলল তারা। চারপাশের ভিড় থেকে কুকুর-বিড়ালের ডাক ছাড়ল গালারা। চারদিক থেকে ছুটে এল বর্বরদের লোভী হাত, হাসতে

হাসতে হাতের লাঠি দিয়ে সেগুলো ঠেকাল গার্ডরা। চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারছে না অ্যানি, এখনও তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা। রেলওয়ের উঠনে ঢুকল ভিড়টা, পাশ কাটাল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে থাকা লাশগুলোকে। এরা সবাই গুদামের ভিতর শুয়ে ছিল, নিজের হাতে এদের সেবা-শুশ্রূষা করেছে অ্যানি। খুন করবার পর প্রতিটি লাশের গা থেকে কাপড়চোপড় সব খুলে নিয়েছে গালারা।

গোটা উঠনে কয়েকশো মশাল জ্বলছে। গুদামের বারান্দার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় মোটা গদির উপর বসা লোকটাকে চিনতে পারল অ্যানি। সন্ন্যাসের মত ঠাণ্ডা চোখ, ঢুলুঢুলু। গায়ের চামড়ার নীচে মাংস যেন নরম কাদা, কখনও যেন রোদে বেরোয়নি। ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক ফোলা, কাঁচা মাংসের মত লালচে। প্রথমবারের মত, এবারও লোকটা যে শুধু অ্যানির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘন ঘন দৃষ্টি বুলাল তাই নয়, বুকের উপর আর তলপেটের নীচের দিকে একদৃষ্টে দীর্ঘ সময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল। ঘৃণায় রি-রি করে উঠল অ্যানির সারা শরীর। কিন্তু নূর আয়াঙ কেন ওখানে গদির উপর বসে আছে বুঝতে পেরে ঘৃণা বা রাগ নয়, আতংকে কাঁপতে শুরু করল সে। বারান্দাটা উঁচু, বন্দিবীর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু উপভোগ করবার জন্য দু'পাশে দুই গাভীকে নিয়ে বসেছে নূর আয়াঙ।

নিজেকে মুক্ত করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল অ্যানি, ধস্তাধস্তি শুরু করল সে। কিন্তু টেনে-হিঁচড়ে সামনে আনা হলো তাকে, তারপর তিনজন মিলে শূন্যে তুলে ফেলল।

দেড় মানুষ উঁচু অসম্ভব ভারি তিনটে গালা বল্লম মাটিতে গঁথে একটা তেপায়া তৈরি করা হয়েছে, ইস্পাতের তৈরি ডগাগুলো এক

করে বাঁধা হয়েছে শক্ত করে তার দিয়ে, পিরামিডের চোখা মাথার মত লাগছে দেখতে। তিনজনের সঙ্গে পারল না অ্যানি, তার পা আর হাত টেনে ধরা হলো, আবার সে অনুভব করল কজি আর গোড়ালি বাঁধা হচ্ছে।

গার্ডরা কাজ সেরে পিছিয়ে গেল গোল হয়ে দাঁড়ানো ভিড়ের গায়ে, অ্যানি দেখল তেপায়ার মাঝখানে ঝুলছে সে, শরীরের ভারে রশি-বাঁধা কজির হাড় ভেঙে যাবে বলে মনে হলো।

মুখ তুলল অ্যানি। সরাসরি তার সামনে, গুদামঘরের বারান্দার উপর, বসে রয়েছে নূর আয়াঙ গালা। চিৎকার করে কী যেন বলল সে, বুঝল না অ্যানি, আতংক আর ব্যথায় বিস্ফারিত চোখে তার মোটা ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু। মোটা ঠোঁট ফাঁক হলো, বাইরে বেরিয়ে এল সাপের মাথার মত কালো জিভের ডগা, ঠোঁট চাটল।

তারপর হঠাৎ খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল নূর আয়াঙ, দুই কনুই দিয়ে গুঁতো মারল দু'পাশে বসা যুবতীদের পাজরে।

মেয়ে দুটো উঠনে নেমে এল, বহুরঙা সিল্ক পোশাক মশালের আলোয় ঝলমল করেছে, আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে গা-ভর্তি গহনা।

যেন আগেই মহড়া দেওয়া ছিল, ঝুলন্ত অ্যানির দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াল তারা। তাদের চেহারা ভাবগম্ভীর, চোখ ঢুলুঢুলু, হাবভাবে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা, দৃষ্টিতে ফুটে আছে প্রায় পবিত্র একটা আলো।

তারা যখন হাত তুলে ওকে স্পর্শ করতে গেল, চমকে উঠে অ্যানি দেখল তাদের হাতে ছোট দুটো ছুরি রয়েছে। ভয়ে চিৎকার করতে চাইল সে, কিন্তু গলা থেকে শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরল। মোচড় খেলো অ্যানি, ঘাড় আর মাথা অসম্ভব বাঁকা করে ছুরির ফলাটা দেখবার চেষ্টা করল।

দক্ষ হাতে, অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে অ্যানির গা থেকে কাপড়গুলো কেটে নামিয়ে নিল তারা। গলার কাছে ব্লাউজের কিনারায় ছুরির ডগা ঠেকিয়ে নামিয়ে আনল নীচের দিকে। ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ার ফাঁক হয়ে গেল, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল দুধ-আলতা রঙের বুক। ঘ্যাঁচ করে আরেক পোঁচে স্কার্টটা কেটে ফেলল, শুকনো পাতার মত খসে পড়ল সেটা কোমর থেকে।

হাততালি দিল নূর আয়াঙ। কুকুর বিড়ালের ডাক ছাড়ল গালা। কিন্তু তারপরই আবার জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল উঠনে। সবাই অধীর আগ্রহের সঙ্গে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, কারও চোখে পলক নেই, এমন সুন্দর আর উত্তেজনাকর দৃশ্য থেকে মুহূর্তের জন্যও কেউ বঞ্চিত হতে চায় না।

সামনের দিকে মাথা নোয়াল অ্যানি, চুলগুলো ঢেকে দিল তার কান্না ভেজা মুখ।

যুবতীদের একজন সরে এল, দাঁড়াল অ্যানির সরাসরি সামনে। হাত তুলল সে। ছুরির ফলাটা ঠেকাল ঠিক গলার নীচে সাদা চামড়ায়। ওখানে একটা শিরা ফাঁদে পড়া ক্ষুদ্রে প্রাণীর মত লাফাচ্ছে। ধীরে ধীরে, অসহ্যরকম মহুরগতিতে, ছুরির ফলাটা নীচের দিকে নামতে শুরু করল।

অ্যানির গোটা শরীর বাঁকি আর মোচড় খেতে লাগল, হাত আর পা আড়ষ্ট, পিঠ এমন বাঁকা হয়ে উঠল যে মসৃণ ফর্সা ত্বকের নীচে থেকে মাথাচাড়া দিল প্রতিটি পেশী।

পিছন দিকে নিক্ষিপ্ত হলো তার মাথা, নিষ্পলক চোখ বিস্ফারিত, খোলা মুখ মস্ত হাঁ হয়ে আছে, গলার ভিতর থেকে রোমহর্ষক চিৎকার বেরিয়ে এল।

যুবতী গালায় কোন দিকে ভ্রক্ষেপ নেই, গভীর ধ্যানমগ্নতার

সঙ্গে সে তার কাজে ব্যস্ত। ফোলা কিন্তু টান টান স্তন জোড়ার মাঝখান দিয়ে নামিয়ে আনল সে ছুরির ফলাটা। ধারাল ডগা সাদা চামড়ায় অগভীর রেখা তৈরি করছে, উজ্জ্বল লাল একটা সরলরেখা দীর্ঘ হলো প্রতি মুহূর্তে।

উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা, তাদের চাপা গর্জন অনেকটা যেন দূর থেকে ভেসে আসা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত, দ্রুত কাছে সরে আসছে। তাদের সঙ্গে হাসছে নূর আয়াঙ, কিন্তু তার সে হাসি কেউ শুনতে পাচ্ছে না। গদির কিনারায় সরে এসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। তার চোখ পাথরের মত চকচক করছে, ফাঁক হয়ে আছে ভিজে ঠোঁট।

একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। স্টেশন বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে ঘোর অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে রূপকথায় শোনা দৈত্যের মত ধেয়ে এল কুৎসিতদর্শন চঞ্চলা, এক পলকে ঢুকে পড়ল মশালের লালচে আলোর ভিতর। এক সেকেন্ড আগেও আর্মারড কারের শব্দ শুনতে পায়নি কেউ-জনতার সম্মিলিত চিৎকারে সেটা চাপা পড়ে ছিল।

ইস্পাতের ভারি খোল, পুরনো বেন্টলি এঞ্জিনের ঘাড়ে চেপে, ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশ্চিহ্ন ভিড়ের গায়ে। মাংস আর হাড়ের নিরেট পাঁচিলটাকে বাধা বলে মানল না চঞ্চলা, খেত জুড়ে খাড়া হয়ে থাকা আখের উপর দিয়ে যেন ছুটল একটা বুলডোজার। গতি এতটুকু মশ্রু না করে ভিড়ের ভিতর দিয়ে নিজের পথ করে নিল আর্মারড কার, নাক বরাবর সোজা এগোল ফাঁকা জায়গাটায় যেখানে বল্লমের তৈরি তেপায়ার মাঝখানে ঝুলছে অ্যানি উইসপার।

চঞ্চলার সঙ্গে একই মুহূর্তে, অন্ধকার গুদামঘরের দোরগোড়া থেকে বারান্দায় পা রাখল মাইকেল সেভারস, নূর আয়াঙ যেখানে

বসে আছে ঠিক তার পিছনে।

আহত হাতের ভাঁজে দখল করা শিফটা রাইফেল, সেটার বাঁট কাঁধে না তুলেই গুলি করল সে।

গালা যুবতীর ছুরি ধরা হাতের কনুই চুরমার করে দিল বুলেট, শুকনো সর ডালের মত মট করে ভেঙে গেল হাতটা, অনুভূতিহীন আঙুল থেকে উড়ে গেল ছুরিটা। তার চিৎকার তীক্ষ্ণ বাঁশির মত বাজল কানে, আছাড় খেয়ে পড়ল সে অ্যানির পায়ের কাছে কাদার উপর।

দ্বিতীয় যুবতীর শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক লাফে অ্যানির সামনে চলে এল সে, ডান হাতটা পিছিয়ে গেল ঠিক যেন ছোবল মারতে উদ্যত একটা কেউটের মাথার মত, ছুরিটা সে তাক করল অ্যানির হৃৎপিণ্ডের দিকে। তার চোখ জ্বলছে, নাকের ফুটো ঘন ঘন বড় হচ্ছে। ছুরি ধরা ডান হাত ছুটে গেল, হাতল পর্যন্ত ডেবে যাবে নরম মাংসের ভিতর-রাইফেল মাজল চুল পরিমাণ ঘুরিয়ে আবার ফায়ার করল মাইকেল।

ভারি বুলেট তার তামাটে কপালের ঠিক মাঝখানে ঢুকল। সদ্য তৈরি কালো গর্তটাকে মনে হলো তৃতীয় একটা চোখের খালি কোটর, পিছন দিকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো মাথাটা।

মেয়েটা পড়ে যাচ্ছে, বোল্ট টেনে আবার রাইফেল মাজল সামান্য ঘোরাল মাইকেল। কিন্তু নূর আয়াঙ মোচড় খেয়ে পিছন দিকে তাকাল, গদিগুলো আঁকড়ে ধরে সামনে তুলবার চেষ্টা করছে সে, আড়াল পেতে চায়। তার মুখ হাঁ হয়ে আছে, ঘাড়ঘড়ে কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, রাইফেল মাজলটা আস্তে করে ঢুকে গেল মুখের ভিতর। তৃতীয়বার গুলি করতেও ইতস্তত করল না মাইকেল।

ঘাড়ের পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট, গর্তটায় মুঠো পাকানো একটা হাত অনায়াসে ঢুকে যাবে। বারান্দা থেকে উঠনে পড়ে বোবা ব্যাণ্ডের মত লাফাতে লাগল নূর আয়াঙ গালা।

লাফ দিয়ে তাকে টপকাল মাইকেল, নেমে এল উঠনের মাটিতে। মাথার উপর তরোয়াল খাড়া করে ছুটে এল একজন গালা। রাইফেল না তুলে আবার গুলি করল মাইকেল, লাশটা টপকে স্থির হলো অ্যানির পাশে, সেই মুহূর্তে ওদের সামনে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল চঞ্চলা, হ্যাচ গলে টারিটে উঠল রানা, হাতে হারারি ড্যাগার নিয়ে লাফ দিল।

ওদের মাথার উপর, টারিটে বসে, ভিকার্স মেশিনগান ঘোরাচ্ছে বানু। একনাগাড়ে, কোন বিরতি ছাড়াই, গুলি ছুঁড়ছে সে। আতংকে অস্থির গালারা অন্ধকারের ভিতর যে যেদিকে পারল ছুটল, পিছনে ফেলে গেল অগণিত লাশ।

অ্যানির হাত আর পায়ের বাঁধন কেটে দিল রানা, সামনের দিকে চলে রানার বুকে পড়ল সে, দু'হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলল রানা।

ঝুঁকল মাইকেল, অ্যানির হেঁড়া কাপড়গুলো এক করে তুলে আহত বগলের নীচে রাখল। 'এবার বোধহয় ফেরা উচিত, কী?' দরাজ গলায় প্রশ্ন করল সে। 'আমার ধারণা এখানে আর কোন মজা নেই।' দু'জন ধরাধরি করে অ্যানিকে তুলে দিল ওরা চঞ্চলার টারিটে।

তিনটে কারণে বানানটো সাতার উদ্ভাবিত দর্শন পরিত্যাগ করে শিফটা বাহিনীর নিরাপদ পশ্চাদভাগ থেকে একেবারে ফ্রন্ট-লাইনে চলে এসেছে কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেরক। জেনারেল ফাদ রেডিও-যোগে জরুরী তাগাদা দিয়ে বলেছে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার

মধ্যে সারডি শহর দখল করতে হবে তাকে, তা না হলে তার জায়গায় নতুন কাউকে কমান্ডার করে পাঠানো হবে। মেজর লুইগি রাকা বাইবেল স্পর্শ করে তাকে জানিয়েছে, গোটা সারডি গিরিখাদ প্রায় খালি হয়ে গেছে, পিছু হটতে হটতে মাথার কাছে সরে গেছে অল্প কিছু রাসটা আর হারারি যোদ্ধা, তাদের কাছ থেকে কোন হামলা আশা করা যায় না। শেষ কারণ, এক ঝাঁক ট্যাংক-সদ্য এসে পৌঁচেছে ওগুলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা দখল করেছে কাউন্ট, সেই সঙ্গে নিরাপত্তা বোধ ফিরে এসেছে তার মনে। চলে এসেছে শিফটা বাহিনীর একেবারে সামনের সারিতে।

তার স্বপ্নিল ঘুম ভাঙল ড্রামের শব্দে। সটান উঠে বসল সে ট্যাংকের শক্ত মেঝেতে। চোখ বড় বড়, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। পিস্তলটা পাবার জন্য উন্মাদের মত হাতড়াতে লাগল অন্ধকারে। 'সাতা!' প্রায় কেঁদে ফেলল কাউন্ট, ড্রামের শব্দ তার বুকে হাতুড়ি ঠুকছে। 'সাতা!' কিন্তু সার্জেন্ট বানানটো সাতার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

দ্রিম দ্রিম শব্দটা পাগল করে তুলল তাকে। দু'হাতে কান চাপা দিল, কিন্তু তবু শুনতে পাচ্ছে, শব্দের সঙ্গে কাঁপছে ট্যাংকের খোল, কাঁপছে তার গোটা অস্তিত্ব। সহ্য করতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠল সে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল, জানে না কোথায় যাচ্ছে। এক সময় পিছনের হ্যাচ ঠেকল হাতে, সেটা খুলে বাইরে মাথা বের করল সে। 'সাতা!'

এবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল। খর্বকায় সার্জেন্ট ট্যাংকের জোড়া স্টীল ট্র্যাক-এর মাঝখানে পাখুরে মাটির উপর কন্মল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কাউন্টের ডাক শুনে মুখ থেকে কন্মল সরাল সে, কাউন্ট শুনতে পেল সাতার দাঁতগুলো সচল

টাইপরাইটারের মত শব্দ করছে।

‘ড্রাইভারকে পাঠিয়ে এই মুহূর্তে খবর দাও মেজর লুইগি রাকাকে।’

‘এই মুহূর্তে।’

কমল গায়ে নিয়েই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সাতা, কয়েক মিনিট পর এমন হঠাৎ করে আবার উদয় হলো সে যে আঁতকে উঠে তার কপাল বরাবর পিস্তল তাক করল কাউন্ট।

‘এক্সেলেন্সী!’ করুণা ভিক্ষা করল সাতা।

‘গাধার লেজ!’ খঁকিয়ে উঠল কাউন্ট, আতংকে খসখসে তার কর্ণস্বর। ‘আরেকটু হলেই তো খুন হয়ে যাচ্ছিলে-জানো না, চিতার মত ক্ষিপ্ত আমি?’

‘এক্সেলেন্সী, আমি কি ট্যাংকের ভিতর ঢুকতে পারি?’

অনুরোধটা এক মুহূর্ত বিবেচনা করল কাউন্ট, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। ‘আগে আমাকে এক কাপ কফি বানিয়ে দাও।’ কিন্তু কফি যখন এল, কাউন্ট বিমর্ষ দৃষ্টিতে দেখল ড্রামের শব্দ তার নার্ভের এমনই বারোটো বাজিয়ে দিয়েছে যে মগটা হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারছে না সে, মগের কিনারা দাঁতের সঙ্গে ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে।

‘ছাগলের মূত বানিয়ে এনেছ!’ মারমুখো হলো কাউন্ট, সাতাকে অস্থিরতার মধ্যে রাখতে চায়, যাতে সে দেখতে না পায় তার হাত কাঁপছে। ‘এ তো বিষ! আমাকে খুন করার ফন্দি!’ কফিসহ মগটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে গিরিখাদের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল মেজর লুইগি রাকার বিশাল দেহ।

‘যোদ্ধারা এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে, মাই কর্নেল,’ ভারি গলায় বলল সে। ‘আর পনেরো মিনিট পর দিনের আলো

ফুটলে...।’

‘গুড। গুড।’ তাকে থামিয়ে দিল কাউন্ট, ড্রামের শব্দ এড়াবার বুদ্ধি বের করে ফেলেছে সে। ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই মুহূর্তে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাব। জেনারেল ফাদের সাথে জরুরী একটা বিষয়ে পরামর্শ...।’

‘চমৎকার, মাই কর্নেল,’ এবার মেজরই বাধা দিল তাকে। ‘আমার কাছে গোপন রিপোর্ট আছে, শত্রুপক্ষের বিরাট একটা দল পাহাড় টপকে আমাদের পিছনে, ডানাকিল মরুভূমিতে পৌঁছেছে। আপনি গিরিখাদ থেকে বেরবার সাথে সাথে, সম্ভাবনা আছে তাদের সামনে পড়ে যাবেন।’ ইতিমধ্যে কাউন্টকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনবার সুযোগ হয়েছে মেজরের, জানে কী রোগের কী দাওয়াই। ‘আপনার সাথে ছোট একটা এসকর্ট থাকবে, কিন্তু তাতে কী, আপনি একাই তো একশো-শত্রুদের দলটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।’

‘কিন্তু আমি সিরিয়াসলি ভাবছি,’ গলায় অপ্রত্যাশিত জোর ফুটিয়ে বলল কাউন্ট, ‘আমার মনটা সন্তানতুল্য সৈনিকদের মাঝখানে রয়ে যাচ্ছে কিনা। মানুষের জীবনে এমন একটা সময়ও আসে যখন মাথার কথা না শুনে, শুনতে হয় হৃদয়ের কথা। এবং তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, রাকা-রক্তে আমার যুদ্ধ করার নেশা জাগছে।’

‘শুনে ধন্য হলাম, মাই কাউন্ট।’

‘আমি এই মুহূর্তে অ্যাডভান্স করব,’ ঘোষণা করল কাউন্ট, পিছনে শত্রুপক্ষের বিরাট দল আছে শুনে সামনে পালাতে চাইছে সে। ‘সাহসী যোদ্ধারা ভোর হবার অপেক্ষায় বসে থাকে না, বুঝলে?’

প্রস্তুতি নিতে নিতে ক্ষীণ আলো ফুটল আকাশে, আর সেই সঙ্গে অকস্মাৎ থেমে গেল ড্রাম পেটানোর আওয়াজ। আকস্মিক নিস্তন্ধতা বিস্ফোরণের মত বাজল কাউন্টের কানে, মুখ তুলে গিরিখাদের উপর দিকে তাকাল সে।

ধীরে ধীরে নতুন একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল স্তব্ধ বাতাসে। রাতের আকাশে পাখির ডানা ঝাপটানোর মত, অথচ সম্পূর্ণ অচেনা। তারপর আরেকটা শব্দ যোগ হলো, ক্ষীণ কিন্তু পরিষ্কার-বহুচপ্তের সম্মিলিত লু-লু। যেন কয়েকশো লোক একসঙ্গে আওয়াজ করছে।

‘মাতা মেরী, যীশু, যীশুর বাপ!’ ভয়ে আর বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল কাউন্ট।

প্রথমে মনে হলো পাথরের ধস নেমে আসছে। সেই সঙ্গে লু-লু ধ্বনিতে কেঁপে উঠল পাথর, মাটি, পাহাড়প্রাচীর, ট্যাংক আর কাউন্টের গোটা শরীর। তারপর চেনা গেল আকৃতিগুলো-পাথর নয়, মানুষের ঢল।

‘রাকা, তোমাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাব!’ চিৎকার করল কাউন্ট। ‘তুমি না বলেছিলে শত্রুপক্ষ হামলা করবে না?’ কিন্তু তার চিৎকার চাপা পড়ে গেল মেজর রাকার ককর্শ কমান্ডে। পরমুহূর্তে সামনের লাইন থেকে গর্জে উঠল মেশিনগানগুলো।

রাসটা আর হারারি যোদ্ধারা ঘর ভাঙা পিঁপড়ের মত ছড়িয়ে পড়ছে গিরিখাদে। দলে দলে, শয়ে শয়ে নেমে আসছে তারা। ঢেউ খেলানো গমের খেত যেন, আলাদাভাবে কাউকে চিনবার উপায় নেই। লাশের উপর জমা হতে লাগল লাশ, তবু তাদের অগ্রযাত্রার বিরাম নেই। মুঘলধারে বুলেট-বৃষ্টি হচ্ছে, ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে জনারণ্য, পিছন থেকে এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় সারি, চোখের

পলকে লাশে পরিণত হচ্ছে সবাই, তাদেরকে টপকে এগিয়ে আসছে আরেক দল।

অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা আতংক ভুলিয়ে দিল কাউন্টকে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল সে। বুলেট-বৃষ্টি এড়িয়ে শত্রুরা সামনে বাড়তে পারছে না, তবু দু’একজন কীভাবে যে ফাঁক-ফোকর গলে একেবারে সামনে চলে এল কেউ বলতে পারবে না। মেজর রাকার নির্দেশে তৈরি কাঁটাতারের বেড়ার সামনে পৌঁছেও থামল না তারা, ধারাল তরোয়াল দিয়ে তার কাটবার চেষ্টা করল।

কাঁটাতারের বেড়ার কাছে যারা পৌঁছল তাদের বেশিরভাগই মারা গেল প্রথম সারির শিফটা ট্রেঞ্চের সামনে। একটা করে রাইফেল গর্জে ওঠে, একজন করে ধরাশায়ী হয়। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেল, ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকছে দু’একজন রাসটা বা হারারি-মৃত্যুকে তারা বরণ করল বেয়োনেট বুকে নিয়ে। কাঁটাতারের বেড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দু’জন হারারি, মাটির সঙ্গে সমান হয়ে গেল বেড়াটা, সেই সঙ্গে মাথায় রাইফেলের বুলেট নিয়ে বেড়ার উপরই মুখ খুঁড়ে পড়ল তারা। পরমুহূর্তে তাদেরকে টপকে ছুটে এল তিনজন।

তিনজনের নেতৃত্বে রয়েছেন কংকালসদৃশ এক বৃদ্ধ। সাদা আলখেল্লা পরে আছেন তিনি। মাথায় কোন চুল নেই, খুলিটা কামানের গোলায় মত চকচক করছে। ঘামে ভেজা মুখে সাদা ধবধবে দাঁত মুক্তোর মত ঝলমলে। শুধু একটা তরোয়াল বহন করছেন তিনি, অস্বাভাবিক লম্বা আর চওড়া সেটা, মাথার উপর অনায়াসে বন বন করে ঘোরাচ্ছেন, মেশিনগান আর রাইফেলের বুলেটগুলোকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য পাহাড়ী ছাগলের মত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লাফ দিয়ে জায়গা বদল করছেন।

তাকে অনুসরণ করছে দু'জন হারারি, তাদের হাতে মাঝাতা আমলের রাইফেল। ছুটে আসছে তারা, কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে, তাদের লু-লু চিৎকার চাপা পড়ে গেল কামাল হাসানের রণহুংকারে।

দলটাকে টার্গেট করে গর্জে উঠল একটা মেশিনগান। ধরাশায়ী হলো সঙ্গী দু'জন, কিন্তু তালগাছের দৈর্ঘ্য নিয়ে আগের মতই লাফাতে লাফাতে ছুটে এলেন কামাল হাসান।

হতভম্ব কাউন্ট যেন তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সে। তার পাশ থেকে একটা মেশিনগান গর্জে উঠল, এবার কামাল হাসান সামান্য একটু হাঁচট খেলেন। কাউন্ট দেখল, বুলেট লেগেছে, টার্গেটের ঢোলা আলখেল্লা থেকে মিহি ধুলো উড়ল, ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল খানিকটা কাপড়, সেই সঙ্গে তাঁর বুকের কাছে ফুটল লাল রঙ। অথচ এখনও আগের মতই ছুটে আসছেন তিনি, এখনও তাঁর গলা থেকে রণহুংকার বেরচ্ছে, লাফ দিয়ে পেরিয়ে এলেন ট্রেঞ্চের প্রথম সারি, নাক বরাবর সোজা এক লাইনে দাঁড়ানো ট্যাংকগুলোর দিকে ধেয়ে আসছেন। তিনি যেন পরম শত্রু কাউন্ট ডিকানডিয়াকে চিনতে পেরেছেন, তাকেই বেছে নিয়েছেন স্বাধীনতা হরণকারীদের অন্যতম হিসাবে। কাউন্টের মনে হলো, একা শুধু তার প্রতিই আক্রোশ নিয়ে ছুটে আসছে লোকটা। লাল রঙ ছিঁড়িয়ে পড়েছে তাঁর বুকের উপর, তবু বাতাসে অনবরত শিস তুলছে তরোয়ালের ফলা। হাঁচট খাচ্ছেন তিনি।

মেশিনগানের শেষদফার বুলেটগুলো আঘাত করল তাঁকে, তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল তরোয়াল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তারপরও ঝল করে এগোলেন, তাকিয়ে আছেন মুখ তুলে সরাসরি কাউন্টের চোখে। চিৎকার করে

কী যেন বলতে চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ, কিন্তু আওয়াজের বদলে সাদা দাঁত ডুবে গেল মুখভরা তাজা রক্তে। গল গল করে রক্ত বমি করলেন তিনি। ঝল করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংকের সামনে পৌঁছে গেলেন। মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন কাউন্টের দিকে, কাউন্ট তার বেরেটা তাক করল কামাল হাসানের মাথা লক্ষ্য করে, কিন্তু আঙুল অসাড় হয়ে গেছে, ট্রিগার টানতে পারল না।

‘মারো!’ চিৎকার করল সে। ‘খতম করো!’

কিন্তু শিফটাদের রাইফেল বা মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে থাকল। এই অভাবনীয় দৃশ্য পাথর করে দিয়েছে তাদের।

চোখ বন্ধ করল কাউন্ট, অনেক চেষ্টা করে এক এক করে পরপর ছ’টা গুলি করল সে। ছ’ফুট দূরে ছ’বার ঝাঁকি খেলেন কামাল হাসান।

এক মিনিট পর চোখ মেলল কাউন্ট। কৃত্রিম দাঁত মুখ থেকে খসে পড়েছে কামাল হাসানের। সেদিকে সভয়ে তাকিয়ে থাকল সে। তার শরীর কাঁপছে। কামাল হাসান এখনও তাকিয়ে আছেন তার দিকে, চোখের স্থির মণিতে প্রাণ নেই।

কাউন্টের পাশে এসে দাঁড়াল মেজর রাকা। ঘোষণা করল, ‘গিরিখাদ শত্রুমুক্ত হয়েছে, সারডির পথ সম্পূর্ণ খোলা।’ তার নির্দেশে একযোগে বেজে উঠল কয়েকটা বিউগল, ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল শিফটা পদাতিক বাহিনী। স্টার্ট নিল ট্যাংকগুলো।

শিফটাদের এক অঙ্গাত পরিচয় সৈনিক পদাতিক বাহিনীর মিছিলে যোগ দেওয়ার আগে নিজের গা থেকে কম্বল খুলে ঢেকে দিল কামাল হাসানের লাশ। ট্যাংক নিয়ে রওনা হবার আগে লাশটার সামনে দাঁড়াল মেজর রাকা, কাউন্টের চোখ ফাঁকি দিয়ে কামাল হাসানকে স্যাঁলুট করল সে।

আঠারো

গিরিখাদের ঠিক ঠোঁটের কাছে বিশাল গ্র্যানিট পাথর সাজিয়ে উঁচু পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে, আর্মারড কলাম দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো। শিফটা পদাতিক বাহিনী এগিয়ে এল পাঁচিল ভাঙবার কাজে। পাঁচিলের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে রাসটা আর হারারি বাহিনীর কিছু যোদ্ধা, অকস্মাৎ মাথা তুলে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল তারা।

আতংকে অস্থির হয়ে দলে দলে পিছিয়ে আসতে শুরু করল শিফটারা, বেশিরভাগ পড়ে গেল পাঁচিলের কাছাকাছি গর্তের ভিতর, পাঁচিলের উপর থেকে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। ট্যাংকের সামনে কয়েকশো লোক ছুটোছুটি করছে, গানাররা সাহস করে গুলি ছুঁড়তে পারল না।

পরপর তিনবার, গোটা সকাল ধরে, পাঁচিলের কাছ থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো শিফটারা। কামানের গোলা ছুঁড়েও পাঁচ ফুট চওড়া গ্র্যানিট পাথরের তৈরি পাঁচিলের তেমন কোন ক্ষতি করা গেল না।

অঘোষিত যুদ্ধবিরতি শুরু হবার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা আর মাইকেল, বিশাল গ্র্যানিট পাথরে হেলান দিয়ে। দু'জনেই ওরা মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা।

‘আমি নীল দেখছি।’ পাহাড়চূড়ার মাথায় এখনও রয়েছে মেঘ, তবে শুকনো মরু বাতাসে ভেসে যাচ্ছে দ্রুত, মাঝে মধ্যে দু’একটা ফাঁক তৈরি হচ্ছে, ফাঁকের ভিতর নীল আকাশ, পরমুহূর্তে ফাঁকটা পূরণ করছে ঘন মেঘের ভেলা।

হঠাৎ উজ্জ্বল এক বলক রোদ গোটা উপত্যকা আলোকিত করে তুলল, ছায়া সরে যাওয়ায় সবুজ রঙ নিয়ে হেসে উঠল যেন পাহাড়গুলোর ঢাল।

‘জীবন ভারি সুন্দর!’ বিড়বিড় করল মাইকেল।

ঘড়ি দেখল রানা। ‘এগারোটা সাত। আর একটু পরই রেডিও মেসেজ পাঠাবে ওরা, আকাশ খালি হয়ে গেছে। পাইলটরা ককপিটে বসে আছে, এখানে পৌঁছুতে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে ওদের।’

সিধে হয়ে বসল মাইকেল, অক্ষত হাতটা দিয়ে চুল সরাল কপাল থেকে। ‘এক ভদ্রলোকের কথা জানি, ওরা যখন আসবে, তিনি তখন এখানে থাকবেন না।’

‘দু’জন ধরো,’ একমত হলো রানা।

‘আমাদের কাজ শেষ, ওল্ড চ্যাপ। যতটুকু করবার করেছি আমরা। দু’চার মিনিট এদিক-ওদিক হলে চকলেট সালে খিটমিট করবে বলে মনে হয় না। বম্বারগুলো যখন আসবে, দুপুর হতে বাকি থাকবে বড় জোর ওই দু’চার মিনিটই।’

‘বেচারি যোদ্ধাদের কী হবে?’ পাথুরে পাঁচিলের নীচে ওদের সঙ্গে যারা বসে রয়েছে তাদের দিকে হাত তুলল রানা। সংখ্যায় তারা কয়েকশো হবে, কামাল হাসান বাহিনীর অবশিষ্টাংশ।

‘বম্বার আসার শব্দ পেলেই ছুটবে ওরা, অনুমতি দিয়ে রাখো।’

‘ব্যখ্যা করে বোঝাবে কে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘যাই, বানুকে ডেকে আনি,’ ত্রল করে এগোল মাইকেল, পাঁচিলের গা ঘেঁষে, কারণ পাহাড়ের মাথায় শিফটলাইপাররা বসে আছে।

পাঁচশো গজ পিছনে ভাঁজবহুল মাটির উপর চারপাশে কর্কশ ঘাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চঞ্চলা, ওটাকে আড়াল করে রেখেছে কয়েকটা সেডার গাছ, রাস্তার পাশে।

একবার চোখ বুলিয়েই মাইকেল বুঝতে পারল উদ্ধার করবার সময় যে নড়বড়ে ভাবটা ছিল সেটা ইতিমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে অ্যানি, তবে চেহারা এখনও স্নান আর ক্লান্ত, পরনের ছোঁড়া কাপড়ে শুকনো রক্ত আর মাটির দাগ। কেবিনের মেঝেতে পড়ে রয়েছে ছেলেটা, তার শুশ্রুষায় বানুকে সাহায্য করছে অ্যানি, মাইকেলকে দেখে মুখ তুলে তাকাল।

‘কেমন আছে ও?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল, খোলা পিছনের দরজা দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল সে। দুটো বুলেট খেয়েছে আব্বাস, গিরিখাদ থেকে তাকে তুলে এনেছে বিশ্বস্ত দু’জন হারারি।

‘সেরে উঠবে ও, আমার ধারণা,’ বলল অ্যানি।

চোখ খুলে ফিসফিস করল আব্বাস।

‘মেজর মাইকেল-হ্যাঁ, সেরে উঠব আমি।’

‘উঠতেই হবে, তা না হলে পাওনা শাস্তিটা ভোগ করবে কে? তোমাকে আমি দায়িত্ব দিয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু হামলা করার দায়িত্ব দিইনি।’

‘মেজর সেভারস!’ বাট করে মুখ তুলল বানু, মায়ের মমতা নিয়ে আব্বাসকে রক্ষা করতে চাইল। ‘বীরত্ব আর সাহসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে...।’

‘ঈশ্বর! সাহসী আর সৎ মানুষদের কবল থেকে রক্ষা করো

আমাকে!’ হাঁপিয়ে উঠল মাইকেল, ‘দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলার জন্যে ওরাই দায়ী।’ বানু আবার তার উপর ঝাল ঝাড়বার সুযোগ পেল না, বলে চলল মাইকেল, ‘আমার সাথে চলো দেখি, কিছু অনুবাদ কর্ম সারতে হবে।’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আব্বাসকে ছেড়ে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল বানু। বেরিয়ে এল অ্যানিও, ইস্পাতের খোলার পাশে মাইকেলের কাছাকাছি দাঁড়াল সে। জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি ভাল তো?’

‘নেভার বেটার,’ অ্যানিকে আশ্বস্ত করল সে, কিন্তু অ্যানি দেখল মাইকেলের চেহায়ায় অস্বাভাবিক একটা রঙ ফুটে উঠেছে, চোখে যেন কীসের একটা নেশা নেশা ভাব।

বাট করে হাত বাড়াল অ্যানি, মাইকেল বাধা দেওয়ার আগেই তার আহত হাতটা ধরে ফেলল। বেলুনের মত ফুলে আছে ওটা। চামড়ার রঙ হয়েছে সবুজাভ লালচে, সামনের দিকে ঝুঁকতেই পুঁজের তীব্র গন্ধ পেল অ্যানি। উদ্বেগের সঙ্গে হাত তুলে মাইকেলের কপাল স্পর্শ করল সে।

‘সর্বনাশ! মাইকেল, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে!’

‘প্রেম আর আবেগ, ওল্ড গার্ল। তোমার চাঁপা কলার মত আঙুলের স্পর্শ পেয়েই...।’

‘হাতটা দেখতে দাও আমাকে,’ জেদ ধরল অ্যানি।

‘না দেখাই ভাল।’ অ্যানির চোখে চোখ রেখে, ঠোঁট টিপে হাসল মাইকেল। ‘কুকুরগুলো ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না, কী? সভ্য জগতে না ফেরা পর্যন্ত কারও কিছু করার নেই।’

‘মাইকেল...।’

‘ওখানে পৌঁছে, মাই ডিয়ার লেডি, তোমাকে বড় এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে দেব আমি, তারপর খবর পাঠাব পাদ্রিকে।’

‘মাইকেল, সিরিয়াস হও।’

‘এত সিরিয়াস কখনও ছিলাম না।’ অক্ষত হাতটা আঙুল দিয়ে অ্যানির চিবুক স্পর্শ করল মাইকেল। ‘ওটা বিয়ের একটা প্রস্তাব ছিল,’ বলল সে, অ্যানি অনুভব করল তার আঙুলের ডগা আঙনের মত গরম।

‘মাইকেল! ওহ্ মাইকেল!’

‘ধরে নিলাম তুমি বলছ-থ্যাংকস, বাট নো থ্যাংকস।’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল অ্যানি, কথা বলতে পারল না।

‘রানা?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল, আবার মাথা ঝাঁকাল অ্যানি।

‘কী জানো, আরও ভাল কাউকে পেতে পারতে তুমি। যেমন, আমাকে।’ তারপরই নিঃশব্দে হাসল সে, কিন্তু তাতানো শরীর থেকে ব্যথা আর বিষাদ অদৃশ্য আঁচের মত ঠিকরে বেরিয়ে এল। ‘আবার, আরও অনেক খারাপ কেউ কপালে জুটে যেতে পারত। যেমন, আমি।’ পরমুহূর্তে ঝট করে বানুর দিকে ফিরল সে, খপ করে তার কনুইয়ের উপরটা খামচে ধরল। ‘চলে এসো, মাই ডিয়ার।’ হাঁটতে শুরু করে কাঁধের উপর দিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল। ‘বন্ধার আসছে শুনতে পেলেই ফিরে আসব আমরা। ছোট্টার জন্যে তৈরি থেকো।’

‘তোমরা যাচ্ছ কোথায়?’ ওদের পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

‘এখনও জানি না।’ হেসে উঠল মাইকেল। ‘তবে চিন্তা করো না, নিরিবিলি একটা জায়গা ঠিকই আমরা খুঁজে নেব।’

প্রথম শুনতে পেল রানা, এত দূরে যে ঝিমানো দুপুরে এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জন বলে মনে হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা, ভেসে আসবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল পাহাড় প্রাচীর।

www.BanglaBook.org

‘আসছে ওরা,’ বিড়বিড় করল রানা, যেন সাই দিয়েই একটা শেল বিস্ফোরিত হলো পাঁচিলের অপরদিকে, গিরিখাদের এক মাইল পিছনে আবার জ্যাস্ত হয়ে উঠেছে শিফটা কামান। হলুদ ধোঁয়ার মোটা একটা স্তম্ভ পাঁচিলের মাথা ছাড়িয়ে রোদ জ্বলা বাতাসে উঠে গেল।

‘মুভ!’ গর্জে উঠল মাইকেল, কমান্ড হুইসেলটা টোটে তুলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করল কয়েকবার।

পাঁচিল ঘেঁষে ছুট দেওয়ার আগে রানা আর মাইকেল নিশ্চিত হয়ে নিল রাসটা আর হারারিরা সবাই সেডার জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েছে। জঙ্গল আর পাঁচিলের মাঝখানে উপত্যকায় কেউ নেই। ট্রেঞ্চগুলোও খালি। এবার নিজেরাও ওরা উপত্যকায় বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে বোমারুগুলো একেবারে পিঠের কাছে চলে এসেছে।

একটু থেমে মাইকেলের অক্ষত হাতটা ধরল রানা। ‘দৌড়াতে অসুবিধে হচ্ছে?’

মাথা নাড়ল মাইকেল, রানার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও জোরে পা চালাল, কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল একবার পিছন দিকে। দেখাদেখি রানাও।

গিরিখাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল প্রথম বোমারু, প্রসারিত কালো ডানা দুটো গোটা আকাশটাকে যেন ঢেকে ফেলতে চাইছে। পেট থেকে দুটো বোমা খসল। একটা পিছনে পড়ল, কিন্তু দ্বিতীয়টা আঘাত করল পাঁচিলে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ওরা, কেউ যেন শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় মারল ওদেরকে।

আবার যখন মাথা তুলল রানা, দেখল ধোঁয়া আর আঙনের মাঝখানে পাঁচিলটা ভেঙে গেছে। ‘পালাই হে চলো,’ মাইকেলকে টেনে তুলল ও। ‘খেল খতম হয়ে গেছে।’

‘আমরা যাচ্ছি কোথায়?’ ওদের নীচে, কেবিন থেকে চিৎকার করে জানতে চাইল অ্যানি; ড্রাইভারের সিট থেকে রানা বা টারিট থেকে মাইকেল, দু’জনের কেউই জবাব দিল না।

‘গাড়ি নিয়ে আমরা যদি সোজা ডেসি রোডে উঠে যাই, অসুবিধে কী?’ জানতে চাইল বানু, ‘সামনে পা মেলে দিয়ে কেবিনের মেঝেতে বসে আছে সে, কোলের ওপর আব্বাসের মাথা। কাপুরুষ গালাদের সাথে না পারার কিছু নেই, ঠিকই একটা রাস্তা করে নিতে পারব...।’

‘গ্যাসের যা অবস্থা তাতে আরও পাঁচ মাইল অনায়াসে যেতে পারব আমরা।’

‘গাড়ি নিয়ে আমরা সাকাল-এর গোড়ায় পৌঁছুতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়,’ প্রায় গোটা দক্ষিণ আকাশ ঢেকে রেখেছে পাহাড়টা, সেদিকে একটা হাত তুলে বলল মাইকেল। ‘ওখানে গাড়ি ফেলে হেঁটে পাহাড় উপকালে হবে।’

হ্যাচ গলে টারিটে, তার পাশে উঠে এল অ্যানি, দু’জনেই মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল আমরা সাকালের দিকে।

‘কিন্তু আব্বাসের কী হবে?’ জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

‘ওকে আমরা বয়ে নিয়ে যাব।’

‘পাহাড় উপকানো কোন দিন সম্ভব নয়। চারদিকে গালারা গিজগিজ করছে।’

‘আর কোন বিকল্প জানা আছে?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল, মরিয়া হয়ে নিজের চারদিকে তাকাল অ্যানি।

গোটা উপত্যকায় একা শুধু চঞ্চলাই সচল বস্তু। পাহাড়ের পাথুরে ঢালগুলো ধরে অদৃশ্য হয়ে গেছে রাসটা আর হারারিরা। চঞ্চলার পিছনে উপত্যকার ঠোঁট পেরিয়ে যে-কোন মুহূর্তে উঠে

আসবে শিফটাদের ট্যাংক বহর।

হতাশ হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলল অ্যানি, চূড়াগুলো ছুঁয়ে অল্প কিছু মেঘ এখনও ইতস্তত করছে। হঠাৎ করে তার সমস্ত মনোবল ফিরে এল, বদলে গেল গোটা মেজাজ। চিবুক উঁচু করল সে, মুখে ফিরে এল সমস্ত রঙ। দুই চূড়ার মাঝখানের ফাঁকটায় হাত তুলল সে, হাতটা কাঁপছে। ‘হ্যাঁ,’ উল্লাসে চিৎকার করল অ্যানি। ‘বিকল্প একটা জানা আছে আমার। তাকাও! উফ, এখনও তাকাচ্ছ না!’

খাড়া ভাবে নামতে শুরু করায় ছোট নীল প্লেনটা রোদে ঝিক্ করে উঠল, দুই চূড়ার মাঝখানে পৌঁছে সিধে করল ডানা, রঙিন প্রজাপতির মত ঝলমল করছে গা।

‘শিফটা প্লেন?’ হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকল মাইকেল।

‘না! না!’ দ্রুত মাথা নাড়ল অ্যানি। ‘ওটা প্রিন্স সালের প্লেন। চিনি, আমি চিনি। প্রিন্সকে নেয়ার জন্যে আগেও একবার এখানে এসেছিল।’ প্রায় উন্মাদিনীর মতই হাসছে সে, দামী পাথরের মত চকচক করছে চোখ। ‘প্রিন্স বলেছিল, ওটা পাঠাবে সে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সময় এই কথাটাই বলার চেষ্টা করেছিল সে...।’

‘ল্যান্ড করবে কোথায়?’ জানতে চাইল মাইকেল।

হ্যাচ গলে ড্রাইভারের পাশে নেমে গেল অ্যানি উইসপার, পথ নির্দেশ দিয়ে পোলো গ্রাউন্ডের দিকে নিয়ে চলল গাড়িটাকে। শহরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ওরা দেখল ঘর-বাড়ি থেকে এখনও ধোঁয়া বেরচ্ছে।

চোখেমুখে ব্যাকুল আত্মহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা সবাই, শুধু আব্বাস বাদে, খোলা মাঠের কিনারায় চঞ্চলার পাশে দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করছে। মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে প্লেনটা, সেটার সঙ্গে ঘুরছে ওদের মাথা।

‘ব্যাটা করছেটা কী!’ রাগের সঙ্গে বলল রানা। ‘শিফটারা এলে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে?’

‘লোকটা নার্ভাস,’ আন্দাজ করল মাইকেল। ‘এখানে কী ঘটছে জানে না। দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছে সে-শহরটা পুড়ছে, আর ট্যাংক। ট্যাংকের সাথে বোধহয় ট্রাকগুলোও ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছে গিরিখাদ থেকে।’

ওদের দিকে পিছন ফিরে আর্মারড কারের দিকে ছুটল অ্যানি, টারিটে উঠে সিঁধে হয়ে দাঁড়াল, ঘন ঘন হাত নাড়ল পাইলটের উদ্দেশে।

পরবর্তী চক্করে আরও অনেক নীচে নামল পুস মথ, ককপিটের পাশের জানালায় পাইলটের মুখ দেখতে পেল ওরা, ওদের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে। তারপর বিধ্বস্ত শহরের উপর দিয়ে ছুটে এল প্লেনটা, প্রতি মুহূর্তে নীচে নামল, চঞ্চলার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় মাঝখানে ব্যবধান থাকল মাত্র দশ গজের মত-টারিটে দাঁড়ানো অ্যানিকে ভাল করে দেখে নিল পাইলট।

অ্যানি চিনতে পারল পাইলটকে, প্রিন্স সালেকে নিয়ে যাবার জন্য এই লোকটাই এসেছিল। পাইলটও চিনতে পেরেছে অ্যানিকে, ককপিটের ভিতর সহাস্যে হাত নাড়ল সে।

পরের বার মাঠে নেমে এল হালকা পুস মথ। ছুটে এসে থামল ওদের সামনে। জানালার কাঁচ সরিয়ে মাথা বের করল পাইলট, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার চিৎকার, ‘হালকা তিনজনকে নিতে পারি, ভারি হলে দু’জনের বেশি নয়। চারদিকে পাহাড়, ওজন বেশি হলে চূড়ায় ধাক্কা খাব।’

নিমেষের জন্য দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর মাইকেল,

পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা টানে কেবিনের দরজা খুলে ফেলল রানা, প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢোকাল মেয়ে দুটোকে। কেবিনটা ছোট, দু’জন উঠবার পর আর প্রায় কোন জায়গাই থাকল না।

‘থামো,’ পাইলটের কানে বোমা ফাটল মাইকেল। ‘হালকা আরও একজন আছে।’

দু’জন ধরাধরি করে চঞ্চলার কেবিন থেকে বের করে আনল আব্বাসকে। এরইমধ্যে বাতাসের দিকে পিছন ফিরবার জন্য প্লেন ঘুরিয়ে নিতে শুরু করেছে পাইলট, আব্বাসকে নিয়ে প্লেনের পিছু পিছু ছুটতে হলো ওদেরকে।

‘রানা...!’ রুদ্ধকণ্ঠে ডাকল অ্যানি, চিৎকার করতে চাইলেও তার গলা ভেঙে গেল, চোখে উন্মাদিনীর দৃষ্টি।

‘চিন্তা কোরো না,’ পাল্টা চিৎকার করল রানা, ওর আর মাইকেলের হাত থেকে মেয়েরা নিজেদের হাতে তুলে নিল আব্বাসকে, প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে এখনও ছুটছে ওরা। ‘চিন্তা কোরো না,’ আবার বলল রানা, ‘আমরা ঠিক বেরিয়ে যাব...।’

‘রানা...,’ কী যেন বলতে চেয়েও পারল না অ্যানি, নীচের ঠোট কামড়ে ধরেও নিজেকে সামলাতে পারল না, দু’চোখ ভাসিয়ে দিয়ে পানি বেরিয়ে এল, ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। ‘ওহ্, রানা...!’

প্লেনের সঙ্গে এখন শুধু একা রানা ছুটছে, লম্বা করা হাত দিয়ে কেবিনের দরজাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করছে ও। টেক-অফ করবার জন্য বেড়ে গেল প্লেনের গতি, কিন্তু আব্বাসের একটা পা বেরিয়ে থাকায় দরজাটা বন্ধ করতে পারছে না রানা। পা-টা ভিতরে ঠেলে দেওয়ার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল ও, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মাথার এক ইঞ্চি উপর দিয়ে ছুটে গেল একটা রাইফেল বুলেট। ফিউজিলাজের ক্যানভাস আবরণ ভেদ করল সেটা।

ঝট করে মুখ তুলতেই রানা দেখল পরবর্তী বুলেটটা ককপিটের পাশের জানালার কাঁচ ভেঙে সরাসরি পাইলটের জুলফির ভিতর ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিট থেকে কাত হয়ে পড়ল পাইলট, বুলে থাকল শুধু শোল্ডার স্ট্র্যাপের সঙ্গে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁকা পথ ধরল প্লেন, রানা দেখল পাইলটের লাশের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে থ্রটলটা বন্ধ করে দিল অ্যানি। ঘুরে দাঁড়িয়ে চঞ্চলার দিকে ছুটল রানা।

ওরা ছুটেছে, ওদের পায়ের কাছে ধুলো ওড়াচ্ছে রাইফেলের বুলেট।

‘কোথায় ওরা?’ মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘বাঁ দিকে।’

ঘাড় ফেরাতেই দুশো গজ দূরে, মাঠের কিনারায় ঘাসের ভিতর শিফটা রাইফেলম্যানদের দেখতে পেল রানা। ওদের পিছনে বড় একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও পিছনে, আরও অনেক পিছনে দেখা গেল ট্যাংকগুলোকে, হেলেদুলে এগিয়ে আসছে।

চঞ্চলার এঞ্জিন চালুই রয়েছে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শিফটাদের দিকে ছুটল রানা, টারিট থেকে ভিকার্স মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ল মাইকেল। লাফিয়ে উঠল শিফটারা, সম্ভ্রান্ত ইঁদুরের মত ছুটে পালাল।

মাইকেল এবার গুলি করল ট্রাক লক্ষ্য করে। ফুয়েল ট্যাংক বাঁঝরা হয়ে গেল, গোটা ট্যাংক ঢাকা পড়ল লাল আগুনে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চঞ্চলাকে প্লেনের কাছাকাছি দাঁড় করাল রানা, হাইপাররা গুলি করলে এখন আর্মারড কারের গায়ে লাগবে।

ইতিমধ্যে অ্যানি আর বানু ধরাধরি করে পাইলটের লাশ ককপিট থেকে নামিয়ে ফেলেছে। লোকটা লম্বা-চওড়া, কাঁধ দুটো ভারি। তার দিকে পিছন ফিরে ককপিটে উঠল অ্যানি, কন্ট্রোলার

পিছনে বসে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধল নিজেকে।

‘গড!’ বলল রানা, চেহারায় পরম স্বস্তি ফুটে উঠল। ‘এক বার বলেছিল বটে প্লেন চালাতে জানে!’

রাইফেলের একটা বুলেট ইস্পাতের খোলে লেগে পিছলে গেল, ছুটে গেল ওদের মাথার উপর দিয়ে।

পাইলটের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইকেল। ‘ওর মৃত্যু ভারি তাৎপর্যপূর্ণ।’

‘আর মাত্র একজনের জায়গা হবে,’ ককপিট থেকে চিৎকার করল অ্যানি। ‘তোমাদের দু’জনকেই তুলে নিলে, পাহাড় উপকানো সম্ভব হবে না।’ দু’জনেই ওরা দেখতে পেল, কথাগুলো বলতে গিয়ে আত্মপীড়নে জর্জরিত হলো অ্যানি।

চঞ্চলার খোলে আরেকটা বুলেট লাগল।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার চিৎকার করল অ্যানি, ‘আর মাত্র একজনকে নেয়া যাবে প্লেনে।’

‘কে যাবে?’ চোখে বিদ্রোপাত্মক, শয়তানি হাসি নিয়ে রানার দিকে তাকাল মাইকেল।

শান্ত সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, ‘কার যাওয়া দরকার? কার চিকিৎসা প্রয়োজন?’

‘তুমি জানো না, ওল্ড চ্যাপ, দান করা জিনিস নিই না আমি?’ বাঁকা হাসি ফুটল মাইকেলের মুখে। ‘এসো টস করি।’ ভোজবাজির মত আবার একবার তার হাতে বেরিয়ে এল তাজ্জানিয়ান শিলিংটা। রানার মুখের উপর নিঃশব্দে হাসল সে।

‘হেডস,’ বলল রানা।

রোদের ভিতর ঘন ঘন ডিগবাজি খেতে খেতে শূন্যে উঠে গেল শিলিংটা, অক্ষত হাতের তালুতে সেটাকে নামতে দিল মাইকেল,

ঝুঁকে তাকাল। ‘জানতাম কোন এক সময় ঘটবে ব্যাপারটা-অবশেষে জিতলে তুমি।’ মাইকেলের নিঃশব্দ হাসি মুখের কোণগুলো উঁচু করে তুলল। ‘ওয়েল ডান, ওল্ড চ্যাপ। বিদায়।’

কিন্তু কজিটা চেপে ধরল রানা, শিলিংটার দিকে তাকাল ও। ‘টেইলস!’ ধমকে উঠল ও। ‘প্রথম থেকেই জানতাম তুমি একটা চাঁট, ইউ বাস্টার্ড!’ ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল ও। ‘তোমাদের টেক-অফ কাভার দেব আমি, অ্যানি। প্লেন আর শিফটাদের মাঝখানে রাখব চঞ্চলাকে, যতক্ষণ পারা যায়!’ বলেই পিছন ফিরল রানা।

ওর পিছনে ঝুঁকল মাইকেল, প্রায় আধ সের ওজনের একটা পাথর হাতে নিয়ে সিঁধে হলো। ‘দুঃখিত, ওল্ড চ্যাপ। লাগলে বলো, কী?’ বিড়বিড় করল সে। ‘কিন্তু এরইমধ্যে আমার হৃদয়টা দখল করে নিয়েছ তুমি, বন্ধু!’ হাতের পাথরটা দিয়ে রানার মাথার পিছনে সাবধানে মারল সে, পাথরটা ফেলে দিয়ে অজ্ঞান শরীরটাকে অক্ষত হাতের ভাঁজে আটকাল।

রানার শিরদাঁড়ার নীচে একটা হাঁটু ঠেকিয়ে, হাঁটুটা উঁচু করল মাইকেল, এক ধাক্কাতেই প্লেনের কেবিনে তুলে দিল ওকে। তারপর একটা পা তুলে রানার পাজরে ঠেকাল, পায়ের চাপে দরজা থেকে ভিতর দিকে ঠেলে দিল শরীরটাকে। বন্ধ করে দিল দরজা।

পর্দার মত কাজ করছে চঞ্চলা, সেটার খোলে একের পর এক বুলেট লাগছে। পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগটা বের করে আনল মাইকেল। পাশের জানালা দিয়ে অ্যানির কোলে ফেলল সেটা। সামনে কন্ট্রোল নিয়ে নিষ্প্রাণ মূর্তির মত বসে আছে অ্যানি।

‘রানাকে বলো, আমি যদি আগে না পৌঁছাই, চকলেট সালের

চেকটা ক্যাশ করে তোমাকে যেন এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে দেয় আমার তরফ থেকে-আর, তাতে যখন চুমুক দেবে, স্মরণ করো সত্যিই তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম।’ অ্যানি জবাব দেওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়াল সে, ছুটল চঞ্চলার দিকে, আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়ল খোলের মাথায়, সেখান থেকে হ্যাচ গলে নেমে গেল ড্রাইভারের সিটে।

পাশাপাশি, হরিহর আত্মার মত, আর্মারড কার আর ছোট নীল প্লেনটা খোলা মাঠ ধরে ছুটল, শিফটাদের বিরতিহীন গুলি মুষ্ণুধারে বৃষ্টির মত আঘাত করছে ইস্পাতের খোলে।

তারপর, ধীরে ধীরে, দ্রুতগতি চঞ্চলাকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল অসম্ভব ভারি পুস মথ। ইতিমধ্যে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে ওরা। মাটি ছেড়ে প্লেনের চাকা শূন্যে উঠে পড়ল, অনুভব করে বাট করে পিছন ফিরল অ্যানি, চোখে দিশেহারা দৃষ্টি।

ড্রাইভারের হ্যাচের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল, অ্যানির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কিছু বলছে সে, শব্দগুলো শুনতে না পেলেও তার ঠোঁট জোড়া নড়তে দেখল অ্যানি। নোংরা ব্যাভেজ বাঁধা হাতটা মাথার উপর তুলল মাইকেল, দু’তিন বার নেড়ে বিদায় জানাল। নিঃশব্দ হাসিটুকু এখনও লেপ্টে রয়েছে ঠোঁটের কোণে।

খোলা মাঠের কিনারায় চঞ্চলাকে দাঁড় করাল মাইকেল, উঠে দাঁড়াল হ্যাচের উপর, অক্ষত হাতটা কপালে তুলে রোদ ঠেকাল, মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল ছোট নীল প্লেনটার দিকে-ভারি পাহাড়ী বাতাস কেটে অত্যন্ত ধীরগতিতে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পাহাড়শ্রেণীর মধ্যবর্তী ফাঁকটার দিকে উঠে যাচ্ছে, গিরিখাদ ওখান থেকে উঠে

গেছে হাইল্যান্ডের দিকে।

তার সমস্ত মনোযোগ রয়েছে আকাশের কোণে দোদুল্যমান নীল বিন্দুটার দিকে, কাজেই বুঝতে পারল না তিনটে সিঁচি খ্রি ট্যাংক মেইন রোড ছেড়ে গ্রামে ঢুকে পড়েছে, চলে এসেছে পাঁচশো গজের মধ্যে।

এখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মাইকেল, ট্যাংকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। টারিট থেকে লম্বা স্প্যাডাউ ঘুরে গেল ওর দিকে।

কামানের গর্জন শুনতে পায়নি মাইকেল, কারণ শব্দ তার কানে ঢুকবার অনেক আগেই আঘাত করল গোলাটা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কাই শুধু অনুভব করল সে, মনে হলো পৃথিবী কক্ষচ্যুত হলো, হ্যাচ থেকে পড়ে গেছে।

বিধ্বস্ত খোলের পাশে মাটিতে পড়ে থাকল সে, অক্ষত হাতটা দিয়ে শরীরের নীচের অংশটার স্পর্শ পাবার চেষ্টা করল, কারণ তার পেটে কী যেন একটা ঘটে গেছে। হাতড়াতে হাতড়াতে নীচে নামল হাতটা, কিন্তু যেখানে পেট থাকবার কথা সেখানে কিছুই ছুঁতে পারল না সে। রয়েছে শুধু বিশাল একটা গর্ত, গর্তের ভিতর হাতটা ধীরে ধীরে নড়াচড়া করল, পচা কোন ফলের শাঁসের মত থকথকে আর নরম কী যেন ঠেকল আঙুলে।

হাতটা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল মাইকেল, কিন্তু পারল না। পেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। মুখ খুলবার চেষ্টা করল, বুঝতে পারল আগে থেকেই হাঁ হয়ে আছে সেটা। চোখ খুলবার চেষ্টা করতে গিয়েও বুঝল, বিস্ফারিত হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। অন্ধকার তার মাথার ভিতর, আর হিম ঠাণ্ডা সারা শরীরে।

চিন্তা শক্তি লোপ পাচ্ছে মাইকেলের। রানার কথা মনে পড়ল তার, সে বলতে চাইল, ‘তুমিই জিতে গেলে, ওল্ড চ্যাপ, কী?’

কিন্তু ঠোঁট থেকে কোন শব্দ বেরল না। অ্যানির কথা মনে করতে চেষ্টা করল, কিন্তু চেহারাটা কিছুতেই মনে করতে পারল না ঠিকমত। তারপর সে অনুভব করল, এক রকম তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হাতটা নড়ছে।

চেষ্টা করল মাইকেল, দেখল পারছে। হাতটা টেনে কোমরের কাছে আনতে চাইল পকেটটা পেল না, কিন্তু যেটা খুঁজছিল সেটা পেয়ে গেল আঙুলের ডগায়। হাসতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু ঠোঁট নড়ল কিনা বুঝতে পারল না।

অন্ধকার আর হিম ঠাণ্ডার মধ্যে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল মাইকেল, ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলছে। ‘ব্যাটা মারা গেছে!’

মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে মাইকেল ভাবল, ‘হ্যাঁ, গেছি। এবার সত্যি গেছি।’ আবার হাসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু তার ঠোঁট শুধু কাঁপল। দাঁতগুলো কামড়ে ধরে আছে গ্রেনেডটার পিন।

‘ব্যাটা মারা গেছে, মাই কাউন্ট,’ আবার বলল বানানটো সাতা।

‘তুমি ঠিক জানো?’ ট্যাংকের টারিট থেকে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল কাউন্ট।

‘ঠিক জানি, মাই কাউন্ট।’ মাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করল সাতা। ‘যার শরীর প্রায় দু’টুকরো হয়ে গেছে সে আবার বেঁচে থাকে কী করে?’ ককর্শ ঘাস আর কাদার ভিতর মোচড় খেয়ে রয়েছে মাইকেলের ঘাড় আর মাথা।

ট্যাংক থেকে নেমে এল কাউন্ট, টেনেটুনে ঠিকঠাক করল ইউনিফর্মটা। সে-ও পরীক্ষা করল মাইকেলকে। ‘তুমি ঠিকই বলেছ, সাতা। লোকটা মারাই গেছে।’

‘বাঁচা গেল!’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল বানানটো সাতা।

‘সাতা!’ হঠাৎ গর্জে উঠল কাউন্ট। ‘তোমার ক্যামেরা কোথায়?’

‘আনছি, মাই কাউন্ট!’ এক ছুটে চলে গেল সাতা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ক্যামেরা নিয়ে।

‘টেরোরিস্টের পাশে দাঁড়িয়ে গোটা কতক ছবি তোলা দরকার,’ বলে মাইকেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কাউন্ট, পোজ দিল।

ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ রেখে তৈরি হলো সাতা। ‘চিবুক আরেকটু ওপরে তুলুন, মাই কাউন্ট।’

পিন খুলবার পরপরই মারা গেছে মাইকেল সেভারস, বিস্ফোরণের খবর তার জানা হলো না। বানানটো সাতা বা কাউন্ট ডিকানডিয়া, বিস্ফোরণের পর দু’জনের কাউকেই আলাদাভাবে চিনবার উপায় থাকল না। মাংস আর হাড় আলাদা হয়ে গেছে, কোন কিছুরই কোন আকৃতি নেই।

গিরিখাদের শেষ চূড়াটা পেরিয়ে এল অ্যানি, প্লেন আর চূড়ার মাঝখানে এক সময় ব্যবধান দাঁড়াল মাত্র পঞ্চাশ ফুট। চূড়া যদি আর খানিক উঁচু হত, পুস মথ সরাসরি ধাক্কা খেত সেটার সঙ্গে, কারণ আকাশের আরও উপরে উঠবার শক্তি ওটার নেই।

তার সামনে হাইল্যান্ড বিস্মৃত হয়ে আছে দক্ষিণ দিকে সেই আদিস আবাবা পর্যন্ত। তার নীচে সরু ডেসি রোড। অ্যানি দেখল, রাস্তাটা সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে। কমিউনিস্ট বাহিনী চলে গেছে লেক টানার দিকে, সম্ভবত ছোট একটা দল নিয়ে গিরিখাদে ঢুকেছে প্রিন্স সালে। হঠাৎ মনে পড়ায় রেডিওটা অন করল সে।

স্টেশন ধরাই ছিল, ঘোষকের উল্লসিত কণ্ঠস্বর আঘাত করল অ্যানির কানে, ‘লেক টানায় কমিউনিস্ট বাহিনীর বিরাট সাফল্য

অর্জিত হয়েছে। রেডিও আদিস আবাবা এখন আমাদের দখলে...।’

স্বস্তি বোধ করলেও, সুসংবাদটা তেমন আনন্দ বয়ে আনল না। শরীর সামান্য ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল অ্যানি। দীর্ঘ সারডি গিরিপথ নিখর পড়ে আছে। দু’পাশের পাহাড় প্রাচীরের মাথা থেকে নীচে নামছে বিপুল জলরাশি, তার মনে হলো এমনকী পাহাড়গুলোও যেন কাঁদছে।

সিটের উপর সিধে হয়ে বসল অ্যানি উইসপার, গালে হাত তুলল। তার দুই গাল চোখের পানিতে ভিজে গেছে অনুভব করে মোটেও বিস্মিত হলো না সে। মাইকেলের দরাজ গলা যেন শুনতে পেল ও, ‘আমি লোকটা অত খারাপ ছিলাম না, অ্যানি, কী?’
